

# দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস

রাজনৈতিক কূটনৈতিক ও সামরিক

[ তৃতীয় খণ্ড ]

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়



নবভারত পাবলিশার্স

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ : ভাদ্র, ১৩৬৭

প্রকাশক : শ্রীরণজিৎ সাহা, নবভারত পাবলিশার্স, ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯

মুদ্রক : প্যারিট প্রেস, ১২ নরেন্দ্র সেন কোয়ার্টার, কলিকাতা ৯

## উৎসর্গ

‘মহাবিজ্রোহী রণক্লাস্ত  
আমি সেই দিন হবো শাস্ত  
যবে উৎপীড়িতের কন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না  
অত্যাচারীর খজা কুপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না—’

বিজ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম

—১৯২২ সালে হুগলী চুঁচুড়াতে যার সঙ্গে আমার জীবনের প্রথম সাক্ষাৎ ও  
গভীর স্নেহের স্পর্শ আশুও অবস্মরণীয় হয়ে আছে, তাঁর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে।





## তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকা

নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো। এই তৃতীয় খণ্ডেই মহাযুদ্ধের সম্পূর্ণ ইতিহাস শেষ হয়ে গেল। এই তৃতীয় খণ্ডে আগের দুই খণ্ডের মতই মহাযুদ্ধের রণনীতি, রাজনীতি ও মানবিক দিকসংক্রান্ত বহু রোমাঞ্চকর, উদ্বেজনাপ্রদ এবং মর্যাদাসিক ঘটনাবলীর সমাবেশ ঘটেছে। এই খণ্ডে এমন সমস্ত তথ্য আছে, যা আমাদের দেশে অন্ততঃ বাংলা ভাষায় আগে কখনও প্রকাশিত হয়নি। সমগ্র ইতিহাস অপেক্ষাপাতভাবে রচনার জন্য এমন সমস্ত পুস্তক বিদেশ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, যেগুলি আমাদের সুবিখ্যাত গ্রন্থাগার লাইব্রেরীতেও প্রাপ্য নয়। প্রত্যেকটি ঘটনাকে নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণিক করার জন্য পাদটীকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য যে, মহাযুদ্ধের এই ইতিহাস রচনার পৃথিবী প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের গ্রন্থগুলিরই সাহায্য নেওয়া হয়েছে এবং ত্রিশ বছরের অধিক কাল আমার কেটেছে মহাযুদ্ধের তথ্যাবলীর পিছনে। আশা করি আমার সেই পরিশ্রম একেবারে বৃথা যায়নি।

জার্মানী ও জাপানের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মধ্যে এই মহাযুদ্ধের ইতিহাস সম্পূর্ণ হলো নবম ও দশম পর্বে। অর্থাৎ ১৯৪৫ সালের মে ও আগস্ট মাসে নাৎসী জার্মানী ও জাপানী জাপানের চূড়ান্ত পরাজয়ের মধ্যে দশটি পর্বে বিভক্ত এই মহা নাটকীয় ইতিহাসের স্ববিনীতা পড়লো। কিন্তু স্ববিনীতা পড়ার আগে পাঠকবর্গ প্রত্যেকটি অঙ্কে এমন সমস্ত পরিবর্তনের সম্মুখীন হবেন, যেগুলি রোমহর্ষক। যেমন, নবম পর্বের গোড়াতেই রাহন নদী অতিক্রম ও বালিন দখল নিয়ে প্রচণ্ড বিতর্কের ঢেউ উঠেছিল। কিন্তু চার্চিলের অপারিসীম আগ্রহ ও হুটুয়াঙ্ক সত্ত্বেও বালিন নগরী ইন্-মার্কিন দখলে গেল না, গেল ইয়ালিনের লালকোজের দখলে। চার্চিল অনেক দিন পক্ষ এহু 'শোক' ভুলতে পারেননি, যার ফলে যুদ্ধাবস্থার সঙ্গে সঙ্গে 'গ্রেট কোয়ালিশন' ভেঙে গেল এবং ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূত্রপাত হল।

মার্শাল জুকোভ, মার্শাল কোনেভ, মার্শাল রকোসোভোজি প্রভৃতি ব্যাভনামা সোভিয়েত সেনাপতিদের নেতৃত্বে এবং সুপ্রিম কমান্ডার-ইন-চিফ মার্শাল ইয়ালিনের নির্দেশে লালকোজের দুর্গমনীয় বালিন আক্রমণ যে কোন যুগে সামরিক ইতিহাসের পক্ষেই অত্যন্ত মর্যাদার ঘটনা। হিটলার তখন বালিনের ভূগুণে আত্মম আশ্রয়ে এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তঁর পরাজয় স্বীকারে অসম্মত ছিলেন। পরাজয় জাতির বেঁচে থাকার যে অধিকার নেই, এমন মনোভাব প্রকাশ করে হিটলার তার স্বদেশবাসীকে ধ্বংস ও অপবৃত্ত্যর মুখে ঠেলে দিতেও বিবেকের বিন্দুমাত্র সংশয় অনুভব করেননি। অবশেষে নিকশার ও হত্যার হিটলার ভূগুণের সেই সুসজ্জিত আশ্রয়ে প্রাণহীন হওয়া ব্রাউনসহ আত্মহত্যা করলেন। অবশ্য তার আগেই তাঁর ক্যাসিট মিডা মুশোলিনীও তাঁর উপপরিষ্কার পেডালিসহ ইতালিয়ান গেরিলাদের (কমিউনিস্ট) হাতে ধৃত ও নিহত হয়েছিলেন। হিটলার তাঁর জীবনের অন্তিম লগ্নে তাঁর একান্ত

সুহৃদের এই ভয়াবহ মৃত্যুর কথাও শুনে গিয়েছিলেন। ক্যাসিট ডিক্টেটর দ্বা  
অত্যাচারের রাজত্ব যে ভয়াবহ ট্রাজিডির মধ্যে শেষ হয়েছিল, পাঠকবর্গ এই পুস্তকে  
সেই করুণ দৃশ্যেরও রেখাচিত্র পাবেন।

এরপর জাপানের পাল। বৃটিশ কলভেন্টের মৃত্যুর পর টুম্যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের  
নতুন প্রেসিডেন্টরূপে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা ও সহযোগিতা বজায়  
রাখতে উৎসুক ছিলেন না, তবু জাপানকে পরাজিত করার জন্য সোভিয়েত রাশিয়া  
সাহায্য না নিয়েও উপায় ছিল না। কিন্তু আমেরিকা কর্তৃক এ্যাটোমিক বোমা  
নির্মাণ ও প্রয়োগের পারমাণবিক শক্তি আবিষ্কারের পর এই মনো প্রবেরও বদল হয়ে  
গিয়েছিল। তবু ঐতিহাসিক পটভূমি সম্মেলনে ব্রিটিশ, মার্কিন ও সোভিয়েত এই  
তিন মহাশক্তির সহযোগিতা অক্ষুণ্ন রইল এবং জাপানের উদ্দেশ্যে চরমপন্থা ঘোষিত  
হলো।

পারমাণবিক শক্তি ও পারমাণবিক বোমার আবিষ্কার এবং পরীক্ষা সম্পর্কে  
বিশ্বাসম্ভব নির্ভরযোগ্য বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যে বিবরণীতে পাওয়া যাবে ঐ  
কালান্তক বোমার জনক সুপার ও শ্রীমন্তগবতগীতা ভক্ত-বিজ্ঞানী ওপেন হাইমারের  
বিচিত্র বাহিনী। এই অধ্যায়টি রচনায় একজন বিশিষ্ট বাঙালী বিজ্ঞানীর (ড. প্রব  
মার্জিত) সুলিখিত প্রবন্ধের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। এই জন্য তাঁর কাছে আমি  
কৃতজ্ঞ।

দেশপ্রেমিক ও সাম্রাজ্যবাদী জাপানের আত্মসমর্পণকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত  
উদ্বেজনাপূর্ণ নাটকীয় ঘটনার সমাবেশ হয়েছিল, সেগুলির বিস্তৃত বিবরণ আগে  
আমাদের দেশে জানা ছিল না—যেমন, স্বয়ং সম্রাটকে গ্রেপ্তার ও বন্দী করার জন্য উগ্র  
মন্তব্য তরু। জাপানী সৈন্যেরা এক চাকল্যকর যত্নবদ্ধ করেছিল। যে দেশে সম্রাটকে  
ভগবানের মত ভক্তি করা হয়ে থাকে, সেই দেশে তাঁকেই গ্রেপ্তারের যত্নবদ্ধ মাধ্যম  
বৈকি ?

জ্যেত্মবার্গের আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতে জার্মান যুদ্ধাপরাধীদের বিচার  
এবং বাবা বাবা নাৎসী রণনায়কদের প্রাণদণ্ড দানের কাহিনী যেমন ঐতিহাসিক  
কারণেই উল্লেখযোগ্য, তেমনি প্রাণধানযোগ্য দুরপ্রাচ্যের আন্তর্জাতিক সামরিক  
আদালতে জাপানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং সেই প্রসঙ্গে ভারতের (বাংলার)  
সুপ্রসিদ্ধ আইন বিশেষজ্ঞ বিচারপতি ড. রাধাবিনোদ পালের ভিন্ন অভিমত জাপকে  
যে রায় সৈন্যদের আন্তর্জাতিক মহলে চাকল্যের সৃষ্টি করেছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের  
প্রকাশিত বিবৃতিটি প্রামাণিক এবং তথ্যবহুল। পুস্তকের শেষের দিকে এই গুরুত্বপূর্ণ  
বিবৃতিটি পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য একটি পৃথক অধ্যায়ের (একাদশ) আকারে দেওয়া  
হয়েছে—যাতে মহাযুদ্ধের ভারত ও ভারতীয় বাহিনীর অংশ গ্রহণ সহজেই উপলব্ধি  
করা যেতে পারে।

এই দ্বিতীয় খণ্ডে মহাযুদ্ধের উপসংহার টানা হয়েছে এবং যুদ্ধের পৃথিবী ও  
যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর একটা রূপরেখার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এই আন্তরিক আশা  
ব্যক্ত করা হয়েছে যে মানুষ যেন আর এই পারমাণবিক ও মানবিক হত্যাকাণ্ডের শিকার  
না হয়।

এই পুস্তক রচনায় যে সমস্ত গ্রন্থ, সাময়িক পত্র, পুস্তিকা ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে, সেই সমস্ত গ্রন্থাগার, লেখক ও প্রকাশক এবং সম্পাদকদের নিকট অকপটে ঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। পাঠটীকার সেই সমস্ত গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে বলে পৃথক কোন গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া হলো না।

এই তৃতীয় খণ্ডের শেষে সমগ্র বইয়ের নির্দেশিকা বা ইন্ডেক্স দেওয়া হয়েছে এবং এটি বিশেষ পরিশ্রম ও স্বত্বপূর্বক রচনা করেছেন আমার প্রীতিভাজন শ্রীমান গৌতম সান্ধ্যাল। এই বইয়ের প্রচ্ছদপট অঙ্কন করেছেন শ্রীমান পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়। এদের দুজনই ধন্তবাদের পাত্র। আর বিশেষভাবে ধন্তবাদ জানাই সাক্ষরতা প্রকাশনের শ্রীমান পার্শ্ব সেনগুপ্ত ও শ্রীমতি স্বপ্না দেবকে, যারা অগ্রণী হয়ে এই বৃহৎ পুস্তক প্রকাশের সাগ্রহ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড মূল্যে ও প্রকাশে সহায়তা করার জন্য প্রাক্তন কর্মী শ্রীমান কেশব আড়ুকে এবং তৃতীয় খণ্ডের জন্য শ্রীমনোতোষ সরকারকে ধন্তবাদ জানাই এবং মানচিত্রের ব্যাপারে শিল্পী শ্রীঅজয় গুপ্তকে আমার আন্তরিক সাধুবাদ। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, বৃগান্তর পত্রিকায় আমার পরলোকগত সহকর্মী মানচিত্র-শিল্পী অনিল মুখোপাধ্যায় অঙ্কিত করে একটি ম্যাপ এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ব্যবহার করা হয়েছে। এজন্য তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

বলাবাহুল্য যে, তাড়াহুড়ার মধ্যে এবং দীর্ঘস্থায়ী লোডশেডিং-এর বিড়ম্বনার জন্য এই মহামুষ্কের ইতিহাস শেষ করতে গিয়ে কিছু কিছু মূত্রণপ্রমাদ ঘটেছে, যার জন্য পাঠকদের কাছে আন্তরিক ভাবেই ক্ষমাপ্রার্থী।

বর্তমান বিংশ শতকের পরিবর্তিত পৃথিবী যেন এক স্বতন্ত্র জগৎ। এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনে পশ্চাৎপট ব্রহ্মবীর পক্ষে যদি দ্বিতীয় মহামুষ্কের এই ইতিহাস পাঠকদের কিছুমাত্র সহায়তা করি, তবে নিজেকে ধন্ত মনে করব।

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

শিবির

১৩২ নগেন্দ্রনাথ রোড

কলিকাতা—২৮

সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮



# সূচীপত্র

## নবম পর্ব

নাৎসী জাৰ্জানীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ

[মে, ১৯৪৫]

ইহ-মার্কিন বিষয়কে বার্লিন, পশ্চিম দিক থেকে ইহ মার্কিন কানাডীয় বাহিনীর জার্মানীর অভ্যন্তরে অভিযান; পূর্ব দিক থেকে লালকোঙ্কের ওডের নদীতীর হতে বার্লিন অভিমুখে অভিযান, বার্লিন দখল এবং রণনীতি ও বৈকৌশল নিয়ে মণ্টগোমারী ও আইজেনহাওয়ারের মধ্যে মতভেদ, রুশদের আগে বার্লিন দখলের জন্য চার্চিলের সামরিক কূটনীতি, কিন্তু কল্ডভেল্ট ও মার্কিন পক্ষের অসিদ্ধা; কেন বার্লিন ইহ-মার্কিন দখলে গেল না; দক্ষিণ জার্মানীতে শেষ আত্মরক্ষার দুর্গ সম্পর্কে গুজব; প্রেসিডেন্টের কল্ডভেল্টের মৃত্যু, বার্লিন দখলের অভিযানে লালকোঙ্ক; স্তালিনের সামরিক কূটকৌশল, মিত্র বাহিনী কর্তৃক জার্মানী উত্তরে ও দক্ষিণে বিখণ্ডিত; টোরগাউতে রুশ-মার্কিন বাহিনীর মিলন, ভুগর্ডের মস্তিষ্ক আত্মরে হিটলার; সুনাপতিদের ব্যর্থতার হিটলারের ক্রোধ; যবনিকা পড়ার আগে ভুগর্ডের বাহ্যরে নাটকের পর নাটক, গোয়েরিং ও হিমলার কর্তৃক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা, পরাজিত জার্মানীকে ফুরার শাসন করিতে চাহিয়াছিলেন; গোয়েরিং হিমলার পদচ্যুত, যুসোলিনীর চরম দণ্ড; উপপত্নীসহ পার্টিজানদের হাতে মৃত ও নিহত মিলান শহরে যুসোলিনী ও তাঁর উপপত্নীর মৃতদেহ নিয়ে বীভৎস দৃশ্য, বার্লিনের ভুগর্ডে, উন্নত ভাণ্ডব; হিটলার ও ইভা ব্রাউনের আত্মহত্যা, গোয়েবেলসের সপরিবারে আত্মহত্যা আত্মহত্যার আগে ফুরার কর্তৃক শেষ উইল সম্পাদন ও উত্তরাধিকারী মনোনয়ন; হিটলার-ইভা আগুনে পুড়িয়া ভস্মীভূত, লালকোঙ্কের দখলে বার্লিন; রাইখস্ট্যাগে সোভিয়েত কয় পতাকা উত্তোলন; বার্লিনে রুশ সৈন্যদের বিরুদ্ধে কিছু কিছু উচ্ছ্বলতার অভিযোগ; বার্লিন বুকে জ্বলোত, কোনিগেড প্রতীতির কৃতিত্ব; সোভিয়েত ও পশ্চিমী মিত্রপক্ষের নিকট জার্মানীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ; দলিল স্বাক্ষরের দৃশ্য; ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসান; ইউনাইটেড নেশন্সের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা; শ্রান ক্রাফটোর সম্মেলন; সম্মেলনে সোভিয়েত বিরোধী কূটনৈতিক চাল। [পৃ: ১০১৭-১০২০;

## দশম পর্ব

জাপানের আত্মসমর্পণ এ্যাটম বোম্বার আবির্ভাব

[মহাযুদ্ধের অবসান—আগষ্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫]

মিত্রশক্তিবর্গের মত বিরোধ সম্পর্কে হপকিন্সের মতামত, ১৯৪৫ সালে রাশিয়ার অর্থনৈতিক সঙ্কট; রুশদের হাতে যুদ্ধবন্দীর সংখ্যা ২৫ লক্ষ; ইউরোপীয় কূটনীতির পটভূমিকায় পটসডাম সম্মেলন; তিন শীর্ষ নেতার অল্প সময় নিয়ে আলোচনা

সব চেয়ে দীর্ঘ সম্মেলন; জার্মানীতে চতুঃশক্তির দখলদারিতে অনমন; জার্মানীর  
 যশস্বন রহস্ত ও ক্ষতিপূরণের দাবী, নূতন পোল্যান্ডের প্রতিষ্ঠা; নান্দসীয়ার উচ্ছেদের  
 সম্বন্ধ; এ্যাটম্ বোমার পটভূমিকায় পটগড়ায় সম্মেলন; জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায়  
 রাশিয়ার সহযোগিতা আর অত্যাশঙ্ক নহ; রাশিয়ার বিরুদ্ধে পারমাণবিক  
 কুটনীতি; ইটালিয়ার কাছ থেকে এ্যাটম্ বোমা আবিষ্কারের ব্যবস্থা গোপন;  
 চার্লিস-টুম্যানের আনন্দ; পতনের মুখে জাপান; দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে  
 দুইয়ন্ত মার্কিন অভিযান, ওকিনাওয়া ইত্যাদি দখল; খাস জাপানী দ্বীপে  
 মার্কিন বিমান চান; অতুতপূর্ণ গোপনীয়তার মধ্যে এ্যাটম্ বোমার নির্মাণ;  
 প্রথম পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের ভয়ঙ্কর দৃশ্য; ‘আকাশে সহস্র সূর্যের উদয়’—বোমার  
 জনক ওপেনহাইমার কর্তৃক গীতার শ্লোক আবৃত্তি; ৬ই আগষ্ট হিরোশিমায় প্রথম  
 পারমাণবিক বোমা বর্ষণ; তৃতীয় বোমা বর্ষণ নাগাসাকিতে; এ্যাটম্ বোমার  
 বর্ষণের সারা পৃথিবী স্তম্ভিত; রাশিয়া কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা,  
 মাজুরিয়ায় জাপানী বাহিনীর বিদ্যুৎগতি পরাজয়; রাশিয়া কর্তৃক এ্যাটম্ বোমাব  
 ধর গোড়ার দিকে গোপন, চীন ও জাপান সম্পর্কে ইটালিয়ার কুটনীতি;  
 জাপানের বিরুদ্ধে ইঙ্গ মার্কিনের চরম পত্র; চরম পত্রের জবাবে ভাষণে বিভ্রান্তি,  
 জাপান সন্ত্রাসে মর্মান্বিত প্রস্তাব; আত্মসমর্পণে জাপানো সম্মতি; ক্রুদ্ধ তরুণ সেনানীদের  
 জাপান সন্ত্রাসকে প্রেরণার বড়বন্ধ; মার্কিন যুদ্ধজাহাজে জাপানের আত্মসমর্পণের দলিল  
 স্বাক্ষর; বেনারেল ম্যাগ-আর্থারের নেতৃত্ব, জাপানে আত্মসমর্পণ হিড়িক;  
 জাপানের আত্মসমর্পণের সংবাদে আমেরিকার উচ্চতমস্তরের দৃশ্য; খাস জাপানে  
 নারীদের উপর বলাৎকার; হাবেনবার্গের আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতে  
 জার্মান যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, কয়েক জন বাবা বাবা নেতার প্রাণদণ্ড, দূরপ্রাচ্যের  
 আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতে জাপানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার; জাষ্টিস্  
 রাবার্টসনের শাসনের ভিন্ন ভিন্ন, মহাযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা সম্পর্কে বৃটিশ সরকারী  
 বিবৃতি; উপসংহার—হত-হতের তালিক ও অন্ত্যস্ত তথ্য—পারমাণবিক অস্ত্রবৃদ্ধির  
 পরিণাম ভয়ঙ্কর; আর যুদ্ধ চাই না।

[ পৃ: ১ ৩০-১৩০৩ ]

(ক) মহাযুদ্ধের দিনপঞ্জী—পৃ: ১৩০৩

(খ) নির্দেশিকা বা ইন্ডেক্স—পৃ: ১৩১৭

## নবম পর্ব

### প্রথম অধ্যায়

#### ইজ-মার্কিন বিভক্তে বার্লিন : রাইন নদী অভিক্রম

১৯৪৫ সালের মে মাসে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের উপর যে বার্নিকা পড়িল তার আগে পশ্চিম দিক থেকে ইজ-মার্কিন-কানাডীয় মিত্রবাহিনীর জার্মানির অভ্যন্তরে অভিযান এবং পূর্বদিকে ওডের নদীর সেতুযুগ থেকে মাত্র ৩০।৪০ মাইল দূরবর্তী বার্লিনের দিকে লালকোঁজের অভিযান—এই দুইটিকেই মহাযুদ্ধের শেষ অঙ্ক বলা বাইতে পারে। অবশ্য এই শেষ অংকের চূড়ান্ত আঘাত হানিয়াছিল সোভিয়েত বাহিনী খাস বার্লিন শহরে, যেখানে ভূগর্ভের পাতালপুরীর আশ্রয়ে হিটলার তাঁর শেষ শয্যা রচনা করিয়া-ছিলেন এবং প্রায় একই সময়ে ইতালীর ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটর মুসোলিনী চরম দণ্ড লাভ করিয়াছিলেন ইতালীয় গেরিলা যোদ্ধাদের হাতে।...

পশ্চিম ইউরোপ থেকে মিত্র বাহিনী ১৯৪৪-এর শেষ ভাগে রাইন নদীর ধারে পৌঁছিয়াছিলেন। কিন্তু আর্দানেস অঞ্চলে ডিসেম্বর মাসে হিটলারের অপ্রত্যাশিত পার্টা-আক্রমণে মিত্র বাহিনী বিষম জ্বল হইয়াছিল এবং সেই আকস্মিক প্রচণ্ড আক্রমণের ধাক্কা সামলাইয়া উঠিতে মিত্র বাহিনীর যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। তখন পশ্চিম রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষের সুপ্রাথমিক কমান্ডার আইজেনহাওয়ারের সদর দপ্তর (Supreme Headquarters of the Allied Expeditionary Forces—সংক্ষেপে SHAEF) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল পুরাতন ও প্রসিদ্ধ রেমস্ (Reims) শহরে। উদ্ভব-পূর্ব ফ্রান্সের এই অঞ্চলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া অনেক যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিয়া গিয়াছে এবং অতীতে ফ্রান্সের রাজগৃহবর্গের অভিব্যক্তি উৎসব এখানেই অনুষ্ঠিত হইত। সুতরাং মিত্রপক্ষের সুপ্রাথমিক কমান্ডারের প্রধান শিবির-অঞ্চলের একটা ঐতিহাসিক ঐতিহ্য ছিল বৈকি এবং সেই ঐতিহ্যের সঙ্গে নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে শেষ অভিযানের কাহিনীও যুক্ত হইল। হিটলারী নাৎসী বর্বরতার বিরুদ্ধে বৃটেন, আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ার যে গ্রাণ্ড কোয়ালিশন সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই কোয়ালিশনের মধ্যে যুদ্ধের এই শেষ পর্যায়ে মতভেদ এবং বিরোধও কম হয় নাই—যদিও ভাগ্যক্রমে যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে কোয়ালিশন ভাঙিয়া পড়ে নাই। কিন্তু এই মতভেদ ও বিরোধ দেখা দিয়াছিল একদিকে বৃটেন ও আমেরিকার মধ্যে এবং অত্রদিকে রাশিয়ার সঙ্গে রণনৈতিক ও রাজনৈতিক উত্তর প্রায়ে।

কয়েক মাস আগে পশ্চিম রণাঙ্গনে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র সৃষ্টির পরিকল্পনার সময় সম্মিলিত সেনানীমণ্ডলীর প্রধানদের পক্ষ থেকে একটি মাত্র বাক্যে সুপ্রাথমিক কমান্ডারকে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল :

‘আপনি ইউরোপীয় মহাদেশে প্রবেশ করবেন এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (ইউনাইটেড নেশন্স) অস্ত্রস্ত্রের সহিত একযোগে জার্মানীর মর্যাদা লঙ্ঘ্য করে ও সমস্ত বাহিনীগুলির ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে রণক্রিয়া অবলম্বন করবেন।’

এই দায়িত্ব তিনি যথাসম্ভব কৃতিত্বের সঙ্গেই পালন করিয়াছিলেন। তথাপি পশ্চিমী ঐতিহাসিকদের অনেকের কাছেই আইজেনহাওয়ার সমালোচনার পাত্র হইয়াছিলেন। কারণ, তিনি রাজনীতি নিয়া মাথা ঘামান নাই, ৫৫ বছর বয়স্ক আইক ইউরোপীয় ঐতিহ্য অথবা বৃটিশ সেনাপতিদের মত রাজনৈতিক লক্ষ্যকে সাময়িক রণনীতির অঙ্গীভূত বলে মনে করতে অভ্যস্ত ছিলেন না। তিনি শুধু যুদ্ধজয় চাহিয়াছিলেন এবং রাজনৈতিক প্রদ্বন্দ্বি রাখিয়া দিয়াছিলেন রাষ্ট্রনেতাদের জন্য। ‘যুদ্ধোত্তর জার্মানীর রাজনীতি সংক্রান্ত কোন নির্দেশ তাঁকে কখনও দেওয়া হয় নাই।’ আইক তাঁর প্রতি প্রদত্ত দায়িত্ব সম্পর্কে বলিয়াছিলেন - ‘আমার কাজ ছিল খুব তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শেষ করা এবং যথাসম্ভব দ্রুত জার্মান আর্মিকে ধ্বংস করা।’—(১)

কিন্তু বালিন কে আগে দখল করিবে, ইজ-মার্কিন পক্ষ কিংবা সোভিয়েত রাশিয়ার সৈন্যদল? এই বিতর্ক উত্থাপন করিলেন বৃটিশ পক্ষ। ৫৮ বছর বয়স্ক বৃটিশ সেনাপতি প্যারিমান ফিল্ড মার্শাল মন্টগোমারী এবং ইম্পিরিয়েল জেনারেল স্টাফের প্রধান ফিল্ড মার্শাল স্যার অ্যালান ক্রক বালিন দখলের রাজনৈতিক গুরুত্ব বিষয়ে অভ্যস্ত সচেতন ছিলেন এবং একটি মাত্র বিদ্যুৎগতি আঘাতের দ্বারা (lightning-like single thrust) বালিন পর্যন্ত দখল ও যুদ্ধ শেষ করার দাবী জানাইয়া আসিতে-ছিলেন। বলা বাহুল্য যে, এর পিছনে সেরা মন্তব্য ছিল স্যার উইনস্টোন চার্চিলের, ‘সৈন্যদের সারা পৃথিবীতে যার মত কূটনৈতিক রণনীতিবিদ আর কেউ ছিলেন না।’ সুতরাং প্যারিস পুনরায় দখলের পরেই চার্চিলের পৃষ্ঠপোষিত ও প্ররোচিত মন্টগোমারী ২১তম আর্মি গ্রুপের দ্বারা জার্মানীর বিকল্প চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য জেনারেল আইজেনহাওয়ারের কাছে দাবী জানাইলেন। আইকের নিকট দাখিল করা এক স্মারকলিপিতে মন্টি মন্তব্য করিলেন যে, আইজেনহাওয়ারের প্রস্তাবিত ব্রড ফ্রন্ট বা একাধিক রণক্ষেত্রে যুদ্ধ চালাইবার মত উপযুক্ত উপকরণ ও সমর-সম্ভার এখন পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছে নাই। সুতরাং সমস্ত শক্তি দিয়া একটি মাত্র রণাঙ্গনে আক্রমণের দ্বারাই যুদ্ধ শেষ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। অবশ্য উপকরণ জুটিলে অগ্ন্যস্তর রণাঙ্গনেও আঘাত দেওয়া সম্ভব। কিন্তু মার্কিন মহলের ধারণা মন্টির প্রস্তাবিত দুইটি আর্মি গ্রুপের ৪০ ডিভিসন সৈন্য নিয়া এই ধরনের আক্রমণের সঙ্কল্প যেন একটা জুয়ার মত। কারণ, চূড়ান্ত জয়ের কোন নিশ্চয়তা নাই এবং এই জয় অর্জিত না হইলে অপূরণীয় ক্ষতি ও বিপর্যয়কর পরিণাম ঘটিতে পারে। অর্থাৎ সূত্রীম কমান্ডারের কাছে এই প্রকার যুদ্ধে সাকল্যের চেয়ে বিপদের ঝুঁকি বেশী মনে হইল এবং সেই ঝুঁকি নিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। আইকের রণনীতির মর্ম ছিল আগে আরও সরবরাহের ব্যবস্থা করা—ল হাবর (Le Havre) এবং এটোয়ার্প বন্দর মুক্ত করা এবং তারপর চওড়া রণাঙ্গনে জার্মানীর ‘ভিতর দিয়া আগাইয়া যাওয়া।’ কিন্তু

(১) The Last Battle—Cornelius Ryan, p. 197. Pocket Book edition, 1966, New York.



বার্লিন অভিযানের আগে রাইন নদীর দুই বাধা অতিক্রমপূর্বক রুডের বিখ্যাত শিল্পাঞ্চল দখল করা।

১৯১৪, সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে যে সমস্ত মত বিনিময় হইল, সেগুলিই এক সপ্তাহ পর আইজেনহাওয়ার তাঁর তিন সেনাপতি মণ্টগোমারী, ব্রাড্‌লি ও ডেভার্সের নিকট ব্যাখ্যা করিয়া জানাইয়া দিলেন এবং বলিলেন যে, বার্লিনও আমাদের লক্ষ্য বটে, সেখানে শত্রুসৈন্যের সমাবেশও সর্বাধিক ঘটিবে। সুতরাং আমাদের সমস্ত সম্পদ সেদিকেই নিয়োগ করিতে হইতে পারে। কিন্তু একটি বিষয় মনে রাখা দরকার যে, আমাদের রণনীতিকে রুশদের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে। সুতরাং বিকল্প উদ্দেশ্য ভাবা দরকার। যেমন, উত্তর জার্মানীর বন্দরগুলি আগে দখল করার প্রয়োজন হইতে পারে বার্লিন যুদ্ধের পার্শ্বদেশ রক্ষা করার জন্য। এমন কি লাইপজিগ-ড্রেসডেন এবং দক্ষিণ জার্মানীর দিকেও অভিযানের প্রয়োজন হইতে পারে।

মার্কিন লেখকদের মতে আইজেনহাওয়ারের 'ব্রড ক্রস্ট পলিসি' তুল হোক, আর শুদ্ধই হোক, তিনি ছিলেন পশ্চিম রণাঙ্গনের সুপ্রীম কমান্ডার। সুতরাং তাঁর হুকুম মানিতেই হইবে। কিন্তু আইজেনহাওয়ার এই দিক দিয়া বিষয় হতাশা বোধ করিলেন। এদিকে বৃটিশ মহলে সেনাপতি হিসাবে মন্টির জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি ছিল অসাধারণ। সুতরাং তিন মাসের মধ্যে যুদ্ধ থাম করার যে পরিকল্পনা তিনি করিয়াছিলেন, সুপ্রীম কমান্ডারের নিকট সেটা গৃহীত না হওয়ায় মণ্ট দুঃস্থ হইলেন।

১৯১৪ সালের শরৎকালে দুই সেনাপতির মধ্যে এই রণনৈতিক বিরোধের আরম্ভ কখনও সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত হয় নাই। বরং আর্দানেস অঞ্চলে জার্মানীর পাণ্টা-আক্রমণের (ডিসেম্বর ১৯১৪) কালে এই বিরোধ যেন বিস্ফোরণের আকার ধারণ করিল। কারণ, এই আকস্মিক হিটলারী আক্রমণে ইঙ্গ-মার্কিন ক্রস্ট বিধাবিভক্ত হইয়া গেল। সুতরাং আইক বাধ্য হইলেন উত্তর ক্ষীতিমুখের সমস্ত সৈন্য মণ্টগোমারীর নেতৃত্বাধীনে আনিতে। অর্থাৎ জেনারেল ব্রাড্‌লির ১২নং আর্দিশ্রুপের বারো আনাই (১নং ও ২নং মার্কিনবাহিনী) মন্টির পরিচালনাধীনে দিতে হইল।

এরপর আরও যোরালো অবস্থার উদ্ভব হইল। ক্ষীতিমুখের যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত জার্মানদের পশ্চাতে হটিবার পর মণ্টগোমারী একটি প্রেস কনফারেন্সে এমন ভঙ্গী দেখাইলেন যে, যেন তিনি একক হস্তে আমেরিকানদের বিপর্যয় থেকে রক্ষা করিয়াছেন। অবশ্য উত্তর ও পূর্বাধিক থেকে মন্টির পাণ্টা আঘাত খুব দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি মার্কিনদের উদ্ধারকর্তা ছিলেন না। অধিকন্তু তিনি এই সাংবাদিক বৈঠকে বিশিষ্ট মার্কিন সেনাপতি ব্রাড্‌লি, প্যাটন প্রভৃতির নাম একবারও উল্লেখ করিলেন না। অথবা প্রত্যেকটি ইংরেজ সৈন্যের জন্য ৩০ থেকে ৪০ জন মার্কিন সৈন্যকে যে লড়িতে হইয়াছিল কিংবা প্রত্যেকটি বৃটিশ সৈন্যের জন্য ৪০ থেকে ৬০ জন আমেরিকান সৈন্য যে হতাহত

হইয়াছিল, সে কথাও মন্টি উল্লেখ করিলেন না। অশচ স্বয়ং চার্চিল ইঙ্গ-মার্কিন সম্পর্কের এই গুরুতর অবনতিতে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া ১৮ ডিসেম্বর ১৯৪৫, কমন্সভার যে বক্তৃতা দিলেন, তাতে তিনি আক্ষেপের সঙ্গে উল্লেখ করিলেন যে, আর্দেনেসের প্রায় সমস্ত যুদ্ধটাই করিয়াছেন আমেরিকানরা এবং দুই লোকদের প্রয়োচনার না তুলিবার জন্য তিনি ব্রিটিশ জনমণ্ডকে সাবধান করিয়া দিলেন। উপরের উদ্ধৃত সৈন্য সংখ্যাও চার্চিলের দেওয়া। (২)

ব্রিটিশ-মার্কিন সম্পর্কের এমন অবনতি আর কখনও ঘটে নাই। ‘মন্টিকে প্রমোশন দাও’—এই মর্মে যে প্রোপাগান্ডা শুরু হইয়াছিল তাতে মার্কিন সেনাপতি ব্রাডলি ও প্যাটন উভয়েই আইজেনহাওয়ারকে জানাইলেন যে, যদি কিন্তু মার্শাল মন্ট গোমারীকে স্থল বাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার পদে নিয়োগ করা হয়, তবে তাঁরা পদত্যাগ করিবেন। অবস্থা এমন গুরুতর আকার ধারণ করিল যে, সুপ্রীম কমান্ডারের নিকটও তা’ অসহ্য মনে হইল। সুতরাং তিনি এর একটা প্রপনেক্ত করিতে চাহিলেন। তিনি সম্মিলিত সেনানীমণ্ডলীর দপ্তরে সমস্ত বিষয়টি পেশ করিয়া মন্টগোমারীকে অপসারণের কথা চিন্তা করিলেন।

এদিকে মন্টির সেনানীমণ্ডলীর অধিকর্তা জেনারেল ডি গুইনগাণ্ড (de Guingand) আসন্ন বিক্ষোভের কথা জানিতে পারিয়া বিপদ গণিলেন। তিনি দ্রুত আইকের সদর দপ্তরে গিয়া হাজির হইলেন এবং সেখানে স্তম্ভিত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, আইক এই মর্মে ওয়াশিংটনে এক বার্তা পাঠাইতেছেন যে, “হয় মন্টি থাকবে, কিংবা আমি থাকবো।” (‘It is either me or Monty’). তখন ডি গুই. গ্যাণ্ড জেনারেল বেডেল স্মিথের (আইকের সেনানীমণ্ডলীর প্রধান) সহায়তায় ও সহযোগিতায় আইজেনহাওয়ারকে অহরোধ করিলেন এই বার্তা ২৪ ঘণ্টা দেরী করিয়া পাঠাইতে। আইক শেষ পর্যন্ত অসিদ্ধার সঙ্গে রাজী হইলেন।

মন্টগোমারী সমস্ত অবস্থা অবগত হওয়ার পর সুপ্রীম কমান্ডারের নিকট সৈন্ত-জনোচিত এক বার্তা পাঠাইলেন :

‘আমার অবাধ্য হওয়ার কোন ইচ্ছা নেই। আমার উপর শতকরা ১০০ ভাগ নির্ভর করতে পারেন।’ নীচে স্বাক্ষর দিলেন—‘আপনার একান্ত অহুগত ও আজ্ঞাধীন—মন্টি।’

এই বার্তার পর তখনকার মত বিরোধের অবসান হইল। (যুদ্ধের পর ১৯৬৩ সালে মন্টি স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তাঁর ঐ ধরনের প্রেস কনফারেন্স করা ঠিক হয় নাই। সে সময় বহু মার্কিন সেনাপতি তাঁকে অত্যন্ত অপছন্দ করিতেন)।

\*

\*

\*

গত ডিসেম্বর মাসে মন্টায় সম্মিলিত সেনানীমণ্ডলীর প্রধানদের বৈঠকে রুডের উত্তর দিক দিয়া মূল আক্রমণ সম্পর্কে আইজেনহাওয়ারের যে পরিকল্পনা অহুমোদিত হইয়াছিল, মন্টি সেটাকেই বাড়াইয়া বালিন পর্যন্ত বিস্তৃত করার জন্তে তাড়া

দিতেছিলেন। কারণ, চার্লিস ও কিঙ্ক মার্শাল ক্রকের মত মণ্টগোমারীও বিশ্বাস করিতেন যে, সময় দ্রুত বহিয়া যাইতেছে। যদি রুশদের আগে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী বার্লিন দখল করিতে না পারে, তবে যুদ্ধের রাজনৈতিক ভাবে ব্যর্থ হইবে। অঞ্চ ওয়াশিংটন থেকে সুপ্রীম কমান্ডার রাজনৈতিক পরিসিগত কোন নির্দেশ (যাতে ব্রিটিশ মনোভাব প্রতিফলিত হইতে পারে) পান নি। তিনি যখন রাইন নদী আক্রমণ এবং রুড়ের উত্তর দিক দিয়া মণ্টর প্রস্তাবিত অভিযান নিয়া আলোচনা করিতেছিলেন, তখন তাঁর বাহ্যত মনে হইয়াছিল যে, রুশদের বার্লিনের সীমানায় পৌঁছিতে আরও কয়েক মাস সময় লাগিবে। কিন্তু বিশ্বব্রহ্মের কথা এই যে, লালকোঁজ ইতিমধ্যেই বার্লিন নর ৪০ মাইলের মধ্যে পৌঁছিয়া গিয়াছে এবং ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী তখন ২০০ মাইল দূরে!

সুতরাং আইকের মনে নানা প্রশ্ন দেখা দিল—জুতো কখন বার্লিন আক্রমণ করিবে? তিন সেনাপতি কি একযোগে অভিযান করিবে? জার্মানদের বাধাদানের শক্তি কিরূপ?—এই সমস্ত গুরুতর প্রশ্নের কোন উত্তর আইকের জানা ছিল না। অঞ্চ তাঁর বণ-পরিকল্পনার অন্তঃগুলি জানা নিতাস্থই অপরিহার্য ছিল।

কিন্তু আসল সত্য এই ছিল যে, আইজেনহাওয়ার রুশদের পরিকল্পনার কিছুই জানিতেন না। তাঁর সদর দপ্তরের সঙ্গে যেক্টোর ইঙ্গ-মার্কিন মিশনের কোন প্রত্যক্ষ রেডিও যোগাযোগও ছিল না। লণ্ডন থেকে বি বি সি যে রুশ সামরিক ইস্তাহার প্রচার করিত একমাত্র সেটুফ্রাই ছিল সংবাদ জানার উৎস। অঞ্চ রুশরা যখন বার্লিনের এত কাছে আসিয়া পড়িয়াছে তখন আইকের কি উচিত হইবে বার্লিন অভিযান করা?

\*

\*

\*

### রাইন নদী অতিক্রম

কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন মহলের এই সমস্ত উদ্বেগপূর্ণ প্রশ্নের আলোচনার আগে বিশেষভাবে উল্লেখ কর দরকার যে, পশ্চিম দিক থেকে রাইন নদী অতিক্রম করার পর মিত্রপক্ষীয় বিরাট সৈন্যবাহিনী অভ্যন্তরীণ জার্মানীর অভ্যন্তরের দিকে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পাইয়াছিল। কারণ, জার্মানী তখন পূর্ব ও পশ্চিম দুই দিক দিয়া আক্রান্ত ও বিপর্যয় এবং এই দুই দিকের আক্রমণ ঠেকাইবার কোন সাধ্য জার্মানীর ছিল না। তবু ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম ও শেষ ভাগে হিটলার জার্মান জনগণের উদ্দেশ্যে দুইটি শেষ রেডিও বক্তৃতা দিলেন। কিন্তু এই বক্তৃতায়ও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গৌ এবং গোয়াতুঁমি ফুটিয়া উঠিল। নববর্ষের বক্তৃতায় তিনি জার্মান জনগণকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিলেন যে, যারা ভীক, যারা পরাজয়বাদী, জার্মান জাতির এই জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামে তাদেরকে নির্ভর্যভাবে ধ্বংস করা হইবে। তবে, “১৯৪৬ সালের আগে জার্মানীর জয় ছাড়া এই যুদ্ধ শেষ হইবে না। কারণ, জার্মানী কখনও আত্মসমর্পণ করিবে না।” অতঃপর হিটলার মিত্রপক্ষকে তাঁর আক্রমণ করিয়া বলিলেন যে, বলশেভিক, ইহুদী এবং গণভ্রষ্টারা জার্মানীকে দাসজাতিতে পরিণত করিতে, জার্মানীর স্বাধীনতাকে কলুষিত করিতে এবং লক্ষ লক্ষ নরনারীকে উপবাসে রাখিয়া মারিয়া

কেলিতে চায়। যুদ্ধে পরাজয় ঘটিলে জার্মান জাতির অস্তিত্ব, সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতির এই পরিণাম ঘটবে।

২০শে জানুয়ারীর (১৯৪৫) দ্বিতীয় বক্তৃতায় নাৎসী নায়কের ক্ষমতা লাভের ১৩তম বার্ষিকী উপলক্ষে হিটলার শেষ পর্যন্ত আর প্রিন্সের সামরিক দপ্তরের উপর ভরসা রাখিতে পারিলেন না। তিনি একেবারে করুণাময় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন, যেন প্রার্থনার উদ্বীণিতে বলিলেন :

‘Almighty God will not abandon the man who throughout life wanted nothing but to preserve his people from a fate they did not deserve.’

‘সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নিশ্চয়ই সেই মানুষটিকে ত্যাগ করিবেন না, যে মানুষটি তার জাতির জনগণকে এমন এক পরিণাম থেকে রক্ষা করিতে চাহিয়াছিল, যে পরিণাম তাদের প্রাপ্য ছিল না।’

ঈশ্বরের নিকট এই করুণ প্রার্থনার পরেই হিটলার তাঁর বক্তৃতার উপসংহারে বলিলেন, ‘আমি আশা করি প্রত্যেকটি জার্মান তার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত কর্তব্য পালন করিবে। আমি প্রত্যাশা করি সমস্ত জার্মান দ্বীলোক ও যুবতী চরমতম ক্যানাটসিজম বা গোড়ামির দ্বারা এই যুদ্ধ সমর্থন করিবে। যে কেহ আমাদের পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত করিবে, তাকেই মৃত্যু ও অপমানজনক মৃত্যুবরণ করিতে হইবে।’ (২)

কিন্তু হিটলারের বক্তৃতায় সেই আগের উত্তেজনা, বলিষ্ঠতা এবং দৃঢ়তা ও আত্ম-বিশ্বাস ছিল ন। কারণ, পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিক দিয়া অবস্থা মারাত্মক হইয়া উঠিতেছিল। জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ এই তিন মাসের মধ্যে মিত্রবাহিনী বহু বাধা অতিক্রমপূর্বক শেষ ‘প্রাকৃতিক বিষ’ রাইন নদী পার হইয়া আসিল। উত্তর ভাগে ১নং কানাডীয় বাহিনী, ২নং ব্রিটিশ বাহিনী এবং ৩নং মার্কিন বাহিনী কিন্তু মার্শাল মন্টগোমারীর অধীনে, মধ্যভাগে ১২নং মার্কিন আর্মিগ্রুপ জেনারেল ওমর ব্রাউলির অধীনে এবং দক্ষিণভাগে ৬নং আর্মিগ্রুপ (মার্কিন ও ফরাসী বাহিনীসহ) লেঃ জেনারেল জ্যাকব এল ডেভার্সের (Jacob L. Devers) নেতৃত্বে যে অভিযান চালাইল তাতে আদ্যোপায়ে জার্মান প্রত্যাক্রমণের ব্যর্থতার পর রাইনের পশ্চিম তীরে জার্মানীর আর বাধা দেওয়ার শক্তি রহিল না। তথাপি ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে বরফ, কাদায় ও জলে এবং স্বতন্ত্র বিরূপ প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে নিজমেজেনের (Nijmegen) দক্ষিণ-পূর্বে মিত্রবাহিনীর আক্রমণ এক ভয়ঙ্কর রক্তশাবী যুদ্ধে পরিণত হইল। জার্মানরা রাইনের সেতুগুলি উড়াইয়া দিয়া পিছু হটিয়া যাইতে বাধ্য হইল— ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৫। রাইন নদীর অজ্ঞাত অংশেও জার্মানরা প্রতিরোধেব চেষ্টা করিল এবং কোথাও কোথাও ড্যাম বা বাধা তৈরিয়া দিয়া বস্তার জল সৃষ্টি করিল। কিন্তু এই সমস্ত সত্ত্বেও ১৩ই মার্চের মধ্যে রাইন নদীর পশ্চিম তীরের সমগ্র উত্তর অংশ মিত্রবাহিনীর হাতে গেল। মধ্য অংশেও একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটিল।

৭ই মার্চ কলোন দখল হইয়া গেল এবং জার্মান সৈন্তেরা হোহেনজোলার্ন ব্রীজ ভাঙিয়া দিয়া পিছনে হটিয়া গেল।

কিন্তু সামরিক ইতিহাসে ভা গার সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিল ৭ই মার্চ, ১৯৪৫। রাইন নদীর এই মধ্যস্থলে প্রাকৃতিক বিষ ছিল সবচেয়ে প্রচণ্ড। কারণ, পূর্বতীর থেকে যে খাড়া পাহাড় উঠিয়া গিয়াছে, তা ছিল যেমন দুর্লভ্য তেমন জার্মানরা অতি সহজেই সেখান থেকে আত্মরক্ষার লড়াই চালাইতে পারিত। এজন্য ১৮০৫ সালে নেপোলিয়নের পর আর কোন যোদ্ধা নদীর এই অংশ সাফল্যের সঙ্গে পার হইতে পারে নাই। কিন্তু মিত্রপক্ষের ভাগ্য সেদিন যেন দৈবক্রমেই খুলিয়া গেল। একজন জার্মান ক্যাপ্টেনকে রাইন নদীর রেমাজেনে অবস্থিত এই লুডেনডর্ক ব্রীজটি বিকেল বেলা চারটাব সময় উড়াইয়া দেওয়ার জন্ত নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। ঠিক সাড়ে তিনটার সময় বিস্ফোরক চার্জ করাও হইল। কিন্তু সেই বিস্ফোরণ এত দুর্বল ছিল যে, ব্রীজটির বিশেষ কোন ক্ষতি হইল না। ঠিক ঘড়ির কাঁটার কাঁটার ৩-৫০ মিনিটের সময় সার্জেণ্ট আলেকজান্ডার ড্রাবিকের নেতৃত্বে এক প্রাচীন সৈন্তের ছোট একটি দল সেখানে আসিয়া হাজির হইল। তারা উল্লাসে চিৎকার করিতে করিতে সেতু পার হইতে লাগিল। জার্মানরা গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল এবং তখন আর একবার বিস্ফোরণ ঘটিল। এবার সেতুটির কিছু ক্ষতি হইল বটে, কিন্তু ভাঙিয়া পড়িল না। এরপর মার্কিন সামরিক ইঞ্জিনীয়াররা আসিয়া হাজির হইলেন এবং অতি দ্রুত সেতুটির এমন মেরামত করিলেন যে, ট্রাক, ট্যাঙ্ক, ট্রেন ইত্যাদি সমস্ত ভারী যন্ত্র ও যন্ত্রপাতি পার্শ্বদিকের উপযুক্ত হইল এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৮ হাজার সৈন্ত পার হইয়া গেল। আর সেই সঙ্গে আরও ২টি অস্থায়ী ব্রীজ তৈরী হইল। অবশ্য জার্মান বোমারু বিমান পরে তীব্র পাল্টা আক্রমণ চালাইয়াছিল। কিন্তু তাদের চূড়ান্ত তারা কৃতকার্ণ হইতে পারিল না।

রাইন নদী তীরের রেমাজেন সেতুর এই 'ঐতিহাসিক ঘটনা' পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মানীর দ্রুত পরাজয়ের অন্তিম প্রধান কারণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এমন কি স্বয়ং হিটলার এবং গোয়েরিংও নাকি একথা স্বীকার করিয়াছিলেন। (৩)

এমন অদৃষ্টপূর্বভাবে রাইন নদীর ক্রুদ্ধতার খুলিয়া যাইবে এবং রেমাজেনের সেতু দিয়া দলে দলে মার্কিন ও মিত্রসৈন্ত জার্মানীর অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়ার সুযোগ পাইবে, এমন সৌভাগ্য আগে মিত্রপক্ষের সেনাপতিরা কল্পনা করিতে পারেন নাই। ওপেন-হাইম ব্রীজের উপর দিয়াও জেনারেল প্যাটনের সৈন্তেরা রাইন নদী পার হওয়ার অল্পরূপ সুযোগ পাইয়াছিলেন। স্বয়ং আইজেনহাওয়ার মন্তব্য করিয়াছেন—“এটা ছিল মহাযুদ্ধের অন্তিম শুভ মুহূর্ত। জার্মানীর মর্মস্থলে প্রবেশ করার চিরন্তন প্রতিরক্ষার বাধা এভাবে বিদীর্ণ হয়ে বাবে, এমন কথা আগে ভাবা যায় নি।”

জার্মানীর এই বিপর্যয়ের জন্ত দায়ী মনে করিয়া হিটলার ৪ জন অফিসারকে সামরিক আদালতে অভিযুক্ত এবং গুলি করিয়া হত্যা করিলেন। কিন্তু যে ক্যাপ্টেন

(ব্রাট্কে) আসলে দায়ী ছিলেন তিনি কিন্তু ত্রাণ পাইয়া গেলেন। কেননা, ভাগ্যক্রমে তিনি আগেই আমেরিকানদের হাতে বন্দী হইয়াছিলেন।

জার্মানদের পক্ষে এরপর আরও বিশ্বয়ের কারণ ঘটিল। কারণ, কয়েকদিনের মধ্যেই ৭৫ হাজার মার্কিন সামরিক ইঞ্জিনীয়ার ৬২টি সেতু, ১১টি পাকা হাইওয়ে এবং ৫টি রেলওয়ে ব্রীজ রাইন নদীর উপর দিয়া তৈরী করিলেন। আর উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত ২৫ মার্চ ১৯৪৫ তারিখের মধ্যে ৭টি মিত্রবাহিনী বিপুলতম ট্যাঙ্ক ও অস্ত্রসম্ভার লইয়া সমগ্র রাইন নদীর ৫০০ মাইল পার হইয়া গেল।

৭০টি জার্মান ডিভিসন ওদেব সম্মুখীন হইয়াছিল বটে, কিন্তু এরা নামে মাত্র ডিভিসন ছিল, আর রণশক্তি ও নৈতিকশক্তি বলিতে এদের সামান্যই ছিল। কার্যতঃ রাইন নদী পার হওয়ার সাতদিনের মধ্যেই পশ্চিমে জার্মানীর প্রতিরোধ শক্তি ভাঙিয়া পড়িল। এদিকে ফ্রুঙ্ক হিটলার পশ্চিম রণাঙ্গনের প্রধান সেনাপতি প্রবাণী একা ফিল্ডমার্সাল ২-গ্রেডকে পদচ্যুত করিলেন এবং ইতালীয় রণাঙ্গনের ফিল্ডমার্সাল কেসেলরিংকে তাঁব জায়গায় নিযুক্ত করিলেন। (৪)

জার্মান লাইনের পিছনে মিত্রপক্ষের প্রচুর বিমানবাহী সৈন্য নামিয়া পড়িল এবং রাইন নদীর বাধা অতিক্রম করার পর প্রচণ্ড বোমা বর্ষণের দ্বারা সার ও রুড অঞ্চলের শিল্পসমৃদ্ধ এলাকাগুলিকে বাকী জার্মানী থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা হইল। ১৯৪৫, মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বোমারুগুলি এই সুবৃহৎ এবং প্রসিদ্ধ শিল্পাঞ্চলের উপর অস্ত্রতঃ ৪২ হাজার বাব বোমা দিল। তারপর শুক হিল রুড অঞ্চলের বিরুদ্ধে বেটন নীতি ও আক্রমণ। একথা সর্বজনবিদিত যে, রুড অঞ্চলই ছিল জার্মানীর অশিশিষ্ট মর্যকেন্দ্র এবং জার্মান সময়শক্তির মূল উৎস। ভূবনবিখ্যাত ফ্রুঙ্ক, হাইসেন, ডটমুণ্ড, ডুইসবার্গ ইত্যাদি নামকরা বিরাট কলকাবধান কিংবা অশিশিষ্ট শহরগুলি ধ্বংস হইতে লাগিল। তবু হিটলার ২২রা হইয়া লুক্ষ দিলেন রুড অঞ্চলের এক-একটি কারখানাকে এক-একটি দুর্গে পরিণত করার জন্ত। জার্মান সৈন্তেরা প্রাণপণ শক্তিতে বাধাও দিল, কিন্তু লেঃ জেনারেল গিম্পসনের নবম মার্কিন বাহিনী এবং লেঃ জেনারেল হড্জের (Hodges) ১২নং মার্কিন আর্মি রুডকে ধরিয়া ধরিয়া সংহারকার্য চালাইতে লাগিল। ৩রা মার্চ, ১৯৪৫, সুপ্রীম কমান্ডার জেনারেল আইজেনহাওয়ার জার্মান সৈন্য ও জনগণের উদ্দেশ্যে আর একবার আবেদন জানাইলেন আত্মসমর্পণের জন্ত। কেননা, এই অবস্থায় জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধ চালানো বুধা লোকত্ব ও ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু হিটলার ও তাঁর চেলা-চামুড়ারা এবং গেট্টাপো ও এস এস সংগঠনগুলি এমন বজ্রমুষ্টি বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিল যে, জয়ের কোন আশা নাই জানিয়াও তারা যুদ্ধ করিয়া যাইতে লাগিল।

অবশেষে ১লা এপ্রিল, ১৯৪৫, ২নং ও ১নং মার্কিন বাহিনীর দুই অংশ সাঁড়ানীর দুই বাহুর মত লিপস্টাড্ (Lippstadt) শহরে আসিয়া মিলিত হইল এবং রুড অঞ্চলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ফিল্ড মার্সাল ভালথার মডেলের নাৎসী সৈন্তেরা ৮০ মাইল ব্যাসার্ধের এক সুবৃহৎ চক্রবাহের মধ্যে আটকা পড়িল এবং ২রা থেকে ১৮ই

এপ্রিল পর্বন্ত দুই সপ্তাহের মধ্যে কড়ের সুবিখ্যাত শিলাকল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল। অজস্র জার্মান সৈন্ত এই প্রতিরক্ষার যুদ্ধে মারা পড়িল এবং চার্চিলের মতে মিত্রপক্ষের হাতে ৩ লক্ষ ২৫ হাজার সৈন্ত বন্দী হইল। কিন্তু মার্সাল মডেল হিটলারের নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হইয়া হতাশ ও বিবল চিত্তে ২১ এপ্রিল, ১৯৪৫, ডুইসবার্গের নিকটবর্তী এক জঙ্গলে আত্মহত্যা করিলেন।

\* \* \*

বাইন নদীর বাধা অতিক্রান্ত এবং গিগাক্রীড লাইন ক্রান্তের ম্যাজিনো লাইনের মত ব্যর্থ প্রমাণিত হওয়ার পর ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর নিকট জার্মানীর অভ্যন্তর ভাগের শত্রুগুলির দ্রুত পতন হইতে লাগিল। বিশেষত পূর্বদিক থেকে সোভিয়েত বাহিনীর দূরদূরান্ত অভিযানের প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে জার্মান সৈন্তবাহিনীর শক্তি আরও বৃদ্ধি করার জন্য অনেকগুলি জার্মান ডিভিসনকে পূর্ব রণাঙ্গনে স্থানান্তরিত করা হইল। এর ফলে পশ্চিমে মিত্রবাহিনীর পক্ষে আরও সুবিধা হইল এবং ব্রিটিশ মহল থেকে জেনারেল আইজেনহাওয়ারের উপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করা হইল বার্লিন অভিযানের জন্য। অর্থাৎ রুশদের আগে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী কর্তৃক বার্লিন দখলের জন্য। কিন্তু মার্সাল জুকোভের গৈল্লেরা ইতিমধ্যেই বার্লিনের ৩০/৪০ মাইলের মধ্যে পৌঁছিয়া গিয়াছিল। সুতরাং আইজেনহাওয়ার বার্লিন দখলের জন্য রুশদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামিতে রাজী ছিলেন না। কারণ এতে দুই পক্ষেরই বিব্রত ও বিপর হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। অর্থাৎ অগ্রসরমান দুই মিত্রপক্ষের গতিশীল বাহিনীগুলির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটিতে পারিত। ১৯৩৯ সালে পোলাণ্ডে পূর্বদিক থেকে অগ্রসরমান সোভিয়েত বাহিনীর সঙ্গে জার্মান বাহিনীর এই ধরনের একটা সংঘর্ষও হইয়া গিয়াছিল।

তা ছাড়া আইকের মাথার উপর তখন খাঁড়ার মত বুলিতেছিল 'National Redoubt' কিংবা 'জাতীয় পার্বত্য আশ্রয়ের' এক চাকল্যকর গুপ্ত খবর। মিউনিকের দক্ষিণে ব্যাভেরিয়ার অলপাইন অঞ্চলে পশ্চিম অস্ট্রিয়া ও উত্তর ইতালীর এলাকায় প্রায় ২০ হাজার বর্গমাইলব্যাপী এই পার্বত্য দুর্গই হইবে হিটলার ও তাঁর নাৎসী বাহিনীর শেষ আশ্রয়। এই 'ঈগল পাখির' নীড়ের মর্যক্রেম হইতেছে বার্সেটগ্যাডেন। সেখানে প্রতিরক্ষার সমস্ত প্রকার সামরিক ব্যবস্থা নাকি একেবারে নিখুঁত করিয়া রাখা হইয়াছে। (৫)

আইকের সদর দপ্তরে এই শেষ পার্বত্য আশ্রয়ের একটি মানচিত্রও তৈরী করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং মিত্রবাহিনীর একাধিক গোয়েন্দা বিভাগ থেকে যে সমস্ত লংবাদ আসিতেছিল তাতে এমন ধারণার সৃষ্টি হইল যে, হিটলার দুই বছর পর্বন্ত প্রতিরক্ষার যুদ্ধ চালাইয়া বাইতে পারিবেন।

২০শে এবং ২৫শে মার্চ ১৯৪৫, মিত্রপক্ষীয় সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের কাছ থেকে আইজেনহাওয়ারের সদর দপ্তরে দক্ষিণ জার্মানীতে হিটলারের শেষ পার্বত্য

আশ্রয় সম্পর্কে আরও যে সমস্ত চাকল্যকর খবর আসিল, তাতে মার্কিন সূত্রীক কমান্ডারের নিকট বার্লিনের সামরিক গুরুত্ব আরও কমিয়া গেল। সুতরাং এই শেষ জার্মান রণপরিকল্পনায় বাধা দেওয়ার জন্য জেনারেল ওমর ব্রাউলি প্রস্তাব করিলেন উত্তর জার্মানী দিয়া অভিযানের বদলে জার্মানীকে সেন্ট্রাল বা মধ্যভাগ দিয়া আক্রমণ এবং দ্বিখণ্ডিতকরণ। কারণ, জার্মানী দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেলে নাৎসী বাহিনী আর দক্ষিণদিকের প্রস্তাবিত পার্বত্য এলাকায় আশ্রয় নিতে পারিবে না। এদিকে ওয়াশিংটনে মার্কিন উচ্চতর সামরিক কর্তৃপক্ষ জেনারেল মার্শালের যাকে আইক খুব ভক্তি করতেন) কাছ থেকে যে সমস্ত খবর ও নির্দেশ আইকের নিকট পৌঁছিল, তাতেও দক্ষিণ দিকে হিটলারের শেষ আশ্রয় সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া গেল। এই অবস্থায় পূর্বদিক থেকে অগ্রসরমান সে ভিয়েট বাহিনীর রণ-পবিকল্পন' এবং দুই পক্ষের সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতির সীমারেখা কোথায় টানা হইবে, সেই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা আইকের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং আইক তিনটি তারবার্তার খসড়া প্রস্তুত করিলেন এবং সেই তিনটির মধ্যে একটি তারবার্তা ছিল 'ঐতিহাসিক' ও অতুতপূর্ব। কারণ, জেনারেল আইজেনহাওয়ার এই তারবার্তাটি সোজানুজি মার্শাল স্ট্যালিনের নিকট পাঠাইলেন রুশ রণপরিকল্পনা জানিবার জন্য।

অন্য যে দুইটি তারবার্তা মার্কিন সেনানীমণ্ডলীর অধ্যক্ষ জেনারেল মার্শাল এবং ব্রিটিশ সেনাপতি মণ্টগোমারীর নিকট পাঠানো হইল, তাতে রুশবাহিনীর সঙ্গে হাত মিলাইবার প্রস্তাব এবং অগ্রাশ্রয় রণনৈতিক কথা আইক বলিলেন বটে, কিন্তু এই সমস্ত বার্তায় বার্লিনের কোন উল্লেখ করা হইল না।

আইজেনহাওয়ার মার্শাল স্ট্যালিনের নিকট প্রেরিত বার্তায় নিজের পবিকল্পনার কথা জানাইলেন এবং প্রস্তাব করিলেন যে, রুশবাহিনীর সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর পক্ষে হাত মিলাইবার সবচেয়ে ভালো এলাকা হইতেছে এবফুট-লাইপজিগ-ড্রুসডেন। কারণ, ওদিকেই জার্মান সরকারী দপ্তরগুলি অপসারিত হইতেছে। অপরপক্ষে দক্ষিণ জার্মানীর পার্বত্য অঞ্চলেও জার্মানরা শেষ আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। সুতরাং এই অঞ্চলে বাধা দেওয়ার জন্য মিত্রবাহিনীগুলিব দ্বিতীয় মিলনক্ষেত্র হইতেছে রিজেন্সবার্গ লিনজ (Regensburg Linz) অঞ্চল।

রুশদের সঙ্গে সামরিক বিষয়ে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনের অধিকার সূত্রীক কমান্ডার আইজেনহাওয়ারের ছিল এবং স্ট্যালিনও ছিলেন সোভিয়েট বাহিনীর সূত্রীক কমান্ডার। সুতরাং আইক লণ্ডন বা ওয়াশিংটনের বড়কর্তাদের কাছে আগেই তাঁর তারবার্তার কথা জানাইবার প্রয়োজন বোধ করিলেন না। অবশ্য এই সমস্ত তারবার্তার কপি লণ্ডনে এবং ওয়াশিংটনে পাঠানো হইয়াছিল। কিন্তু লণ্ডনে চার্লিস আইকের তারবার্তার কপি পাইয়া যেন তেলেবেগুনে জলিয়া উঠিলেন। দীর্ঘ তিন বছরের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মধ্যে এই প্রথম চার্লিস আমেরিকানদের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। (৩০শে মার্চ তখন রুজভেল্ট অসুস্থ) বিশেষতঃ ২৭শে মার্চ মণ্টগোমারী তাঁকে জানাইয়া দিলেন যে, তাঁর বাহিনী এলবে (Elbe) নদীর দিকে এবং সেখান থেকে অটোভান সড়ক (বার্লিনকে ঘিরিয়া আংটির মত তৈরী কেরো কংক্রিটের



উৎকৃষ্টতম সড়ক) ধরিয়া বার্লিন দখলের অভিযান চালাইবেন। কিন্তু আইকের তারবার্তায় এই সমস্ত কিছুই ছিল না।

এই সময় বৃটিশের পক্ষে আর একটা ক্ষোভের কারণও ঘটিল। কারণ, মন্টগোমারী কিন্তু মার্শাল ক্রককে জানাইলেন যে, মার্কিন নবম বাহিনীকে তাঁর কমান্ড থেকে সরাইয়া নিয়া মার্কিন জেনারেল ব্রাউলির ১২নং আর্মি গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত করা হইতেছে এবং এই সমস্ত বাহিনী মধ্য জার্মানী দিয়া লাইপজিগ-ড্রেসডেনের দিকে অভিযান করিবে। কিন্তু ‘মন্টির মতে এটা মারাত্মক ভুল।’ (৬)

উত্তর জার্মানী দিয়া বার্লিন অভিযুখে আক্রমণের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হওয়ায় বৃটিশপক্ষ রুষ্ট হইলেন। ২০শে মার্চ ক্রক ওয়াশিংটনে তাঁর প্রতিবাদ জানাইলেন—মার্শাল স্ট্যালিনের নিকট সরাসরি বার্তা পাঠাইবার কোন প্রক্রিয়ার আইজেনহাওয়ারের নাই। সম্মিলিত সেনানীমণ্ডলীর মারকং যোগাযোগ স্থাপন করা উচিত ছিল।

জর্জ মার্শাল বৃটিশ পক্ষের বিরক্তি এবং উত্তর জার্মানী দিয়া বার্লিনের দিকে প্রস্তাবিত অভিযানের কথা আইজেনহাওয়ারকে জানাইয়া দিলেন। কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপার নিয়া বৃটিশ-মার্কিন বিরোধ ক্রমশ অত্যন্ত প্রবল হইল। তবে উভয় পক্ষই একটা আপোস মীমাংসা ও গোড়াভালি দিতে চাহিলেন। মিত্রপক্ষের প্রধানদের নিকট আরোও ক্ষোভের কারণ এই ছিল যে, আইক সংক্রান্ত ঘটনা এমন এক সময়ে ঘটিতেছিল, যখন বৃটিশ, মার্কিন ও রুশ—এই তিন পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক আদৌ ভালো বাইতেছিল না। অধিকন্তু প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টও অসুস্থ ছিলেন। অপর পক্ষে সাম্রাজ্যবাদী চার্লিস স্ট্যালিনের যুদ্ধ-পরবর্তী মতলব সম্পর্কে সন্দেহ ব্যতিক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। ফলে, পশ্চিম দিকে অগ্রসরমান সোভিয়েত বাহিনীর জঘণ্টালিকে প্রীতির চক্ষে দেখিলেন না। সেই সঙ্গে ইজ-মার্কিন পক্ষের নিকট রাশিয়ার আচরণ আরও ক্ষোভের কারণ হইয়া উঠিল। কারণ, স্ট্যালিন অভিযোগ করিলেন যে, পশ্চিম জার্মানীর যুক্ত বন্দীশালাগুলি থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত রুশ বন্দীদের উপর দুর্য্যবহার করা হইতেছে।

অপর দিকে পশ্চিমী মিত্রদের পক্ষ থেকে স্ট্যালিনের নিকট অভিযোগ করা হইল যে, মিত্রবাহিনীর বোম্বার্ডগুলিকে তৈল নেওয়ার জন্ত এবং অন্যান্য কারণে রুশ বাহিনীর পিছনে অবতরণ করার যে অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, কার্ষক্ষেত্রে তা পালিত হইতেছে না।

অধিকন্তু ইতালীতে জার্মান বাহিনীর আত্মসমর্পণের প্রস্তাব নিয়াও স্ট্যালিনের সঙ্গে ইজ-মার্কিন কর্তাদের তাঁর ক্ষোভের কারণ ঘটিল। কারণ, স্ট্যালিন এই মর্মে গুরুতর অভিযোগ করিলেন যে, ইতালীতে জার্মান সৈন্তেরা ইজ-মার্কিন পক্ষের নিকট আত্মসমর্পণের জন্ত গোপনে আলোচনা চালাইতেছে এবং এই সমস্ত চলিতেছে সোভিয়েত পক্ষের অজ্ঞাতসারে। অধিকন্তু এই সমস্ত জার্মান বাহিনীকে (৩ ডিভিসন) পূর্ব রণাঙ্গনে পাঠাইবারও মতলব করা হইয়াছে।

অর্থাৎ সোজা কথার স্ট্যালিন মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে “বিশ্বাসবাতকভার” এবং হিটলারের সঙ্গে “পৃথক সন্ধি” করার গুরুতর অভিযোগ তুলিলেন।

বলা বাহুল্য যে, চার্লিস এবং রুজভেল্ট উভয়েই স্ট্যালিনের এই ‘মিথ্যা’ সন্দেহের ও ‘ভিত্তিহীন’ অভিযোগের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইলেন। তথাপি রুজভেল্ট তাঁর প্রেরিত বার্তায় যথাসম্ভব সংযম ও শিষ্টাচার রক্ষার চেষ্টা কবিলেন। কারণ, তিনি মিত্রপক্ষের মধ্যে ঐক্যরক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন।- (৭)

\*

\*

\*

মিত্রপক্ষের মধ্যে এই ধ্বনের অপ্রীতিকর অবস্থার যখন উদ্ভব হইয়াছিল, তখন স্ট্যালিনের নিকট সোজাসুজি প্রেরিত আইজেনহাওয়ারের বার্তা নিষা যতাবতই তীব্র বাদ-প্রতিবাদের সৃষ্টি হইল। কারণ, চার্লিস ও বৃটিশ পক্ষের নিকট বার্লিনের রাজনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম ছিল। কিন্তু আইক তাঁর সাময়িক পরিকল্পনার দ্বারা সেটাই নষ্ট কবিতা দিতেছেন। অথচ রাজনৈতিক ব্যাপারে স্ট্যালিনের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার কোন ঐচ্ছিক্যের আইজেনহাওয়ারের ছিল না। সুতরাং ২০শে মার্চ রাতে চার্লিস জেনারেল আইজেনহাওয়ারের নিকট জরুরী টেলিফোন করিলেন। তবে চতুর চার্লিস আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক অব্যাহত রাখার জন্য আইকের সাথে আলোচনায় স্ট্যালিনের নিকট আইকের প্রেরিত বার্তার কথা চাপিয়া গেলেন, কিন্তু কোণে মস্তির প্রভাবিত বার্লিন অভিযানের উপর খুব জোর দিলেন। কিন্তু আইক দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দিলেন যে, বার্লিনের আর কোন সাময়িক গুরুত্ব নাই।

রেইমসের সদর দপ্তরে বসিয়া আইজেনহাওয়ার বৃটিশ প্রতিবাদের জন্য অত্যন্ত রাগিয়া গেলেন এবং ৩০শে মার্চ সকালে লণ্ডন ও ওয়াশিংটনে এই মর্মে জবাব পাঠাইলেন যে, লাইপজিগ-ড্রেসডেন ও মধ্য জার্মানীর ভিতর দিয়া অভিযান চালানো হইবে এবং দক্ষিণ দিকে জার্মানীর পার্বত্য আশ্রয় লাভে বাধা দেওয়া হইবে। দানিয়েব নদী উপত্যকায় রুশ বাহিনীর সঙ্গে হাত মিলাইবার চেষ্টা করা হইবে। তবে, পরিবর্তিত অবস্থায় প্রণালিরও পরিবর্তন ঘটিতে পারে।

কিন্তু এই সমস্ত জবাবে বার্লিনের কোন উল্লেখ ছিল না। বরং সুপ্রীম কমান্ডার ওয়াশিংটনে অভিযোগ করিয়া পাঠাইলেন যে, বৃটিশ পক্ষ রাইন ও জার্মানী অভিমুখে অভিযান পদে পদে বাধা দিয়াছে। কিন্তু তিনি তাঁর পরিকল্পনা অহুসরণ করিয়াই যাইবেন।...

এদিকে চার্লিস আবার আইজেনহাওয়ারের নিকট প্রেরিত একটি বার্তায় স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, রুশ সৈন্তবাহিনী নিশ্চয়ই অস্ত্রিয়া ও ভিয়েনা দখল করিয়া নিবে। সেই সঙ্গে বার্লিনও তাদের দখলে গেলে সাময়িক ও রাজনৈতিক ফলাফল গুরুতর হইবে। (৮)

মস্কোতে বৃটিশ ও মার্কিন খিলট্যারিশ মিশনের (জেনারেল ডীন) প্রধানগণ আইজেনহাওয়ারের প্রেরিত বার্তা স্ট্যালিনের হাতে দিলেন এবং স্ট্যালিন আইকের

(৭) চেস্টার উইলমট—পৃষ্ঠা ৭৮৬-৮৭

(৮) কর্নেলিয়াস রায়ান—পৃষ্ঠা ২৩৬

রণনৈতিক পরিকল্পনার তারিফ করিলেন। কিন্তু নিজেকে পরিকল্পনার কথা কিছু বলিলেন না।...

২৮শে মার্চের টেলিগ্রামের জবাবে স্ট্যালিন রাড্রি ৮টার সময় পান্টা, এক টেলিগ্রামে আইজেনহাওয়ারকে জানাইয়া দিলেন যে, তাঁর রণ-পরিকল্পনা তিনি সমর্থন করিতেছেন, লাইপজিগ-ড্রেসডেন এলাকাতেই লালকৌজের সঙ্গে হাত মিলানো উচিত। সোভিয়েত বাহিনীরও প্রধান আক্রমণ ওদিকেই ঘটিবে এবং আইজেনহাওয়ারের সঙ্গে তিনিও একমত যে, বার্লিনের আর আগের মত সামরিক গুরুত্ব নাই। সেজন্ত সেখানে দ্বিতীয় সারির সৈন্ত পাঠানো হইবে। আর যে মাসের দ্বিতীয় অর্ধভাগে লালকৌজের আক্রমণ শুরু হইতে পারে।...

আইজেনহাওয়ারের নিকট প্রেরিত স্ট্যালিনের তারবার্তার কপি পাওয়া চার্চিলের সন্দেহ আরও গভীর হইল। তিনি আইজেনহাওয়ারের নিকট প্রেরিত পুনরায় একটি তারবার্তায় জানাইয়া দিলেন যে, যতদূর মতে বার্লিনের সামরিক গুরুত্ব হ্রাস পাওয়ার যে কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝিতে হইবে রাজনৈতিক গুরুত্বের বিচারে। সুতরাং বার্লিনে আমাদের আগে প্রবেশ করা দরকার। কারণ, 'যত পূর্বে বাশিয়ানদের সঙ্গে হাত মেলানো' যায় ততই ভালো'— "that we should shake hands with the Russians as far to the east as possible..." (১)

অর্থাৎ চার্চিলের মতে সোভিয়েত রাশিয়াকে মধ্য ইউরোপ থেকে যত দূরে রাখা যায়, ততই পশ্চিম ইউরোপের পক্ষে মঙ্গল। কিন্তু এই রাজনৈতিক মতামতের গুরুত্ব নিয়া আইজেনহাওয়ার মাথা ঘামাইতে প্রস্তুত ছিলেন না। কারণ, রাশিয়ার সঙ্গে সম্ভাব্য রাখার প্রয়োজন ছিল।

**বার্লিন কেন ইঙ্গ মার্কিন দখলে গেল না?**

জেনারেল আইজেনহাওয়ার কর্তৃক সরাসরি মার্শাল স্ট্যালিনের নিকট তারবার্তা পাঠাইবার জন্ত আইকের বিরুদ্ধে বৃটিশ সরকারী মহলে সমালোচনা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, বিদেশী গভর্নমেন্টের সঙ্গে এভাবে আলোচনা করার অধিকার তাঁর ছিল না। তেমনি লালকৌজের আগেই বার্লিন দখলের অভিযান না করার জন্তও তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা করা হইয়াছে। বিশেষত যুদ্ধের পরবর্তীকালে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের আবহাওয়ার আইজেনহাওয়ার, রুজভেল্ট প্রভৃতির বিরুদ্ধে অতলাস্তিকের এপারে-ওপারে সমালোচনার সুর আরও তীব্র হইয়াছিল। তাঁদের মতে চার্চিলের রণনীতিই সঠিক ছিল। যদি রুজভেল্ট ও মার্কিন সেনানীমণ্ডলী চার্চিলের রণনীতি অহুমোদন এবং অহুসরণ করিতেন, তবে, বলকান ও পূর্ব ইউরোপ যেমন সোভিয়েত কিংবা কমিউনিস্ট দখলদারিতে যাইত না, তেমনি জার্মানী ও বার্লিন নিয়াও এত বিজ্ঞাত দেখা দিত না।

কিন্তু যারা এই সমালোচনা ক্রমশ উচ্চ পর্দায় চড়াইয়াছেন, তারা গোড়াকার আসল অবস্থাটাই ভুলিয়া গিয়াছেন, কিংবা উপেক্ষা করিয়াছেন। কারণ, হিটলার

জার্মানীর মারাত্মক সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে সবচেয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছিল রাশিয়া। যে রাশিয়ার ৫ লক্ষ বর্গ মাইল ভূমি জার্মানরা দখল করিয়া নিয়াছিল এবং অপরিমিত লোকস্বয় ও ধ্বংসলীলা বিস্তার করিয়াছিল বাশিয়াতে যে পরিমাণ রক্তশ্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তার কোন তুলনা নাই। পশ্চিমের সামরিক লেখকদের পুস্তকেই এবং যে সমস্ত লেখক সোভিয়েত-বিবোধী তাঁদের লেখাতেই (যেমন, চেস্টার উইলমট, ক্যাপ্টেন হ্যাংস প্রভৃতি) স্বীকার করা হইয়াছে যে, ১৯৪৩ সালের নভেম্বরে মোট ৩০০ ডিভিসন জার্মান সৈন্যের মধ্যে ক্রমশঃ পূর্ব রণাঙ্গনেই ২০৬ ডিভিসন জার্মান সৈন্য লালকোঁজের বিরুদ্ধে নশলিষ্ট ছিল। আর বাকী ডিভিসনগুলি ছিল ইউরোপের অন্যান্য ২২শে। ১৯৪৪ সালের জুন মাসে পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলাব সময়েও ১৫৭ ডিভিসন জার্মান সৈন্য ছিল পূর্ব রণাঙ্গনে। আর ৫০ ডিভিসন ছিল জাহুয়ারী মাসে বুটেনের বিপরীত 'দিকে, এবং এর মধ্যে আবার ২৬ ডিভিসন ছিল 'অতলান্তিক প্রাচীর' পাহারা দেওয়ার জন্যে। পশ্চিমের সামরিক গোয়েন্দাদের ধারণা ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসে ১৯২ ডিভিসন জার্মান সৈন্য ছিল পূর্ব রণাঙ্গনে। আর ১৩৭ ডিভিসনের মধ্যে ৫১ ডিভিসন ছিল ক্রান্ত ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলিতে। ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসেও মাত্র ৫২ ডিভিসন ছিল পশ্চিম রণাঙ্গনে, যেগুলি নামে মাত্র ডিভিসন ছিল। এমন কি, ১৯৪৫ সালের জাহুয়ারী মাসে পর্যন্ত ১৩৩ ডিভিসন জার্মান সৈন্য ছিল রাশিয়ার বিরুদ্ধে—অর্থাৎ জার্মানীর মোট স্থলসৈন্যের অর্ধেকই ছিল পূর্ব রণাঙ্গনে। আর পশ্চিম রণাঙ্গনে ৭৬ ডিভিসন এবং ইতালীতে ২৪ ডিভিসন। সুতরাং এই সংখ্যাগুলির দ্বারা ই বুঝা যাইতেছে যে, জার্মান সমরশক্তির বিরুদ্ধে আসল লড়াই চালাইতেছিল লালকোঁজ এবং ইউরোপীয় মহাদেশের যুদ্ধের আসল মর্মকথাও ছিল এখানে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এই ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করিয়া কেবল গল্প বা উপকথা রচনা করিলেই চলিবে না। (১০) জার্মানীর বিশাল সামরিক শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য একদিকে সোভিয়েত শক্তির উপর নির্ভর করিতে হইবে, অন্যদিকে আবার বলকান বা পূর্ব ইউরোপে তাদের বিজয়ী সৈন্যদের প্রবেশ রুদ্ধ করা হইবে—এমন অবাস্তব অবস্থা তো চলিতে পারে না। 'চার্লিস এই শতাব্দীর সবচেয়ে চতুর এবং দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ রাজনৈতিক রণনীতিবিদ ছিলেন বটে, কিন্তু ঠিক সেই কারণেই তাঁর সামরিক রণনীতি অনির্ভর-যোগ্য এবং বিপজ্জনক ছিল'—একথা লিখিয়াছেন আমেরিকার বিখ্যাত চিন্তাশীল রাজনীতিক গ্রন্থকার মিঃ ডি এফ ফ্লেমিং।

বার্লিন দখলের প্রশ্ন নিয়া এই কারণেই বুটেনের সঙ্গে আমেরিকান সেনানীদের তীব্র মতভেদ ও বিরোধ দেখা দিয়াছিল। কারণ, চার্লিস তখনই ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, "যুদ্ধ হুঁ-য়ার পক্ষে রাশিয়া সবচেয়ে মারাত্মক বিপদরূপে দেখা দিয়াছে।"

কিন্তু চার্লিস বা বুটশ সেনানীমণ্ডলী কর্তৃক প্রস্তাবিত বার্লিন দখলের প্রশ্ন তখন বাস্তবতাসম্মত ছিল না। কারণ, যুদ্ধপক্ষীয় সৈন্যদলের কাছ থেকে বার্লিন তখন ৩০০ মাইল দূরে। আর জুকোভের অধীন রুশ সৈন্যেরা ছিল বার্লিনের মাত্র ৩০

মাইল দূরে ওডের নদীর সেতুমুখ থেকে। ১০ লক্ষ সোভিয়েত সৈন্য বার্লিন আক্রমণের জন্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং আইজেনহাওয়ার যদি সেই সময় বার্লিন জয়ের জন্য আগাইয়া যাওয়ার চেষ্টা করিতেন, তবে, খুব সম্ভবত মার্সাল জুকোভ আগেই সেখানে পৌঁছিয়া যাইতেন এবং সেই অবস্থানই মার্কিন অধিনায়কদেব পক্ষ খুব অনুবিধাজ্ঞক ও লঙ্কার বিষয় হইয়া পড়িত। যদি তর্কের খাতিরে ধবিয়াও লওয়া যায় যে, পশ্চিমের মিত্রপক্ষীয় সৈন্তেরা ওডের নদী পাব হইতে পারিবেন, তথাপি সেই অবস্থায় তাঁদের খাল-বিল-নদী এবং জলা ও ডালা জায়গায় ৫০ মাইল আক্রমণ করিতে হইত। সেজন্যই আইজেনহাওয়ারের প্রস্তাব জবাবে জেনারেল ওমব ব্রাডলি বলিয়াছিলেন যে, এই অঞ্চল জয় করিয়া বার্লিনে অগ্রসর হইতে ১ লক্ষ মিত্রপক্ষীয় সৈন্য হতাহত হইবে। আইজেনহাওয়া স্বভাবতই এই প্রকার বিপদের ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক ছিলেন না কারণ, এর দ্বারা শত্রুসৈন্য সংহারের যে আসল দায়িত্ব সুপ্রাথমিকমণ্ডার হিগাবে তাঁর উপর অর্পিত হইয়াছিল, সেটাও পালন করা কঠিন হইত।

এই সমস্ত ছাড়াও আর একটি গুরুতর প্রশ্ন ছিল, যে প্রশ্নটিকে সমালোচকগণ বাহ্যত উপেক্ষা করিতেছেন। পরাজিত জার্মানীকে বৃটেন, আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে ভাগ করার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। (পরবর্তীকালে ফ্রান্সকেও এই অংশীদারীতে গ্রহণ করা হইয়াছিল।) ১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসে লণ্ডনে ইউরোপীয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কমিশনের বৈঠকে স্থির করা হইয়াছিল তিন প্রধান শক্তির মধ্যে পরাজিত জার্মানীর কে কোন্ এলাকা দখল করিবেন। সোভিয়েত রাশিয়ার জন্য স্বভাবতই জার্মানীর পূর্বাংশ (বার্লিন সহ) নির্দিষ্ট হইয়াছিল। এই পবিত্রল্লাও রাশিয়ার বণিত ছিল না, ছিল বৃটিশ পক্ষের। তিন প্রধান শক্তির মধ্যে জার্মানীর দখলীকৃত অঞ্চল সম্পর্কে এই চুক্তি ইয়ান্টাব শীর্ষ সম্মেলনে অনুমোদিত হইয়াছিল। সোভিয়েত দখলীকৃত এলাকার মধ্যে ছিল বার্লিন, পশ্চিম দিকের ইক-মার্কিন দখলীকৃত লাইন থেকে যে বার্লিনের দূরত্ব ছিল ১১০ মাইল। তবে বার্লিন সম্পর্কে এই বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল যে, ইহা মিত্রশক্তিদের যৌথ দখলদারিতে একটি স্বতন্ত্র এলাকারূপে পরিচালিত হইবে। এই ভাগ-বাঁটোয়ারার আমেরিকানদেরও সম্মতি ছিল। এমন কি, ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সোভিয়েত রাশিয়া যে জার্মানীর মাত্র এক-তৃতীয়াংশ দখলে রাখার প্রস্তাবেই সন্তুষ্ট ছিল, সেটাও রাশিয়ার উদারতা বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছিল। কারণ, তখন একমাত্র ইতালীতে ছাড়া ইউরোপের কোথাও পশ্চিমী মিত্রশক্তির কোন পাত্তা ছিল না।

সুতরাং আইজেনহাওয়ার যদি বার্লিন দখল করিয়া নিতেও পারিতেন, তথাপি ভাগ-বাঁটোয়ারার চুক্তি অনুসারে জার্মানীর সেই পূর্বাংশ ছাড়িয়া দিয়া আগিতে হইত। সুতরাং এই অবস্থায় জার্মানীর রাজধানীর দিকে অভিযান করা আইজেনহাওয়ারের মতে বোকামি বা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হইত। (১১)

হিটলার-বিরোধী কোয়ালিশনের তিন প্রধান শক্তি যে আগে থেকেই পরাজিত

জার্মানীর ভাগ-বাটোয়ারা এবং অধিকৃত এলাকাগুলির মোটামুটি একটা সীমারেখা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেটা তাঁদের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়াই গণ্য হইয়াছিল। কেন না, মিত্রশক্তিবর্গ যদি জার্মানী ও বার্লিন দখলের জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু করিয়া দিত, তবে, গুরুতর জটিলতা ও বিপদের কারণ ঘটত। মিঃ ডি এক ক্রেমি যের মতে যদি মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে কেউ বার্লিন দখলের অধিকারী ছিল, তবে, সেই অধিকার ছিল একমাত্র সোভিয়েত রাশিয়ার। কারণ, হিটলরী শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য সে একাই সবচেয়ে বেশী বুকের রক্ত ঢালিয়াছিল। সুতরাং বার্লিন দখলে তার অধিকারকে কোন মতেই অস্বীকার করা চলিত না।

উইনস্টো চার্চিল চতুর ও বুদ্ধিমান ছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু অতিরিক্ত বুদ্ধি খাটাইয়া পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় বণাঙ্কন খুলিতে গিয়া তিনি ও তাঁর সমর্থকগণ এত বেশী বিলম্ব করিয়াছিলেন যে, তখন মধ্য ইউরোপ পর্যন্ত লালকোঁজের অগ্রগতিতে বাধা দেওয়ার কোন সুযোগ ছিল না।

\*

\*

\*

অবশ্য ১৯৮ সালের শরৎকালেই ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ বার্লিন দখলেব প্রস্তুতি নিয়া জল্পনা-কল্পনা করিতেছিলেন। এমন কি, মণ্টগোমারীর সঙ্গে মার্কিন পক্ষের মত বিরোধের সংঘ আইজেনহাওয়ার -এই সেপ্টেম্বর ১৯৪৪, তাঁর নিকট এক পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, যদি শক্তি ও সম্পদে কুলায় তবে, বার্লিন দখলেব কথাও নিশ্চয়ই ভাবিতে হইবে।

কিন্তু এটা ছিল মস্তিকে শোকবাক্য দেওয়ার মত। কেননা, ১লা এবং ২রা এপ্রিল রুজভেল্ট ও আইজেনহাওয়ারের নিকট চার্চিলের পর পর তারবার্তা সবেও বার্লিন অভিযান অনুমোদিত হয় নাই। কারণ, মিত্রবাহিনী তখন বার্লিন আক্রমণ ও দখলের জন্য প্রস্তুত ছিল না। রুজভেল্টের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ব্যক্তি ও পরামর্শদাতা হ্যারি হপকিন লিখিয়াছেন—“যদি আমাদের শক্তি থাকিত, তবে আমরা বার্লিন দখল করিতাম। কেননা, আমাদের সৈন্তবাহিনীর জয়গৌরব তার দ্বারা বৃদ্ধি পাইত।” (১২)

সুতরাং চার্চিল ও ব্রিটন পক্ষের দুর্ভাগ্য এই যে, বার্লিনের দিকে প্রস্তাবিত অভিযানে রুজভেল্ট ও আইজেনহাওয়ারের তেমন কোন সম্মতি ও উৎসাহ ছিল না। কেন না, মূলগতভাবে এটা রুজভেল্ট ও স্ট্যালিনের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। মিত্র পক্ষের বাহিনীগুলির মধ্যে বার্লিনে আগে কে পৌঁছাবে সেই প্রশ্নটা এক্ষণে রবণীতির চেয়ে কূটনৈতিক গুরুত্ব বেশী অর্জন করিল এবং লালকোঁজেরও অনেকে খরিয়াই লইলেন যে, বার্লিন তারাই আগে দখল করিবেন। একমুখ ক্রশ বাহিনীর মধ্যে অনেকেই বার্লিন অভিযানে যাত্রা করার জন্য অস্থির হইয়া পড়িল। তাঁদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, ইয়ান্টোতে রুজভেল্ট ও স্ট্যালিনের মধ্যে আগেই এই বিষয়ে একটা চুক্তি হইয়া গিয়াছে এবং জেনারেল

আইজেনহাওয়ার এজডই বালিনের বদলে দক্ষিণ জার্মানীর দিকে অভিযানের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু স্ট্যাটিনিয়াস এর প্রতিবাদে বলিয়াছেন যে, ইয়ান্টাভে স্ট্যাটিন-কন্ডেণ্টের মধ্যে এমন কোন চুক্তি হইয়াছে বলিয়া তাঁর জানা নাই। (হপকিন্সও এমন শুভবের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ করিয়াছেন।) তবে, আসল সত্য এই যে, ক্রমের আগে আমেরিকানরা বার্লিন দখল করিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে ভয়ঙ্কর বিরোধ দেখা দিত এবং সেকথা কন্ডেণ্ট জানিতেন (১৩)

---

(১৩) আলেকজান্ডার ওয়ার্থ—পৃষ্ঠা ৮৩:

## ‘হুভার’ অধ্যায় প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের যুত্ম

পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিক থেকে জার্মানী যখন আক্রান্ত এবং যুদ্ধপক্ষের সৈন্তেরা যখন ভিতরের দিক অগ্রসরমান এবং লালকোজ যখন খোদ বালিন অভিধানে প্রকৃত ( ১৬ই এপ্রিল ) মহাযুদ্ধের ঠিক সেই চরম মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ‘টিলারী’ জার্মানীর পতন ও যুদ্ধপক্ষের চরম জয়লাভের সুনিশ্চয়তা তিনি দেখিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মাত্র সামান্ত কয়েকদিনের জন্য তিনি জার্মানীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পনের ঐতিহাসিক মুহূর্তটা প্রত্যক্ষ করিয়া যাইতে পারিলেন না। ১১ ই এপ্রিল ১৯৪৫, তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যু কেবল আমেরিকা, বৃটেন ও সোভিয়েত রাশিয়ার নয়, পৃথিবীর সর্বত্র যুদ্ধপক্ষীয় মহলে গভীর শোক উদ্বেক করিল। কেননা, ক্যাসাবিরোধী গ্রাণ্ড কোয়ালিশনের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান নায়ক এবং সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে একত্রে বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য ইউনাইটেড নেশন্স সংগঠনের প্রধানতম উদ্যোক্তা।

কিন্তু তাঁর মৃত্যু আকস্মিক হইলেও সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল না। কেননা, যুদ্ধ-সংক্রান্ত অসংখ্য কাণ্ডাবলীর অসম্ভব চাপে তাঁর স্বাস্থ্য অনেক দিন আগেই ভাঙিয়া পড়িয়াছিল এবং অসুস্থ দেহ নিয়াই তিনি একমাত্র মনের জোরে ইয়ান্টার ঐতিহাসিক শীর্ষ সম্মিলনে ( কত্‌য়োর’ মাসের গোড়ার দিকে ) যোগ দিয়াছিলেন এবং অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে সেই সম্মেলন পরিচালনা করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি ছিলেন চার্লিল ও স্ট্যালিনের মধ্যে মধ্যস্থের মত এবং সেদিক থেকে তিনি তিন পক্ষেই প্রকার পাত্র ছিলেন।

কিন্তু তিনি যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে জাহাজযোগে ম্যান্টার চার্লিলের সঙ্গে মিলিয়াছিল এবং পরে বরমানযোগে ইয়ান্টায় ( ক্রিমিয়া ) স্ট্যালিনের সঙ্গে বৈঠকে একত্র হইয়াছিলেন, তখন স্বয়ং চার্লিল ও অন্যান্য কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখিয়া উদ্বেগ বোধ করিয়াছিলেন। একমাত্র মানসিক শক্তি এবং মহৎ কর্তব্যবোধের দ্বারা তিনি সেই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের সাকল্যজনক পরিণতি ঘটাইতে পারিয়াছিলেন। অনেক দিন ধরিয়াই তিনি অসুস্থ ছিলেন এবং মৃত্যুর ২ মাস আগে তিনি বলিয়াছিলেন—

‘All that is within me cries out to go back to my home on the Hudson River’ (১)

‘হাডসন নদীর তীরে আমার স্বগৃহে কিরে বাওয়ার জন্য আমার অন্তরাখা কাঁদছে।’

অবশেষে সেই নদী তীরে তাঁর স্বগৃহে তিনি প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রাণহীন হয়ে।...

(১) Roosevelt : the Lion and the Fox—by James Mac Gregor Burns, New York, p. 478



মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩২তম প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডিল্যানো রুজভেল্ট ৬৩ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। আমেরিকার ঐতিহাসিক সমগ্র রেকর্ড ভুল করিয়া (দুই বারের বেশী প্রেসিডেন্ট হওয়ার নিয়ম নাই) তিনি চতুর্থবারের জন্য রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং এই নির্বাচনের তিন মাসের মধ্যেই তাঁর জীবনমণীপ নিভিয়া গেল। যে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি সেই সময় হোয়াইট হাউসে যাতায়াত করিতেন, তাঁরা কিন্তু উষ্মের সঙ্গে প্রেসিডেন্টে স্বাস্থ্য লক্ষ্য করিতেন এবং বলানি করিতেন যে, হয় রাষ্ট্রপতি গুরুতর অসুস্থ কিংবা শীঘ্রই তাঁর দেহে আশ্রয় পচার করা হইবে।

জর্জিয়ার ওয়াশিংটন স্ট্রীট অঞ্চলের একটি পাহাড়ের 'হাউস' নামে ৬ কামরার যে পার্বত্যনিবাস ছিল, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সেখানে গেলেন তাঁর দীর্ঘ প্রত্যাশিত বিজ্ঞান জাহাজের জন্য। ১২ই এপ্রিল, ১৯৪৫, যখন মধ্যাহ্নের সময় তিনি একটি আরামকেদারায় বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছিলেন এবং একজন মহিলা শিল্পী তাঁর প্রতিকৃতি অঙ্কন করিতেছিলেন, তখন বেলা ১টার সময় রুজভেল্ট তাঁর হাতঘড়ির দিকে তাকাইলেন এবং বলিলেন যে, আর কিছু মাত্র ১৫ মিনিট সময় আছে। 'মিস ডিল্যানো নাম্নী একজন আত্মীয়া মহিলা যখন ফুলদানিতে ফুল সাজাইতেছিলেন এবং রুজভেল্ট একটি সিগারেট ধরাইয়াছিলেন, তখন হঠাৎ তিনি বী হাত দিয়া কপালের শিরা চাপিয়া ধরিলেন এবং অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, আমার ভয়ঙ্কর মাথা ধরেছে' (I have a terrific headache), বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাত এবং মাথা ঝুলিয়া পড়িল এবং তিনি জ্ঞান হারাইলেন। তাঁর এই বাক্যটিই 'ল' তাঁর জীবনের শেষ কথা। তখন বেলা ১টা ১৫ মিঃ—যে ১৫ মিনিটের কথা তিনি আগেই বলিয়াছিলেন।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই নৌবিভাগের ডাক্তার কমান্ডার হাওয়ার্ড ব্রুয়েন (Bruenn) আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রুজভেল্টকে বহন করিয়া তাঁর বেডরুমে লইয়া যাওয়া হইল। তাঁর খুব শ্বাসকষ্ট হইতেছিল, তাঁর নাড়ীর গতি ছিল ১০৪ এ ২ তাঁর হৃৎকোর চাপ ১০০-এর উপরে উঠিয়া গিয়াছিল। ডাক্তার বলিলেন প্রেসিডেন্ট মস্তিষ্কের রক্তস্রবণে আক্রান্ত হইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে ওয়াশিংটনে থবর গেল মিসেস রুজভেল্টের (হোয়াইট হাউজে) নিকট এবং অল্পা ডাক্তাররাও আসিলেন। কিন্তু ওয়াশিংটনের সময় অসুখাশী বেলা ৪টা ৩৫ মিনিটের সময় রুজভেল্ট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।—(১)

১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ১২ বছর ধরিয়া রুজভেল্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এবং আন্তর্জাতিক জগতের বহু সম্মতজনক সমস্রার মধ্যে প্রেসিডেন্টের দুরূহ বর্তব্য পালন করিয়াছেন। তাঁর সাহস, তাঁর সুমিষ্ট স্বভাব এবং তাঁর উজ্জল আনন্দের ব্যক্তি দ্বয় জন্য তিনি লক্ষ লক্ষ লোকের প্রীতি ও জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। জর্জ ওয়াশিংটন ও লিঙ্কনের মত ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রেসিডেন্টের মর্যাদা ও

জনপ্রিয়তা যেমন তাঁর ছিল তেমন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জগতে তাঁর বিরোধীর সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। কারণ, ১৯৩৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চরম আর্থিক দুর্গতির সময় তিনি যখন বাণিজ্যিক হাল ধরছিলেন, তখন তাঁকে অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে বন্ধনসূত্র সমুদ্র পাড়ি দিতে হইয়াছিল এবং সেই অর্থনৈতিক দুর্গতি থেকে আমেরিকাকে উদ্ধার করার জন্য তিনি এমন কতকগুলি জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন যার জন্য তাঁর বিরোধীপন্থ এবং ধনী মহলের একাংশ তাঁকে কমিউনিস্ট পক্ষপাতী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। জর্জ ওয়াশিংটন ও লিঙ্কনের পর এত ক্ষমতার বিরুদ্ধে আর কোন প্রেসিডেন্টকে লড়িতে হয় নাই। তাবপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবিস্মৃত রকমের চাপ তাঁকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। ‘অশুচ জীবনব্যাপী তাঁকে পোলিও-রোগের যন্ত্রণা বহন করিতে হইয়াছিল এবং তিনি বীরের মত এই রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। গণতন্ত্রের ও স্বাধীনতার মহান আদর্শের প্রতি তাঁর ছিল গভীর নিষ্ঠা, সর্বোপরি তিনি ছিলেন বাস্তববাদী—কাজের লোক এবং কাজের মধ্য দিয়াই তিনি তাঁর নীতি ও আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁর ক্রটি ছিল না, দুর্বলতা ছিল না, এমন নয়। কিন্তু এই সমস্ত ক্রটি ও দুর্বলতাকে ছাড়িয়া তিনি মানবতার পতাকাকে উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। ক্যাসিডম ও হিটলার-বিরোধিতার মূলও হিটলার এই বংশের ও তাগতির আদর্শবোধ। তিনি ও তাঁর একান্ত অনুরক্ত সহকর্মীগণ একত্র প্রায় পাড় থেকেই অস্ত্রধার করিয়াছিলেন যে, হিটলারী জার্মানীর বিরুদ্ধে শব্দ পর্যন্ত ঘোষণাকারী অন্ত্রধারণ করিতেই হইবে এবং তাঁর এই কার্য সহজ হইয়া গেল জাপান কর্তৃক পার্সিয়ার বারবার আক্রমণের জন্য। তারপর থেকে আমেরিকার সর্বসাধারণ মানুষ রক্তভেঁটের পিছুনে পাড়াইল। জনপ্রিয়তার শীর্ষে তিনি আরোহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ১২ই এপ্রিল আচরিতে তাঁর মৃত্যুসংগত ঘোষণা হওয়ায় অনেকের গোড়ার দিকে তা বিশ্বাস করিতে চাছেন নাই। কিন্তু পরে যখন তাঁরা বুঝিতে পারিলেন যে, সত্য সত্যই রক্তভেঁট আর বাঁচিয়া নাই, তখন অসংখ্য মানুষ শাকাজির হইয়াছিলেন। তাঁর এই মৃত্যু সম্পর্কে সময় বিভাগ থেকে একটি অদ্ভুত বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল :

Army-Navy Casualty List Washington, April 13—Following are the latest casualties in the military services, including next-of-kin.

Army-Navy Dead—Roosevelt, Franklin D, Commander in Chief, wife Mrs. Anna Eleanor Roosevelt, the White House.

মার্কিন সশস্ত্রবাহিনীর সর্বোচ্চ সেনাপতির মৃত্যু-সংক্রান্ত এই বিজ্ঞাপন সাময়িক ইতিহাসে অনঙ্গীয় হইয়া রহিয়াছে। মিসেস রক্তভেঁট মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, তাঁর স্বামী “সৈনিকের মত মৃত্যু বরণ করিয়াছেন।”

হোয়াঃট হাউসে অবিলম্বেই মন্ত্রিসভার জরুরী অধিবেশন ডাকা হইল এবং ডাইস-প্রেসিডেন্ট জারি এস ট্রুম্যান প্রেসিডেন্টরূপে শপথ গ্রহণ করিলেন এবং ঘোষণা করিলেন তিনি পরলোকগত প্রেসিডেন্টের নীতি ও পন্থা অনুসরণ করিবেন—যদিও

এই আকস্মিক গুরুদায়িত্ব বহনের জন্য তিনি আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না এবং শেষ পর্যন্ত রুজভেল্টের আদর্শ ও নীতির প্রতিও তিনি নিষ্ঠা রাখিতে পারিলেন না।

অপরায়িত্ব এই মৃত্যু সংবাদের প্রচারে গোটা আমেরিকা সেদিন স্তম্ভিত হয়েছিল। এবং তাঁর শোকযাত্রায় ওয়াশিংটনে অসংখ্য লোক যোগ দিয়েছিলেন।

\*

\*

\*

১৩ই এপ্রিল, ১৯৪৫, শুক্রবার সকালে বুটেনের প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম চার্চিল প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের এই মৃত্যুসংবাদ পাইলেন এবং গভীর শোকে অভিভূত হইলেন। তিনি তাঁর যুদ্ধের বইতে লিখিয়াছেন যে, তিনি যেন এই অপ্রত্যাশিত সংবাদের দ্বারা ‘একটা গুরুতর দৈহিক আঘাত পাইলেন।’ যুদ্ধের ভয়ঙ্কর দিনগুলিতে তাঁর সহায়তা, সাহায্য ও অন্তরঙ্গতা স্বরণ করিয়া চার্চিলের মনে হইল এই ক্ষতি অপূরণীয়—বিশেষতঃ ইতিহাসের এই সঙ্কটময় সন্ধিক্ষণে। তিনি মিসেস রুজভেল্টের (যাকে তিনি ধৈর্যশীলা ও মহিষসী মহিলা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন) কাছে এবং হ্যারি হপকিন্স ও নুতন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের কাছে গভীর সমবেদনাপূর্ণ বার্তা পাঠাইলেন এবং যুদ্ধে চরম জয়ের আশা ব্যক্ত করিলেন।

চার্চিলের প্রস্তাব অনুযায়ী সেদিন কমন্সভার অধিবেশন পরিসমাপ্তিক্রমে স্থগিত রাখা হইল। চার্চিল নিজেই বলিয়াছেন যে, কোন ‘বিদেশী রাষ্ট্রনায়কের’ মৃত্যুতে কমন্সভার অধিবেশন স্থগিত রাখা এক অভূতপূর্ব ঘটনা। (৩)

মস্কোতেও কালো রঙের বর্ডার দেওয়া পতাকা উত্তোলিত হইল এবং সুরক্ষিত সোভিয়েতের অধিবেশনে সদস্তগণ দণ্ডায়মানপূর্বক শাওনময় চিন্তে রুজভেল্টের মৃত্যুর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন। রাশিয়ার সমস্ত সংবাদপত্রে রুজভেল্টের জন্য গভীর বিষোদবেদনা প্রকাশ করা হইল।

চার্চিল ও স্ট্যালিনের মধ্যে শোকবার্তার বিনিময় হইল এবং নুতন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের নিকট স্ট্যালিন সোভিয়েত সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে গভীর সমবেদনা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলেন এবং রুজভেল্টকে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনেতাকল্পে বর্ণনা করিলেন—যে রাষ্ট্রনেতা যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা স্থানান্তরিত করিতে চাহিয়াছিলেন। স্ট্যালিন তাঁর বার্তার বৃহৎ শক্তিবর্গের পারস্পরিক সহযোগিতার উপরেও জোর দিলেন।

সোভিয়েত রাশিয়াতে কেবল সরকারী স্তরে নয়, জনসাধারণের মধ্যেও শোকের ছায়া নামিয়া আসিল। প্রত্যাশ্বর্ণী মিঃ আলেকজান্ডার ওয়ার্ল লিখিয়াছেন যে, ইয়ান্টা সন্মেলনেই রুজভেল্ট পীড়িত ছিলেন এবং তাঁকে খুব শীঘ্র দেখাইতোছিল। মস্কোয় মেট্রোপোল হোটেলের বয়স্ক পরিচারিকা ক্রিমতী কেনারা ইয়ান্টাতেও রুজভেল্টের ব্যক্তিগত ‘চেয়ারমেন্ড’ ছিলেন। তিনি মস্কোতে কিরিয়া আসিয়া অপ্রসিক্ত নরেনে বলিয়াছিলেন—“এত মিত্রবৃত্তাব, এত দয়ায় মানুষ, কিন্তু ভয়ঙ্কর পীড়িত ছিলেন।”

কেবল কেনারা নয়, সেদিনের রাশিয়ার হাজার হাজার নারী রুজভেল্টের মৃত্যুসংবাদে কাঁদিয়া কেঁদিয়াছিলেন।

অন্ধ শক্তিবর্গের মনেও রুজভেন্টের এই আংশিক যুতাসংবাদে বিচিত্র প্রতি-  
ক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল। জাপানের প্রধানমন্ত্রী অ্যাডমিরাল নুহুকি আমেরিকার  
জনগণের উদ্দেশ্যে তাঁদের নেতার মৃত্যুতে ‘গভীর সমবেদনা’ প্রকাশ করিলেন এবং  
মন্তব্য করিলেন—‘এই নেতার জন্তই আমেরিকানরা আজ এই সুবিধাজনক অবস্থানে  
পৌঁছিয়াছে।’

অপর পক্ষে জার্মান রেডিওতে ঘোষণা করা হইল—“ইতিহাসে রুজভেন্টের নাম এই  
বলিয়া চিহ্নিত থাকিবে যে, ইনি সেই ব্যক্তি যার প্রয়োচনার বর্তমান যুদ্ধ দ্বিতীয়  
মহাযুদ্ধে পরিণত হইয়াছিল এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্টরূপে তাঁর বৃহত্তম শত্রু  
বলশেভিক সোভিয়েত ইউনিয়নকে ক্ষমতার আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।”(৪)

ফ্রান্সে এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশে গীর্জায় গীর্জায় প্রার্থনা অহুষ্ঠিত হইল।  
জেনাভে লিগ গল স্বয়ং প্যারিসের অন্তর্গত যোগ দিয়াছিলেন।...

#### হিটলারী শিবিরে উল্লাস

হিটলারী শিবিরে এক অদ্ভুত পাগলামির দৃশ্যের অবতারণা হইল। যদিও সমগ্র  
জার্মানী এবং রাজধানী খাস বার্লিন শত্রুর আক্রমণের মুখে বিপর, তথাপি হিটলার  
এবং তাঁর একান্ত ভক্ত কয়েকজন প্রভুতর বিশেষভাবে গোয়েবেলস তখনও এই বলিয়া  
নিজেদেরকে আশ্বাস দিতেছিলেন যে, শেষ মুহূর্তে এমন একটা ‘মিরাক্যাল’ বা অঘটন  
ঘটিবে, যার কলে জার্মানী রক্ষা পাইয়া যাইবে।

হিটলার বিগত নভেম্বর মাসেই (১৯৪৪) পূর্ব প্রুশিয়ায় তাঁর রায়স্টনবুর্গের সদর  
দপ্তর ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। কারণ, বিজয়ী লালকোঁজ আগাইয়া আসিতে-  
ছিল। তারপর থেকে তিনি বার্লিনেই অবস্থান করিতেছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে  
ডিসেম্বর মাসে পশ্চিম রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে আর্দেনেস অঞ্চলে প্যাট্টা আক্রমণ  
চালাইবার জন্ত তিনি জিয়েগেনবার্গে (Ziegenberg) তাঁর সদর দপ্তর স্থাপন  
করিয়াছিলেন। কিন্তু আর্দেনেসের এই বেপরোয়া অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি  
১৬ই জানুয়ারী আবার বার্লিনে ফিরিয়া আসিলেন এবং সেখানে চ্যাঙ্গেলার বা  
মন্ত্রিবনের ৫০ ফুট ভূগর্ভের নিম্নে যে বিখ্যাত (বা কুখ্যাত?) বাঁকার বা আশ্রয়শালা  
নির্মিত হইয়াছিল বিমান আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্ত, সেখানে তিনি আশ্রয়  
নিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। এটিকে মিত্রপক্ষীয় বিমানবহরের প্রচণ্ড বোমা-  
বর্ষণে মন্ত্রিবনের বিশাল মার্বেল হল ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। এখানে তিনি তাঁর  
পাত্রমিত্র নিম্ন অবস্থান করিতেছিলেন বার্লিন ও জার্মানীর বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষের আক্রমণ  
রোধ ও সৈন্তবাহিনী পরিচালনার জন্ত। যদিও হিটলারের দৈহিক শক্তি একেবারে  
ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, তবু সেই অস্বাভাবিক তাঁর মানসিক শক্তি অটুট ছিল এবং তিনি  
নিজে ও তাঁর পাত্রমিত্রেরা বিশ্বাস করিতেন যে, শেষ মুহূর্তে একটা অঘটন ঘটিবেই।...

হিটলার যে সমস্ত সামরিক গ্রন্থ ও ইতিহাস পড়িত ভালোবাসিতেন সেগুলির  
মধ্যে অন্যতম ছিল মনোবী কার্লাইল রচিত ফ্রেডেরিক দি গ্রেটের ইতিহাস। এপ্রিল  
মাসের এক সন্ধ্যায় গোয়েবেলস সেই ইতিহাস থেকে একটা অধ্যায় হিটলারকে পড়িয়া

শুনাইতেছিলেন। সাত বছর যুদ্ধ চালাইয়া ফ্রেডেরিক দ্বি গ্রেট তখন পরাজয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে অঙ্ককার পর্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। তখন রাজা ফ্রেডেরিক তাঁর মন্ত্রিবর্গকে বলিলেন—যদি ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে যুদ্ধের গতির পরিবর্তন না হয়, যদি সেই গতি ভালোর দিকে না যায়, তবে তিনি রণে ক্ষান্ত হিবেন এবং বিষপানপূর্বক জীবনের অবসান ঘটাইবেন। এই অধ্যায়টাই গোয়েবেলস্ তাঁর প্রভুকে পড়িয়া শুনাইতেছিলেন অত্যন্ত নাটকীয় ভঙ্গীতে এবং সেই অধ্যায়ের এক জায়গায় ছিল—‘বীর রাজা, আর একটু ধৈর্য ধরুন। আপনার ভাগ্যসূর্য মেঘমুক্ত হইয়া শীঘ্রই পূর্ণ দীপ্তি নিয়া দেখা দিবে। সেই লক্ষণ ইতিমধ্যেই প্রকাশমান। ১২ই ফেব্রুয়ারী জাভিনা (রানী বা সম্রাজ্ঞী) মারা গেলেন এবং ব্রাণ্ডেনবুর্গ রাজবংশের মিরাক্যাল ঘটয়া গেল।’

অর্থাৎ ফ্রেডেরিক জয়লাভ করিলেন। ইতিহাসের এই অংশ স্তনিতে স্তনিতে হিটলারের চোখে জল আসিল। (৫)

এদিকে আর একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৩৩, হিটলারের একটা ঠিকুজি ভৈয়ার হইয়াছিল। ঐদিন তিনি ক্ষমতায় আসিয়াছিলেন। আর একটা ঠিকুজি কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি কর্তৃক ২ই নভেম্বর, ১৯১৮ তারিখে ভৈয়ারি হইয়াছিল ভেইমার রিপাব্লিকের ভাগ্য সম্পর্কে। এই দুই ঠিকুজিতেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল যে, ১৯৩২ সালে যুদ্ধ বাধিবে এবং ১৯৪১ সাল পর্যন্ত ক্রমাগত জয়লাভ ঘটিবে। কিন্তু তারপর কতকগুলি পরাজয় ঘটিবে এবং সর্বাপেক্ষা বিষম পরাজয় ঘটিবে ১৯৪৫ সালের প্রথম ভাগে—বিশেষতঃ এপ্রিল মাসের প্রথম অর্ধভাগে। এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় অর্ধভাগে সাময়িক সাফল্য ঘটিবে। তারপর আগস্ট মাস পর্যন্ত একটা অচল অবস্থা দেখা দিবে এবং সেই সঙ্গেই শান্তি। কিন্তু পরবর্তী তিন বছর জার্মানীর খুব খারাপ অবস্থা ঘাইবে। কিন্তু ১৯৪৮ সালে জার্মানী আবার উঠিয়া দাঁড়াইবে। (৬)

এদিকে কাল হইল এবং অগ্নিদিকে ঠিকুজির ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা উদ্ভুদ্ধ হইয়া প্রচারবিহারক গোয়েবেলস ৬ই এপ্রিল তারিখে সৈন্তবাহিনীর উদ্দেশ্যে এক মর্মস্পর্শী আবেদনে বলিলেন—“ফুরার ঘোষণা করেছেন যে, এই বছরেই আমাদের ভাগ্য পরিবর্তন ঘটিবে। সত্যকার প্রতিভার লক্ষণ হচ্ছে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী আগেই জানতে পারা। একমাত্র ফুরাই সেই পরিবর্তনের যুহুর্টটি জানেন। ভাগ্যদেবতা তেমন এক ব্যক্তিকে আমাদের নিকট পাঠিয়েছেন, একমাত্র তিনিই জানেন কখন সেই মিরাক্যাল বা দৈবঘটনা ঘটেবে।”...

এই ঘটনার এক সপ্তাহ পর ১২ এপ্রিল রাতে যখন মার্কিন সৈন্তেরা ডেসাউ-বার্লিন অটোড্যান সড়ক দিয়া আগাইতেছিল এবং অগ্রসরমান লালকোজের কাছাকাছি বার্লিন থেকে শূন্য ঘাইতেছিল, তখনও গোয়েবেলস দৈবঘটনার প্রতীক্ষায় ছিলেন এবং একজন অফিসার যখন জিজ্ঞাসা করিলেন—এবার জার্মানী কে হবেন ?

(৫) শাইয়ার, পৃষ্ঠা ১৩১৬

(৬) পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ১৩১৭

তখন গোয়েবেলস জবাব দিলেন—‘জানি না বটে, তবে, ভাগ্যে যে কোন ব্যাপার ঘটতে পারে।’...

সেদিন রাতে বার্লিনের উপর মিত্রবাহিনীর বোমাবর্ষণের পর যখন সাইরেনে যোদ্ধারা (‘অল ক্রিয়ার’) বাজিয়া উঠিল, তখন প্রচার মন্ত্রিবনের ভূগর্ভ আশ্রয় থেকে প্রেস সেক্রেটারি রুডলফ সেমলার একটি টেলিফোন-বার্তা পাইলেন। সরকারী জার্মান নিউজ এজেন্সির একজন অফিসার টেলিফোনে বলিলেন—

‘হ্যালো, শুনন, একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটেছে। রুজভেল্ট মারা গেছেন!’

‘তুমি কি ঠাট্টা করছো?’

‘না, ই মাত্র রয়টারের খবর এলো—রুজভেল্ট আজ দ্বিপ্রহরে মারা গেছেন!’

তখনই খবরটা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল এবং একজন চণ্ডীকার করিয়া বলিলেন, ‘এই সেই দৈবঘটনা যার অপেক্ষায় আমরা ছিলাম।’

কয়েকজন অফিসার তাড়াহুড়া করিয়া গোয়েবেলসের দপ্তরে গিয়া হাজির হইলেন। গোয়েবেলসের গাড়ি মাত্র তখনই দপ্তরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইতেছিল, আর মিত্রপক্ষের বোমাবর্ষণের ভয় তখন একটি হোটেল ও মন্ত্রিবনের অট্টালিকা জ্বলিতেছিল। আশ্মিনাখ্য সেই অঞ্চলটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, গোয়েবেলসকে খোঁজতে পাইয়া একজন রিপোর্টার বলিয়া উঠিলেন—‘মন্ত্রী মহাশয় রুজভেল্ট মারা গেছেন।’

গোয়েবেলস খবরটা শুনিয়া গাড়ি থেকে লাফাইয়া পড়িলেন এবং যে কয়েকজন অফিসার সেখানে একত্র হইয়াছিলেন, তাঁরা উত্তেজিতভাবে মন্ত্রিমহোদয়কে ঘিরিয়া ধরিয়াছিলেন। গোয়েবেলস স্নানোত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—‘আমাদের সব চেষ্টা ভালো ফলোয় নিলে এলো, আর এলো আমরা ফুরাবের সঙ্গ ক’থা বলি।’

গোয়েবেলস তাঁর দপ্তরে ঢুকিয়া মাত্র প্রেস সেক্রেটারি সেমলার আর আশ্রয়দপ্তর খরিতে পারিলেন না, গোয়েবেলসের দিকে চোঁচাইয়া খবরটা বলিলেন।

আর গোয়েবেলস মন্তব্য করিলেন—‘এবার ইতিহাসের মোড় ঘুরছে।’

তারপর অবিশ্বাসের সুরে বলিলেন—‘খবরটা কি সত্যি?’

গোয়েবেলস তখন হিটলারকে টেলিফোন করিলেন, আর জনাধিক লোক গোয়েবেলসের উপর কুঁকিয়া পড়িল এবং গোয়েবেলস অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে টেলিফোনে হিটলারকে বলিলেন—‘আমার ফুরার, আপনাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। রুজভেল্ট মারা গেছে। রাশিয়াকেই লেখা ছিল এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আমাদের বরাত ধুলে বাবে। আজ শুক্রবার, ২৩ই এপ্রিল। মধ্যরাত্রি অভিক্রান্ত, ভাগ্য আপনার সবচেয়ে বড় শত্রুকে নিপাত করেছে। ভগবান আমাদের ত্র্যাগ করেন নি। দু’বার আপনাকে বর্বর হত্যাকারীদের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। ১৯১৭ এবং ১৯৪৪ সালে শত্রুর আপনাকে খুন করতে চেয়েছিল। আর আজ আমাদের সব চেষ্টা ভরপুর শত্রু খতম হয়েছে। এটাই সেই মিরাক্যাল বা দৈবঘটনা।’

হিটলার টেলিফোনে এই সমস্ত শুনিলেন এবং বলিলেন যে, এখন যে কোন ঘটনাই ঘটতে পারে। ‘ইউর্যান রুজভেল্টের তুলনার অনেক বেশী মজারটে হতে পারেন।’

গোয়েবেলস এত উল্লসিত হইলেন যে, প্রেস সেক্রেটারি সেমলারের ঘনে হইল যুদ্ধ ঘেন শেব হইয়া গিয়াছে। এমন কি হিটলারের সর্বমন্ত্রী অভিন্যাত বংশের বিখ্যাত কাউন্ট Schwerin Von Krosigk পর্যন্ত এই ঘটনার মধ্যে 'ইতিহাসের দেবদূতের পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন' এবং 'গোয়েবেলসকে অভিনন্দন জানাইয়া লিখিতভাবে মন্তব্য করিলেন -

“রুজভেল্টের মৃত্যুর মধ্যে ভগবানের জ্ঞানবিচার প্রতিকলিত হয়েছে।”—(৭)

ইউরোপীয় যুদ্ধের ধ্বনিকা পড়ার আর বেশী দিন বাকী ছিল না। কিন্তু তার আগে বার্লিনে হিটলারী সাক্ষাৎসাক্ষাৎের মধ্যে ঘেন চূড়ান্ত পাগলামির অভিনয় হইয়া গেল।...

অবশ্য গোয়েবেলসের টেলিফোনের জ্বাবে হিটলারের প্রতিক্রিয়ার কোন লিখিত দলিল পাওয়া যায় নাই বটে, কিন্তু হিটলারও যে রুজভেল্টের মৃত্যুকে ভাগ্যদেবতার ইচ্ছিত ও দৈবঘটনা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ বার্লিনে ‘বলশেভিকদের আক্রমণ যে রক্তের বন্যার ডুবিয়া যাইবে’ এমন আশা তিনি প্রকাশ করিলেন সৈন্তদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত একটি দীর্ঘ বিবৃতিতে এবং এই বিবৃতিই ছিল জার্মান জনগণ ও প্রতিরক্ষাকারী বাহিনীর উদ্দেশ্যে তাঁর ‘শেব’ আহ্বান। এই আহ্বানের উপসংহারে তিনি বলিলেন—“এই সঙ্কটক্ষেত্রে ভাগ্যদেবতা পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বকালের সবচেয়ে বড় যুদ্ধাপরাধী রুজভেল্টকে অপসারণ করিয়াছেন। সুতরাং এখন থেকেই এই যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়া যাইবে।”(৮)

যুদ্ধের মোড় অবশ্য অনেক আগেই ঘুরিয়াছিল। কিন্তু সেটা হিটলার ও ন্যাৎসী জার্মানীর ধ্বংসের মধ্যে।

(৭) The Last Hundred Days, John Toland, p. 417-419.

(৮) পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৪৪২

## নবম পর্ব তৃতীয় অধ্যায় বার্লিন দখলের অভিযান

যদিও জার্মানীর ইতিহাস-বিখ্যাত রাজধানী বার্লিন শহর দখলের অভিযান শুরু হইয়াছিল এপ্রিল মাসের মধ্যভাগে, তথাপি লালকোঁজ পশ্চিম রণাঙ্গনে বিব্রত মিত্রপক্ষীয় বাহিনীকে সহায়তা করার জন্য অভ্যস্ত কদর্ঘ্বে আবহাওয়া ও ঠাণ্ডা উপেক্ষা করিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করিয়াছিল জাহুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে। সোভিয়েত বাহিনীর কৃতিত্ব এই যে, ১ জাহুয়ারী তারিখে ‘অসময়ে’ (অর্থাৎ সেই সময় আক্রমণের জন্য সোভিয়েত সময় কর্তৃপক্ষ তেমন প্রস্তুত ছিলেন না) জার্মানীর বিরুদ্ধে যে অভিযান শুরু হইয়াছিল, চার মাস পর বার্লিন দখলের আগে সেটা আর শেষ হইল না।

শিচুলা থেকে ও’ডার নদী অভিমুখে সোভিয়েত বাহিনীর এই অভিযান জার্মানীর নিকট কিছুটা অপ্রত্যাশিত ছিল। অবশ্য এই দুই নদীর মধ্যে মধ্যে তারা ৭টি প্রতিরক্ষার লাইন গড়িয়া তুলিয়াছিল। কারণ, ওয়ারশ থেকে বার্লিন অভিমুখে রুশ আক্রমণের সম্ভাবনা সম্পর্কে তারা সচেতন ছিল বটে কিন্তু জার্মানী মনে করিয়াছিল ‘মধ্য রণাঙ্গনের’ এই অভিযানের আগে কোরল্যাণ্ডে (বাল্টিক অঞ্চলের অন্তর্গত) আটকা পড়া ৩০ ডিভিসন জার্মান সৈন্যকে খতম না করিয়া সোভিয়েত বাহিনী এই দিকে অগ্রসর হইবে না। এমন কি, তার আগে হাঙ্গেরীকে জার্মানীর কবলমুক্ত না করিয়া ছাড়িবে না। কিন্তু তার আগেই ১নং বেলোকশিয়ান এবং ১নং উক্রাইনীয়ান ফ্রন্টের (ক্রান্ত অর্থে আর্মিগ্রুপ—৩ থেকে ৮টি পর্বন্ত বাহিনী নিয়া গঠিত ১৬৩ ডিভিসন সৈন্য কিংবা মোট ২২ লক্ষ লোক ও বহু সহস্র ট্যাঙ্ক, কামান ও বিমান নিয়া জয়যাত্রা শুরু করিল। ওয়ারশ-বার্লিন ছিল এই অভিযানের মুখ্যপথ এবং শত্রুর তুলনায় তখন লালকোঁজ সব দিক দিয়াই অধিকতর শক্তিশালী ছিল। যেমন—সৈন্যসংখ্যা ৫৫ গুণ, কামান ৭৮ গুণ, ট্যাঙ্ক ৫৭ গুণ এবং বিমান ১৭৬ গুণ বেশী। (সোভিয়েত সরকারী ইতিহাসের মতে)।

১৮ জাহুয়ারীর মধ্যে এই বিপুল অভিযানের রূপরেখা স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল :

১। জেনারেল কোনেভ দক্ষিণ পোল্যান্ডের মধ্য দিয়া শিল্লসমূহ সাইলেশিয়া অভিমুখে।

২। জেনারেল কুকোভ মধ্য পোল্যান্ডের ভিতর দিয়া জার্মানীর মর্যভূমির দিকে।

৩। জেনারেল রকোসোভোজ উত্তর পোল্যান্ডের মধ্য দিয়া ডানিঙ্গা অভিমুখে।

৪। দক্ষিণে চতুর্থ উক্রাইনীয়ান ফ্রন্টের জেনারেল পেট্রোভ কার্পোশিয়ান পর্বতের দিকে এবং উত্তর দিকে—

৫। জেনারেল চেরনিয়াখোভস্কি তৃতীয় বেলোকশিয়ান ফ্রন্টের অধিনায়করূপে পূর্ব প্রাশিয়ান ভিতরের দিকে।

এই পাঁচটি ক্রান্ত বা আর্মিগ্রুপ জার্মানী অভিমুখে যেন দুর্বার গতিতে অগ্রসর হইতেছিল। ২১ জাহুয়ারীর মধ্যে কুকোভ ১২৩৮ সালের জার্মান সীমানা অতিক্রম



কিংবা পোজনারের জার্মান দুর্গ বিবরণ্য কেলিন এবং ওডের নদীতীরস্থ ক্রাকফোর্টের অভিমুখে জার্মানীর ব্রাউনশ্বেইগ প্রদেশের মধ্যে প্রবেশ করিল। এই অস্থান মধ্যে হিটলার তাঁর ক্ষমতালাভের স্বাক্ষর বার্ষিকী উপলক্ষে যে বক্তৃতা দিলেন, মনে হইল তা পেরুয়ানের ভাষণ। কেননা, তখন যাত্রা একটু প্রতিবন্ধক বাকী ছিল—ওডের নদী এবং লালকোজ কর্তৃক এই নদী পার হওয়ার পরেই জার্মানী স্বতম।...

বার্লিনে নিরাপত্তা আতঙ্কের সঞ্চার হইল। হাজার হাজার আত্মরক্ষার্থী ভীড় করিতে লাগিল। বহু প্রকার গাড়িতে পলায়মান জনতা—স্ত্রীলোক, শিশু, বৃদ্ধ এবং বন্দীশালা থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত যুদ্ধবন্দী ও হাস-অমিকের দল। বার্লিনকে নিরাপদ মনে করিয়া এই জনতা রাজধানী অভিমুখে ছুটিল। কিন্তু প্রচণ্ড শীতে, তুষারবর্ষণে এবং মিত্রপক্ষীয় বিমানের ভয়াবহ বোমাবর্ষণে অল্প নর-নারী প্রাণ হারাইল। মাইলের পর মাইল আশুনে জলিয়া গেল এবং পূর্বদিক থেকে উদ্ভাস্ত শ্রোত পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইল। আক্রান্ত প্রশিয়ার বিখ্যাত ট্যানেনবার্গ (প্রথম মহাযুদ্ধে) থেকে জার্মানী কর্তৃক হিগেনবুর্গ ও তাঁর স্ত্রীর দেহাবশেষ বার্লিনে অপসারিত হইল। আর জার্মান সামরিক ভাস্কর্য জেনারেল ডিটমার রেডিও বোম্বে ঘোষণা করিলেন—‘পূর্ব-রণাঙ্গনের অবস্থা অবিস্মায়া রকমের গুরুতর।’ (১)

কিন্তু এই চরম দুর্গতি এবং বিষম বিপদ সত্ত্বেও জার্মান সৈন্যেরা অপরিসীম বীরত্বে সজ্জা সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে। দলে দলে এবং হাঙ্গারে হাঙ্গারে যুদ্ধাবরণ করিয়াছে, তবু ‘বর্বর বলশেভিকদের’ হাতে ধরা দিতে চাহে নাই। কারণ, তারা একথা বুঝিয়াছিল যে, রাশিয়াতে তারা যে ভয়ঙ্কর অত্যাচার করিয়াছে এবং রুশ যুদ্ধবন্দীদের যেভাবে হত্যা করিয়াছে, তাতে রুশদের হাতে ধরা পড়িলে জার্মানদের আর রক্ষা নাই। অতএব মরিয়া হইয়া তারা যুদ্ধ করিয়াছে।

আর এদিকে পশ্চিমের ইঙ্গ-মার্কিন মিত্রবাহিনীও পশ্চিম ও দক্ষিণ জার্মানীর দিকে ধাবমান। কিন্তু দক্ষিণ জার্মানীর ব্যাভেরিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের নিরাপদ দুর্গে দুর্ধর্ষ ন্যাৎসীবাহিনীর শেষ ‘জাতীয় প্রতিরক্ষার আশ্রয়’ (স্মাশনাল বিডাউট) গড়িয়া উঠিল—এটা ছিল নিভাস্তই সাজানো গুজব এবং গোয়েবেলসের অতি কৌশলপূর্ণ প্রোপাগান্ডার সাক্ষ্য। অবশ্য কিছু-কিছু সরকারী দপ্তর দক্ষিণদিকে অপসারিত হইয়াছিল এবং কিছু কিছু ন্যাৎসী নেতাও সেদিকে পালাইয়াছিলেন। কিন্তু হিটলার বার্লিন ছাড়িয়া এক পা নড়িতে রাজী ছিলেন না।

\* \* \*

১৯৪৫ সালের বসন্তকালে কেবল সোভিয়েত বাহিনীই নয়, মিত্রবাহিনীও জার্মানীর অভ্যন্তরে রণক্রিয়ায় লিপ্ত ছিল। লালকোজ যখন বার্লিন থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে তখন ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী হামবুর্গ-উইটেনবার্গ-ম্যাগডেবার্গ রণক্ষেত্রের লাইন ধরিয়া এপ্রিলের মধ্যভাগে এলবে নদীতীরে পৌঁছিল। সেখান থেকে তাদের অগ্রগতি হ্যারেসবার্গ এবং স্টার্টাটের দিকে। বার্লিন থেকে তখন মিত্রবাহিনীর

দূরত্ব ছিল ১০০ থেকে ১২০ কিলোমিটার। কিন্তু তার আগে মস্কোতে একটি ছোট্ট—কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ নাটকীয় ঘটনার অবতারণা হইয়াছিল।

\* \* \*

কিন্তু সেই ঘটনা বলার আগে মহাযুদ্ধের চূড়ান্ত বছর ১৯৪৫ সাল সম্পর্কে উল্লেখ করা দরকার যে, ইংলন্ডারী জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার আন্তর্জাতিক মর্যাদা খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। যুদ্ধের আগে যেখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মাত্র ৫টি দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল, সেখানে যুদ্ধ জয়ের জন্য ১৯৪৫ সালে ৪১টি দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সর্বোপরি সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে ভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক আদর্শের মতবৈষম্য থাকা সত্ত্বেও ‘সাধারণ শত্রু’ ক্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে বৃটেন, আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে ঐতিহাসিক মহাজোট বা

এট কোয়ালিশনের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং ১৯৪৫ সালের আরম্ভে ইউরোপের রণনৈতিক পরিস্থিতি রাশিয়া, আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্সের সৈন্যবাহিনীর পক্ষে অসুকল ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও স্মরণে রাখা দরকার যে, জার্মানীর অবস্থা বা পজিশন খুব খারাপ হওয়া সত্ত্বেও, তখনও তার সৈন্যশক্তি প্রচুর ছিল। জার্মান আর্মিতে তখন ৭৪ লক্ষ ৭৬ হাজার লোক ছিল। এর মধ্যে ৫৩ লক্ষ ৪৩ হাজার সৈন্য ছিল প্রত্যক্ষরূপে রণাঙ্গনের কাজে এবং সেই সমস্ত সৈন্তের মধ্যে ৩১ লক্ষ ছিল পূর্ব রণাঙ্গনে। আর তাদের অস্ত্রের সংখ্যা ছিল ২৮৫০০ কামান ও মর্টার, ৩০৫০ ট্যাঙ্ক ও গান, এবং ১২৬০ ডিভিসন। অবশ্য ১৯৪৪ সালের জুলাইয় এটা কম ছিল। কারণ, ইতিমধ্যে রুম্যানিয়া, বুলগেরিয়া ও ফিনল্যান্ড রণক্ষেত্র থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হইয়াছিল।

অপর পক্ষে ১৯৪৫ সালের জ্যুজ্যুয়ারীতে ১৯৪৪ সালের মতই সোভিয়েত বাহিনীতে ১ কোটি ১৫ লক্ষ ৫৬ হাজার সৈন্য ছিল। এর মধ্যে বণাক্তনে ছিল ৬০ লক্ষ। কামান ও মর্টার ছিল ৯১ হাজার ৪ শত, রকেট নিক্ষেপকারী ছিল ২৯৯৩, ১১ হাজার ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামান ও ১৪ হাজার ৫ শত বিমান (লেনিনগ্রাদ ও দক্ষিণ-পূর্ব বুলগেরিয়া ছাড়া)। পোলিশ, চেক, রুমানীয় ও বুলগেরিয়ান সৈন্তেরাও (মোট ২২ ডিভিসন ও ব্রিগেড) লালকোজের সঙ্গে একত্র লড়িয়াছিল। এবং তাদের মোট সৈন্তসংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ২৬ হাজার ৫ শত এবং সময়সম্ভারের মধ্যে ছিল ৫ হাজার ২ শত কামান ও ২ শত ট্যাঙ্ক। একটি করাসী বিমান ইউনিটও সোভিয়েত বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করিয়াছিল (২)

পশ্চিমের মিত্রপক্ষের তখন ৮৭টি পুরো ডিভিসন সৈন্ত, ৬ হাজার ৫ শত ট্যাঙ্ক ও ১০ হাজারের বেশী রণবিমান ছিল। আর বিপরীত দিকে জার্মানীর ছিল ৭৪টি নিয়মানের ডিভিসন ও ৩ ব্রিগেড সৈন্ত, ১ হাজার ৬ শত ট্যাঙ্ক ও ‘আঘাতকারী কামান’ এবং ১,৭৫০টি রণবিমান। অর্থাৎ পশ্চিমের মিত্রপক্ষ সৈন্তসংখ্যায় ও মারাত্মক শক্তিতে জার্মান বাহিনীর জুলনায় অনেক বেশী বলশালী ছিল। ইতালীতে ও

বলকানেও মিজপক্ষের শক্তি বেশী ছাড়া কম ছিল না। কিন্তু তবু তাদের ক্ষতগতি জয় হইল না। অস্তিত্বকে সোভিয়েত বাহিনী সমগ্র রণাঙ্গন ব্যাপিয়া অর্থাৎ ভিচুলা নদীর মুখ থেকে ভিয়েনা (অস্ট্রিয়া) পর্যন্ত আঘাত করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু আসল আক্রমণের পথ ছিল ওয়ারশ থেকে বার্লিন। সুতরাং জার্মানীও বার্লিনের প্রবেশপথে বাধা দেওয়ার জন্য পবপর গতি প্রতিরক্ষার লাইন তৈরী করিয়াছিল। ভিচুলা ও ওডের নদীর মধ্যবর্তী পোলিশ ভূমির মধ্য দিয়া ৫০০ কিলোমিটার গভীর আত্মরক্ষার বাহ তৈরী হইয়াছিল এবং পুরাতন জার্মান-পোলিশ সীমান্তে ওডের নদী বরাবর জার্মানদের বাধাদান বেশ প্রচণ্ড ছিল। (৩)

\* \* \*

রাইন নদী পার হওয়ার পর ইক-মার্কিন বাহিনী আর জার্মানীর কাছ থেকে তেমন বাধাব সম্মুখীন হইল না। সুতরাং তারাও জার্মানীর অভ্যন্তরে ক্ষত অগ্রসর হইতে লাগিল এবং বার্লিনের দখল নিয়া মিজপক্ষীয় মহলে যে বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছিল, তা আগেই বিস্মৃতভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু ভিয়েনা ও বার্লিন লালকোঁজের দখলে গেলে রণনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় দিক দিয়া সোভিয়েত রাশিয়াইউবোপে অজ্ঞেয় হইয়া উঠিবে, ব্রিটিশপক্ষ এবং বিশেষভাবে চার্চিল এই আশঙ্কায় ইক-মার্কিন সৈন্যপত্নের উপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। যদিও পশ্চিম রণাঙ্গনে মার্কিন সূপ্রায় কমান্ডার জেনারেল আইজেনহাওয়ার বার্লিনের রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব স্বীকার করিতে তেমন রাজী ছিলেন না, তবু লণ্ডন এবং ওয়াশিংটনের সরকারী মহলে লালকোঁজের আগে বার্লিনে পৌঁছিবার জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল।

এই সময় মস্কোতে সেই নাটকীয় ঘটনাটির অবতারণা হইল, যে কথা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে।...

সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল আইভান কোনভের বার্লিন যুদ্ধ সংক্রান্ত স্বীকৃতি-কথার দেখা যায়—

১৯৪৫ সালের ১লা এপ্রিল সূপ্রায় কমান্ডার-ইন-চীফ মার্শাল স্ট্যালিন হঠাৎ ১নং বেলোকনিয়ান ফ্রন্টের প্রধান সেনাপতি মার্শাল জুকোভ এবং ১নং উক্রাইনিয়ান ফ্রন্টের অধিনায়ক মার্শাল আইভান কোনভকে মস্কোর সদর দপ্তরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ক্রেমলিনে স্ট্যালিনের স্মরণ পাঠককে কনকাবলের জন্য একটি স্মরণ টেবিল ছিল এবং প্রাচীরগায়ে ছিল অভীত রাশিয়ার জাতীয় বীর সেনানী স্তোরোভ ও কুটোভোভের প্রতিচ্ছবি। রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটির বিশিষ্ট সদস্য—সেনানীমণ্ডলীর প্রধান এ আই আন্ডানোভ এবং অপারেশন কমান্ডেব প্রধান এস এম স্তেমেনকো (Shtemenko) প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। স্ট্যালিন জুকোভ ও কোনভকে স্বাগত সম্বাধ জানািবার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘পরিদৃষ্ট কি পাড়াচ্ছে সে বিষয়ে আপনারা কিছু খবর রাখেন?’

জুকোভ ও কোনভ জবাব দিলেন যে, তাঁরা তাঁদের প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী খবর রাখেন।

স্ট্যালিন তখন স্তেমেকোর দিকে তাকাইলেন এবং টেলিগ্রামটি পড়িয়া শুনাইতে বলিলেন। স্তেমেকো যে তারবার্তা পড়িয়া শুনাইলেন তার মর্ম এই :

“—the U. S. British Command was staging an operation to capture Berlin with the aim of taking the city before the Soviet Army could do it. The main forces were being organised under the command of Field Marshal Montgomery. The direction of the main attack was being planned north of the Ruhr, via the shortest road between Berlin and the main British forces.”

‘সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী কর্তৃক বার্লিন অধিকার ও শহর দখল করার আগেই মার্কিন ও ব্রিটিশ সৈন্যপতা বার্লিন দখলের উদ্দেশ্যে রণক্রিয়ার অস্ত্রাণ করিতেছে। কিন্তু মার্শাল মন্টেগোমারীর অধীনে প্রধান সৈন্যদল সংগঠিত হইতেছে। বার্লিন ও প্রধান ব্রিটিশ বাহিনীগুলির মধ্যে সংক্ষিপ্ততম রাস্তা ধরিয়া এবং কড়ের শিল্পাকলের উত্তর দিক দিয়া এই মূল আক্রমণ অস্ত্রাণের পরিকল্পনা চলিতেছে।’ (৪)

টেলিগ্রামের মধ্যে মিত্রপক্ষের অস্ত্রাণ প্রস্তুতির কথাও ছিল। সুতরাং স্তেমেকোর পড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্ট্যালিন জুকোভ ও কোনেভকে জিজ্ঞেস করিলেন :

“তা হলে বার্লিন কারা দখল করছে ?—আমরা এ মিত্রপক্ষীয়রা ?”

মার্শাল কোনেভই আগে জবাব দিলেন এবং বলিলেন—‘আমরাই আগে বার্লিন দখল করবো এবং মিত্রপক্ষের আগেই করবো।’

স্ট্যালিন একটু মুহূর্ত হাসিয়া মন্তব্য করিলেন—‘তা হলে আপনারা তেমন লোক ? ...কিন্তু আপনি আপনার সৈন্যদলকে কিতাবে পুনর্গঠন করবেন ? কারণ, আপনার আসল সৈন্যবাহিনী তো রয়েছে আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে অতএব আপনাকে পুনর্গঠনের জন্য অনেক কিছু করতে হবে।’

‘কমরেড স্ট্যালিন, আপনি এ নিয়ে কোন দুর্ভাবনা করবেন না। যথা সময়ে বার্লিনের দিকে অভিযানের জন্য আমরা ‘সমস্ত প্রকার উপযুক্ত ব্যবস্থা নিব।’—জবাব দিলেন মার্শাল কোনেভ।

আর জুকোভ বলিলেন যে, তাঁর সৈন্তেরা বার্লিন দখলের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। ১২ং বেলোরুশিয়ান ক্রপ্ট সৈন্যবলে ও অন্তর্বলে সুসজ্জিত হইয়া সংক্ষিপ্ততম পথে বার্লিন অভিযানের জন্য তৈয়ার হইয়া রহিয়াছে।

স্ট্যালিন তখন বলিলেন—‘আচ্ছা বেশ, দু’জনে আপনারদের পরিকল্পনা সদর দপ্তরে বসে দু-একদিনের মধ্যেই ঠিক করে কেলুন এবং সদর দপ্তরের অনুমোদিত পরিকল্পনা নিয়ে নিজ নিজ রণাঙ্গনে কিংবদন্তি।’

স্ট্যালিনের সঙ্গে এই আলোচনার কলে বুঝা গেল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বার্লিন অভিযান করতে হইবে। ১২ং বেলোরুশিয়ান ক্রপ্টের অধিনায়ক জুকোভ সোজা-সুথি

(৪) How Wars End—(Berlin Operation), Ivan Corev, Moscow, 1969, p. 9.

এবং নং উক্রাইনীয়ান ক্রুটের প্রধান সেনাপতি কোনেভ দক্ষিণ দিকে কটবাস (Kotthbus) অঞ্চল হইয়া বার্লিন আক্রমণ করিবেন।

উক্ত ক্রুটের সৈন্তেরাই মধ্যভাগে ড্রেসডেনের দিকে আক্রমণ চালাইয়া এলবে নদীতীরে পৌঁছিব। (৫)

এখানে আর একটি তাৎপর্যবাহক ঘটনা উল্লেখ করা দরকার। স্ট্যালিন যখন দুই প্রধান নায়কের সৈন্তবাহিনীর পুনর্গঠন এবং আক্রমণের গতিপথ নিয়া আলোচনা করিতেছিলেন তখন তিনি একটি পেন্সিল দিয়া মানচিত্রের উপর ১নং বেলোরুশিয়ান ও নং উক্রাইনীয়ান ক্রুটের অগ্রগতির সীমারেখা টানিয়া দিতেছিলেন। কিন্তু বার্লিনের ৮০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে লুব্বেন (Lubben) শহরের দিকে আসিয়া তিনি তাঁর পেন্সিলের লাইন টানা হঠাৎ থামাইয়া দিলেন।

এই লাইন টানার পর স্ট্যালিন নিঃশব্দ রহিলেন। কিন্তু পরে তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন—

'Who gets in first, let him take Berlin.'

অর্থাৎ যিনি আগে ঢুকিতে পারিবেন, তিনিই বার্লিন দখল করুন। (৬)

বার্লিন দখলের জন্য লালকোঙ্কের সাধারণ সৈন্ত থেকে শুরু করিয়া অধিদারদের মধ্যে পর্যন্ত গভীর ঝুঁসুকা ও উত্তেজনা দেখা দিয়াছিল। এমন কি কে কে মন্তব্য করিয়াছেন যে, বার্লিন আক্রমণ ও দখল করার বিষয়ে তিন মার্সালের—জুকোভ, কোনেভ এবং রকোসোভোভির মধ্যে প্রতিযোগিতার মনে ভাব পর্যন্ত দেখা দিয়াছিল। স্ট্যালিন তাঁর সদর দপ্তরের মানচিত্রের উপর লাইন টানিয়া অত্যন্ত কৌশলে এই প্রতিযোগিতার উদ্ভাস দিয়াছিলেন।

২নং বেলোরুশিয়ান ক্রুটের অধিনায়ক মার্সাল কে কে রকোসোভি ৬ই এপ্রিল তারিখ স্ট্যালিনের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন। তাঁকে ভার দেওয়া হইয়াছিল সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের উত্তর দিক দিয়া বার্লিন দখলে সহযোগিতা করার জন্য।

বার্লিন অভিযানের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ছিল 'ভিক্টুলা' নদী এবং 'সেন্টার' বা মধ্য রণাঙ্গনের দুইট কার্খান আর্মিগ্রুপকে ধ্বংস করিয়া বার্লিন দখল করা এবং সেই সঙ্গে এলবে নদীতে পৌঁছিয়া ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর সহিত মিলিত হওয়া। ইউরোপীয় যুদ্ধ শেষ করার এইটাই ছিল চূড়ান্ত পরিকল্পনা।

বার্লিনের দিকে যখন অভিযান চলিতে থাকিবে তখন চেকোস্লভাকিয়া আক্রমণ করাও সোভিয়েত বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল। এবং এই আক্রমণের লক্ষ্য ছিল চেকোস্লভাকিয়া থেকে যাতে কার্খান বাহিনী বার্লিনের দিকে অপসারিত হইতে না পারে, তেমন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা।

লালকোঙ্ক চর্তুর্থ বার্লিন দখলের অভিযানে নান্দী কার্খানী সর্ব্ব পণ করিয়া বাধা দিবে এবং পশ্চিমের ইঙ্গ-মার্কিন বিদ্রোহীহীকে তেমন কোন প্রতিরোধ করা হইবে না, নোভোভোড চর্তুর্থ এই দৃষ্ট 'ববর সুয়েই বিবেচনা করিয়া'ছেন। সুতরাং

(৫) পূর্বোক্ত পৃষ্ঠক, পৃষ্ঠা ২২

(৬) Great Patriotic War of the Soviet Union—p. 377.

বার্লিন বেটন ও জার্মানীকে আক্রমণের জন্য সোভিয়েত হাইকমান্ড যে সামরিক শক্তির সমাবেশ করিলেন, তেমন শক্তি অন্য রণক্ষেত্রে দেখা যায় নাই। জুকোভ, কোনেভ এবং রকোসোভস্কি—এই তিন মার্শালের নেতৃত্বে তিনটি সম্মিলিত ফ্রন্টের সৈন্য সংখ্যা দাঁড়াইল ২৫ লক্ষ, যার ৪২ হাজার, ট্যাঙ্ক ৬২৫০, রণবিমান ৭৫০০ এবং রকেট-নিক্ষেপক ১ হাজারের বেশী। আর আসল রণাঙ্গনের প্রতি কিলোমিটারে ২৫০টি কামান। অর্থাৎ জার্মান বাহিনীর তুলনায় সোভিয়েত বাহিনী রণক্ষেত্রের সৈন্যশক্তিতে এবং অস্ত্রশক্তিতে বিশেষ থেকে চারগুণ বেশী বলশালী ছিল।

এই ঐতিহাসিক আক্রমণের তারিখ নির্দিষ্ট হইয়াছিল ১৬ এপ্রিল শেষ রাত্রি—কুস্তিন থেকে ওডের নদী পার হইয়া এই আক্রমণের বোধন করা হইবে।

\*

\*

\*

কিন্তু একমাত্র বার্লিন শহর দখলের জন্য ১০ লক্ষ সৈন্য, ১০ হাজার ৪ শত কিলোগ্রাম এবং অন্যান্য অস্ত্র ও সমরসজ্জার সমাবেশ কি প্রয়োজনের তুলনায় মাত্রাতিরিক্ত ছিল না এবং কলে অতিরিক্ত সৈন্যত্ব কি হইয়াছিল না?—এই প্রশ্ন সোভিয়েত মহল থেকে উঠিয়াছিল। (৭)

এই প্রশ্নের জবাবে বার্লিন যুদ্ধের অন্ততম সেনাপতি লেঃ জেনারেল কে. এক টেলিগ্রাম তাঁর এক প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, ই. কণাটা আংশিক সভ্য, পুরাপুর নয়। কুস্তিন-বার্লিন যথা রণাঙ্গনের সংক্ষিপ্ততম পথে ১২ বেলোরুশিয়ান এবং ১২ উক্রাইনীয়ান ফ্রন্টের (আর্মি গ্রুপ) পারস্পরিক সহযোগিতায় বার্লিনের যুদ্ধ হইবে। আরও কম সৈন্য ও কম অস্ত্রশক্তির সহযোগিতায় জয় করা যাইত। কিন্তু একথা মনে রাখা প্রয়োজ্য যে, জার্মান হাইকমান্ড তাঁদের সর্বশক্তি বার্লিন প্রতিরক্ষার যুদ্ধে নিয়োগ করিয়াছিলেন এ ২ তাঁরা ধরিয়াই লইয়াছিলেন যে, ওডের নদীর যুদ্ধেই বার্লিনের ভাগ্য চূড়ান্ত রূপে নির্ণীত হইয়া যাইবে। এজন্য বার্লিন রক্ষাকারী ২০০ আর্মির অধিকাংশকেই ওডের রণাঙ্গনের দিকে পাঠানো হইয়াছিল। বার্লিনের উত্তর দিক থেকে মার্শাল জুকোভের সৈন্যবাহিনীর পার্শ্বদেশে আক্রমণের পরিকল্পনার জন্য কিছু মজুত সৈন্যও জমায়ত করিয়া রাখা হইয়াছিল জার্মানীও ১০ লক্ষ সৈন্য ১০ হাজার কামান ও মর্টার, প্রায় দেড় হাজার ট্যাঙ্ক এবং তিন হাজার রণবিমান সমাবেশ করিয়াছিল। অধিকন্তু বার্লিনের প্রতিরক্ষার জন্য প্রচণ্ড আয়োজন করা হইয়াছিল। এমন কি, পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে সৈন্য সরাইয়া আনিয়া পূর্ব দিকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল এবং পশ্চিমের ষাঁটিও শহরগুলি থেকে জার্মান সৈন্তেরা বেজায় ইন্-মার্কিন পক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছিল। ১১ এপ্রিলের মধ্যেই মার্কিন বাহিনীর অগ্রবর্তী হল ম্যাগডেবুর্গে হাজির হইয়াছিল। এভাবে নদীর বিস্তৃত রণাঙ্গনেও তাঁরা পৌঁছিয়াছিল। এমন কি ইন্-মার্কিন বাহিনীর বিমান-সৈন্তেরা বার্লিনের সন্নিকটে অবতরণ করিয়া লালকোন্সের আগেই বার্লিন শহর দখল করিয়া নিবে—সোভিয়েত কমান্ডের নিকট এই বর্ষে রিপোর্ট পৌঁছিয়াছিল। মার্কিন বিমান-বাহিনীর অন্ততম সেনাপতি জেনারেল গ্যাভিন সোভিয়েত সেনাপতি লেঃ জেনারেল

টেলিগনের নিকট এক সময় মন্ব্য করিয়াছিলেন যে, কখনো এক আশ্চর্য জাতি। ভিক্টোলা থেকে ওডের নদী পর্যন্ত তাঁরা যেভাবে বৃদ্ধ চালাইয়া আসিয়াছেন, তাতে ইক-মার্কিন পক্ষের ধারণা হইয়াছিল যে, যে মাসের মাঝামাঝির আগে সোভিয়েত সৈন্তেরা বালিনের দিকে অভিযান করিতে পারিবে না। কিন্তু কি আশ্চর্য তার আগেই তাঁরা বালিন দখল করিয়া নিয়াছিলেন। (৮)

১১ই এপ্রিল সোভিয়েত সর্বাধিনায়ক মার্শাল স্ট্যালিন মার্শাল জুকোভের দপ্তরে এই মর্মে এক টেলিগ্রাম পাঠাইলেন :

“হিটলার বালিন এলাকায় মাকড়শার জাল বু নতেছে। উদ্দেশ্য হইতেছে রাশিয়া ও মিত্রপক্ষের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা। এই জাল ছিন্ন করার জন্য সোভিয়েত বাহিনীকে বালিন দখল করিতে হইবে।...আমরা এটা করিতে পারি এবং আমাদের অবশ্যই এটা করিতে হইবে।”

অর্থাৎ মার্শাল স্ট্যালিন স্বাসস্তব দ্রুত বালিন দখলের জন্য মার্শাল জুকোভ এবং মার্শাল কোনেভকে তাগিদ দিলেন। (৯)

উচ্চতম সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছিল ১২ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে বালিন শহর দখল করা। হিটলারও রাজধানী রক্ষা করার জন্য শহরের প্রবেশপথে গভীরভর বাহ তৈয়ার করিলেন এবং ওডের নদী ও স্প্রী নদী বরাবর প্রচুর প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিলেন। পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ এবং উত্তর—সমস্ত দিক দিয়াই বালিনকে ঘুরেস্ত কণার জন্য চেষ্টার কোন ক্রটি করা হইল না। হিটলারের পক্ষে আর একটা ভরসার কারণ এই ছিল যে, বালিনের চারিদিকে প্রাকৃতিক বিষণ্ড প্রচুর ছিল—জঙ্গল, জলাভূমি, নদী ও ক্যানেল বা খাল ইত্যাদি ছিল। আর রাজনৈতিক দিক দিয়া চেষ্টা ছিল “সোভিয়েত রাশিয়া ও পশ্চিমের মিত্রপক্ষের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো।” সৌভাগ্যক্রমে হিটলার ও তাঁর দলবলের সেই আশা পূর্ণ হইল না। মার্শাল কাইটেল হুরেমবার্গের আন্তর্জাতিক আদালতে তাঁর সাক্ষ্য বলিয়াছেন যে, ১৯৪৪ সাল থেকেই হিটলার রাশিয়া ও ইক-মার্কিনের মধ্যে বিচ্ছেদের আশা ছিলেন।

কিন্তু মিত্রপক্ষের মধ্যে যেমন বিচ্ছেদ ঘটানো সম্ভব হইল না তেমনি বালিনের প্রবেশপথ থেকে শুরু করিয়া রাস্তার রাস্তায় যে অজস্র প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হইয়াছিল, লালফৌজের ভয়াবহ আক্রমণের বজ্রাবেগে সেগুলি যেন ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল। ১৬ই এপ্রিল রাজি ৪টার মার্শাল জুকোভের বাহিনী কুস্তি থেকে অভূতপূর্ব গোলাগুলি বর্ষণের দ্বারা বালিনের দিকে অভিযানের বোধন করিলেন। প্রচণ্ড আলোকের বজ্র (১৪৩টি ফ্লাড লাইট) জার্মান সৈন্তদের চোখ যেন ধাঁধিয়া গেল এবং হাজার হাজার কামানের অগ্নি উদগরণে শত্রুসৈন্তেরা একবারে হতভম্ব হইয়া পড়িল। ১৭ই এপ্রিল জার্মানদের দ্বিতীয় আত্মরক্ষার বাহ বিদ্ধ হইল এবং তৃতীয়ের দিকে আক্রমণ অস্বীকৃত হইল। ১৮ই এপ্রিল স্প্রী (Spree) নদী অভিক্রান্ত

(৮) পূর্বোক্ত পুস্তক, লেঃ জেনারেল টেলিগনের প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা ২৬০।

(৯) ঐ পুস্তক, ঐ পৃষ্ঠা।

বিমহা (৩)—৩

হইল এবং ২০শে এপ্রিল জোসেন্ (Zossen) বা জার্মান সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরের প্রতিরক্ষার লাইন ভাঙিয়া গেল। অভিযানের বষ্ট দিনে ওডের-নেইসী নদী বরাবর ৩০০ কিলোমিটার দীর্ঘ রণাঙ্গন বিদীর্ণ হইল। ২১শে এপ্রিল সন্ধ্যায় রুশ সৈন্তেরা বার্লিনের শহরভলীতে প্রবেশ করিল এবং ২২শে এপ্রিল বার্লিনের বিহর্বুহ ভাঙিয়া গেল এবং অপরাহ্নে বার্লিনের রাস্তার রাস্তায় যুদ্ধ অহুষ্ঠিত হইল—বর্দিও স্ট্যালিনগ্রাদের অতরুণ নয়।

বার্লিন পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল এবং যে ১২নং জার্মান আর্বি মার্কিন বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য গঠিত হইয়াছিল, তাদের নিয়োগ করা হইল অগ্রসরমান সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে। ক্রমে বার্লিন তিনটি সম্মিলিত ক্রুতের অর্থাৎ জুকোভ, কোনেভ ও রকোসোভস্কির দ্বারা বেষ্টিত হইতে লাগিল।

বার্লিনে বিপর্যয় ও আভ্যন্তরীণ সৃষ্টি হইল এবং দলে দলে নরনারী সেই আভ্যন্তরীণ শিকার হইল। এদিকে জল, কয়লা, বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি বন্ধ হইয়া গেল। দ্রাসগ্রস্ত হিটলারের চেলারা এবং একদা বীরের দোঁদগ প্রতাপে জার্মানী ও অধিকৃত ইউরোপ কাঁপিত, হিটলারের সেই দুর্দান্ত চেলারা—হিমলার, গোয়েরিং প্রভৃতি বার্লিন থেকে চম্পট দিল। বোমার ও কামানের গোলাবর্ষণে বার্লিন নগরী তখন মাইলের পর মাইল অগ্নিশিখার জলিতেছিল। মিত্রপক্ষ ৬৫ হাজার টন বোমা বর্ষণ করিয়াছিল, আর সোভিয়েত পক্ষ ৪০ হাজার টন গোলা নিক্ষেপ করিল। কিন্তু সেই অবস্থায়ও জার্মান সৈন্তেরা রাস্তার রাস্তায় বাধা দিতেছিল। এমন কি প্রত্যেকটি গৃহকে যেন তারা সুবক্ষিত দুর্গে পরিণত করিয়াছিল। অবশ্য রাস্তার যুদ্ধে সোভিয়েত সৈন্তদেরও প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল,—স্ট্যালিনগ্রাদেই তার প্রমাণ। মার্শাল জুকোভ বার্লিন যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং রণনীতি ও রণক্রিয়া সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে, বার্লিন যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে সুলীম কমান্ডার-ইন-চীফ মার্শাল স্ট্যালিন অত্যন্ত দক্ষতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে এই রণপ্রস্তুতির পরিচালনা করিয়াছিলেন। (১০)

বার্লিন যুদ্ধে উভয় পক্ষেই প্রচুর সৈন্ত হতাহত হইয়াছিল। কেননা, গোয়েবেলসের দপ্তর ‘বলশেভিক বর্বরতা’ এবং নিঃসৃত আত্মসমর্পণের ভয়াবহ বিপদ সম্পর্কে জার্মান সৈন্ত ও জনগণের চিন্তে প্রচণ্ড উত্তেজনা ও ভীতির সঞ্চার করিয়াছিলেন। কলে, রুশদের হাতে বন্দী হওয়ার চেয়ে যুদ্ধে প্রাণ হেঁচকা ভালো—এই মনোভাবের দ্বারা জার্মানরা উৎসাহিত হইয়াছিল। এদিকে ২৫ মার্চ ১৯৪৫, হিটলারের কড়া হুকুম ছিল ‘যেই সৈন্তটিকেও প্রাণ দিয়া রাজধানী রক্ষা করিতে হইবে।’ এবং এই কাজে যারা ব্যর্থ হইবে কিংবা পশ্চাতে হটিতে চাহিবে তাদেরকে গুলি করিয়া মারা হইবে। সুতরাং বার্লিনের জন্ত জার্মানদের যত্নোপায় বন্ধ না করিয়া উপায় ছিল না।

শেষের কয় মাসের এই মর্মান্তিক অবস্থা সম্পর্কে লেঃ জেনারেল কে এক টেলিগ্রাম লিখিয়াছেন:

“The history of the last months of the Nazi dictatorship is a bloody chronicle of the tragedy of thousands of German families,



of the officers and men who had been shot or tortured 'for disobedience, "for loss of the German spirit" for desertion and for attempts to surrender. Special S S groups had orders to shoot on the spot any person who left his position without orders or tried to surrender. 'Any person, whether private or officer, who will retreat will be shot on the spot' such was Hitler's order."—(১১)

সোজা কথায় এর মর্থ হইতেছে যে কোন জার্মান সৈন্য রাজধানী রক্ষার এই যুদ্ধে হুকুম পালন করিতে ব্যর্থ হইবে, কিংবা পালনের চেষ্টা না করিবে, অথবা পশ্চাদপসরণ করিবে, তাকেই তৎক্ষণাৎ গুলি করিয়া হত্যা করা হইবে। হিটলারী ডিক্টেটরির শেষ কয়েক মাসে হাজার হাজার জার্মান পরিবার এভাবে ভয়ঙ্কর ট্রাজেডির সম্মুখীন হইয়াছিলেন।

হিটলারের আদেশ ও গোয়েবেলসের প্রচারকার্য মিলিয়া বার্লিনের জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামকে ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছিল—যদিও তখন সোভিয়েত সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বার্লিনের আত্মরক্ষার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং এই যুদ্ধ জার্মানীর প্রায় আত্মহত্যার সমান ছিল। কারণ, লালকৌলের ২৫ লক্ষ সৈন্য তখন জার্মানীকে ভিন্ন দিক দিয়া ঘিরিয়া কেলিয়াছিল এবং পশ্চিমের ইং-মার্কিন মিত্রবাহিনী পশ্চিম ও দক্ষিণ জার্মানীর ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া বাণ্ডার কলে জার্মানী উত্তরে ও দক্ষিণে বিচ্ছিন্ন এবং বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। ২৫শে এপ্রিল এলবে নদীতীরের টোরগাউ (Torgau) শহরের নিকট রুশ ও মার্কিন সৈন্যদল পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলাইলেন। জার্মানীর অভ্যন্তরে মিত্রবাহিনীর পরস্পরের মধ্যে এই হাত মিলানো ইউরোপে এক নতুন ইতিহাসের অধ্যায় খুলিয়া দিল। কেননা, হিটলারের ঘোষিত 'হাজার বছরের রাইখের' অস্তিত্ব নশা ঘনাইয়া আসিল এবং ইউরোপীয় মানচিত্রের ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গুরুতর পরিবর্তন ডাকিয়া আনিল।

কিন্তু জার্মানী ও বার্লিনের বিরুদ্ধে যখন এই চূড়ান্ত যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন নাৎসী মহানায়ক হিটলার এবং তাঁর দলবল কি করিতেছিলেন? সেই অদ্ভুত ঐতিক ও রোমহর্ষক কাহিনী পরবর্তী অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

(11) The Gread March of Liberation. p. 270-71.

## নবম পর্ব চতুর্থ অধ্যায় ভূগর্ভের অস্তিত্ব আশ্রয়ে হিটলার

২০শে নভেম্বর, ১৯৪৪, হিটলার পূর্ব প্রুশিয়ার রাস্তেনবুর্গের সদর দপ্তর শেষ বারের জন্য ত্যাগ করিয়া বার্লিনে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পূর্ব রণাঙ্গনের যুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়াকে ধ্বংস করার জন্য হিটলার এত কাল যে সদর দপ্তরে ছিলেন, 'সোভিয়েত বাহিনীর ঐতিহাসিক জয় ও অগ্রগতির জন্য রাস্তেনবুর্গের সেই বিখ্যাত সদর দপ্তর পরিত্যক্ত হইল। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব রণাঙ্গনের এই ভয়াবহ যুদ্ধের আবহাওয়ার পর হিটলার কন্সটান্স বার্লিনে আসার সুযোগ পাইয়াছেন। কিন্তু ২০শে নভেম্বর রাস্তেনবুর্গের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া তিনি বার্লিনে আসার পর পশ্চিম দিকে ইক-মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে আর্দেনেস অঞ্চলে যে বেরোরো পাণ্টা আক্রমণ তিনি চালাইয়াছিলেন, সে জন্য ১০ই ডিসেম্বর বার্লিন ত্যাগ করিয়া তিনি পশ্চিমের সদর দপ্তর জিয়েগেনবার্গে (Ziegenberg) কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই পাণ্টা আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৪৫, আবার বার্লিনে ফিরিয়া আসিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বার্লিনেই ছিলেন। কিন্তু পশ্চিম ও পূর্ব দিক থেকে মিত্র পক্ষের প্রবল আক্রমণের জন্য হিটলারের পক্ষে বার্লিনে মস্তিভবনে বা চ্যান্সেলারিতে অবস্থান করা আর সম্ভব ছিল না। কারণ, রাইখ চ্যান্সেলারির সেই বিখ্যাত ভবন মিত্রপক্ষীয় (প্রধানতঃ ইক-মার্কিন রোমান্স) বোমা বর্ষণে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল এবং হিটলার ও তাঁর দলবল পুরাডন চ্যান্সেলারি ও বাগানের ৫০ ফুট মাটির নীচে বিশেষভাবে নির্মিত ভূগর্ভের বৃহৎ বাস্কারে আশ্রয় নিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই বাস্কারে জার্মান রণপ্রভুর দৈনন্দিন জীবনযাপন ও যুদ্ধ পরিচালনার জন্য মোটামুটি সব ব্যবস্থাই ছিল। অবশ্য এই বাস্কারে আরাম ও বিলাসিতার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ৫০ ফুট মাটির নীচে হিটলার যেন পাতালপুরীর কংক্রীটের আশ্রয়ে এক ধরনের 'আত্মগোপনে'র মত অবস্থান করিতেন। বলাই বাহুল্য যে, বোমা ও গোলাবর্ষণ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই হিটলার ও তাঁর স্টাক এভাবে ভূগর্ভের নিরাপদ আশ্রয় অবলম্বন বাধ্য হইয়াছিলেন। বার্লিনের যুদ্ধ এবং হিটলারের অস্তিম আশ্রয়ের জন্য এই বাস্কার সারা পৃথিবীতে 'খ্যাতি' অর্জন করিয়াছিল। এই বৃহৎ বাস্কার প্রধানতঃ দুইটি অংশে বিভক্ত ছিল। প্রথম অংশে ছিল ১২টি কক্ষ বা কক্ষ। হিটলার দুর্গাঙ্গ ও নৃশংস হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জীবনযাত্রা সহজ ও অনাড়ম্বর ছিল। কোন প্রকার নেশা তাঁর ছিল না এবং তিনি নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করিতেন। বাস্কারে একজন বিশেষভাবে নিরামিষ রান্নাঘর ছিল। এছাড়া দ্বিতীয় অংশে, অর্থাৎ ফুরারের নিজস্ব বাস্কারে ১৮টি কক্ষ ছিল। কিন্তু কক্ষগুলি আরতনে খুব ছোট ছিল এবং বাতায়নের পথ ছিল সঙ্কীর্ণ। তবে বাস্কার থেকে জরুরী অবস্থায় পলায়নের বা বহির্গমনের জন্য একটা গোপন সুড়ঙ্গপথের ব্যবস্থাও ছিল। হিটলার ছাড়া গোয়েবেলস, বোরম্যান প্রভৃতি পক্ষস্থানসী নেতাদের জন্য সরকারী ভবনগুলির নীচে

আরও কয়েকটি বাহ্যিক ছিল এবং যুদ্ধের শেষের দিনগুলিতে এই সমস্ত বাহ্যিক আঙ্গুর ও আলোচনা-সভা বসিত। জড্‌ল, কাইটেল প্রভৃতি শীর্ষ রণনায়কেরা তাঁদের সদর দপ্তর জোসেন (Zossen) বা পটসডাম থেকে এই সমস্ত আলোচনা সভায় যোগ দিতেন। আর আসিতেন আমি জেনারেল স্ট্রাসের নুতন অধিনায়ক জেনারেল হ্যান্স ফ্রেবস্‌। কারণ, ইতিমধ্যে পূর্ববর্তী অধিনায়কদের মত জেনারেল গুডেরিয়ানের সঙ্গেও হিটলারের তীব্র মত বিরোধ ও ঝগড়া হইয়াছিল। ৩০শে মার্চ হিটলার-প্রস্তাবিত রণনীতি নিষা জেনারেল গুডেরিয়ান ও হিটলারের মধ্যে ঝগড়ার এক “হিংস্র দৃষ্টান্ত” অবতারণা হইয়াছিল এবং এই ঝগড়ার শেষে হিটলার গুডেরিয়ানকে পদচ্যুত করিলেন তাঁর “দুর্বল হাটের” জন্য অবসর গ্রহণ বা পদত্যাগ করিতে। সুতরাং গুডেরিয়ানের বদলে জেনারেল ফ্রেবস্‌ সেনানায়কগণের নুতন নায়ক নিযুক্ত হইলেন। এককালে অবশ্য তিনি মস্কোর জার্মান দূতাবাসে ‘মিলিটারি অ্যাট্যাশে’ ছিলেন। সেনাপতি হিসাবে তিনি দক্ষ ছিলেন বটে, তবে, হিটলারের বশবশ্ত ছিলেন।

হিটলার তাঁর এই পাতালপুরীর আঙ্গুরে তাঁর পাক্ষিক নিষা রোজ দরবার করিতেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নামজাদা ঐতিহাসিক এইচ. আর. ট্রেভর রোপার “হিটলারের শেষের দিনগুলি” (দি লাস্ট ডেইজ অব হিটলার) নামে মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই যে মূল্যবান পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তাতে হিটলারের বাহ্যিক ঘটনাবলীর অত্যন্ত নিপুণ ও প্রামাণিক বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। মৌলিক গ্রন্থ হিসাবে বইটি সর্বত্র শিক্ষিত মহলে সমাদৃত। মিঃ ট্রেভর রোপার বলিতেছেন যে, হিটলার ও ন্যাৎসী রাষ্ট্র সম্পর্কে কতকগুলি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। হিটলারের শেষের দিনগুলির ব্যাপ্তিভাষ্যে বৃত্তিতে হইলে এই ভুল ধারণাগুলির সংশোধন হওয়া দরকার। প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, হিটলার কাহারও হাতের “দাবার বড়ো” ছিলেন না এবং ‘ন্যাৎসী রাষ্ট্র কোন তাৎপর্যবাহক অর্থেই টোটেলিটারিয়ান বা সর্বপ্রাসী ছিল না’ এবং এই রাষ্ট্রের নেতৃত্বান্বিত রাজনীতিকরাও ‘গবর্নমেন্ট’ ছিলেন না। কিন্তু এটা ছিল একটা কোর্ট বা রাজদরবারের মত—যে দরবারের প্রকাশন ক্ষমতা ছিল নগণ্য। কিন্তু চক্রান্তবাজিতে এর ক্ষমতা ছিল অপরিমিত—প্রাচ্য দেশের যে কোন খেজাচারী মূলতানের মত। অবশ্য একটা রাইখ ক্যাবিনেট ছিল। কিন্তু এই মন্ত্রিসভাও ছিল নামে মাত্র। কারণ কোনদিন কার্যতঃ এর কোন অবিবেচন বা বৈতক বসে নাই। ন্যাৎসী সংবিধানের পণ্ডিত নামে পরিচিত মিঃ ল্যামার্স (Lammers) হুসারবার্গের আন্তর্জাতিক আদালতে বলিয়াছিলেন যে, তিনি একদা মন্ত্রিসভার সদস্যদের একত্রে একটা বীয়ার পানসভায় মিলাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু হিটলার তা জানিতে পারিয়া নিষেধ করিয়া দিলেন এবং মন্তব্য করিলেন যে, ‘একল পরীক্ষা বিপজ্জনক।’<sup>(১)</sup>

(১) The Last Days of Hitler—H. R. Trevor Roper, Pan-Books, 1952, p. 9.

১২৪৪ সালের শীতকালে কিংবা ১২৪৫ সালের বসন্তকালে অভিশপ্ত বার্লিন শহর থেকে যে কঠোর স্ত্রী বাইত, সেটাই ছিল নাৎসী পার্টির আসল মনের কথা—হয় বিশ্বব্যাপী শক্তির অধিকারী কিংবা ধ্বংস। ( World power or Ruin )। এর জন্য তাদের দরকার রাশিয়া বা প্লাভ জাতিকে সংহার কর' এবং পূর্ব ইউরোপকে উপনিবেশে পরিণত করা। নাৎসীবাদের পক্ষে এটা ছিল অপরিহার্য। ফ্রান্স বা বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছিল গতানুগতিক—সাধারণ রাজ্যজয়ের যুদ্ধ কিংবা রাশিয়াকে সংহার করার পরিপূরক যুদ্ধমাত্র। কিন্তু নাৎসীদের কাছে সোভিয়েত রাশিয়ার 'অস্তিত্বই ছিল অপরাধজনক'। সুতরাং দণ্ডযোগ্য বা সংহারযোগ্য।...পশ্চিমদিকের যুদ্ধ ছিল 'কূটনৈতিক এবং সীমাবদ্ধ লক্ষ্যের যুদ্ধ। অতএব কিছু আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন সেই সমস্ত যুদ্ধে মানা হইত। কিন্তু পূর্ব রণাঙ্গণের যুদ্ধ ছিল 'ক্রুসেড' বা ধর্মযুদ্ধের মত—মতাদর্শের সংগ্রাম, যে সংগ্রামে সমস্ত নিয়মকানুন অগ্রাহ্য করা হইয়াছিল। মূলগতভাবেই নাৎসীবাদে ক্রুশবিরোধী ছিল :

"As Russia's crime was its existence, so its judgment was extermination. The war in the west was a traditional war, a war of diplomatic aims and limited objectives, in which some residue of international convention was regarded ; the war in the east was a crusade, a 'war of ideologies' in which all conventions were ignored. It is essential that we remember the basic anti-Russian significance of Nazism !" (২)

মিঃ ট্রেভার রোপার হিটলারী চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন যে, হিটলারী মতে প্রকৃতি হইতেছে নিষ্ঠুর। সুতরাং তাঁর পক্ষেও 'নিষ্ঠুর হইতে কোন বাধা নাই—১২৩৪ সালে ইহুদী ও প্লাভদের সম্পর্কে তাঁর এই মন্তব্য। অতএব তিনি স্থির করিলেন বিন্দুমাত্র করুণা না দেখাইয়া সংহারপর্ব চালাইতে হইবে। তিনি ছিলেন রক্তপিপাসু এবং আগাগোড়া যুদ্ধ পরিচালনার সময় তিনি এই রক্তপিপাসার অনবরত পরিচয় দিয়াছেন। 'হত্যার জন্যই হত্যার' একটা দৈহিক ও মানসিক আনন্দ তিনি উপভোগ করিতেন। এমন কি যে-সমস্ত জেনারেল রক্তপাতে ও কঠোরতার অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁরা পর্বস্ত হিটলারী নির্মমতার দৃষ্টান্তে গভীরভাবে আহত হইতেন। কেবল পরের দেশে নয়, নিজের দেশেও সৈন্ত ও লোকদের রক্তপাতেও তিনি উল্লাসবোধ করিতেন। কারণ, 'এই সমস্ত রক্তপাত ছিল ভবিষ্যৎ যুদ্ধ অর্জনের বীজ বপন স্বরূপ।' হিটলার যেন এক নরমাংসাশী অপদেবতার মত ছিলেন এবং তাঁর এই ভয়ঙ্কর রক্তের তৃষ্ণা কোনদিন পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করে নাই এবং তাঁর ধ্বংসের আকাঙ্ক্ষাও কোন দিন পূর্ণ চরিতার্থ হয় নাই এবং তাঁর প্রায় শেষের দিনের নির্দেশগুলিও ছিল হত্যা করার কিংবা বধ করার কলঙ্কে লিপ্ত। প্রাচীনকালের 'বীরদের' মত নরবলি-সহ তাঁকে গোর দেওয়া হোক, এটাই যেন ছিল তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা। তাঁর নিজের

মেহ গোড়াইয়া ভষীভূত করার আদেশও ছিল তাঁর সেই 'ঋণসাম্রাজ্যিক বিশ্ববের বৃত্তিসম্বত উপসংহার যাত্রা।' (৩)

ষষ্ঠীয় মহাযুদ্ধের নরমেধযজ্ঞের কথা মনে রাখিলে মিঃ ট্রেজর রোপারের এই মন্তব্য নিশ্চয়ই অতিরঞ্জিত মনে হইবে না। কারণ, বার্লিনের ভূগর্ভের অস্তিম আশ্রয়েও তিনি পাশাখিক নিষ্ঠুরতার অনেক বর্বর দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন এবং গোটা জার্মান জাতিকে ঋণসের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছিলেন।

\*

\*

\*

২০শে এপ্রিল ছিল হিটলারের ৬৬তম জন্মদিন। তাঁর 'চ্ছা' ছিল দক্ষিণ দিকে ওবেরস্লামজবার্গে এই জন্মদিন পালন করার এবং সেখান থেকে বারবারোসার পৌরাণিক কাহিনীমণ্ডিত পার্বত্য ভূগর্গ থেকে তৃতীয় রাইখের শেষ আত্মরক্ষার যুদ্ধ পরিচালনা করার। একজু ১০ দিন আগেই বাসেটসগ্যাডেনে তিনি তাঁর ভৃত্য ও গৃহস্থালির লোকদের পাঠাইয়া দিয়াছিলেন তাঁর বার্গহোফের মনোরম ভিলাটিকে সাতাইবার জন্ত। ট্রাকের পর ট্রাক ভর্তি করিয়া সরকারী স্টাক ও দপ্তরখানা এবং দলিলপত্র ইত্যাদি দক্ষিণ দিকে পাঠানো হইল। বার্লিনের আসন্ন পতনের আশঙ্কায় ভীত সরকারী কর্মচারীরাও সেদিকে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন। (একজুই পশ্চিম দিক থেকে অগ্রগামী ইক-মার্কিন সৈন্যপতন্যমহলে গোপন রিপোর্ট পৌঁছিয়াছিল যে, দক্ষিণের পার্বত্য অঞ্চল থেকেই হিটলারী জার্মানী তার শেষ প্রতিরক্ষার সংগ্রাম চালাইবে এবং পশ্চিম রণাঙ্গনের মিত্রপক্ষীয় সুপ্রাথম কমান্ডার আইজেনহাওয়ারও সেই রিপোর্টের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বার্লিনের সামরিক গুরুত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন, যার জন্ত পশ্চিমের মিত্রপক্ষীয় মহলে প্রচুর ক্ষোভ ও বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল।) কিন্তু হিটলারের অদৃষ্টে আলপাইনের সেই মনোরম নিবাস দেখার সুযোগ আর ঘটিল না। কেননা, যে দশদিন আগে তিনি তাঁর ভৃত্য ও সরকারী কর্মচারীদের সেই পার্বত্য নিবাসে পাঠাইয়াছিলেন, সেই কয়েকদিনের মধ্যেই একটার পর একটা বিপর্যয় ঘটিতে লাগিল। এত দ্রুত জার্মানী ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল যে, হিটলার তা অস্বপ্ন করিতে প করেন নাই। কার্যতঃ জার্মানী দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। মার্কিন ও রুশ বাহিনী এলবে নদীতীরে পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলাইবার জন্ত দ্রুত আগাইয়া আসিতেছিল। রুশরা ইতিমধ্যেই ওডের এবং নাইসী নদী তটবর্তী এলাকায় পৌঁছিয়া গিয়াছিল এবং ড্রেসডেন ও বার্লিন বিপর্যয় করিয়া তুলিয়াছিল। আর উত্তর দিকে বৃটিশ বাহিনী ব্রেমেন ও হ্যাডর্গ বন্দরের শহরগুলিতে পৌঁছিয়া জার্মানীকে অধিকৃত ডেনমার্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। দক্ষিণ দিকে ক্রাসসী সৈন্তেরা উত্তর দানিয়ার এবং রুশ সৈন্যেরা ১৩ এপ্রিল ভিয়েনায় পৌঁছিয়া গেল। নাৎসী পার্টির রাজধানী হ্যারেমবার্গ অবরুদ্ধ হইল এবং মার্কিন সপ্তম বাহিনীর একাংশ নাৎসী আন্দোলনের জন্মভূমি মিউনিখের দিকে ধাবমান হইল। ইতালীতে কিন্তু মার্সাল আলেকজান্ডারের সৈন্যেরা বলাগনা কাড়িয়া লইল এবং পো নদীর উপত্যকায় প্রবেশ করিল। মার্কিন

জেনারেল প্যাটন ব্যাভেরিয়া ও রাইখের মর্যাদা ভেদ করিয়া দক্ষিণে আলসের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। তখন খোদ রাজধানী বার্লিন থেকে সোভিয়েত বাহিনীর বৃহৎ কামানগুলির গোলাবর্ষণের শব্দ শুনা বাইতেছিল।

এই অবস্থার মধ্যে হিটলার যখন তাঁর জন্মদিন অমুষ্ঠানের কথা ভাবিতেছিলেন, তখন তাঁর পণ্ডিতম্ভ্য অর্থস্বামী কাইস্ট সেভেরিন ভন ক্রোসিগ (Schwerin Von Krosigk) বলশেভিকদের অগ্রগতির সংবাদ শুনিবা মাত্র বার্লিন ছাড়িয়া উত্তর দিকে পলায়ন করিলেন এবং ২৩ এপ্রিল ডার্মস্টাতে মস্তব্য করিলেন—“আমাদের জাতির ভাগ্যে ঘোরতর অন্ধকার ঘনিষে আসছে।”

কিন্তু এই বিপর্যয়কর পরিস্থিতি সত্ত্বেও হিটলার যেন নিশ্চিন্ত এবং তাঁর ধারণা বার্লিনের প্রবেশপথে সোভিয়েত বাহিনী নিশ্চয়ই চূর্ণ হইবে এবং তাঁর বংশবধ ভক্তেরাও—যেমন, হিমলার, গোয়েরিং, গোয়েবলস, ডোয়েনিৎস, কাইটেল, জডল, বোরম্যাং, রিবেল্ট্রপ প্রভৃতি তাঁর জন্মদিনের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাইতে আসিয়া তাঁকে নানা স্তোত্রবাক্য শুনাইলেন। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই আন্তরিক ছিলেন কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ, তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল হিটলারকে ভোয়াজ করা এবং পরস্পরকে ল্যাং মারিয়া সম্ভব হইলে আরও ক্ষমতার আসন দখল করা।...

তবু সেদিনের সাময়িক নেতাদের বৈঠকে রাইখের ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা নিয়া উষেগ দেখা দিল এবং নেতারা হিটলারকে পরামর্শ দিলেন অবিলম্বে বার্লিন ছাড়িয়া দক্ষিণ দিকে আশ্রয় নেওয়ার জন্ত। কারণ, এর পরে আর বিচ্ছিন্ন জার্মানীর স্থলপথ দিয়া দক্ষিণ অংশে যাওয়া সম্ভব হইবে না। আর রুশ সৈন্তেরা যেভাবে বার্লিন শহরকে ঘিরিয়া ধরিতেছে, তাতে এই অবরুদ্ধ শহর থেকে পলায়নের আর কোন উপায় থাকিবে না। সুতরাং বড় বড় নাৎসী নেতারা হিটলারকে অমুরোধ করিলেন বার্লিন ত্যাগ করার জন্ত। কিন্তু হিটলার দৃঢ়তার সহিত অস্বীকৃত হইলেন। বরং তিনি জার্মানীর বিচ্ছিন্ন দুই অংশে—উত্তর ও দক্ষিণে দুইটি পৃথক কমান্ড গঠন করিতে চাহিলেন। উত্তর অংশের নেতৃত্বে থাকিবেন গ্রাও অ্যাডমিরাল ডোয়েনিৎস এবং দক্ষিণ অংশে কিন্তু মার্শাল কেসেলরিং। এই দুই জনের প্রতিই হিটলারের গভীর আস্থা ছিল। কিন্তু হিটলার তখনও জানিতেন না যে, তাঁর প্রিয় কিন্তু মার্শাল ততক্ষণে ইতালীতে জরলাভের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এবং নিশ্চল আত্মসমর্পণের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। সুতরাং হিটলারের এই সমস্ত পরিকল্পনা যুধে ও কাগজ-পত্রেরেই রহিয়া গেল।

বৈঠকের শেষে সেই রাতেই অনেক রথী-মহারথীই বার্লিনের বাহ্যক ছাড়িয়া লরী ট্রাক গ্লেন ও অন্তান্ত যানবাহনের কনভয় বোগে ওভারস্টালজবার্গের দিকে পলায়ন করিলেন। এই পলায়িত বীরপুরুষদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নাম হিমলার ও গোয়েরিং, যে দুই নেতা হিটলারের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও একনিষ্ঠ সহকর্মী-রূপে পরিচিত ছিলেন। বলা বাহুল্য যে, গোয়েরিং পলায়নের আগে অনেক ট্রাক ভর্তি করিয়া তাঁর বিশাল ঐশ্বর্যপূর্ণ কারিন্‌হল্ জমিদারী থেকে অনেক দ্রব্যবান

বৃত্তি মাল লইয়া গেলেন। তবে, হিমলার ও গোয়েরিং উভয়েই এই মনোভাব নিয়া বার্লিন ত্যাগ করিলেন যে, তাঁদের প্রিয়তম ফুরার শীঘ্রই মারা পড়িবেন, সুতরাং রাইখের সর্বময়ক্ষমতা তাঁদের হাতেই বর্তাইবে।

অস্তান্ত যে সমস্ত সেনাপতি ও অফিসরেরা পলায়ন করিলেন, তাঁরা অন্ততঃ এই ভাবিয়া সাহস পাইলেন যে, আর অনবরত হিটলারের গালাগালি শুনিতে ও অসম্মান বহন করিতে হইবে না। কেননা, শেষের দিকে যতই পরাজয় ঘটিতেছিল ততই হিটলারের মেজাজ বিগড়াইতে ছিল। বিশেষভাবে বিমান বাহিনীর ব্যর্থতার জন্য হিটলার চিৎকার করিয়া বলিতেছিলেন—‘হু একজন অফিসারকে গুলি করিয়া মারো, কি বা বিমানবাহিনীর গোটা স্ট্যাককে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দাও।’

কিন্তু উভক্ষেপে বিমানবাহিনীর বড় কর্তা হেরমেন গোয়েরিং বার্লিন থেকে চম্পট দিয়াছেন।(৪)

হিটলার কুর্সের বাকার ত্যাগ করিয়া বার্লিন ছাড়িয়া বাইতে অনিচ্ছুক ছিলেন। এর অন্ততম কারণ এই ছিল যে, তিনি নিজেকে রণবিশারদ বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং বার্লিন থেকে রুশ বাহিনীকে হটাইয়া দেওয়ার জন্য তিনি একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতে চাইলেন। তিনি বার্লিন রক্ষার জন্য একটা রণ-পরিকল্পনাও স্থির করিলেন এবং বিভিন্ন সেনাপতির উপর পশ্চিম, পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে আক্রমণ চালাইয়া রুশদেরকে হটাইয়া দেওয়ার জন্য হুকুম দিলেন। এই সমস্ত পরিকল্পিত আক্রমণের মধ্যে তিনি মানচিত্রের দিকে তাকাইয়া ‘স্টেইনার’ (Steiner) ‘স্টেইনার’ বলিয়া চোঁকাইয়া উঠিতেন। অর্থাৎ এস এস জেনারেল স্টেইনারকে তিনি তাঁর সৈন্যদল সহ রুশদের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য নির্দেশ দিলেন। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস এই যে, স্টেইনারের অধীনে কোন শিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্যদল ছিল না। তিনি সেনাপতিভাণের বড় কর্তা জেনারেল ফ্রেবসকে সে কথা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। কিন্তু হিটলার সেই সমস্ত কথা কানে তুলিতেই চাইলেন না। তিনি এক দীর্ঘ জোরালো বক্তৃতায় স্টেইনারকে বলিলেন—“ভূমি যেথেন নিও স্টেইনার, রুশ সৈন্তেরা বার্লিন প্রবেশের কটকে বৃহত্তম পরাজয় যেনে নিতে বাধ্য হবে।”

যদিও বার্লিন রক্ষার আর কোন আশা ছিল না, তবু হিটলার সেই সমস্ত বৃত্তি অগ্রাহ্য করিলেন এবং স্টেইনারের ‘মাথার বিনিময়ে’ এই হুকুম কার্যকর করার নির্দেশ দিলেন।(৫)

গত কয়েক দিন হিটলার নিজের বার্লিন শহরের বিভিন্ন ব্যাটেলিয়ানকে পরিচালনা করিতেছিলেন এবং ২১ এপ্রিল বার্লিনের দক্ষিণ শহরতলীতে রুশদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ও সর্বাঙ্গক আক্রমণের আদেশ দিলেন। প্রত্যেকটি সৈন্য, প্রত্যেকটি ট্যাক এবং প্রত্যেকটি প্লেন এই আক্রমণে নিয়োগ করিতে হইবে। কেবল স্টেইনার নয়, গোয়েরিংয়ের বিমানবাহিনীর প্রধান জেনারেল কোলার (Koller) ও অন্তান্ত অফিসারদেরকেও হুকুম দেওয়া হইল যদি কেউ পিছনে হটে কিংবা লড়াইতে বিরূপ

(৪) ঐডর-মোপার, পৃষ্ঠা ১১৮

(৫) The Last Battle—Ryan, p. 402-3

হয়, তবে ৫ ঘটটার মধ্যে তার প্রাণ হনন করা হইবে। কোলারকে তাঁর মাথা বাজি রাখিয়া শেব সৈন্যটিকে পর্বন্ত রণক্ষেত্রে নিয়োগ করিতে হইবে।

সারা দিন ধরিয়া হিটলার আশা করিয়া রহিলেন স্টেইনারের পাল্টা-আক্রমণের সংবাদেই জয়। কিন্তু কার্যতঃ কোন আক্রমণই ঘটিল না। কারণ, একমাত্র হিটলারের উত্তম মণ্ডিৎ ছাড়া এই সমস্ত সৈন্যের কোন পাল্টাই ছিল না। বাস্তবতার সঙ্গে হিটলারের যে কোন সম্পর্ক ছিল না এই ঘটনাই তাঁর স্পষ্ট প্রমাণ। পরদিন বেলা ৩টা পর্বন্ত তিনি টেলিফোনের কাছে বসিয়া রহিলেন বিভিন্ন বাঁটি থেকে আক্রমণের সংবাদ পাওয়ার জন্য। কিন্তু কোন খবরই পাওয়া গেল না। (৬)

সে দিনে, অর্থাৎ ২২ এপ্রিল অপরাহ্নে সামরিক নেতাদের আলোচনা বৈঠকে এতদিনের অবরুদ্ধ ঝড় যেন ভাঙিয়া পড়িল এবং হিটলারের শেষের দিনগুলির ইতিহাসের সেটাই যেন ছিল চূড়ান্ত ও ভাগ্য নিয়ামক :

'Then came the storm, which made the conference of 22nd April famous and decisive in the History of Hitler's last days.' . (৭)

সেই ঝড়ের দৃষ্ট সৈন্য যেন সমস্ত সামরিক অফিসার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং তাঁদের সহকারীরা যে দৃষ্ট দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতেছিলেন, তাঁদের বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে, হিটলার ক্রোধে কাটিয়া পড়িলেন, গলার স্বর সপ্তমে চড়াইয়া চিৎকার করিয়া বলিলেন— 'সকলেই তাঁকে ভাগ করিয়াছে।' আর্মির উদ্দেশ্যে গালাগালি করিলেন, সকলকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া মৃগুপাত করিলেন এবং চারিদিকে কেবল বিশ্বাস-ঘাতকতা, ব্যর্থতা, দুর্নীতি এবং মিথ্যাচার দেখিতে পাইলেন। তারপর ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন এবং ঘোষণা করিলেন যে, সব শেষ হইয়া গিয়াছে। অবশেষে এই প্রথম তিনি স্বীকার করিলেন যে, তাঁর মিশন বা ব্রত ব্যর্থ হইয়াছে, কিছুই আর বাকী নাই। তৃতীয় রাইখ ব্যর্থতার পরিণত : এবং এই রাইখের প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যু বরণ ছাড়া আর কিছু করার নাই। সমস্ত সন্দেহ সংশয় তাঁর পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। তিনি বার্লিন ছাড়িয়া দক্ষিণ দিকে বাইবেন না। যাদের তেমন ইচ্ছা আছে, তাঁরা চলিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু তিনি বার্লিনেই থাকিবেন এবং সেখানেই মৃত্যু বরণ করিবেন।

হিটলারের এই প্রকার বিস্ফোরণে বিস্ময় ও বিস্মিত সেনাপতিরা এবং রাজনৈতিক নেতারা প্রতিবাদ করিলেন এবং বলিলেন এখনও সব শেষ হইয়া যায় নাই। কিন্তু মার্শাল স্কেলেরনায়ের (Schoerner) আর্মি গ্রুপ চেকো-স্লোভাকিয়াতে এবং কিছু মার্শাল কেসেলিংয়ের অধিকাংশ সৈন্য ইতালীতে এখনও অটুট আছে। সুতরাং হিটলারের উচিত আর বিলম্ব না করিয়া বার্লিন ছাড়িয়া দক্ষিণদিকে চলা বাওয়া।

হিমলার, ডোয়েনিংস এবং রিৎস্ট্রপ তাঁদের সহকারীদের কাছ থেকে টেলিফোনে সংবাদ পাইয়া ফুরারকে অজরোধ জানাইলেন ওয়ারস্ভালজবার্গে চলিয়া যাওয়ার জন্য। কিন্তু হিটলার তাঁর সংকল্পে অবিচলিত রহিলেন এবং তাঁর নির্দেশে

(৬) উইলিয়াম শাইয়ার, পৃষ্ঠা ১০২১

(৭) ফ্রেডর-রোপার, পৃষ্ঠা ১২৬



বার্লিন রেডিও থেকে ঘোষণা করা হইল যে, ফুরার বার্লিন জ্যাপ করিবেন না। তিনি ও গোয়েবেলস বার্লিনেই অবস্থান করিবেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বার্লিন রক্ষার জন্য লড়াই চালাইবেন :—

এই নাটকীয় ঘোষণার পর হিটলার গোয়েবেলস ও তাঁর পত্নীকে তাঁদের বোম্ব-বিক্ষেপ্ত আবাস ভাগ করিয়া ফুরারের বাসারে আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া জ্ঞান হারান। কারণ, গোয়েবেলস দম্পতিও ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তাঁরা এবং তাঁদের ৬টি শিশুসন্তান বার্লিনেই অবস্থান করিবেন এবং ফুরার-সুস্থ জার্মানীতে তাঁরাও বাঁচির থাকিতে চাহেন না, তাঁরাও মৃত্যুবরণ করিবেন। তাঁদের সন্তানদের বিব্রপ্ররোগে মারিয়া কেনা হইবে— এমন নিদাক্ষণ সংকল্পের কথা কোন শিক্ষিত দায়িত্বশীল বাবা-মার মুখ থেকে কদাচিত্ত শুনা গিয়াছে। কিন্তু গোয়েবেলস দম্পতি সেই সংকল্পের কথাই ব্যক্ত করিলেন।

এইভাবে হিটলারের সেই পাতালপুরীর নাট্যমঞ্চে যেন একটির পর একটি স্বকল্প চূড়ান্ত ঘটনিকা পতনের দিকে অগ্রসর হইতেছিল এবং তারই প্রস্তুতি স্বরূপ হিটলারের নির্দেশে কিছু বাছাই-করা বলিলপত্র পোড়াইয়া ফেলা হইল। তারপর তাঁর দুই শীর্ষ সামরিক নেতা কাইটেল ও জডলকে তিনি বার্লিন ছাড়িয়া দক্ষিণে চলিয়া যাইতে বলিলেন। কিন্তু তাঁরা অস্বীকৃত হইলেন। তখন হিটলার কাইটেলের প্রতি অতুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন—‘আপনি আমার হৃদয় ম্যানিতে বাধ্য।’ সমগ্র সমস্ত বাহিনীর প্রধান কাইটেল হিটলারের প্রতি কুহুরের মত অগ্ররক্ত ছিলেন এবং কোনদিন তিনি হিটলারকে অমান্য করা দূরের কথা, হিটলারের অস্বস্ত্যময় অপরাধমূলক নির্দেশ-গুলিও তিনি বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করিয়াছেন। সুতরাং কাইটেল আর কথা না বলিয়া চূপ করিয়া গেলেন। রণক্ৰিয়ার প্রধান জডল যদিও গোড়া হিটলারভক্ত ছিলেন, তথাপি তিনি একেবারে অন্ধ ছিলেন না। তিনি এই প্রস্তাবে যোরতর আপত্তি জানাইলেন। কিন্তু হিটলার তাঁর প্রতিজ্ঞার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলেন, তিনি নিজে বার্লিন রক্ষা করার যুদ্ধ পরিচালনা করিবেন। কারণ, অন্তেরা যখন বার্ষ হইয়াছে, তখন তিনি নিজে একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। তবে, তিনিও যদি বার্ষ হন, তা হলে শেষ মুহুর্তে তিনি বন্ধুকের গুলিতে আত্মহত্যা করিবেন। অবশ্য তিনি স্বীকার করিলেন যে, তাঁর শরীর একেবারে হালিয়া পড়িয়াছে। তথাপি তিনি জীবিত বা মৃত অবস্থায় শত্রুর হাতে ধরা দিবেন না। তখন জডল ও কাইটেল প্রস্তাব করিলেন যে, তাঁরা পশ্চিম দিক থেকে সৈন্তবাহিনী কিরাইয়া আনিবেন এবং সমগ্র পশ্চিম জার্মানী তাঁরা ব্রিটিশ ও আমেরিকানদের হাতে তুলিয়া দিবেন এবং এভাবে অন্ততঃ বার্লিনকে রুশদের হাত থেকে রক্ষা করা যাইবে। সম্ভবতঃ এই সমস্ত ঘটনার অন্তই সোভিয়েত পুত্রকাহিতে অভিযোগ করা হইয়াছে যে, জার্মানবাহিনী পশ্চিমে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীকে ভেদন বাধা দেয় নাই।

কাইটেল ও জডল আরও স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, তাঁরা সকলেই যদি বার্লিন ছাড়িয়া দক্ষিণে চলিয়া যান, তবে, জেনারেল স্ট্রাকের সহযোগিতা ছাড়া তিনি বার্লিনের যুদ্ধ চালাইবেন কিভাবে? সুতরাং সুপ্রাথমিক কথাগুলির নিকট তাঁরা হৃদয়ের

প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিতেছেন। হিটলার জবাব দিলেন যে, তাঁর পক্ষে আর হুখ দেওয়ার কিছু নাই। কারণ, সমগ্র জার্মানী ভাঙিয়া পড়িতেছে, আর কিছু করিবার নাই। সমস্তই শেষ হইয়া গিয়াছে। তবু যদি তাঁরা হুকুম নিতে চান, তবে, তাঁরা রাইখ মার্শালের কাছ থেকে আদেশ নিতে পারেন। এর জবাবে কাইটেল ও জড্‌ল বলিলেন যে, একজন জার্মান সৈন্যও রাইখ মার্শালের (গোয়েরিং) অধীনে হুকু করিতে রাজী হইবে না।

এর জবাবে হিটলার যা বলিলেন তার তাৎপর্য ও প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। কারণ, হিটলার বলিলেন যে, এক্ষণে হুকু করার আর গ্রন্থ উঠে না। কারণ, হুকু করিবার মত আর কিছু নাই। আর যদি পশ্চিমের ইক্স মার্কিন পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধবিবর্তির আলোচনা করিতে হয়, তবে, তার উপযুক্ত পাত্র হইতেছে গোয়েরিং। সে এই সমস্ত বিষয়ে আমার চেয়ে ভালো। আলোচনা চালাইতে পারিবে। (৮)

এরপর হিটলার কাইটেলের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন কি ভাবে বালিনকে উদ্ধার করা যাইতে পারে। তিনি প্রস্তাব করিলেন জেনারেল ভেন্কে (Wenck) যে ১২ নং আমি বালিনের দক্ষিণ-পশ্চিমে এলবে নদীর ধারে রহিয়াছে, তাদের উচিত অবিলম্বে সেখানকার রণক্রিয়া ত্যাগ করিয়া পটসডামের দিকে অভিস্রব করা এবং বালিন, চ্যামেলারি ও ফুরারকে উদ্ধার করা।

কিন্তু এই সমস্ত প্রস্তাবও বাস্তবে কোন কাজে আসিল না। কিন্তু হিটলার বালিন ত্যাগে অপরীকৃত হওয়ার কলে কাইটেল ও জড্‌লকে বাধ্য হইয়াই হাই কমান্ডের কিছু স্টাকসহ বালিনের পশ্চিম শহরতলীতে একটা দপ্তর খুলিতে হইল। কিন্তু সেখান থেকে স্থান পরিবর্তন করিতে করিতে শেষ পর্যন্ত এই দপ্তর উত্তর প্রান্তবর্তী ডেনমার্ক সীমানায় ক্লেনবুর্গে অপসারিত হইয়াছিল। অবশ্য জেনারেল ফ্রেবস্ হিটলারের সামরিক পরামর্শদাতা হিসাবে বাকারেই রহিয়া গেলেন।

হিমলার তখন বালিনের উত্তর-পশ্চিমে হোহেনলাইচেন শহরে অবস্থান করিতে ছিলেন। সদর দপ্তরের সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী এস এস অকিসার হেরমান ফেগেলিনের (Hermann Fegelein) দ্বারা থেকে টেলিকোনযোগে যখন তিনি বাকারের এই সমস্ত ঘটনাবলী শুনিতেছিলেন তখন তিনি চোঁচাইয়া উঠিলেন—  
‘বালিনে সকলেই পাগল হয়ে গেছে! আমি আর কি করতে পারি?’

কেউ কেউ তাঁকে বালিনে বাওয়ার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তিনি গেলেন না। কারণ, তখন তিনি এস এস জেনারেল শোলেনবার্গের উদ্বাহনেতে সুইডেনের কাউন্ট বার্নাডোটের (রেডক্রসের বড় কর্তা) সঙ্গে পশ্চিম দিকে জার্মান বাহিনীর আত্মসমর্পণের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। অবশ্য হিমলার হিটলারের বাকারে টেলিকোন করিয়া তাঁকে বালিন ত্যাগের জন্য অজরোথ জানাইয়াছিলেন। এদিকে হিমলারের দৃষ্টবন্দী বিভাগের প্রধান গটলোব বার্গার (Gottlob Berger) পশ্চিম জার্মানীতে আটক কয়েকজন বিশিষ্ট বন্দী—বুটশ, করাসী ও আমেরিকান এবং প্রাক্তন জার্মান সেনাপতি

হালভার, অৰ্ধনীতিবিদ শাকট ও অস্তিত্বের প্রাক্তন চ্যান্সেলার গুগনিগ প্রতীতির স্থানান্তরিতকরণ সম্পর্কে যখন হিটলারের মতামত জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তখন বিপোর্ট পাওয়া গেল যে, অস্তিত্ব ও ব্যাভেরিয়াকে বিচ্ছিন্নতার দাবিতে বিজ্ঞোহের মত দেখা দিয়াছে, তখন হিটলার পুনরায় ক্রোধে কাটিয়া পড়িলেন এবং তাঁর হাত-পায়ের কাঁপুনি সত্ত্বেও চিৎকার করিয়া উঠিলেন—‘সবাইকে গুলি করে মারো!’

তবে এই চিৎকার বন্দীদের উদ্দেশ্যে কিংবা বিজ্ঞোহীদের উদ্দেশ্যে তা স্পষ্ট বুঝা গেল না। সেদিন রাত্রি ১০টার সময় রুশ গোলাবর্ষণের মধ্য দিয়াই বাক্সারের অধিকাংশ কৰ্মী ও সহকারী, এমন কি হিটলারের বিশ্বাসভাজন ও ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডঃ মোরেল পর্যন্ত ওয়ারস্যালজবার্গের দিকে পলায়ন করিলেন। অবশ্য মার্টিন বোরম্যান এবং আরও কয়েকজন থাকিয়া গেলেন। কিন্তু বিমানবাহিনীর জেনারেল কোলার রাত্রি সাড়ে তিনটার সময় বাক্সার ত্যাগ কবির বিমানযোগে মিউনিখ চলিয়া গেলেন এবং সেখান থেকে দুপুরের দিকে (২৩ এপ্রিল) ওয়ারস্যালজবার্গে পৌঁছিলেন এবং রাইখ-মার্শাল গোয়েরিংকে সমস্ত ঘটনা বলিলেন। সমস্ত কাহিনী শুনিয়া গোয়েরিং অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

### গোয়েরিং ও হিমলার কর্তৃক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা

গোয়েরিং তাঁর সহকারী ও পরামর্শদাতাদের সঙ্গে এক আলোচনা বৈঠকে বসিলেন। তাঁর পক্ষে ক্ষমতা দখলের সময় আসিয়াছে এবং এরূপ একটা সুযোগের জন্যই তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁকে সাবধানে অগ্রগর হইতে হইবে। কেননা, তাঁর ‘মারাত্মক শত্রু’ মার্টিন বোরম্যানের কোন ফাঁদে গিয়া তিনি না পড়েন। এবং বোরম্যান সম্পর্কে তাঁর এই ভীতি যে গতিহীন ছিল না, সেটা পরে প্রমাণিত হইয়াছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে গোয়েরিং বিধায় পড়িলেন। তাঁর পরামর্শদাতাদের নিকট তিনি বলিলেন—‘যদি এই সময় আমি কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করি, তবে আমি বিশ্বাসঘাতক রূপে চিহ্নিত হইতে পারি। আমার কোন কিছু না করিয়াই যদি আমি চুপচাপ থাকি, তবে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠিতে পারে যে, জাতির এই ভয়ঙ্কর দুর্বিপাকের সময় আমি কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হইয়াছি।’

তথাপি এ কথা সত্য যে, ১৯৪১ সালের ২০শে জুন হিটলার এই মর্মে এক ভিক্রি জারি করিয়াছিলেন যে, যদি হিটলার মারা যান, তবে, গোয়েরিং হইবেন তাঁর উত্তরাধিকারী কিংবা হিটলার যদি কোন কারণে অক্ষম হইয়া পড়েন, তবে গোয়েরিং তাঁর ক্ষেপুটি হিসাবে কাজ করিবেন। সুতরাং গোয়েরিং এই প্রব্লে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের আইন বিশেষজ্ঞ হ্যান্স ল্যামার্সের (যিনি তখন বার্সেলিগ্যাডেনে) মতামত অহ্বান করিলেন। মিঃ ল্যামার্স এই মর্মে অভিমত জ্ঞাপন করিলেন যে, ১৯১১ সালের সেই ভিক্রির তখনও আইনগত সত্তা পুণ্যপূরি বজায় আছে। কারণ, নতুন কোন আদেশের দ্বারা এই ভিক্রি বাতিল করা হয় নাই। সকলেই এই বিষয়ে একমত হইলেন যে, হিটলার বাসিলে নৃত্যর জন্য অপেক্ষা করিয়া সামরিক কমান্ড ও গবর্নমেন্ট পরিচালনা উভয় দিক থেকেই অক্ষম হইয়াছেন। সুতরাং আইন অঙ্গুসারে গোয়েরিংয়ের কর্তব্য হইতেছে রাষ্ট্রের ক্ষমতা নিজ হাতে গ্রহণ করা। অতএব সমস্ত দিক বিচার-বিবেচনা

করিয়া এবং ‘ঘরে-বাইরে সমস্ত প্রকার ক্ষমতা লাভ’ সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া তাঁর সহকারীগণ অভ্যন্তর সতর্কতার সঙ্গে একটি টেলিগ্রামের খসড়া রচনা করিলেন। কারণ, গোয়েরিংয়ের একান্ত ইচ্ছা ছিল ‘ক্ষমতা’ লাভের পরেই তিনি পশ্চিমের যুদ্ধবিভিন্ন জন্তু আলোচনা আরম্ভ করিবেন। এমন কি, প্রয়োজন হইলে তিনি ব্যক্তিগতভাবে আইজেনহাওয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্তু উড়িয়া যাইবেন। কিন্তু আইজেনহাওয়ারের সঙ্গে দেখা করার সময় কি পোশাক পরিয়া যাইবেন—সে কথা বি-রা তিনি তাঁর জ্বরী সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। এদিকে উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে তখন বোম্বাষণা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। একমাত্র বেতারবার্তা পাঠানো ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। গোয়েরিংয়ের সেই ঐতিহাসিক বার্তাটি অভ্যন্তর সুরচিত ছিল :

“My Fuehrer !—In view of your decision to remain at your post in the fortress of Berlin, do you agree that I take over at once the total leadership of the Reich, with full freedom of action at home and abroad, as your deputy, in accordance with your decree of 29 June 1941 ? If no reply is received by ten o'clock tonight, I shall take it for granted that you have lost your freedom of action, and shall consider the conditions of your decree as fulfilled, and shall act for the best interests of our country and our people. You know what I feel for you in this gravest hour of my life. Words fail me to express myself. May God protect you, speed you quickly here in spite of all. Your loyal—Hermann Goering.”(৩)

এর সহজ মর্ম :

আমার ক্ষুর ! বার্লিনের দুর্গে আপনার অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে আপনি কি মনে করেন যে, আপনার ২৯ জুন ১৯৪১ তারিখের ডিক্রি অনুযায়ী আপনার সহকারী হিসাবে ঘরে এবং বাইরে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে কাজ করার অধিকারসহ আমার পক্ষে অবিলম্বেই উচিত রাইখের সম্পূর্ণ নেতৃত্বভার গ্রহণ করা ? আজ রাজি ১০টার মধ্যে যদি আমি কোন উত্তর না পাই, তবে আমি একথাই নিশ্চিত হিসাবে ধরিয়া নিব যে, আপনি আপনার স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা হারাইয়াছেন এবং আপনার ডিক্রির সর্বশক্তি ও পূর্ণতা লাভ করিয়াছে এবং আমার দেশের ও জনগণের সর্বোত্তম স্বার্থের জন্যই আমি কাজ করিয়া যাইব। আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আমি আপনার জন্য কিরূপ অনুভব করছি তা আমার পক্ষে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ভগবান আপনাকে রক্ষা করুন এবং সব কিছু সত্ত্বেও আপনি যেন যথাসম্ভব শীঘ্র এখানে আসিতে পারেন। ইতি,

আপনার বিশ্বস্ত  
হের্মান গোয়েরিং

গোয়েরিংয়ের এই টেলিগ্রামের উপযুক্ত ভাষ্য ও ব্যাখ্যা কাইটেল, রিবেন্ট্রপ এবং কর্নেল নিকোল'স কম বিলোকেও ( হিটলারের বিমানবাহিনীর সহকারী ) পাঠানো হইল। কিন্তু এই টেলিগ্রামের ক্যাপস অত্যন্ত গুরুতর হইল।...

ঐদিন সন্ধ্যায় বার্লিন থেকে কয়েক শত মাইল দূরে হিটলারের আর একজন 'বিশ্বস্ত' ও শীর্ষস্থানীয় সহকর্মী হাইনরিখ হিমলা বার্লিনিক সমুদ্রের লুয়েবেক শহরের সুইডিগ দ্বীপবাসে ( কমমুলেট ) কাউন্ট বার্নাডোটে'র সঙ্গে আলোচনা করিতেছিলেন। এস এস জেনারেল ভান্টার শেলেনবার্গও হিমলারের সঙ্গে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। গোয়েরিং তবু হিটলারের উত্তরাধিকারীরূপে ক্ষমতা দখল করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু হিমলার ধরিয়াই লইয়াছিলেন যে, তিনি ক্ষমতায় আসিয়া গিয়াছেন! বার্লিনের পাভালপুরীতে বাকারের অভ্যন্তরে যে সমস্ত গুরুতর ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, শেলেনবার্গ এবং কাউন্ট বার্নাডাট সেই সমস্ত কিছুই জানিতেন না, কিন্তু হিমলার সমস্তই অবগত ছিলেন। সুতরাং তাঁর গভ কয়েকদিনের বিধাঘল সবই কাটিয়া গিয়াছিল। তিনি কাউন্ট বার্নাডোটকে বুঝাইতেছিলেন যে, ফুরারের বৃহৎ জীবনের অবসান আসিয়াছে। দুই-একদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হইবে। সুতরাং হিমলার বার্নাডোটকে অহুরোধ করিলেন তিনি যেন জেনারেল আইজেনহাওয়ারকে জানাইয়া দেন যে, জার্মানী পশ্চিমদিকে আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু পূর্বদিকে জার্মানী বৃদ্ধ চালাইয়া বাইতেই ইচ্ছুক, যতক্ষণ না পশ্চিমী শক্তিবর্গ নিজেরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে পূর্ব রণাঙ্গনের দায়িত্ব নিতেছেন।

এস এস বাহিনীর প্রধান ও প্রতিপত্তিশালী নায়কী নেতা হিমলার কত নীরেট মস্তিষ্কের লোক কিংবা বোকা ছিলেন, বার্নাডোটের নিকট তাঁর এই বক্তব্যেই স্পষ্ট বুঝা বাইতেছে। হিমলার আরও বুঝাইলেন যে, বার্লিনের পতন ঘনাইয়া আসিয়াছে এবং হিটলার মারা বাইবেন। সুতরাং আগে তিনি বার্নাডোটকে যে কথা দিতে পারেন নাই এখন সে কথা দিতেছেন। কারণ, পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অতএব সুইডিগ সরকারের মাধ্যমে তিনি জার্মানীর আত্ম-সমর্পণের প্রস্তাব করিতেছেন। তখন বার্নাডোট হিমলারকে অহুরোধ করিলেন তাঁর এই আত্মসমর্পণের প্রস্তাব লিখিতভাবে দাখিল করার জন্ত। হিমলারও তৎক্ষণাৎ মোমবাতির আলোকে তাড়াতাড়ি একটা চিঠি লিখিয়া দিলেন। ভূগর্ভের একট কক্ষে মোমবাতির আলোকে এই পত্র রচনা করিতে হইল একান্ত যে, তখন বৃটিশ বিমানবহর বোমাবর্ষণ করিতেছিল এবং লুয়েবেক শহরের বিদ্যায় বহু হইয়া গিয়াছিল। সেই অবস্থাতেই হিমলার আত্মসমর্পণের চিঠিতে স্বাক্ষর করিয়া দিলেন।...

বলা বাহুল্য যে, হিমলার এবং গোয়েরিং উভয়েই 'অসময়ে' 'কাঁচাকাঁচ' করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কারণ হিটলার যদিও তাঁর ভূগর্ভে বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিলেন এবং যদিও ২৩শে এপ্রিল সন্ধ্যায় মধ্যে সোঁভিয়েত বাহিনীর সৈন্তেরা বার্লিনকে প্রায় ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল, তথাপি অতি শীঘ্র ও সামান্য

বেতারব্যবস্থার যোগে হিটলার তাঁর সৈন্যবাহিনী ও মন্ত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা করিয়া চলিতেছিলেন এবং তিনি প্রমাণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন যে, তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা ও প্রেক্ষিত্যের দ্বারা তিনি এখনও জার্মানীর ভাগ্য-নিয়ন্ত্রার পক্ষেই আছেন। সুতরাং তাঁর অল্পচরদের মধ্যে যিনি বতই ক্ষমতাশালী বা খ্যাতিমান হইয়া থাকুন না কেন, বিশ্বাসঘাতকতা বা দেশদ্রোহিতার অপরাধে তাঁকে উপযুক্ত দণ্ড দেওয়ার শক্তি এখনও তাঁর অব্যাহত আছে। এবং সেটা তিনি প্রমাণ করিয়াও ছাড়িয়াছিলেন।

সেই রাজ্যে যখন গোয়েরিং ওবারশ্চালজবার্গে তাঁর টেলিগ্রামের উত্তর পাওয়ার জন্ত প্রায় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং হিম্মলার লুয়েবেক শহরে কাউন্ট বার্নাডোটের নিকট জার্মানীর আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করিতেছিলেন, তখন হিটলারের বাক্যের আর একটি চমকপ্রদ এবং অভিনব দৃষ্টের অবতারণা হইল। অল্পসঙ্কা ও গোলাবারুদের মন্ত্রী আলবার্ট স্পীর (Albert Speer) যে কোন ভাবেই হউক, সেই অবরুদ্ধ নগরীতে ভূগর্ভের বাক্যের আসিয়া হাজির হইলেন হিটলারের সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের জন্ত। স্থপতি-শিল্পী হিসাবে তিনি যেমন দীপ্তিমান ও প্রতিভাধর ছিলেন, তেমন অল্পসঙ্কার মন্ত্রী হিসাবে তিনি অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। সুতরাং নিয়মমাত্তক নাৎসী নেতা না হওয়া সত্ত্বেও উচ্চতম মহলে তিনি সমাদৃত ছিলেন এবং ব্যক্তিগতভাবে হিটলারের প্রতি প্রভাবান ও অলুগত ছিলেন। কিন্তু এ হেন ব্যক্তিও শেষপর্যন্ত হিটলারের প্রতি বিগড়াইলেন, কিন্তু কেন? জার্মানীর পতনের মুখে সেই ঘটনাটা নিত্যন্ত উল্লেখযোগ্য।...

আলবার্ট স্পীর তাঁর আত্মজীবনমূলক বিখ্যাত বইতে নাৎসী পার্টি ও হিটলারী রাজত্বের অনেক চাক্ষু্যকর তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সমস্ত তথ্যে প্রকাশ যে, জার্মানীর পরাজয় বতই আসন্ন হইয়া উঠিল, হিটলার ততই তাঁর পুরাতন সহকর্মীদের মধ্যে একমাত্র গৌড়া ভক্তদের সাহচর্যের গণ্ডীতে আবদ্ধ রহিলেন। রাতের পর রাত তিনি একমাত্র গোয়েবেলস্, বার্ট লে (জার্মান লেবার ক্রস্টের অধিকর্তা) এবং বোরম্যানের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরামর্শে কাটাইতেন। সেই মন্ত্রণাকক্ষে আর কাহারও প্রবেশের অধিকার ছিল না। তাঁদের এই আচরণ সন্দেহজনক ছিল এবং তাঁদের ভাবভঙ্গীতে বুঝা গেল যে, জাতির ভাগ্যের চেয়েও নিজেদের ভাগ্যকে তাঁরা বড় করিয়া দেখিতেন। তাঁরা জার্মানীর ভাগ্য সম্পর্কে স্থির করিলেন—“We will leave nothing but a desert to the Americans, English and Russians.”—আমরা আমেরিকান, ইংরেজ ও রুশদের জন্ত একমাত্র মরুভূমি ছাড়া আর কিছুই রাখিয়া যাইব না।” (১০)

প্রথমে ব্যাপারটা ছিল কেবল মৌখিক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরে হিটলার স্বয়ং জাতির অস্তিত্ব ধ্বংস করার জন্য ইচ্ছানাশা জারি করিলেন। কারণ তাঁর মতে পরাজিত জাতির বাঁচিয়া থাকার অধিকার নাই। তিনি

স্পীরের নিকটও মস্তব্য করিয়াছিলেন যে, যদি যুদ্ধে পরাজয় ঘটে, তবে জার্মান জাতিও ধ্বংস হইবে। তাদের আদিম জীবনযাত্রা বাঁচাইয়া রাখার দরকার নাই। এজন্য সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কলকারখানা এবং বড় বড় সমস্ত সেতু ইত্যাদি ধ্বংস করিয়া দেওয়ার জন্য তিনি হুকুম জারি করিলেন।

[ মাকিন ঐতিহাসিক শাইরারও তাঁর পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসে নাৎসী পার্টির প্রশাসনিক অফিসারদের (gauleiter) কাছে এক বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন—‘যদি জার্মান জনগণ এই যুদ্ধে পরাজিত হয়, তবে, প্রমাণিত হইবে যে, জাতি হিসাবে তারা অত্যন্ত দুর্বল এবং তাদের ভাগ্যে একমাত্র ধ্বংসই লেখা আছে।’—পৃষ্ঠা ১৩১০।

‘দি লাস্ট হানড্রেড ডেইজ’ ( পৃষ্ঠা ৫৩৬ ) জন টোল্যান্ড লিখিয়াছেন যে, হিটলার তাঁর বাক্যে এপ্রিল মাসে একজন সেনাপতির নিকট মস্তব্য করিয়াছিলেন যে, তাঁর নেতৃত্বে যদি জার্মান জাতি এই চূড়ান্ত যুদ্ধে পরাজিত হয়, তবে তাদের বাঁচিয়া থাকার অধিকার থাকিবে না। বরং পূর্বদিকের জাতি তাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিবে এবং জার্মান জনগণের পতন মানিয়া লওয়া ছাড়া আর কিছু করিবার থাকিবে না। ]

শত্রুকে বিধ্বস্ত করার উদ্দেশ্য এই ধরনের পোড়ামাটির নীতি অনুসরণ করিলে জার্মান জাতির পক্ষে অস্তিত্ব রক্ষা করাও সম্ভব হইবে না এবং হিটলারের মৃত্যুর সঙ্গে জার্মানীরও মৃত্যু ঘটবে। এমন একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার কথা চিন্তা করিয়া আলবার্ট স্পীর এই সর্বশাস্ত্র হুকুম বানচাল করিবার জন্য উদ্ভিন্না পড়িয়া লাগিলেন এবং সম্ভাব্য যে-সমস্ত অধিনায়ক বা নায়কদের হাত দিয়া এই সর্বাঙ্গিক ধ্বংসকার্য বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব স্পীর অত্যন্ত দৃঢ়তা ও ঐকান্তিকতার সঙ্গে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করিয়া এই আদেশ বানচাল করার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি গভীর বিপদের ঝুঁকি নিয়া হিটলারকেও একটি স্মারকলিপিতে এই আদেশের বিপর্যয়কর দিকটা বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন।

আলবার্ট স্পীর এই সময় যেন একটা মানসিক যন্ত্রণায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি উপলব্ধি করিলেন যে, হিটলার বাঁচিয়া থাকিতে এই যুদ্ধ শেষ করা যাইবে না। অথচ জার্মানী ধ্বংস হইয়া যাইবে। সুতরাং তিনি হিটলারকে সংহার করার সংকল্প করিলেন। হিটলারের বাক্যের বায়ু চলাচল করার রক্তপথ দিয়া তিনি বিবাক্ত গ্যাস প্রবেশ করাইয়া হিটলার এবং তাঁর সামরিক নেতাদের একযোগে হত্যা করার পরিকল্পনা করিলেন। এই উদ্দেশ্য নিয়া তিনি একদিন বাক্যের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে গেলেন। কিন্তু সেখানে গিয়া তিনি বিষ্ময়ে হতবাক হইলেন। কেননা, তিনি দেখিতে পাইলেন যে, বায়ু চলাচল করার সেই রক্তের উপর ইতিমধ্যে দশফুট উঁচু একটা চিমনি বসানো হইয়াছে। আর সমস্ত গ্রহরীরা সারাক্ষণ সেখানে পাহারা দিতেছে এবং রাজবেলা প্রভূত সার্চ লাইটের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সুতরাং হিটলারকে হত্যার এই শেষ পরিকল্পনাও নষ্ট হইয়া গেল। (১১)

২৩শে এপ্রিল সন্ধ্যায় আলবার্ট স্পীর হিটলারের বাক্যে আসিয়া হাজির হইলেন এবং সেখানে অবশিষ্ট নেতাদের মধ্যে দেখা পাইলেন বোরম্যান, গোয়েবেলস,

রিবেট্রুশ, ক্রেবস, কন্ বিলো এবং হিটলারের সহকারীবৃন্দ ও তাঁর প্রণয়িনী ইভা ব্রাউনকে। স্পীর অত্যন্ত সাহস ও সরলতার সঙ্গে হিটলারের সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে জানাইয়া দিলেন যে, বার্লিনকে পোড়ামাটির নীতির দ্বারা ধ্বংস করার যে আদেশ তিনি দিয়াছিলেন, জার্মান জাতির অস্তিত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে গত কয়েক দিন বহু চেষ্টার পর সেই আদেশ স্পীর অকেজো করিয়া দিয়াছেন।

স্পীর ভাবিয়াছিলেন যে, হিটলারের আদেশ অমাত্র করার অপরাধে নিশ্চয়ই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হইবে। এমন কি তাঁর প্রাণদণ্ডও হইতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এই সমস্ত কিছুই ঘটিল না। হিটলার অত্যন্ত মন দিয়া স্পীরের বক্তব্য শুনিলেন এবং বাস্তবতঃ মনে হইল স্পীরের আন্তরিকতায় তাঁর হৃদয় 'গভীরভাবে স্পর্শ' করিয়াছিল। যে রক্তপিপাসায় হিটলার কাতর ছিলেন এবং নিবিকার চিত্তে খাতি-অগত্য অজস্র মানুষের রক্তপাত ঘটাইয়াছেন, সেই হিটলার আলবার্ট স্পীরের বেলা অতন্ত শাস্ত ভাব ধারণ করিলেন। বোধহয় তরুণ বয়স্ক (বয়স ৪০: বছর) স্পীরের শিল্প প্রতিভার প্রতি হিটলারের গভীর অমুরাগ ছিল এবং অস্ত্রসজ্জার মন্ত্রী হিসাবে তাঁর দক্ষতার প্রতিও হিটলারের আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। সুতরাং স্পীরের বেলা হিটলারের আচরণের বিশ্বয়কর ব্যতিক্রম দেখা গেল। বাক্যের ৮ ঘণ্টা কাটাইবার পর স্পীর ভোর রাত্রি ৪টার সময় বোমাবিক্ষেপণ এবং আক্রান্ত বার্লিন ত্যাগ করিলেন।

\*

\*

\*

হিটলারের পার্শ্বচর এবং ন্যাৎসী পার্টির বড় বড় নেতাদের মধ্যে লোভ, ঈর্ষা এবং ক্ষমতা লিপ্সুর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব অত্যন্ত প্রবল ছিল। একমাত্র গোয়েবেনস ছাড়া এঁদের অনেকের মধ্যেই বিত্তাবৃত্তির কোন প্রার্থনাও ছিল না। গোয়েরিং, হিমলার ও মার্টিন বোরম্যান হিটলারের শুল্ক স্থানে জার্মানীর ভাগ্যানিয়ামকের আসনে বসিবার জন্য ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। সুতরাং হিটলারের শেষের দিনগুলিতে এঁদের কার্যকলাপ চক্রান্তপ্রবণ হইয়া উঠিল।

মার্টিন বোরম্যান চার বছর ধরিয়া অপেক্ষমাণ ছিলেন গোয়েরিংকে ধ্বংস করার জন্য। কিন্তু কোন উপযুক্ত সুযোগ পান নাই। এবার সেই সুযোগ আসিল। কিন্তু এতিকে সময় খুব সঙ্কীর্ণ। কারণ, হিটলার যে কোন দিন মারা যাইতে পারেন। কিন্তু ইতিপূর্বেই আইনগত যে ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাতে হিটলারের পর গোয়েরিংয়েরই ক্ষমতা লাভ করার কথা। সুতরাং এই আইনগত অবস্থার যদি কোন পরিবর্তন না ঘটানো যায়, তবে গোয়েরিংই হইবেন হিটলারের উত্তরাধিকারী এবং বোরম্যানের কপালে আর কোনদিন ক্ষমতা জুটবে না। কিন্তু এতদিন পর তাঁর সুযোগ আদ্যিচ্ছা। গোয়েরিং তাঁর টেলিগ্রামের দ্বারা বোরম্যানের ফাঁদে পাইয়াছেন। কেননা, কাইটেল ও জডল ইতিমধ্যে বাক্স-ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন এবং এখনও যে দুই ভিন্ন জন আছেন, তাঁরা কেউ গোয়েরিংকে বাঁচাইবার জন্য মাথা দামাইবেন না। সুতরাং বোরম্যানের পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ ছিল হিটলারের কান ভাঙান দেওয়ার। বোরম্যান প্রথমেই হিটলারের দৃষ্ট আকর্ষণ করিলেন গোয়েরিংয়ের টেলিগ্রামের সেই অংশটির উপর যেখানে রাত্রি ১০টার মধ্যে অব্যব পাওয়ার দাবি ছিল। তিনি



পরিষ্কার বুঝাইয়া দিলেন যে, গোয়েরিংয়ের এটা চরমপত্র বা 'আলটিমেটাম'। সেই সঙ্গে বোরম্যান হিটলারকে আরও স্বরণ করাইয়া দিলেন যে, ৬ মাস আগেই গোয়েরিং সম্পর্কে এই সন্দেহ কর হইয়াছিল যে, তিনি ভিতরে ভিতরে মিত্রশক্তির সঙ্গে যুদ্ধ বিবর্তের আলোচনা চালাইবার জন্ত চেষ্টা করিতেছিলেন। সুতরাং পরিষ্কার বুঝাইতেছে যে, গোয়েরিং সেই চেষ্টা চালাইবার জন্তই ক্ষমতা দখল করিতে চাহিতেছেন। এবার সন্দেহবাতিকগ্রস্ত হিটলারের গভীর সন্দেহ আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। বিগত ২০শে জুলাইয়ের ভয়াবহ হত্যা-চক্রান্তের কথা তিনি আদৌ ভুলেন নাই। সুতরাং গোয়েরিংয়ের নিকট এক টেলিগ্রাম পাঠাইয়া জানাইয়া দেওয়া হইল যে, হিটলার এখনও সমস্ত ক্ষমতা খাটাইবার অধিকার ও সামর্থ্য রাখেন, অতএব স্বাধীনভাবে কোন চেষ্টা (যুদ্ধবিবর্তের) চালানো নিষিদ্ধ করা হইল।

তখন পর্যন্ত আলবার্ট স্পী। বাক্সবেই ছিলেন। হিটলার তাঁর দামনাই গোয়েরিংয়ের বিরুদ্ধে তাঁরা রোষ প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন যে, গোয়েরিং অত্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত ও নেশাগ্রস্ত এবং তাঁর কাজকর্মও তিনি বার্ষ হইয়াছেন।

একথা বলার পরেই হিটলার কিছুটা শান্ত হইলেন এবং বলিলেন—‘গোয়েরিং যদি আত্মসমর্পণের কথা চালাতে চান, তবে, চালাতে পারেন। এখানে একমাত্র ব্যক্তির কথাই বড় নয়।’

এই মন্তব্যের পরেই হিটলারের মজাজ আবার বিগড়াইয়া গেল এবং বোরম্যানের প্রবোচনায় এই মর্মে এক টেলিগ্রাম গোয়েরিংকে পাঠানো হইল যে, গোয়েরিং নাৎসী পার্টি এবং ফুবাংয়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। এর একমাত্র শাস্তি হইতেছে মৃত্যুদণ্ড। তবে, নাৎসী পার্টি ও রাষ্ট্রের প্রতি তিনি দীর্ঘকাল সেবা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁকে এই শর্তে ক্ষমা করা যাইতে পারে, যদি তিনি অবিলম্বে তাঁর সমস্ত পদ থেকে ইস্তফা দেন। হিটলার দাবী করিলেন—এর জবাবে গোয়েরিংকে অবিলম্বে উত্তর দিতে হইবে ‘হ্যাঁ কিংবা না’।

কিন্তু বোরম্যান এই সুযোগে তাঁর ধূংসিত খাটাইয়া ওবারস্যালজবার্গে অবস্থিত এস এস বাহিনীর নেতাদেরকে আর একখানা টেলিগ্রামে জানাইয়া দিলেন গুরুতর দেশদ্রোহিতার অপরাধে গোয়েরিং এবং কোলর ও ল্যামার্সসহ তাঁর সমস্ত পরামর্শদাতা ও উপদেষ্টাদেরকে অবিলম্বে গ্রেপ্তারের জন্ত। সেদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর দলবলসহ গোয়েরিংকে গ্রেপ্তার এবং তাঁদের স্ব স্ব গৃহে আটক করা হইল। হিটলারের পর যিনি অধিতীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং জার্মানীর ইতিহাসে যিনি একমাত্র ‘রাইখ মার্শাল’ ছিলেন, যার বিলাসিতা, দান্তিকতা এবং ঐশ্বর্য ছিল অপরিমিত, যিনি সমগ্র জার্মান বিমানবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন, তাঁকে এভাবে চূড়ান্ত অপমানের মধ্যে গ্রেপ্তার করা হইল।

পরদিন বালিনে ঘোষণা করা হইল যে, স্বাস্থ্যের কারণে গোয়েরিং তাঁর সমস্ত পদে ইস্তফা দিয়াছেন। অর্থাৎ বোরম্যানেরই জয় হইল এবং আবার হিটলারের উত্তরাধিকারীর প্রত্নটি দেখা দিল। (১২)

২৪শে এপ্রিল সোভিয়েত বাহিনী বার্লিন ঘিরিয়া ফেলিল এবং বাস্কার অবরুদ্ধ হইল। এই সময় বার্লিনবাসীদেরকে আশস্ত করার জন্ত রটনা করা হইল যে, জেনারেল ভেন্কে (Wenck) বাহিনী পশ্চিম দিক থেকে আগাইয়া আসিতেছে বার্লিনকে উদ্ধারের জন্যে। কিন্তু এই সমস্তই ছিল মিথ্যা গুজব মাত্র। হিটলর তাঁর অবরুদ্ধ বাস্কারে যে অবস্থাব মধ্যে ছিলেন, তাতে বহির্জগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে তাঁর ধারণাও ছিল সামান্য। ইতিমধ্যে হিমলারের বদলে কেন্ন-জেনাবেল হাইনরিসিকে (Heinrich) নিয়োগ করা হইল এবং রেডিও-টেলিফোনের যে সামান্য যোগাযোগ জেনাবেল স্টাফের সঙ্গে ছিল, সেই সূত্রে ধরিয়া হিটলার পাগলের মত খোঁজ নিতে লাগলেন—হাইনরিস, ভেদ প্রভৃতি কোথায়? কাইটেলই বা কি করিতেছেন? কিন্তু এই সমস্ত প্রশ্নের কোন জবাব পাওয়া গেল না। কেননা, সৈন্যবাহিনীগুলি কার্যত ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল এবং পারস্পরিক যোগাযোগ নষ্ট হইয়া বিশ্বৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল। এদিকে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে চ্যামেলারি ভাঙিয়া পড়িতেছিল। এই দুর্ধোগের মধ্যে রাত্রিবেলা প্রচার দপ্তর থেকে হিটলারের বাস্কারে খবর পৌঁছিল যে, হিমলার কাউন্ট বার্নাডোটের মারকং পশ্চিমের সঙ্গে যুক্তবিরতির আলোচনা চালাইতেছেন। ব্রিটিশ সংবাদ স্রবরাহ প্রতিষ্ঠান এরটারের মারকং এই খবর বিদেশী সংবাদপত্রে প্রচারিত হইয়াছিল।...

হিটলারের পাতালপুরীর আন্তানায় এই সময় শেষ যে দুই ব্যক্তি সাক্ষাতের জন্য আসিয়াছিলেন, তাঁদের একজন ছিলেন জার্মানীর সবচেয়ে খ্যাতিসম্পন্ন মহিলা পাইলট (টেস্ট পাইলট)—নাম হান্না রিৎস্ (Hanna Reitsch) এবং অপরজন হইতেছেন মিউনিক থেকে আগত সেনাপতি রিটার ফন গ্রীম (Ritter von Greim)। ২৪শে এপ্রিল সন্ধ্যার জীবন বিপন্ন করিয়া হান্না রিৎস কোনমতে বার্লিনের বাস্কারে পৌঁছিলেন বটে, কিন্তু যে বিমানে তাঁরা আসিয়াছিলেন, কুশদের গুলিবর্ষণে সেটি ধারেল হইয়াছিল এবং জেনারেল গ্রীমের একটি পা চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাঁর পায়ে যখন অস্ত্রোপচার করা এবং ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হইতেছিল, তখন হিটলার সেখানে আসিয়া হাজির হইলেন এবং গ্রীমকে জানাইয়া দিলেন যে, গোয়েরিং তাঁর প্রতি এবং দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। এজন্য তাঁকে গ্রেপ্তার এবং সমস্ত পদ থেকে বরখাস্ত করা হইয়াছে এবং তাঁর শূন্যপদে জেনারেল গ্রীমকে সমগ্র বিমানবাহিনীর প্রধান সেনাপতির পদে নিয়োগ করা হইল। এমন কি তাঁকে মার্শাল পদবীতে উন্নীত করা হইল। বলা বাহুল্য হয়, আহত গ্রীম হতবাক হইলেন। কেননা, এই আদেশ তাঁকে বেতারবার্তা যোগেও জানাইয়া দেওয়া যাইত, তা' হলে এভাবে শত্রুর গুলিতে তাঁকে আহত হইতে হইত না! কিংবা বাস্কারে শুইয়া থাকিয়া তিনটি মূল্যবান দিবসও নষ্ট করিতে হইত না। কিন্তু জার্মানীর রণপ্রভু হিটলার চাহিয়াছিলেন তাঁকে ডাকিয়া আনিয়া তাঁর মনের কথা জানাইয়া দিতে। অতএব গোয়েরিংয়ের টেলিগ্রামটি তিনি বিমানবাহিনীর নূতন সেনাপতিক পড়িয়া শুনাইলেন এবং ক্রুদ্ধ উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—‘গোয়েরিং এত বড় কাপুরুষ যে, আমাকে না জানাইয়া শত্রুর সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে।’

হঠাৎ তাঁর মুখের শিরাগুলি ফুলিয়া উঠিল এবং তাঁর হাত-পা কাঁপিতে লাগিল। হিটলার চিৎকার করিয়া উঠিলেন—এত বড় স্পর্ধা আমাদের সে চরমপত্র পাঠাইয়াছে!

“An ultimatum! A crash ultimatum! Nothing now remains! nothing is spared me! no loyalty is kept, no honour observed; there is no bitterness, no betrayal that has not been heaped upon me: and now this! It is the end. No injury has been left undone.”

(অর্থাৎ সহজ কথায় হিটলারের বক্তব্য ছিল এই যে, এমন কোন অসম্মান, এমন কোন বিশ্বাসঘাতকতা, এবং এমন কোন ক্ষতি নাই, য’ তাঁর প্রতি করা হয় নাই! অতএব এখানেই শেষ।)

এইসব কথা বলিতে বলিতে হিটলারের চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এদিকে বার্লিনের উদ্ধারের জন্ত হিটলারের প্রত্যাশিত পশ্চিম দিক থেকে জেনারেল ডেক্সে অধীন ১২ নং আর্মি, কিংবা উত্তর দিক থেকে জেনারেল হেইনরিচের অধীন ডিস্কুলা আর্মিগ্রুপ কিংবা দক্ষিণ দিক থেকে জেনারেল বুশের (Busse) অধীন ২নং বাহিনীর কোন সৈন্যদলই আগাইয়া আসিল না বা আসিতে পারিল না। কারণ এই সমস্ত সৈন্যবাহিনীই কোনই শক্তি-ছিল না এবং সেগুলি ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। হিটলার তাঁর উত্তপ্ত মস্তিষ্কে কল্পনায় এই সমস্ত প্রত্যাক্রমণের স্বপ্ন দেখিতে ছিলেন। অথচ ২৮শে তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করার পরও তাদের কোন খবর পর্যন্ত পাওয়া যাইতেছিল না।

২৬শে এপ্রিল রাত্রি থেকে রুশ কামানের গোলা সোজাসু’জ চ্যামেলারির উপর আসিয়া পড়িতেছিল এবং বাঙ্কার সহ সমগ্র এলাকা যেন কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। আর বাঙ্কারের অভ্যন্তরে ঝাড়া ছিলেন, তাদেরকে কেন্দ্র করিয়া যেন পাগলামির দৃশ্যের অবতারণা হইল। নাচ, হল্লা ও মস্তপান ইত্যাদির মত্ততা দেখা দিল। অর্থাৎ জীবনের এক বেপরোয়া রূপের উদ্ঘাটন হইল—প্রত্যক্ষদর্শী মহিলা পাইলট হান্না রিংস’-এর বর্ণনা অনুসারে।

সেই অবস্থায়ও জেনারেল গ্রীম এবং হান্না রিংস হিটলারকে অহরোধ করিলেন বার্লিন ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে। কিন্তু হিটলার আগের মতই অস্বীকৃত হইলেন এবং ঘোষণা করিলেন যে, রুশরা বার্লিন দখল করিয়া নিলে তিনি এবং ইভা ব্রাউন একত্রে আত্মহত্যা করিবেন এবং তাঁদের দেহ আগুনে পোড়াইয়া ফেলা হইবে—এই ব্যবস্থা তিনি পাকা করিয়া রাখিয়াছেন। তখন হান্না রিংস এবং জেনারেল গ্রীমও বাঙ্কারে অবস্থানের এবং হিটলারের সঙ্গে মৃত্যুবরণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। হিটলার তাঁদেরকে এক শিশি করিয়া বিব দিলেন সঙ্কটজনক অবস্থায় ব্যবহারের জন্ত।

ইতিমধ্যে অবস্থার আরও অবনতি ঘটিল এবং রুশরা বার্লিনের অভ্যন্তরে আরও আগাইয়া আসিতে লাগিল। ২৮শে এপ্রিল তারিখটি বাঙ্কারের বাসিন্দাদের পক্ষে নিদারুণ হইয়া উঠিল। কারণ, ঐদিন রাতে বি বি সি-এর সংবাদে প্রচারিত হইল যে, হিমলার সুইডিশ সরকারের মাধ্যমে পশ্চিমের মিত্রপক্ষের নিকট জার্মানীর আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করিয়াছেন। এই সংবাদ যেন বাঙ্কারের অভ্যন্তরে বজ্রপাত ষটাইল এবং প্রায় সকলেই হিমলারের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে চীৎকার করিয়া

উঠিলেন। হিটলার এই সংবাদে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কেননা হিমলাবকে তিনি সবচেয়ে বিশ্বস্ত বলিয়া মনে করিতেন। অথচ তাঁর এই নীতি ও বিশ্বাসঘাতকতা? গোয়েরিং তবু হিটলারের কাছে অল্পমতি চাহিয়াছিল— সরকারী ক্ষমত লাভের জন্ত। কিন্তু হিমলার ততটুকু নিয়মকানূনের জন্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করেন নাই। হিটলারের অজ্ঞাতসারে আত্মসমর্পণের চক্রান্ত করিয়াছেন। হিটলারের এমন সন্দেহ হইল সকলেই তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে। অত্যাধি বার্লিনকে উদ্ধারের জন্ত কোন সৈন্যবাহিনী আগাইয়া আসিল না কেন? হিটলার ক্রোধে জ্বলিতে লাগিলেন। হিমলারের এই বিশ্বাসঘাতকতা ইতিহাসে সবচেয়ে জঘন্য ব্যাপার বলিয়া তাঁর কাছে প্রতিভাত হইল। সুতরাং ২৮-২৯ রাতিবেনা হিমলারকে পদচ্যুত এবং তাঁর উত্তরাধিকারের দাবি বাতিল করিয়া তিনি দলিলপত্র স্বাক্ষর করিলেন।

এদিকে হিমলারের ঘটনায় হিটলারের মনোবল আরও সন্দেহাতুর হইয়া উঠিল। হেরম্যান ফেগেলিন (Fegelein) ছিলেন হিটলারের দরবারে হিমলারের প্রতিনিধি। হিটলারের সন্দেহ হইল যে, ফেগেলিনও নিশ্চয়ই হিমলারের প্রস্তাবিত আত্মসমর্পণের চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত আছে। অত্যাধি হিটলারের কাছে অল্পমতি না হইয়াই সে বাক্য থেকে এবং তার দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে পলাইতে চাহিয়াছে কেন? কার্যতঃ সে ২৮শে তারিখে নিশ্চয়ই বাক্যের থেকে সরিয়া পড়িয়াছিল। পবদিন অপরাহ্নে হিটলারের সেটা নজরে আসিল এবং অক্ষপাৎ তিনি এস এস বাহিনীর একটি দলকে পাঠাইয়া গেলেন ফেগেলিনকে ধরিয়া আনার জন্ত। প্রকাশ যে, গেস্টাপোর অধিকর্তা মুয়েলারের নিকট সে স্বীকার করিয়াছিল যে, হিমলার ও বার্গডোফের মধ্যে সাক্ষাতের কথা সে জানিত। ফেগেলিনকে গ্রেপ্তার এবং পদচ্যুত করা হইল। হিটলারের প্রণয়িনী ইভা ব্রাউনের ভগ্নীকে সে বিবাহ করিয়াছিল সুতরাং তার আশা ছিল ইভা ব্রাউন নিশ্চয়ই হিটলারের প্রতিহিংসা থেকে তাঁর ভগ্নীপতিকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু ইভা কোন চেষ্টাই করিল না। বরং হান্না রিংসের কাছে কঁাদো কঁাদো সুরে সে বলিল “আহা নোরা অ্যাডলফ! সকলেই তাঁকে ত্যাগ করিয়াছে। সকলেই তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। বরং ১০ হাজার লোকের প্রাণ ঝাউক সেও ভালো, তবু জার্মানী তাঁকে (হিটলাবকে) যেন না হারায়।”

হিটলারের রক্তপিপাসা জাগিয়া উঠিল। ফুরারের হুকুমে সশস্ত্র গ্রহরীরা ফেগেলিনকে বাক্যের বাইরে চ্যান্সেলারির বাগানে নিয়া গেল এবং সেখানে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিল।...

এদিকে রাতি দ্বিপ্রহরের পর হিটলার জেনারেল গ্রীমের কক্ষে আসিলেন এবং তাঁকে তাঁর শেষ হুকুম দিলেন—

প্রথমতঃ জার্মান বিমানবহরের সাহায্যে চ্যান্সেলারি আক্রমণকারী রুশসৈন্যদের ঘাঁটির উপর বোমা বর্ষণ করিও। ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করিয়া দিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ হিমলারের মত জঘন্য বিশ্বাসঘাতককে নিশ্চয়ই গ্রেপ্তার করিতে হইবে। হিটলার চিৎকার করিয়া বলিলেন—“একজন বিশ্বাসঘাতককে নিশ্চয়ই আশার শূন্য পথে বসিতে দেওয়া হইবে না। সেই ব্যবস্থা তোমাকে অবশ্যই পাকা করিতে হইবে।”

জেনাৰেল গ্ৰীম (Greim) এবং হান্স ৱিৎস (Reitsch) বার্লিনৰ ভূগৰ্ভৰ আশ্ৰয়  
থেকে ৰুশ আক্ৰমণৰ গুৰুত্ব বিপদ মাথায় নিয়া বিমানযোগে যাত্ৰা কৰিলেন।  
ইভা ব্ৰাউন তাঁৰ বোন মিসেস ফেগেলিনেৰ কাছে একখানা চিঠি লিখিয়া হান্স  
ৱিৎসেৰ হাতে দিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু চিঠিটা এত বাজে ছিল যে, ৱিৎসেৰ ফি-কট  
তা অপাঠ্য মনে হইয়াছিল। কিন্তু ইভা যখন সেই চিঠি লিখিতেছিল, তখন ইভাৰ  
ভগ্নীপতি ফেগেলিনেৰ মৃতদেহ চ্যাম্বেলারিঃ বাগানে গৈ দেখা হইতেছিল।

## নবম পর্ব

### পঞ্চম অধ্যায়

#### মুসোলিনীর চরমদণ্ড : উপপঙ্কীসহ নিহত

হিটলার যখন বার্লিনের ভূগর্ভে তাঁর অন্তিম আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পূর্ব ও পশ্চিম দুই দিক থেকে জার্মানী যখন ক্রমশঃ চূড়ান্ত পতনের মুখে পড়িতেছিল, তখন তাঁর মিতা ও সমরসঙ্গী এবং ইউরোপে ক্যাসিজমের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা মুসোলিনী কি অবস্থায় ছিলেন ? একথা আগেই উল্লেখ (ষষ্ঠ পর্ব, তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য) করা হইয়াছে যে, ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হিটলারের নির্দেশে স্কোরজেনি (Skorzeny) কর্তৃক বন্দী মুসোলিনীর ( ১৯৪৩, ২৫ জুলাই ইতালীর রাজ্য কর্তৃক পদচ্যুত ) উদ্ধারের পর উত্তর ইতালীর লেক গারডা অঞ্চলে একটি নতুন ক্যাসিস্ট রিপাব্লিকান গবর্নমেন্ট স্থাপন করিয়াছিলেন। রোম থেকে ৫০০ মাইল দূরে স্ত্রালো নামক ক্ষুদ্র শহরে এই সরকারের দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এজ্ঞে এই নতুন সরকার 'স্ত্রালো রিপাব্লিক' নামে পরিচিত ছিল। আসলে এটা কোন স্বাধীন ও সার্বভৌম গবর্নমেন্ট ছিল না এবং মুসোলিনী নিজেকে এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান বলে ঘোষণা করিলেও এর বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা ও শাসনকার্য চালাইবার ক্ষমতা ছিল না। এটা ছিল সম্পূর্ণরূপে নাৎসী জার্মানীর কবলিত এবং হিটলার ও তাঁর প্রতিনিধিদের ইচ্ছানুসারে পরিচালিত— যদিও স্ত্রালো রিপাব্লিকের তথাকথিত কয়েকজন মন্ত্রীও ছিল। প্রকৃতপক্ষে মুসোলিনী এস এস জার্মান গুণ্ডাবাহিনীর দ্বারা পবিত্রীকৃত ছিলেন। যিনি বিশ বছর ধরিয়া ইতালীর ভাগ্যবিধাতা এবং আন্তর্জাতিক জগতের একজন নেতা ছিলেন, তাঁর পক্ষে এই অবস্থা বরদাস্ত করা নিশ্চয়ই সম্ভব ছিল না। অথচ মুসোলিনীর পক্ষে স্বাধীনভাবে কিছু করারও উপায় ছিল না। মুসোলিনী তখন নিত্যন্তই হতাশ ও ভয়স্বাস্থ্য। তবু, নাৎসী জার্মানদের অসম্মানজনক ও অসহনীয় কবল থেকে তিনি জ্ঞান পাইতে চাহিলেন।

১৯৪৪ সালের শেষভাগে ইতালীতে মিত্রপক্ষের অগ্রগতি শুরু হইল এবং জার্মানদের গোথিক লাইন নামে প্রতিরক্ষার ব্যূহ ভাঙ্গিয়া গেল এবং উত্তর ইতালী ক্রমশঃ বিপদের মুখে পড়িল। জার্মান ও ইতালীয় ক্যাসিস্টরা একত্রে বাখাদানের কথা চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু বাস্তবে তেমন কিছু ঘটিল না। তখন ১৯৪৫ সালের আরম্ভে ইতালীয় ফ্রন্টে মিত্রপক্ষের নতুন অভিযানের ফলে ইতালীর জার্মান নাম্বকেরা যুদ্ধাবসানের কথা ভাবিতে লাগিলেন। কারণ, তখন ইউরোপের সর্বত্রই ক্যাসিস্ট নেতাদের অধিকাংশ বৃষ্টিতে পারিয়াছিলেন যে, যুদ্ধে আর জয়লাভের আশা নাই। কিন্তু বলশেভিক রাশিয়ার ভয়ে তাঁরা ভীত ছিলেন এবং এজ্ঞে নানা সূত্রে ধরিয়া বৃটিশ ও মার্কিন পক্ষের নিকট যুদ্ধবিরতি বা আত্মসমর্পণের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। গোয়েরিং, হিমলার, রিবেট্রপ এবং কালটেনব্রনার প্রমুখ বাঘা বাঘা নাৎসী নেতারা সুইডেন, মাদ্রিদ ও সুইজারল্যান্ডে তাঁদের প্রতিনিধি বা অহুচরদের পাঠাইয়া কিংবা নিরপেক্ষ দূত মারক্স শান্তি স্থাপনের জন্ত আলোচনার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিশেষভাবে ইউরোপে নিরপেক্ষ সুইজারল্যান্ডের ভৌগোলিক সংস্থান সুবিধাজনক

বলিয়া এবং সেখানে মার্কিন গোয়েন্দা শিরোমণি অ্যালান ডালাসের প্রধান দপ্তর প্রতিষ্ঠিত থাকায় পশ্চিমী মিত্রশক্তির সঙ্গে যুদ্ধাবসানের চেষ্টা চলিতে লাগিল। মুসোলিনীও এই সুযোগে জার্মান হাত থেকে ত্রাণ পাওয়ার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। কারণ, উত্তর ইতালী ছিল অত্যন্ত শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চল এবং তখন পর্যন্ত মিত্রপক্ষের অধিকারের বাইরে। কিন্তু ইতালীর ক্যাসিট-বিরোধী দেশপ্রেমিক বোদ্ধারা কিংবা পার্টিজান গেরিলারা ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিলেন। এঁদের মধ্যে কমিউনিষ্টরা ছিলেন বিশেষ শক্তিশালী এবং ৬টি অ্যান্টি-ক্যাসিট দল এমনভাবে গড়িয়া উঠিতে লাগিল যে, তাঁরা শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত ছাইয়া ফেলিলেন ইতালীর জার্মান ক্যাসিটদের বিরুদ্ধে। পার্টিজানদের সংখ্যা ১ লক্ষ ৭০ হাজারে দাঁড়াইল এবং এঁদের সঙ্গে বহু ক্রীলোক বা মহিলারাও যোগ দিয়াছিলেন। নাৎসী ক্যাসিটদের যুদ্ধ-যাত্রায় বাধা দেওয়ার জন্য তাঁরা উত্তর ইতালীর বড় বড় শিল্প-কলকারখানাগুলিতে এবং রেলওয়েতে ধর্মঘট বাধাইয়া দিলেন। আর সেই সঙ্গে হানাদারি গুপ্ত আক্রমণ ও সাবোটাজ অন্তর্ভুক্ত হইতে লাগিল। ফলে, ইতালীয়-জার্মান ক্যাসিটরা পার্টিজানদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত ভয়াবহ ও বর্বর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে লাগিল। এখানে শত শত 'লিডিস'-এর সৃষ্টি হইল এবং একটি গ্রাম থেকেই ১৫০০ লোককে হত্যা করা হইয়াছিল।(১)

উত্তর ইতালীর কলকারখানা ও শিল্পোৎপাদনের গুরুত্বের জন্য এই অঞ্চলটা কমিউনিষ্টদের দখলে গেলে পশ্চিমী শক্তিগুলির রাজনৈতিক ভবিষ্যতের পক্ষে বিপদের কারণ ঘটবে। সুতরাং এই পরিণতি নিবারণের জন্য হয়তো ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ ক্যাসিট-দেব সঙ্গে শান্তি আলোচনায় রাজী হইতে পারেন, এমন চিন্তা ঢুকিল নাৎসী নেতাদের মাথায়। এমন কি কিছুকালের জন্য হিটলার এবং সেই সঙ্গে মুসোলিনীর যন্তুক্ষেও এই কল্পনার ডেউ খেলিয়া গেল। আর ভ্যাটিকান বা খ্রীষ্টান ধর্মগুরু পোপের দপ্তরেও ক্যাসিট যুদ্ধেব ধ্বংস ও ত্রাস এবং রক্তশাত ও বিপ্লব থেকে উত্তর ইতালীকে রক্ষা করার জন্যে উদ্বিগ্ন দেখা দিল।... (২)

কিন্তু জার্মানদের পক্ষ থেকে এই সমস্ত শান্তি প্রচেষ্টায় মিত্রপক্ষ তেমন কিছু সাড়া দিলেন না এবং সোভিয়েত রাশিয়া উত্তর ইতালীর জার্মান নায়কদের এই সমস্ত প্রচেষ্টা সন্দেহের চোখে দেখিলেন এবং চার্চিলের নিকট আপত্তি জানাইলেন। বিশেষভাবে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মৃত্যুর পর এই আপত্তি আরও তীব্র হইল—যদিও মুসোলিনীর মনে রুজভেল্টের মৃত্যু সংবাদ কিছুটা আশার সঞ্চার করিয়াছিল এবং অন্যান্য ক্যাসিট-দের মত তাঁরও মনে হইয়াছিল যে, অতঃপর সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমী শক্তিবর্গের বিচ্ছেদও ঘটিতে পারে। অবশ্য ক্যাসিট শক্তিবর্গের বিপর্যয়কর অবস্থার জন্যই এই সমস্ত রঙীন কল্পনা তাদের পক্ষে সাংসনা স্বরূপ ছিল।...

এদিকে মুসোলিনীর সঙ্গে জার্মানদের বিশেষ বনিবনা হইতেছিল না। উত্তর

(১) দি সেকেন্ড শ্রেট ওয়ার, নংম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭০১-৩৭০৩

(২) The Last Days of Mussolini—F. W. Deakin, Penguin,

ইতালীর স্ত্রালো রিপাব্লিকে জার্মানীর নতুন দৃঢ় কডলফ র্যান (Rudolf Rahn) অত্যন্ত ধূর্ত কূটনৈতিক ছিলেন এবং তিনি মুসোলিনীর গতিবিধির উপর নজর রাখতেন। অধিকন্তু এস এস বাহিনীর কমান্ডার জেনারেল উলফ (Wolff) সামরিক প্রতিনিধি হিসাবে মুসোলিনীর শাস্তি প্রচেষ্টা সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। মার্শাল গ্রাংসিয়ানীকে মুসোলিনী পছন্দ করিতেন না। কিন্তু হিটলার তাঁকে মুসোলিনীর নতুন সরকারের সমরসচিব ও সেনানীমণ্ডলীর প্রধানের পদে নিয়োগ করিতে বাধ্য করিলেন। (৩) অসুস্থরূপে শুইভো বুফারিনি (Guido Buffarini) স্ত্রালো রিপাবলিকের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যদিও বুফারিনি একজন পাকা রাজনীতিক ও দক্ষ প্রশাসক ছিলেন, তবু মুসোলিনী তাঁর নিয়োগ বাতিল করিয়া দিলেন। কিন্তু কি কারণে তাঁকে বরখাস্ত করা হইল, তা স্পষ্ট বুঝা গেল না। সুতরাং জার্মান মহল মুসোলিনীর উপর খুব অসন্তুষ্ট হইলেন এবং জার্মানীর সঙ্গে মুসোলিনীর দৈনন্দিন সম্পর্ক খুব খারাপ হইতে লাগিল। (৪)

মুসোলিনী হিটলারী গ্রাস থেকে নিজেকে উদ্ধার করার কথা ভাবিতে লাগিলেন এবং কিভাবে একটা ‘ইতালীয় রাজনৈতিক মীমাংসার’ দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান ঘটানো যায়, সেই চিন্তা তাঁর মাথায় ঘুরিতে লাগিল। হিটলারের কাছ থেকে তিনি ক্রমশ দূরে সরিয়া যাইতে চাহিলেন এবং পশ্চিমী শক্তিবর্গের সঙ্গে একটা আপোস মীমাংসায় আসিবার জন্ত মিলানের আর্ক বিশপের মাধ্যমে “রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে” লিখিতভাবে একটি আবেদন পাঠাইলেন। এই আবেদনে তিনি উত্তর ইতালীকে ধ্বংস, রক্তপাত ও কমিউনিস্ট বিপ্লব থেকে রক্ষা করার, এমন কি রিপাব্লিকান ফ্যাসিষ্ট পার্টি ভাঙিয়া দেওয়ার প্রস্তাব পর্ষন্ত করিলেন। কিন্তু ৬ই এপ্রিল (১৯৪৫) পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও তিনি তাঁর আত্মসমর্পণের প্রস্তাবের কোন জবাব পাইলেন না। অধিকন্তু ঐ দিনই তিনি ইতালীয়-জার্মান বাহিনীর পক্ষ থেকে সুইজারল্যান্ডে যুদ্ধ বিরতির আলোচনার সংবাদ শুনিতে পাইলেন। অবশ্য এই সংবাদ মিথ্যা ছিল না এবং এই শাস্তি প্রচেষ্টার নাম ছিল ‘অপারেশন সানরাইজ’। মুসোলিনী এই সংবাদে হতভম্ব হইলেন এবং জার্মান রাষ্ট্রদূতকে ডাকিয়া আনিয়া ব্যাপারটা বুঝিতে চাহিলেন। কিন্তু ডঃ কডলফ র্যান জানিয়াও না জানার ভান করিলেন এবং সামরিক প্রতিনিধি উলফকে ডুচের বিরক্তি ও অসন্তোষ সম্পর্কে সাবধান করিয়াছিলেন। (৫)

এখানে পার্থক্যবর্গকে আর একবার স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে যে, মুসোলিনীর অবস্থা নিতান্তই শোচনীয় ছিল। উত্তর ইতালীর লেক গারডার পশ্চিম তীরে যে ছোট স্ত্রালো শহরে তাঁর ‘গবর্নমেন্ট’ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেটা সম্পূর্ণ রূপেই জার্মানদের কবলিত ছিল এবং লেক গারডা, লেক কমো, স্ত্রালো ইত্যাদি জায়গাগুলি ছিল সুইজারল্যান্ড, অট্রিশ, বিখ্যাত ব্রেনার গিরিমালা, অস্ট্রিয়া ইত্যাদি সন্নিহিত সীমান্ত অঞ্চলে, ১৯৪৩ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর ইতালীর আত্মসমর্পণ এবং ১৩ অক্টোবর ইতালী

(৩) ডুচে—রিচার্ড কোলিয়েব, পৃষ্ঠা ২৮০

(৪) দি লাস্ট ডেইজ অব মুসোলিনী, পৃঃ ২৭৩

(৫) দি লাস্ট হ্যান্ডবুড ডেইজ, পৃষ্ঠা ৫৩০



কর্তৃক জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পরেই ইতালী উত্তরে ও দক্ষিণে ভাগ হইয়া গিয়াছিল। দক্ষিণ দিকটাই ছিল মিত্রপক্ষের দখলে। ১৯৪৪ সালের ৪ঠা জুন মিত্রবাহিনী রোম দখল করিয়া নিয়াছিল। অর্থাৎ জার্মানরা রোম ছাড়িয়া উত্তর ইতালীতে চলিয়া গিয়াছিল। তাবপর থেকেই উত্তর ইতালীতে বাকী ইতালীয় স্যামিগ ও জার্মানদের বিরুদ্ধে পার্টিজান ও গেরিল। বাহিনী সংগঠিত হইতে থাকে এবং শেষপর্যন্ত তারাই বিখ্যাত মিলান শহর সহ সারা উত্তর ইতালী ছাইয়া ফেলিয়াছিল।

এই অবস্থার মধ্যে মুসোলিনী স্ত্রী আলো শহরে জার্মানদের আশ্রয়ে “স্বাধীন” সরকার গঠন করিলেন। কিন্তু তখন তিনি দেহে ও মনে ভাঙিয়া পড়িয়াছিলেন। কারণ কার্যতঃ তখন তিনি ফুবারেব ইতালীয় এক্সেস্টে পরিণত হইয়াছিলেন এবং তাঁরই চাপে পড়িয়া ভেবোনা জেলে তাঁর জামাতা কাউন্ট চিয়ানো (প্রাক্তন পরবাহু মন্ত্রী) ও অগ্নাত্তের বিচার প্রহসন ও প্রাণহনন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অথচ কত্যা ডেডাকে তিনি ভালোবাসিতেন। কিন্তু এই ভালোবাসার জোবেও তিনি তাঁর জামাতাকে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ থেকে রক্ষা করিতে পারিলেন না এবং কার্যতঃ কত্গার কাছে যুগ দেখাইতেও সাহস পাইতেছিলেন না। মন্দভাগিনী কাউন্টসেস ডেডা শোকে, দুঃখে, ক্ষোভে ভাঙিয়া পড়িয়াছিলেন এবং এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য পিতা মুসোলিনীকে আত্মহত্যার জন্ত বলিয়া পার্থক্যিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, মুসোলিনী স্বী জার্মান পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁর জামাতা কাউন্ট চিয়ানোর উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাঁর প্রাণদণ্ড সমর্থন করিয়াছিলেন।

অধিকন্তু এই সময় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টোন চার্চিল কমন্সভার এক বক্তৃতায় তাঁর কঠোর মন্তব্য করিলেন যে, নিজের জামাতার বক্তৃতা হাত কলঙ্কিত করিয়া মুসোলিনী আবার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখা দিতেছে।

চার্চিলের এই মন্তব্য মুসোলিনীকে গভীরভাবে আহত করিয়াছিল। সুতরাং তিনি এক যাজকের কাছে প্রার্থনা করিলেন তাঁর “আত্মার শাস্তি ও জন্য” এবং “গগনবানের সঙ্গে তাঁর আত্মার সংযোগ বিধানের দোষ্টা কবাব জন্য।” (১০)

কিন্তু ভগবানের দরবারে মুসোলিনী শাস্তি প্রার্থনার কি দশা হইয়াছিল, তা জানার সুযোগ ছিল না। তবে ১১ই এপ্রিল, ১৯৪৫, এটা জানা গেল যে, পশ্চিমীদের নিকট তাঁর যুদ্ধ বিরতির বা শাস্তি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইল। সুইজারল্যান্ডে ডালেসের দপ্তর থেকে ভ্যাটিকানের মাধ্যমে মুসোলিনীকে জানানো দওয়া হইল যে, একমাত্র নিঃসর্ত আত্মসমর্পণ ছাড়া মিত্রপক্ষের নিকট আর কিছু গ্রহণযোগ্য নহে।

\*

\*

\*

লেক গারডা ও স্ত্রী আলো থেকে মুসোলিনী এবার তাঁর গবর্নমেন্ট মিলানে স্থানান্তরিত করিতে চাহিলেন এবং ১৬ই এপ্রিল সকালে তাঁর “মিত্রসভার” নিকট সে কথা ঘোষণা করিলেন। অবশ্য তার আগে তিনি বলিয়াছিলেন যে, যদি শেষ যুদ্ধ চালাইয়া মরিতেই হয়, তবে, তিনি স্বদেশের ভূমিতেই মরিতে চান এবং উত্তর দিকে ভালটেলিনাতে তিনি তাঁর শেষ যুদ্ধ করিতে চান। কিন্তু তাঁর এই প্রস্তাবে বাধা দিলেন মার্শাল গ্রাৎসিয়ানী। কারণ, তাঁর মতে জার্মানীর সম্মতি ছাড়া এমন কার্য করা উচিত নয়। আর বাধা দিলেন ইতালীতে জার্মানীর সামরিক

প্রতিনিধি এস এস জেনারেল উলফ। অধিকন্তু উলফ মুসোলিনীকে যুদ্ধবিরাতির কোন আলোচনা চালাইতেও নিষেধ করিলেন। কারণ, এটা মানিয়া নিলে মুসোলিনীর স্বাধীন সত্তা স্বীকার করিতে হয়, যেটা ছিল জার্মানীর স্বার্থের একান্ত বিরোধী। এদিকে জেনারেল উলফ ইতালী সম্পর্কে আলোচনার জন্য বার্লিনে আহৃত হইলেন।...

কিন্তু ডুচে মিলানে যাওয়ার জন্য উদ্যোগ আয়োজন করিলেন। তিনি মনে মনে স্থির করলেন এই যুদ্ধের একটা 'ইতালীয় মীমাংসা' করিতেই হইবে। সুতরাং মিলানে গিয়া তিনি পার্টিজানদের কমিটির সঙ্গে অথবা পশ্চিমীদের সঙ্গে যুদ্ধ বিরাতির আলোচনা করিবেন কিংবা শেষ পর্যন্ত ভলটেরিনাতে গিয়া জীবনের শেষ সংগ্রাম চালাইবেন।

আগেই বলা হইয়াছে মুসোলিনী হিটলারের কাছ থেকে দূরে সরিয়া যাইতে চাহিতেছিলেন। কারণ, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি যেন মাকড়শার জালে আটকা পড়িয়াছেন। অপর পক্ষে হিটলারও ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে ইতালীতে মুসোলিনীর ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই মুসোলিনীর সম্পর্কে মোহমুক্ত হইতেছিলেন। সেই সময় তিনি তাঁর অন্তবঙ্গদের সঙ্গে প্রাইভেট আলোচনা প্রসঙ্গে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, মুসোলিনীর সঙ্গে তাঁর 'অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব' সম্ভবতঃ ভুল হইয়াছিল। 'স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ইতালীর সঙ্গে আমাদের মিত্রতা আমাদের শত্রুদের পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক হইয়াছিল। আমাদের সর্ব-প্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও যদি এই যুদ্ধে আমরা হারিয়া যাই, তবে, বুঝিতে হইবে সেই পরাজয়ের জন্য ইতালীর সঙ্গে মিত্রতা কম দায়ী ছিল না। ইতালী আমাদের সবচেয়ে বেশী উপকারে আসিতে পারিত, যদি সে এই সংঘর্ষে যোগদান না করিত।' কিন্তু তবু হিটলার এখনও ইতালীর জন্য যে একটা 'সহজাত প্রেরণা' বলেই বন্ধুতা অসম্ভব করেন। কিন্তু আমি নিজেকে দোষী বলিয়! সাব্যস্ত করি এজন্তে যে, আমি যুক্তির কথা মানি নাই—যার জন্তে ইতালীর সঙ্গে বন্ধুত্ব আমাকে নির্যম করিয়া তুলিয়াছিল।' (৭)

কিন্তু মুসোলিনীর সঙ্গে এই 'নির্যম বন্ধুতার বা পার্শ্বিক মিত্রতার' (কোন কোন লেখক যেমন—এক ডব্লিউ ডিকিন এই ক্ষেত্রে 'ক্রেটাল ফ্রেণ্ডশিপ' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন) আয়ুও শেষ হইয়া আসিতেছিল। ১৯৮ই এপ্রিল সন্ধ্যা সাড়েটায় মুসোলিনী জার্মান নিরাপত্তা বাহিনীর পাহারায় এটি মোটরগাড়ী এবং একটি মালভর্তি ট্রাকের কনভয় যোগে মিলানের দিকে রওনা হইলেন এবং রাত্রি ৯টায় মিলানের নগররক্ষী বাহিনীর বাহিনী ছিল মুসোলিনীর শেষ কর্তৃত্বের আশ্রয়স্থল এবং এখানে তিনি মিলানের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিলেন।

কার্ডিনাল স্কুস্টারের (Scuister) মধ্যস্থতায় মিলানে আর্কিবিশপের প্রাসাদে মুসোলিনী সঙ্গে পার্টিজান বাহিনীর কমান্ডার কমিটি অব্ লিবারেশন-এর প্রতিনিধিদের দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইল। মুসোলিনীর দিকে তাকাইয়া কার্ডিনালের মনে হইল যে, 'এক নিদাক্ষণ বিপর্যয়ে মুসোলিনী যেন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে'। তবু কার্ডিনাল তাকে একটু চাঞ্চা করিতে চাহিলেন এবং বলিলেন যে,

ইতালীকে আর অনাবশ্যক ধ্বংসের মধ্যে টানিয়া না নিয়া তাঁর উচিত আত্মসমর্পণ করা। কিন্তু জবাবে মুসোলিনী বলিলেন যে, তিনি ৩০০ কালোকূর্তা সৈন্তসহ ভালটেলিনাতে গিয়া শেষ যুদ্ধ চালাইবেন। কিন্তু কার্ডিনাল তাঁকে স্বরণ করাইয়া দিলেন যে, ডুচের মনে যেন কোন মোহ না থাকে, তিন হাজার দূরের কথা, তিনশত ক'লোকূর্তাও তিনি পাইবেন কিনা সন্দেহ। মুসোলিনী জবাব দিলেন যে, তাঁর কোন মোহ নাই, তবে তিন শতের চেয়ে কিছু বেশী পেতে পারেন।

ইতিমধ্যে মুসোলিনী'র সঙ্গে যুদ্ধবিরতির আলোচনার জ্ঞাত বিবারণেন কমিটির তিনজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি আসিয়া হাজির হইলেন। কিন্তু সেই সময় হঠাৎ মার্শাল গ্রাংসিয়ানি মুসোলিনী'র দুইজন মন্ত্রীসহ সেখানে উপস্থিত হইলেন। কার্ডিনালের প্রস্তাব অনুসারে তাঁরা সকলে একটি বড় গোলাটেবলের চারদিকে আসন গ্রহণ করিলেন। মুসোলিনী যেন কিছুটা অধৈর্যের সঙ্গে বিবারণেন কমিটির সদস্যদের জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনাদের প্রস্তাব কি ?

পার্টিজানদের মুখপাত্র মারাজ্জা (Marzà) জবাব দিলেন— ‘আমাদের প্রস্তাব খুব ছোট্ট এবং সুনির্দিষ্ট। আমরা শুধু আপনার আত্মসমর্পণের দাবি এবং ৬ গ্রহণ করতে এসেছি।’

মুসোলিনী বাধা দিয়া বলিলেন—‘আমি কিন্তু সেজ্ঞাত আসি নি। আমার সঙ্গে কথা ছিল আমরা একত্রে মিলে শর্তাদি সম্পর্কে আলোচনা করবো। আমি এসেছিলাম আমার শোকসন, তাদের পরিবারবর্গ ও ক্যাসিষ্ট মিলিশিয়ার রক্ষাকবচ দাবি করার জন্য। তাদের ভাগ্যে কি ঘটবে সেটাও আমার জানা দরকার। আমার সরকারের কর্মচারীদের পরিবারবর্গের নিরাপত্তার জন্য অবশ্যই গ্যারেন্টি দিতে হবে এবং আমাব সৈন্যেরা যদি আত্মসমর্পণ করে, তবে, তাদেরকে যুদ্ধবন্দীর মর্যাদা দিতে হবে।’

তখন একজন পার্টিজান প্রতিনিধি বলিলেন—‘এগুলি বিজ্ঞত আলোচনার বিষয়। সেই আলোচনা করার অধিকার আমাদের আছে।’

ডুচে তখন বলিলেন—‘বেশ কথা, তবে, আমরা একটা মীমাংসার সর্তে পৌঁছতে পারি।’

তখন মার্শাল গ্রাংসিয়ানি হঠাৎ যেন লাকাইয়া উঠিলেন—‘না, না, ডুচে। আপনি তা করতে পারেন না। জার্মানদের প্রতি আমাদের বাধ্যবাধকতা আছে। তাদের সম্মতি ও পরামর্শ ছাড়া আমরা এভাবে আত্মসমর্পণের কোন চুক্তিপত্রে সই দিতে পারি না। কর্তব্যের ও আত্মমর্যাদার নিয়মকানুনগুলি আমরা ভুলিতে পারি না।’

তখন পার্টিজান প্রতিনিধিরা বলিলেন, ‘জার্মানদের কিন্তু তেমন কিছু নিয়ম-কানুনের বালাই নেই। গত চারদিন ধরে আমরা তাদের আত্মসমর্পণের সর্ত নিয়ে আলোচনা করছি! যে কোন মুহূর্তে তাদের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে।’

মুসোলিনী তখন ব্যথিত ও ক্ষুব্ধচিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন—‘আগে আমি জার্মান কমান্ডারের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করিতে চাই এবং বলিতে চাই যে, জার্মানী ইতালীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।’

এই কথা বলিয়া মুসোলিনী সেই কক্ষ থেকে বাহির হইয়া গেলেন। সেইদিন সন্ধ্যা ৮টার সময় মুসোলিনী ক্যাসিষ্ট মিলিশিয়ার ইউনিফর্ম পরিয়া অবিলম্বে মিলান

ভাগ করিয়া। কোমো অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে মার্শাল গ্রাৎসিয়ানি, জার্মান সশস্ত্র প্রহরী এবং ১০ গাড়ী বোম্বাই লোকজন।

মুসোলিনী'র এক মন্ত্রী আরেক মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘আমরা কোথায় যাচ্ছি?’ উত্তরে সেই ভক্তলোক বলিলেন ‘ঈশ্বর জানেন, বোধ হয় যমপুরীতে।’

নিয়তির অনতিক্রম্য বন্ধনের মত ক্লার পতাকাও (মুসোলিনী'র উপপত্নী) আর একটি গাড়ীতে আসিয়া হাজির হইলেন।

\*

\*

\*

কোমো হ্রদের ৫ মাইল দক্ষিণে সুবিধাবাদী মার্শাল গ্রাৎসিয়ানী মুসোলিনী'র দলবল ছাড়িয়া জার্মান এস এস সীমান্ত বাহিনীর সদরে আসিয়া আশ্রয় নিলেন। আর মুসোলিনী কোমোতে পৌঁছিয়া তাঁর স্ত্রীকে এই মর্মে এক বার্তা পাঠাইলেন যে, তিনি তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে এবং ‘বয়সের শেষ পুষ্টায়’ পৌঁছিয়াছেন। সুতরাং তাঁর স্ত্রী যেন তাঁর অনিচ্ছাকৃত সমস্ত অপরাধের জন্য তাঁকে ক্ষমা করেন। আর সেই সঙ্গে মুসোলিনী তাঁর স্ত্রীকে (ডোনা র্যাচেলি) পরামর্শ দিলেন বাচ্চা দুইটি সহ অবিলম্বে সুইজারল্যান্ডে চ'লিয়া যাইতে এবং সেখানে গিয়া নতুনভাবে জীবন আরম্ভ করিতে।...

২৬শে এপ্রিল ভোর হওয়ার আগেই মুসোলিনী তাঁর ক্ষুদ্র একটি দলসহ কোমো হ্রদের পশ্চিম তীর ধরিয়া রওনা হইলেন এবং কোমো থেকে ২৫ মাইল দূরে একজন স্থানীয় ক্যাসিষ্ট অফিসারের গৃহে আশ্রয় নিলেন তাঁর পাটি-সেক্রেটারি প্যাভোলিনার ৩ হাজার কালোকূর্তা সৈন্যসহ আগমনের অপেক্ষায়। মুসোলিনী ঘুমা'য়া পড়িয়াছিলেন, জাগিয়া উঠিয়া দেখিলেন তাঁর উপপত্নী ক্লারা পেতাকা দুইটি বর্মাবৃত গাড়ী এবং কয়েক কোম্পানী রিপাব্লিকান সৈন্যসহ আসিয়া হাজির হইলেন কিন্তু এত বড় কনভয় সহ সেখানে অপেক্ষা করা বিপজ্জনক। সুতরাং তিনি ‘অল্প রাস্তায় গাড়ীগুলিকে ঘুরা'য়া দেওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং নিজের তাঁর প্রণয়িনীসহ একটি পৃথক গাড়ীতে চড়িয়া পশ্চিম দিকে সুইজারল্যান্ডের সীমানা অভিমুখে রওনা হইলেন। তাঁর জার্মান প্রহরী এস এস লে: বারজার (Blaz r) এবং বাকী কনভয় তাঁর পিছু পিছু অহুসরণ করিল। রাস্তায় একটি ছোট্ট হোটেলে অবস্থান কালে মুসোলিনী রেডিও যোগে প্রচারিত এই মর্মে একটি বার্তা শুনিতে পাইলেন যে, ব্রিটিশ বাহিনীর ৫: জেনারেল মার্ক ক্লার্ক ক্রমাগত জয়াভিধানে আগাওয়া আসিতেছেন এবং উত্তর ইতালীর সর্বত্র পাটিজানদের অভ্যুত্থান ঘটতেছে।...

মুসোলিনী সেখান থেকে সন্ধ্যাবেলাই ভ্যালটেলিনার দিকে রওনা হইতে চাইলেন। কিন্তু জার্মান নিরাপত্তা রক্ষী লে: বারজার বাধা দিলেন এবং বলিলেন যে, পাটিজানরা নিশ্চয়ই রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। তা ছাড়া তাঁর দলবলের লোকজনেরাও ক্লান্ত। সুতরাং সেই রাতে সে' স্থানীয় হোটেলে অপেক্ষা করাই ভালো। পরদিন ভোরবেলা বরং রওনা হওয়া যাবে। মুসোলিনী রাজী হইলেন।

\*

\*

\*

কার্যতঃ তখন বাকী ইতালীয় ক্যাসিষ্টরা ও জার্মানরা উত্তর দিকে সীমান্ত অঞ্চল দিয়া পরিভ্রমণে পথ খুঁজিতেছিল। পাটিজান ও গেরিলা বাহিনীর সৈন্যেরা এজন্য

যথাসম্ভব সর্বত্র সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছিল। কোমো হ্রদ অঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টিজানদের ছিল আধিপত্য। তাঁদের নেতা ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশজাত কাউন্ট পিয়ের লুইগি বেলেনি ডেলা স্টেল—সংক্ষেপে বেলেনি নামে পরিচিত। ২২ বছরের সুশিক্ষিত ও সুশ্রী যুবক। জার্মানদের হাতে এর পিতা নিহত হইয়াছিলেন। এর সহকারী ছিলেন ২০ বছরের যুবক আরবানো ল্যাজারো, কিন্তু এঁরা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না। এমন কি, কমিউনিস্টও ছিলেন না। কিন্তু একান্তরূপে জার্মান ও ক্যাসিষ্ট বিরোধী ছিলেন। বেলেনি মধ্যরাত্রে লেকের রাস্তায় ডগোর দক্ষিণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করলেন। এদিকে ক্যাসিষ্ট পার্টির সেক্রেটারি আলেকজান্দারো প্যাভোলিনী মুসোলিনীর হোটেল আসিয়া পৌঁছিলেন এবং বিরস বদনে ডুচেকে বলিলেন যে, কালোকূর্তা সৈন্যদের অধিকাংশই কোমো এলাকায় পার্টিজানদের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। মুসোলিনী তখন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ভ্যালটোলনাতে তাঁর প্রস্তাবিত লড়াইয়ের জন্য কত জন কালোকূর্তাকে তিনি সংগ্রহ করতে পারিয়াছেন? প্যাভোলিনী কিছুটা ঘিষা ও সঙ্কোচের সঙ্গে জবাব দিলেন ১২ জন!

এই জবাব থেকেই বোঝা যাইবে পরিস্থিতি কিরূপ ভয়াবহ হইয়া উঠিতেছিল। তথাপি মুসোলিনী ভাববেলা লেকের রাস্তায় জার্মান কনভয়ের সঙ্গে যোগ দিলেন সীমান্ত পার হইয়া ইতালী পরিত্যাগের জন্য। এই জার্মান কনভয়েতে ২৮ টি ট্রাক ভর্তি জার্মান সৈন্য, একটি বর্মাবৃত গাড়ী জার্মান অধিনায়কের জন্য, আর ১০ টি যানবাহন ছিল অসামরিক লোকজনে ভর্তি। কিন্তু কনভয়েতে নানা ধরনের প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ছিল। মুসোলিনী নিরাপত্তার খাতিরে আর্মার্ড কারের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁর উপপত্নী ক্লারা পেভাচি এবং তাঁর ভাইও পরিবারের লোকেরাও স্পেনে যাওয়ার জন্য কনভয়ের সঙ্গে যোগ দিলেন। কিন্তু এই যাত্রাপথেই শুরু হইল ইতালীয় বিয়োগান্ত নাটকের হীরো মুসোলিনীর শেষ অঙ্ক। কাউন্ট বেলেনির পার্টিজান সৈন্যেরা কনভয়ের পথ রোধ করিয়া দাড়াইল। কিন্তু জার্মান কনভয় সামরিক দিক থেকে এত বলশালী ছিল যে, কাউন্ট বেলেনির সাধ্য ছিল না প্রকাত যুদ্ধের দ্বারা তাদের গতিরোধ করার। সুতরাং বেলেনি চাতুর্ঘ্যনীতি অবলম্বন করিলেন এবং এমন ভঙ্গী দেখাইলেন যেন সারা অঞ্চল জুড়িয়া পার্টিজান সৈন্য ও সমরশক্তির প্রচুর দাপট রহিয়াছে। বেলেনি ও তাঁর অনুচরেরা আগে থেকেই পথে নানা বকমের রোডব্লক (প্রতিবন্ধক) সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং জার্মান কনভয়ের গতি রুদ্ধ হইল এবং বেলেনি আসিয়া জার্মান অধিনায়ক ক্যাপ্টেন অটো কিসনাটকে (Kisnatt) নানা ভাবে জেরা করিতে লাগিলেন। জেরার মুখে কিসনাট্ট স্বীকার করিলেন যে, তাঁর দলে কিছু ইতালীয়ান আছে। কিন্তু তাদের জন্য তাঁর কোন দায়িত্ব নাই। তখন বেলেনি আরও কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর এই সর্ভে জার্মান কনভয়কে অগ্রসর হইতে দিলেন যে, তাদের দলের সমস্ত ইতালীয়ানকে তাঁর হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া বেলেনির কানে কানে বলিল যে, মুসোলিনী এই দলে রহিয়াছে। তাঁকে যেন ছাড়িয়া দেওয়া না হয়। 'মুসোলিনী এই দলে?'—কথাটা যেন বেলেনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। সুতরাং তিনি ল্যাজারোকে গুরুত্ব করিতে বলিলেন। ল্যাজারোও কথাটা তখন বিশ্বাস

করিতে পারিতেছিলেন না। তখন নেগ্রি নামক পার্টিজানদের সাহায্যকারী এক ব্যক্তি আসিয়া ল্যাজারোকে কিস্ কিস্ করিয়া বলিল যে, “সেই বেজগ্লাটা এখানেই আছে।”

ল্যাজারো উত্তর দিল—“তুমি কি স্বপ্ন দেখছ?”

নেগ্রি তখন দৃঢ়তার সঙ্গে বলিল—“না, না, অবিশ্বাসের কারণ নেই। লোকটা মুসোলিনীই বটে, আমি তাকে স্বচক্ষে দেখেছি।”

‘কোথায়?’

‘এখানে একটু ট্রাকের মধ্যে। জার্মানদের ছদ্মবেশে লুকিয়ে আছে।’

ল্যাজারোর তখনও বিশ্বাস হইতেছিল না। সুতরাং বলিলেন যে, তোমার নিশ্চয় ভুল হয়েছে।

নেগ্রি জবাব দিল, ‘না, তার ভুল হয় নাই, জার্মানদের দলিলপত্র পরীক্ষা করার সময় একটা ট্রাকে কবল মুড়ি দেওয়া একটি লোককে আমি দেখেছি। তার পরিধানে লম্বা কোট, সেই কোটের কলারে তার কান পর্যন্ত ঢাকা এবং তার মাথায় জার্মান হেলমেট বা শিরস্ত্রাণ, সেই শিরস্ত্রাণ দিয়া তার মুখ পর্যন্ত ঢাকা। আমি তার দলিলপত্র দেখতে চেয়েছিলাম, তখন ট্রাকের জার্মানরা আমাকে বাধা দিল এবং বোঝাল লোকটি মাতাল।...’

তখন ল্যাজারো নিজে অগাইয়া গেলেন এবং নেগ্রির বর্ণিত ট্রাকে গিয়া ছদ্মবেশধারী লোকটির শিরস্ত্রাণ টান দিয়া খুলিয়া ফেলিলেন—দেখা দিল একটা মস্ত টাক মাথা, তার চোখ থেকে সানন্মাস খুলিয়া নিলেন এবং লম্বা কোটের কলারটা নামাইয়া দিলেন—দেখা গেল মুর্তিমান মুসোলিনী স্বয়ং তাঁর দুই হাঁটুর মধ্যে একটা ‘মেসিন পিস্তল’ চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া আছেন, পিস্তলের বাটটা তাঁর চিবুকের কাছ পর্যন্ত।

ল্যাজারো মুসোলিনীর পিস্তলটা কাড়িয়া নিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, আরও অস্ত্র আছে কি না? মুসোলিনী বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁর কোটের বোতাম খুলিয়া ফেলিয়া আর একটি স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র ল্যাজারোর হাতে দিলেন। মুসোলিনীকে ভীত দেখাইতেছিল না, কিন্তু অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাইতেছিল।

দুই চার জন করিয়া একটি ছোট্ট জনতাও সেখানে জমায়েত হইতেছিল,—স্থানটি কোমো হ্রদের ডগ্গা শহর। ল্যাজারো তখন অত্যন্ত শাস্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন :

“ইতালীর জনগণের নামে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করছি।”

২৮শে এপ্রিল মুসোলিনীকে গ্রেপ্তার করিয়া প্রথমে ডোকোর টাউন হলে লইয়া যাওয়া হইল।

ক্লারা পেতাচ্চি এবং তথাকথিত স্পেনীয় পাশপোর্টধারী অস্ত্রান্তকেও গ্রেপ্তার করা হইল। এর আগেই বেলিনিকে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, মুসোলিনীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। বেলিনি মুসোলিনীকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, তিনি এই এলাকার কমান্ডার এবং তিনি কথা দিতেছেন যে, মুসোলিনীর কোন অনিষ্ট হইবে না। মুসোলিনী শুধু ক্লান্ত কণ্ঠে বলিলেন—“আপনাকে ধন্যবাদ”।

ল্যাজারো মুসোলিনীর চামড়ার প্রকাণ্ড পোর্টফোলিও ব্যাগ ও অস্ত্রান্ত জিনিস তল্লাস করিয়া কিছু গোপনীয় দলিলপত্র, ভেরোনা জেলের কাগজপত্র, হিটলারের কাছে লেখা চিঠিসমূহ এবং ১৬০টি স্বর্ণমুদ্রা ও ৫ লক্ষ খিরার (ইতালীয় টাকা) কয়েকটি চেক পাইলেন।

হতিমধ্যে মুসোলিনীর ‘সরকারের’ অস্ত্রান্ত সমস্তরূপে ধৃত হইয়াছিলেন।

বেলেনি ভাবিয়া দেখিলেন যে, মুসোলিনীকে এখানে রাখা বিপজ্জনক। কেননা, জার্মানরা তাঁকে আর একবার উদ্ধারের চেষ্টা করিতে পারে। কিংবা শহরেব লোকেরা তাঁকে খুন করিতে পারে। সুতরাং সেই রাত্রির জন্ত মুসোলিনীকে কোন নিরাপদ গোপন স্থানে লুকাইয়া রাখিতে হইবে। পাহাড়ের উপর তিন মাইল দূরে সীমান্ত প্রহরীদের ব্যারাকে এবং সেখান থেকে শেষ পর্যন্ত একটি গ্রামে—যেখানে সাধারণতঃ পার্টিজানেরা আত্মগোপন করিয়া থাকে।

\* \* \*

শেষ পর্যন্ত মুসোলিনী ও তাঁর উপপত্নী ক্লারা পেতাচ্চিকে সীমান্তবর্তী গ্রামের একটি গোপন আবাসে নেওয়া হইল। বেলেনি আগাগোড়া খুব ভয় আচরণ করিতেছিলেন এবং মুসোলিনী ও পেতাচ্চি উভয়ের অহুরোধে পরস্পরকে একত্র মিলিত হইতে দিলেন। বেলেনিকে সহানুভূতিসম্পন্ন দেখিতে পাইয়া পেতাচ্চি কি ভাবে মুসোলিনীর প্রেমে পড়িয়াছিলেন, সেই গল্প বলিলেন। মুসোলিনীর সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হইয়াছিল ১৯২৬ সালে, তখন তাঁর বয়স মাত্র বিশ বছর এবং মুসোলিনীর বয়স ষিঙগেরও বেশী। কিন্তু তাঁকে দেখাইতে সতেজ যুবকের মত—মুসোলিনীর সাহস, দৃঢ়তা এবং তাঁর কঠোর পুরুষোচিত ব্যক্তিত্ব পেতাচ্চিকে মুগ্ধ ও অভিভূত করিয়াছিল। অবশ্য মুসোলিনীর অনেক প্রেমিকা ও উপপত্নী ছিল। কিন্তু সেজন্ত তাঁর কোন ঝগড়া ছিল না। বরং পরবর্তী কালে মুসোলিনীর প্রেমিকাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর কাছে সাহায্যের জ্ঞেও আসিত। পেতাচ্চি বিনা দ্বিধায় তাদেরকে সাহায্য দিতেন। কারণ, তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল যে, মুসোলিনীর ক্ষমতার উপর একমাত্র তাঁরই আধিপত্য ছিল।...

পেতাচ্চি কখনো প্রসঙ্গে এক সময় বেলেনিকে অহুরোধ করিলেন যে, মুসোলিনীকে মিজপঙ্কের হাতে সমর্পণ করা হোক। বেলেনি উত্তরে বলিলেন যে, মিজপঙ্কের সঙ্গে এই ব্যাপারের কোন সম্পর্ক নাই। এটা সম্পূর্ণরূপেই ইতালীরই ব্যাপার।

এরপর ক্লারা পেতাচ্চি হঠাৎ একসময় কাঁ দিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন—“আমি বুঝেছি আপনারা তাঁকে গুলি করে মারবেন।” এই কথা বলার পর কম্পিত হস্তে চোখের জল মুছিয়া পেতাচ্চি বেলেনিকে অহুরোধ করিলেন—

“You must promise that if Mussolini is shot I can be near him until the last moment and that I shall be shot with him. Is that too much to ask? . I want to die with him.”—(৮)

“আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, মুসোলিনীকে যদি গুলি করে মারা হয়, তবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমাকে তাঁর কাছে থাকতে দেওয়া হবে এবং তাঁর সঙ্গে আমাকেও গুলি করা হবে। এমন অহুরোধ করা কি আমার পক্ষে লাড়াবাড়ি?... আমি তাঁর সঙ্গেই মরতে চাই।”

বেলেনি মুসোলিনীর প্রণয়িনীর এই গভীর আবেগের জন্য বিচলিত হইলেন এবং বলিলেন—“আমি শপথ করে বলছি যে, মুসোলিনীকে গুলি করার ইচ্ছা আমার নেই।”...

সেই রাতেই বেলিনি এবং আরও দুইজন পার্টিজান কোমো হ্রদ থেকে ১৪ মাইল

(৮) দি লাস্ট হাস্লেড ডেইজ, পৃষ্ঠা ৫৬৩

বিষম্বা (৩)—৫

দূরে মুসোলিনী ও ক্লারা পেভাকিককে সঙ্গে নিয়ে গাড়ীতে রওনা হইলেন একটি গ্রামের দিকে এবং সেখান থেকে বৃষ্টির মধ্যে পায়ে হাঁটিয়া পাহাড়ের উপর এক চাবী দম্পতির তিন ভাঙ্গা সাধা বাড়ীতে পৌঁছিলেন। মারিয়া দম্পতি অবশ্যই জানিতেন না আশ্রয়-প্রার্থী এই দম্পতি কারা, অথচ চেহারা দেখিয়া তাদের সন্দেহ হইল পুরুষটি যেন মুসোলিনীর মত দেখিতে! কিন্তু এই সামান্য চাবীর ঘরে মুসোলিনী?—এও কি সম্ভব? সুতরাং তাঁরা ধরিয়া নিলেন পুরুষটি একজন জার্মান বন্দী। তবে, এই সন্দেহী স্ত্রীলোকটি কে? সেকথা তাঁরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

তাঁদের দুইজনের জন্ত একটি পরিচ্ছন্ন শয়ন কক্ষ দেওয়া হইল। মুসোলিনী এবং ক্লারা শয়ন কক্ষ দেখিয়া খুব খুশী হইলেন এবং অতিরিক্ত আর একটি বালিশ চাহিয়া নিলেন। মুসোলিনী নাকি দুইটি বালিশ ছাড়া ঘুমাইতে পারিতেন না। দুইজন সশস্ত্র গ্রহরী তাঁদের জন্ত মোতামেদন করা হইল।

\*

\*

\*

এদিকে মিলানে পার্টিজানদের সদর দপ্তরে স্থির হইল মুসোলিনীকে মিলানে ফিরাইয়া আনা; হইবে এবং ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতা পার্মেরো ভোগলিয়াস্তি গোপনে হুকুম পাঠাইলেন সোজাসুজি মুসোলিনী এবং তাঁর রক্ষিতাকে মৃত্যুদণ্ড দান ও হনন করার জন্ত। এই আদেশ কার্যকর করার জন্ত কর্নেল ভ্যালেরিওকে ভার দেওয়া হইল। ভ্যালেরিও একজন নিষ্ঠাবান কমিউনিস্ট এবং স্পেনের গৃহযুদ্ধে লড়িয়াছিলেন। ২৮শে এপ্রিল ভোরবেলা তিনি রওনা হইয়া গেলেন ১৫ জন সশস্ত্র পার্টিজান সৈন্যসহ।

বেলিনের সঙ্গে যখন কর্নেল ভ্যালেরিওর দেখা হইল, তখন বন্দীদেরকে মিলানে পাঠানো নিয়মতাবিজ্ঞান হইল। কারণ, এদেরকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল বেলিনের সদর দপ্তর এলাকায়। তখন ভ্যালেরিও কঠোর স্বরে বলিলেন জাতীয় মুক্তি কমিটির সদর দপ্তর সর্বসম্মতক্রমে নির্দেশ দিয়াছেন মুসোলিনী ও তাঁর রক্ষিতাকে অবিলম্বে হনন করার জন্য এবং এই আদেশ কার্যকর করার ভার দেওয়া হইয়াছে ভ্যালেরিওর উপর। “আমি এসেছি এদেরকে গুলি করে মারার জন্য।”

অপরাত্ন ৪টার সময় কর্নেল ভ্যালেরিও ও তাঁর সঙ্গীরা মুসোলিনী ও তাঁর রক্ষিতাকে মারিয়া নাম্নী কৃষক দম্পতির গ্রাম্যগৃহ থেকেবাহির করিয়া নিয়ে আসিলেন। ভ্যালেরিও মুসোলিনীকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন। তাঁরা একটি ভিলার লোহার গেটের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং সামনে যেন কোন বিপদের আশঙ্কা করা হইতেছে এমন ভঙ্গী দেখাইয়া মুসোলিনী ও ক্লারাকে চুপি চুপি গাড়ী থেকে নামিতে এবং গেটের কাছে লুকাইতে বলিলেন। মুসোলিনী ব্যাপারটা আশ্চর্য করিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং শঙ্কিত চিত্তে গেটের কাছে গেলেন এবং ক্লারাও তাঁকে অহুসরণ করিলেন। তখন চারিদিকে যেন অশান্তির নিস্তব্ধতা। হঠাৎ সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ভ্যালেরিও চীৎকার করিয়া উঠিলেন :

“বাবাদিকারী বেক্রোপেবী দৈত্যদের সদর দপ্তরের নির্দেশক্রমে ইতালীর জনগণের প্রতি আমি স্ত্রায় বিচার করিতে বাধ্য।”



মুসোলিনী স্তম্ভভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন। কিন্তু ক্লারা তাঁর কোমলবাহু দিয়া মুসোলিনী'র কণ্ঠদেশে জড়াইয়া ধরিলেন এবং চোঁচাঃরা বলিলেন—“না, তাঁকে মারিতে দেওয়া হবে না।”

ভ্যালেরিও আদেশ দিলেন—‘বহি আপনিও মরতে না চান, তবে, কাছ থেকে সরে যান।’

কিন্তু ক্লারা পেতাচ্চি ডুচের ডানদিকে স্থান নিলেন। ভ্যালেরিও ১০ ফুট দূরে দাঁড়াইয়া পাঁচবার গুলী করিলেন। মুসোলিনী মাটির উপর পড়িয়া গেলেন। তাঁর উপপত্নী পেতাচ্চিকেও অগুরুপভাবে গুলী করিয়া মারা হইল। মেজেশ্রী গ্রামের প্রান্তে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিল। সেই সঙ্গে আরও কয়েকজন ক্যাসিষ্ট বন্দীকে এবং মুসোলিনী'র ‘সরকারের’ ১৫ জন সদস্যকে ডোক্তোতে গুলী করিয়া হত্যা করা হইল। ১৯৪৪ সালের ১২ই আগস্ট মিলানের পিয়াজো লরেটোতে জার্মানরা ১৫ জন ইতালীয়ানকে হত্যা করিয়াছিল একটি জার্মান লরীর উপর বোমা নিক্ষেপের জন্ত। এই হত্যাকাণ্ডগুলি ঋণি তারই প্রতিশোধস্বরূপ।—(২)

\* \* \*

ইতালীতে মিত্রপক্ষের সদর দপ্তর থেকে মিলানের পার্টিজান সদর দপ্তরকে অগ্নিরোধ করা হইয়াছিল ষ্ট মুসোলিনীকে মিত্রপক্ষের হাতে অর্পণের জন্ত। কিন্তু মিলানের কমিউনিষ্ট সদর দপ্তর এই অগ্নিরোধ অগ্রাহ্য করিয়া এক টেলিগ্রামে জানাইয়া দিল যে, গণ-আদালতের বিচারে মুসোলিনী'র প্রাণদণ্ড বিধান এবং তা কার্যকর করা হইয়াছে।

২০শে এপ্রিল, ১৯৪৫, ভোরবেলা একটি লরীযোগে ২৩টি মৃতদেহ মিলানে আনা হইল এবং মিলানের প্রকাশ্য স্থানে পিয়াজো লরেটোতে মৃতদেহগুলি লরী থেকে খালাস করা হইল এবং সাজাইয়া রাখা হইল। ক্রমে সেখানে ভীড় জমিতে লাগিল এবং মুসোলিনী ও ক্লারা পেতাচ্চির মৃতদেহের জঘন্যতম অসম্মান ঘটিল। কসাইয়ের দোকানের মাংস খুলাইবার ছক দিয়া মুসোলিনী ও ক্লারার মৃতদেহ খুলাইয়া রাখা হইল—তাদের মাথা নীচের দিকে ও পা দুইটি উপরের দিকে খুলিয়া রাখিল, ক্লারার স্মার্ট নীচ থেকে মাথার দিকে খুলিয়া পড়িয়াছিল। একজন মহিলা সেটা তুলিয়া ধরিয়া বেঁট দিয়া দুই পায়ের সঙ্গে বাঁধিয়া দিলেন। কিন্তু উল্লাসমত্ত উত্তেজিত জনতা ইতালীর ‘সর্বময় প্রভুর’ মৃতদেহের উপর ষ্ ষ্ নিক্ষেপ করিতে, জুতা দিয়া লাথি মারিতে ও অশ্রুতভাবে অপমান করিতে লাগিল। আর একজন মহিলা অভ্যন্ত উত্তেজিতভাবে মুসোলিনী'র মৃতদেহের উপর পাঁচবার গুলী নিক্ষেপ করিলেন তাঁর পাঁচটি পুত্রের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্ত। কিন্তু এর চেয়েও অসম্মান ঘটিল মুসোলিনী'র মৃতদেহের—ভাষার তার বর্ণনা দেওয়া কঠিন। একদা যে মুসোলিনী সুইমিং পুলে স্নান করিতে নামিলে যুবতী নারীরা উল্লসের মত তাঁকে ধরিয়া ধরিত, সেই মুসোলিনী'র মূখের উপর ত্রীলোকেরা স্মার্ট তুলিয়া ‘দেহজল’ নিক্ষেপ করিল!—(১০)

(২) দি লাষ্ট ডেইজ অব্ মুসোলিনী, পৃষ্ঠা ৩২৭

(১০) ডুচে—রিচার্ড কলিয়ার, পৃষ্ঠা ৩৭১

২৩ বছর আগে যে মুসোলিনী রোম নগরীতে মার্চ করিয়া আসিয়াছিলেন এবং ক্যাসিজমের জাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ৩২ বছর বয়সে তাঁর সেই নাটকীয় হিংস্র জীবনের ভয়াবহ অবসান ঘটিল। জেনারেল আইজেনহাওয়ার এই সংবাদ শুনিয়া মন্তব্য করিলেন—“হা ভগবান, কি কলঙ্জনক মৃত্যু!”.....

মুসোলিনীকে এভাবে খুন করার জন্ত চার্চিল ফোভ প্রকাশ করিলেন। বিশেষভাবে একজন মহিলাকে হত্যা করার জন্ত তিনি সমগ্র ব্যাপারটাকে ‘কাপুরুষতা’ ও ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ বলিয়া নিন্দা করিলেন এবং নিজেই প্রশ্ন তুলিলেন এই মহিলা কি যুদ্ধাপরাধী ছিলেন?—(১১)

কিন্তু ইতিহাসে মুসোলিনীর মত অত্যাচারী ডিক্টেটরদের এই পরিণামই ঘটিয়া থাকে। চার্চিল এই ব্যাপারে যত ফোভই করিয়া থাকুন না কেন, মুসোলিনীর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার ইতালীর জনগণ সর্বত উল্লাস প্রকাশ করিলেন।

---

(১১) চার্চিল, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬০

## নবম পর্ব

### ষষ্ঠ অধ্যায়

হিটলারের আত্মহত্যা : ইভা ব্রাউনের সহমরণ

১৫ এপ্রিল, ১৯৪৫, ইভা ব্রাউন বার্লিনে আসিসেন হিটলারের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। কিন্তু কে এই ইভা ব্রাউন, যাকে আগের অধ্যায়ে হিটলারের প্রণয়িনী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যদিও ১২ বছরের অধিককাল ধরিয়া ইভা হিটলারের প্রণয়িনী ছিলেন, তবু জার্মানীর খুব কম লোকই তাঁর নাম জানিতেন এবং তার চেয়েও কম লোক হিটলারের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা জানিতেন। কারণ, ইভা সর্বত্র আড়ালেই থাকিতেন এবং হিটলার তাঁকে প্রকাশে আনিতে না, কিংবা প্রকাশে আত্মপ্রকাশ করিতে দিতেন না। এবং পাঠকবর্গ জানিয়া হতাশ হইবেন যে, তিনি কোন ইতিহাসের নায়িকা ছিলেন না কিংবা যুদ্ধ ও বিপ্লবের দিনে যেমন বীর পুরুষদের নামের সঙ্গে সম্বন্ধ সময় খুব নাম করা স্মরণীয় এবং বৃদ্ধিতে ও হাশ্বে লাস্তে উজ্জ্বল কোন কোন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহিলার কথা শুনা যায়, ইভা ব্রাউন আদৌ সেই জাতের মেয়ে ছিলেন না। তাঁর কোন 'গ্লামার' ছিল না। কিন্তু তিনি স্ত্রী ও দীর্ঘাঙ্গী ছিলেন। তাঁর দেহ ছিল সবল সূঠাম এবং বেশ ছিল চম্পকবর্ণ। তথাপি জার্মানীর এত বড় রণপ্রভুর সঙ্গিনী হওয়ার মত যোগ্যতা বা গুণাবলীও তাঁর ছিল না। হিটলার ছিলেন তার চেয়ে ২৩ বছরের বড়। তবু আশ্চর্য এই যে, ইভা ও হিটলার পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন এবং ইভা ব্রাউনের মত একটি সাধারণ মেয়ে হিটলারের জীবনের একেবারে শেষ পর্বায়ে সহমরণ যাত্রার সময় পর্যন্ত সর্বত্র পরিচিতি লাভ করিলেন এবং ইতিহাসে একটা স্থান করিয়াও লইলেন।

ইভা ব্রাউনের জন্ম ব্যার্ডেরবার একটি নিম্নবিত্ত সাধারণ পরিবারে। তাঁর পিতা ছিলেন একজন স্থল মাস্টার। কিন্তু তাঁর বাবা ও মা গোড়ার দিকে হিটলারের সঙ্গে তাঁর 'অবৈধ সম্পর্কের' বোরতর বিরোধী ছিলেন। হোক না হিটলার জার্মানীর সর্বময় প্রভু, তবু তাঁর সঙ্গে এই ধরণের অবৈধ সম্পর্ক আপত্তিকর। মিউনিখের হেনরিক হফম্যান (Heinrich Hoffmann) ১৯২২ সাল থেকে হিটলারের প্রধান কটোগ্রাফার ছিলেন এবং ইভা ব্রাউন তাঁর সেই ছুটিওতে কাজ করিতেন। কটোগ্রাফার হফম্যানই একদিন ফুরারের সঙ্গে ইভার পরিচয় করাইয়া দেন এবং ফুরার তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। এর আগে হিটলার গেলি রাউবল নাম্নী তাঁর ভায়ারী সঙ্গে 'বিবম প্রেম' পড়িয়াছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ বিচ্ছেদ ও অশান্ত কারণে সেই মেয়েটি আত্মহত্যা করিয়াছিল এবং এই ঘটনারই দুই এক বছর পরে ইভা ব্রাউনের সঙ্গে হিটলারের পরিচয় ঘটিয়াছিল।—(১)

ইভা যদিও হিটলারের আলপাইন পার্বত্য নিবাসের মনোরম ভিলাতে বাস করিতেন, তবু দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হইত না। কারণ, হিটলারের ছিল অত্যন্ত কর্মব্যস্ত জীবন। এই ধরনের দীর্ঘ বিচ্ছেদ মাঝে মাঝে ইভার কাছে অসহ্য মনে হইত। সুতরাং তিনিও হিটলারের আগেকার প্রণয়িনীর মত দুইবার আত্মহত্যা করিতে উদ্ভত হইয়াছিলেন। অবশ্য ক্রমে ক্রমে এই দীর্ঘ বিচ্ছেদ তাঁর গা সহ্য হইয়া গিয়াছিল। মাসের পর মাস যুদ্ধের ভয়াবহ দিনগুলিতে হিটলার থাকিতেন তাঁর বিভিন্ন রণশিবিরে সেনাপতি, রাজনীতিবিদ ও অগ্ন্যস্ত্র পদস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে বাস্তব। সুতরাং এই সমস্ত শিবিরে বা সদর দপ্তরে তাঁর যাতায়াত ছিল নিবন্ধ। সুতরাং নিরুপায় ইভা ব্রাউন ও বারন্তালজবার্গের বের্গহোফ ভিলাতে সত্তা ও চটকদার উপস্থাপন পড়িয়া কিংবা বাজে কিন্ন দেখিয়া কিংবা সঁাতার কাটিয়া ও ক্ষী খেলিয়া দিন কাটাইতেন। কোন কোন সময় নৃত্যও করিতেন। কিন্তু হিটলার সেটা পছন্দ করিতেন না। বার্লিনে পর্যন্ত তাঁকে কদাচিৎ আসিতে দেওয়া হইত। সুতরাং তাঁর দীর্ঘ বিরহের দিনগুলি ছিল বিষন্ন। হিটলারের মোটর গাড়ীর চালক এরিক কেম্পকা (Erich Kempka) বলিতেন যে, জার্মানীতে তিনি ছিলেন সবচেয়ে অনুশীলিত জীলোক। তিনি তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় হিটলারের প্রতিকার কাটাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু মার্শাল কাইটেল হ্যারেমবার্গের আদালতে বলিয়াছিলেন যে, ইভা ব্রাউন ছিলেন পরিচ্ছন্ন, মৃষ্টি স্বভাবের জীলোক। তাঁর পা দুটি খুব সুন্দর ছিল। কিন্তু তিনি সর্বদাই আড়ালে থাকিতেন, কদাচিৎ তাঁকে বাইরে দেখা যাইত।

সুতরাং মর্যাদার দিক থেকে ইভা ব্রাউন হিটলারের পত্নীও ছিলেন না, উপপত্নীও ছিলেন না—ছিলেন দুর্লভ মুহূর্তের সঙ্গিনী। (২) ইভা কিন্তু হিটলারকে সমস্ত অন্তর দিয়া ভালোবাসিতেন এবং তাঁর অন্ধ ভক্ত ছিলেন। হিটলারের ব্যক্তিত্বের দ্বারা ইভা একেবারে আচ্ছন্ন ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে হিটলারের একজন নামজাদা মন্ত্রী আলবার্ট স্পীর লিখিয়াছিলেন যে, পুরাতন পার্টি সহচরদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের সময় ইভা ব্রাউনকে উপস্থিত দেখা বাইত বটে, কিন্তু যে মুহূর্তে রাইখের পদস্থ সম্মানভাজন ব্যক্তিগণ, যেমন ক্যাবিনেট মন্ত্রী প্রভৃতি দেখা করিতে আসিতেন, ইভা ব্রাউনকে তৎক্ষণাত্ চণিয়া যাইতে হইত। এমন কি গোয়েন্দা এবং তাঁর পত্নী যখন আসিতেন, তখনও ইভাকে তাঁর ঘরের মধ্যে অবস্থান করিতে হইত। অর্থাৎ হিটলার তাঁকে খুব সংকীর্ণ সামাজিক গুণীর বাইরে গ্রহণ করিতে রাজী ছিলেন না। হিটলারের শরন কক্ষের পাশের ঘরে যেন তাঁকে আটক বন্দীর মত থাকিতে হইত। ইভা এত ভয় পাইতেন যে, সাহস করিয়া ঘরের বাইরে একটু বেড়াইতে যাইতেও পারিতেন না, হিটলার তাঁর মনোভাবের প্রতি সামান্যই সূচিবচনার পরিচয় দিতেন। এমন কি, তাঁর উপস্থিতিতে উপেক্ষা করিয়াই হিটলার নারীজাতি সম্পর্কে মন্তব্য করিলেন :

“একজন প্রথম বুদ্ধিমান লোক কি কোন আদিম বোকা মেয়ে মানুষকে গ্রহণ করিতে পারে? ভেবে দেখুন সমস্ত কিছু উপরে যদি কোন জীলোক আমার কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করতো! আমার অবসর সময়ে আমি শান্তি চাই...কিন্তু বিষয়ে করা কখনও আমার পোষাবে না। যদি আমার একগাধা ছেলেমেয়ে থাকতো, তা’ হলে আমার কি সমস্যা দাঁড়াতো, তা’ ও চিন্তা করে দেখুন।”...

“আমি অববিবাহিত, এজন্য বহু নারী আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। আমার আন্দোলনের দিনগুলিতে অবশ্য এর খুব উপযোগীতা ছিল। এ যেন সিনেমার কোন অভিনেতার বিষয়ে করার মত। যে সমস্ত মেয়ে আগে তাঁকে পূজা করতো, বিশ্বের পর থেকেই তাদের সেই আগ্রহ নষ্ট হয়ে যেতে থাকতো। আগের মত সে আর তাদের কাছে উপাশ্রয় দেওয়ার মত থাকত না।”

আলবার্ট স্পীর বলিতেছেন—“হিটলার বিশ্বাস করিতেন যে, জীলোকদের কাছে তাঁর খুব ঘোঁন আবেদন আছে। কিন্তু তিনি বিশ্বাসা উঠিতে পারিতেন না যে, তাঁর এই আবেদন চ্যান্সেলর হিসাবে কিংবা এ্যাডমিরাল হিসাবে। মহিলাদের উপস্থিতিতেই তিনি রুঢ়ভাবে মন্তব্য করিতেন যে, তিনি তাঁর চারিপাশে খুব রসিকা ও বুদ্ধিমতী জীলোক পছন্দ করেন না।’

ইভা ব্রাউনের রাজনীতিতে কোন আগ্রহ ছিল না এবং হিটলারের উপর তিনি কোন প্রভাব খাটাইতেও চাহিতেন না। কোন কোন সময় তরুণ সৈন্যদের সঙ্গে তিনি গভীর আগ্রহে নৃত্য করিতেন বটে, কিন্তু তিনি কোন মতেই আধুনিক পম্পাদুর (১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজা লুইয়ের উপপত্নী, প্রভাব প্রতিপত্তি ও রাজনৈতিক বুদ্ধিতে যিনি অসাধারণ ছিলেন) ছিলেন না। সৈনিক থেকে ইতিহাসে তাঁর কোন স্থান ছিল না।—(৩)

আমাদের দেশে এবং পশ্চিমেরও কোন কোন মহলে এক কালে প্রচলিত ছিল যে, হিটলার ‘ব্রহ্মচারী’ গোছের মানুষ ছিলেন। তাঁর যেমন কোন নেশা ছিল না, তেমনি কোন নারীর সঙ্গে তার কোন দৈহিক সম্পর্কও ছিল না। কিন্তু এই ধারণা ভুল। মহাযুদ্ধের পর পশ্চিমের পত্র-পত্রিকায় ইভা ব্রাউনের সঙ্গে হিটলারের দৈহিক কিংবা যৌন সম্পর্কের কথা স্বীকার করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, জীবনের শেষ মুহূর্তে ইভার সঙ্গে বিবাহের কয়েক বছর আগেই এই দৈহিক সম্পর্ক ঘটিয়াছিল। অর্থাৎ অবৈধ সংসর্গ ছিল।

\* \* \*

হিটলারের নির্দেশগুলি ডোয়েনিৎস, শোয়েরনার ও কেসেলরিং এই তিন সামরিক পুরুষকে স্ব স্ব দপ্তরে পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য ২৮শে এপ্রিল রিটার ফন গ্রীম ও মহিলা পাইলট রিৎস স্বনামধন্য থেকে বার্লিন ত্যাগ করিয়া আকাশ পথে উড়িয়া গেলেন, তখন রুশ গোলন্দাজ আক্রমণে সেই বিমানটি ‘পাখীর পালকের মত হেলিতেছিল, দুলিতেছিল।’ তাঁরা ২০ হাজার ফুট উর্কে উঠিয়া গেলেন রুশ আক্রমণ

এড়াইবার জন্ত এবং তাঁরা নীচে তাকাইয়া দেখিলেন রাজধানী বার্লিন যেন আগুনের সমুদ্রে জ্বলিতেছে।...

বার্লিনের পূর্বদিকে জার্মানদের প্রচণ্ড প্রতিরোধ চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া রুশ সৈন্যরা দ্রুত গতিতে আগাইয়া যাইতে লাগিল এবং ফুরারের ভূগর্ভের আশ্রয়ের উপর লালকোঁজের গোলাগুলি ও বোমা পড়িতে লাগিল। তখন জার্মানীর ধ্বংস এবং নিজের আশ্রয়স্থানের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া দেহে মনে বিধ্বস্ত হিটলার ঘোষণা করিলেন—  
‘ইভা ব্রাউন বার্লিনে আসিয়াছেন আমার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্ত। যে নারী দীর্ঘকাল বিধ্বস্ত-দুঃস্থের পর আমার সঙ্গে স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণের সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাঁকে আমি যথার্থীভূত বিবাহ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছি। কারণ, তিনি আমার স্ত্রী হিসাবেই সহমরণে যাইতে প্রস্তুত। সুতরাং আমরা দুইজনেই চাই আশ্রয়ের মৃত্যুর পর আমাদের দুইজনের দেহ যেন দাহ এবং ভস্মীভূত করা হয়।’ হিটলার আরও বলিলেন যে, তিনি চান না, তাঁর দেহ জীবিত বা মৃত অবস্থায় শত্রুর হাতে পড়ুক।

যুদ্ধের অস্বাভাবিক ও বিপজ্জনক অবস্থার জন্ত ২৮ এপ্রিল রাত্রে ১টা থেকে ৩টার মধ্যে (ইংরাজী মতে ২১ এপ্রিল) হিটলার অত্যন্ত সাধারণ ও সরল অহুষ্ঠানের মাধ্যমে ইভা ব্রাউনকে বিবাহ করিলেন। গোয়েবেলস্‌ ভার্ণার ভাগনার (Walter Wagner) নামে একজন সরকারী প্রশাসককে এই অভিনব বিবাহে ‘পৌরহত্য’ করার জন্ত জাকিয়া আনিলেন এবং সেই বেচারী অকস্মাৎ এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেলেন। তিনি ছাড়া এই বিবাহের আরও সাক্ষী ছিলেন গোয়েবেলস এবং বোরম্যান। বাকারের গ্রাইভেট অংশে একটি ছোট্ট ম্যাপক্রেমে এই বিবাহ অমুষ্ঠিত হইল। বর ও কনে উভয়েই দিব্যি করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, তাঁরা সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত আত্মবংশ সম্ভূত এবং বিবাহ বাতিল হইয়া যাওয়ার মত তাঁদের কোন বংশগত রোগ নেই, তাঁরা স্বেচ্ছায় পরস্পরকে বিবাহের সম্মতি দিতেছেন। অতঃপর তাঁরা রেজিস্টারে নাম স্বাক্ষর করিলেন। কিন্তু কনে তাঁর নাম স্বাক্ষর করিতে গিয়া প্রথমে লিখিলেন ‘ইভা ব্রাউন’ কিন্তু পরমুহূর্তেই তুল সংশোধনপূর্বক ‘বি’ অক্ষরটি কাটিয়া দিয়া লিখিলেন ‘ইভা হিটলার’—জন্মগত পদবী ব্রাউন।

এতদিনে ইভা ব্রাউন জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়া হিটলারের পত্নী হিসাবে আইনগত স্বীকৃতি ও মর্যাদা লাভ করিলেন। এখন থেকে তিনি হইলেন ‘ফ্রাউ হিটলার’। এই সংক্ষিপ্ত বিবাহ অমুষ্ঠানের পর বিবাহ উপলক্ষে একটি ভোজের ব্যবস্থা হইল এবং সেখানে উপস্থিত ছিলেন বোরম্যান, গোয়েবেলস ও ফ্রাউ (মিসেস) গোয়েবেলস, হিটলারের দুইজন মহিলা সেক্রেটারি ও নিরামিষ রান্ধুনী এবং পরে আসিয়া যোগ দিলেন জেনারেল ফ্রেবস, জেনারেল বার্গডোরফ প্রভৃতি। অতিথিরা আত্মগোষ্ঠানিকভাবে স্যাম্পেন পান করিলেন এবং কিছুক্ষণের জন্তে জার্মানীর ভয়াবহ অবস্থার কথা ভুলিয়া গিয়া পুরানো দিনের কিছু আনন্দের কথা নিয়া আলোচনা করিলেন। হিটলার তাঁর জীবনের কোন কাহিনী উল্লেখ করিয়া পুনরায় ঘোষণা করিলেন যে, শ্রাশনাল সোসিয়েলিজম শেষ হইয়া গিয়াছে। তাঁর পুরাতন বন্ধুরা তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁর পক্ষে আর বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ

নাই। অতিথিদের কেহ কেহ এই সময় অশ্রুসিক্ত চোখে নিঃশব্দে কক্ষ থেকে নিজস্ব হইলেন। তখন হিটলারও পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন এবং তাঁর একজন সেক্রেটারি ফ্রাউ গার্টকড জওকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হিটলার তাঁর নিকট তাঁর শেষ ইচ্ছাপত্র বা উইল ডিক্টেট করিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি দুইটি দলিল তৈয়ার করিলেন— একটি ব্যক্তিগত এবং অপরটি রাজনৈতিক। এই দলিলে মিথ্যা, অর্ধমিথ্যা, অপপ্রচার, নাৎসী মতবাদের গুণগান, ইতিহাসের বিকৃতি ইত্যাদি ঘটাইলেন এবং নিজের ব্যর্থতার জন্য অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাইলেন। তথাপি ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য তিনি তাঁর ‘শেষ আবেদন’ রাখিয়া গেলেন।...

রাজনৈতিক দলিলেব দুইটি অংশ ছিল। প্রথমটি সাধারণ রকমের এবং দ্বিতীয়টি সুনির্দিষ্ট ধরনের।

রাজনৈতিক দলিলের গোড়াতেই তিনি যুদ্ধের জন্য সমস্ত দায়িত্ব অস্বীকার করিলেন : “একথা সত্য নয় যে, আমি কিংবা জার্মানীতে অপর কেহ ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ চাহিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে প্ররোচনা দিয়াছিলেন কিংবা এই যুদ্ধ চাহিয়াছিলেন একমাত্র সেই সমস্ত আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ধুরন্ধরগণ, যারা ইহুদীবংশ সম্ভূত কিংবা যারা ইহুদীদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কাজ করিতেছিলেন। নিরস্ত্রীকরণের জন্য আমার সর্বপ্রকার প্রস্তাবের পর ভবিষ্যৎ বংশধরগণ নিশ্চয়ই আমার ঘাড়ে যুদ্ধের দায়িত্ব চাপাইয়া দিতে পারিবেন না।...শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া যাইবে, আমাদের শহরগুলির ধ্বংসসূচক ও নৃতিস্তুত হইতে সেই সমস্ত লোকের প্রতি ঘৃণা সর্বদাই নতুন করিয়া দেখা দিবে, যারা শেষ পর্যন্ত এর জন্য দায়ী ছিল। আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদ ও সেই মতবাদের সাহায্যকারী যারা তাদেরকে এজন্য আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

অতঃপর হিটলার পোলিশ-জার্মান যুদ্ধের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া বলিলেন যে, যুদ্ধের তিন দিন আগেও তিনি পোলিশ-জার্মান সমস্ত্রাণ একটি যুক্তিসঙ্গত মীমাংসা চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ইংলণ্ডের শাসকচক্র এই যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন একদিকে বাণিজ্যিক কারণে এবং অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ইহুদী-বাদের প্রোপাগান্ডার চাপে।

যুদ্ধক্ষেত্রে এবং বোমাবিধ্বস্ত শহরগুলিতে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুর জন্য এবং তাঁর নিজ হাতে ইহুদীদের হত্যাকাণ্ডের জন্য সমস্ত দায়িত্ব তিনি ইহুদীদের ঘাড়েই চাপাইয়া দিলেন। তারপর তিনি ঘণনা করিলেন কেন তিনি বালিনে অবস্থানের জন্যই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন :

After six years of war, which inspite of all setbacks will one day go down in history as the most glorious and heroic manifestation of the struggle for existence of a nation, I can not forsake the city that is the Capital of this State...I wish to share my fate with that which millions of others have also taken upon themselves by staying in the town...

I have therefore decided to remain in Berlin and then to choose death voluntarily...I die with a joyful heart in the knowledge of the

immeasurable deeds and achievements of our peasants and workers and of a contribution unique in history of our youth which bears my name. (8)

অর্থাত্—“সমস্ত বাণীবপিন্তি সঙ্গেও ৬ বছর ধরিয়া সংগ্রামের পর এই যুদ্ধ একটা জাতির স্বাধীনতার লড়াই হিসাবে নিশ্চয়ই একদিন ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবান্বিত এবং সাহসিকতাপূর্ণ বলিয়া চিহ্নিত হইবে। যে শহর এই রাষ্ট্রের রাজধানী তাকে আমি ভাগ করিয়া যাইতে পারি না।...যে সমস্ত লক্ষ লক্ষ লোক এই শহরে অবস্থান করিয়া নিজেদের ভাগ্যকে জড়াইয়াছেন, আমিও তাঁদের সঙ্গে সেই একই ভাগ্যের অংশীদার হইতে চাই।...”

সুতরাং আমি স্থিতিশীল সিদ্ধান্ত করিয়াছি বার্লিনে অস্থানের এবং সেখানে যেখানে যত্ন বরণের...আমি অত্যন্ত প্রফুল্লচিত্তে যত্ন বরণ করিতেছি। কারণ, আমি জানি যে, আমদের কৃষকেরা এবং শ্রমিকেরা অপরিমেয় কর্ম সম্পাদন ও উদ্ভাষন করিয়া গিয়াছেন এবং আমার নামের সঙ্গে যুক্ত যুববাহিনী ইতিহাসে অপূর্ব অবদান রাখিয়া গিয়াছেন।”

দলিলের শেষের দিকে তিনি জার্মানদেরকে সংগ্রাম পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিলেন এবং ভরসা দিলেন যে, জার্মান সৈন্যদের এবং তাঁর নিজের ত্যাগ স্বীকারের ফলে যে বীজবপন করা হইল, তাতেই একদিন জাতীয় সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের এবং একটা সত্যকার ঐক্যবদ্ধ জাতির পুনর্জন্ম ঘটবে।

বর্তমান যুদ্ধে জাতির এই বিপর্যয়ের জন্য হিটলার আর্মি এবং তার অফিসার বাহিনীকে দায়ী ও নিন্দা করিলেন এবং ভবিষ্যতের জন্য এই উপদেশ দিলেন যে, কোন ভূমি বা স্থান ত্যাগ করার চেয়ে যত্নবরণ বরং বাছনীয়।...

এই রাজনৈতিক টেটামেন্টে দ্বিতীয় অংশ প্রথম অংশের তুলনায় আরও বেশী কঠোর এবং নিন্দাত্মক ছিল। এই বিবৃতির গোড়াতেই বলা হইল :

“আমার যত্নের আগে আমি পার্টি থেকে প্রাক্তন রাইখ মার্শাল হেরম্যান গোয়েরিংকে বিভাড়িত করছি এবং ১৯৩১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর রাইখস্ট্যাগে আমার বক্তৃতায় এবং ১৯৪১ সালের ২২ জুন আমার এক ডিক্রির দ্বারা গোয়েরিংয়ের হাতে যে সমস্ত অধিকার অর্পণ করিয়াছিলাম, সেগুলি প্রত্যাহার করিয়া নিতেছি। তাঁর শুল্কস্থানে আমি গ্রাও অ্যাডমিরাল ডোয়েনিংসকে রাইখের প্রেসিডেন্ট এবং সমস্ত বাহিনীসমূহের সুপ্রীম কমান্ডার পদে নিয়োগ করিতেছি।”

গোয়েরিংয়ের পর হিমলারের পালা। কারণ, হিমলারও যে, পশ্চিমের মিত্রপক্ষের নিকট আত্মসমর্পনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, সেই সংবাদও ইতিমধ্যে হিটলারের নিকট পৌঁছিয়াছিল। অতএব হিমলারকেও অল্পরূপভাবে পদচ্যুত ও ক্ষমতাচ্যুত করা হইল। যেহেতু রাজনৈতিকরা তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, আর্মি (স্ববাহিনী) তাঁর প্রতি বিশ্বাসভঙ্গ করিয়াছে, এস এস বাহিনী তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, সুতরাং সেই অবস্থায় একমাত্র নোবাহিনীর নামক তাঁর উত্তরাধিকার পাইবেন। যদিও নৈশ বা নোবাহিনীর কার্যকলাপ সর্বদাই খুব উচ্চস্তরের ছিল না। তথাপি অন্তত তাঁরা নাৎসীবাদের প্রতি অল্পরক্ত ছিলেন।



“ভবিষ্যতে জার্মান আর্মি অফিসারেরা যেন নেভির মত সম্মানাই হইতে পারেন ...”

অর্থাৎ হিটলারের পর কে ?—উত্তরাধিকারের এই জটিল প্রশ্নটির এভাবে মীমাংসা করা হইল—নৌঅধিনায়কের হাতে ক্ষমতা অর্পণের দ্বারা। তাঁর ইচ্ছাপত্রের বাটেটেমেটে আবার ঘোষণা করা হইল :-

“আমার মৃত্যুর আগে আমি হেইনরিখ হিমলারকে পার্টি থেকে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে, এস এস রাইখ ফুরারের এবং অগ্নাজ্ঞ সমস্ত দপ্তর থেকে বিতাড়িত করছি। তাঁর পরিবর্তে পার্টি-প্রশাসক কার্ল হানকে (Karl Hanke) রাইখফুরার এস এস এবং জার্মান পুলিশের প্রধান পদে এবং পার্টি প্রশাসক পল গিজলারকে (Paul Giesler) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে নিয়োগ করছি।

“গায়েরিং ও হিমলার আমার অজ্ঞাতসারে এবং আমার বিনা অনুমতিতে শত্রুর সঙ্গে গোপনে আলোচনা করিয়াছেন, রাষ্ট্রের ক্ষমতা অবৈধভাবে দখলের চেষ্টা করিয়াছেন—কেবল ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করা হয় নাই, আমাদের দেশ এবং আমাদের সমগ্র জনগণের প্রতিও অপরিমিত কলঙ্কের কারণ ঘটানো হইয়াছে।”

এভাবে বিশ্বাসঘাতকদের ব্যবস্থা করিয়া এবং তাদের স্থানে নতুন উত্তরাধিকারী নিয়োগ করিয়া হিটলার তাঁর অবর্তমানে একটি নূতন গবর্ণমেন্টও গঠন করিয়া গেলেন। জার্মান জাতি যাতে এই যুদ্ধ সর্বাত্মকভাবে চালাইয়া যাইতে পারেন, সেজন্য সম্মানাই লোকদের দ্বারা একটি গবর্ণমেন্ট গঠন করা হইল এবং ১৯টি ক্যাবিনেট মন্ত্রীর পদে তিনি তাঁর নিজস্ব লোকদের মনোনীত করিলেন। যদিও নিয়মাহুসারে এই দায়িত্ব বর্তানো উচিত ছিল পরবর্তী গবর্ণমেন্টের উপর, তথাপি হিটলার তাঁর পছন্দসই লোক নিয়োগ করিয়া গেলেন। ডোয়েনিংসকে রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, শশস্ত্র বাহিনীর সুপ্রীম কমান্ডার, যুদ্ধমন্ত্রী ও নৌ-বাহিনীর প্রধান সেনাপতির পদে নিয়োগ করা ছাড়াও হিটলার তাঁর অন্যান্য গোঁড়া ভক্তদেরকেও নূতন ক্ষমতার পদে নিয়োগ করিলেন। যেমন, গোয়েবেলসকে করা হইল রাইখের চ্যান্সেলর, মার্টিন বোরম্যানকে পার্টি চ্যান্সেলর, অস্ট্রিয়ার কুইসলিং ও হল্যাণ্ডের পীডনকারী সেইস-ইনকোয়ার্টকে (Seyss-Inquart) পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পদে নিয়োগ করা হইল। অর্থাৎ একদা হিটলার যে রিবেট্রপকে জার্মানীর দ্বিতীয় বিসমার্ক (রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরের পর) নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, তাঁর সেই প্রিয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীকেও জীর্ণ-বস্ত্রের মত ত্যাগ কর' হইল। আর কিন্তু মার্শাল শোয়েরনারকে সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি পদে নিয়োগ করা হইল। কারণ, হিটলারের তখনও আশা ছিল যে, শোয়েরনার হয়তো বোহেমিয়ার প্রতিরক্ষার যুদ্ধে সাক্ষ্য অর্জন করিতে পারিবেন। রিবেট্রপের মত আলবার্ট স্পীরকেও (অস্ত্রসজ্জার মন্ত্রী) নূতন মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেওয়া হইল।

উইলের মধ্যে হিটলার তাঁর শেষ নির্দেশ দিয়া গেলেন যে, বাদদের উপর রাইখের নূতন ভার অর্পণ করা হইল, তারা সর্বতোভাবে নাৎসী প্রশাসন, নাৎসী যুদ্ধ এবং নাৎসীবাদকে রক্ষা করিবেনই। “সর্বোপরি তাঁরা অত্যন্ত কঠোরভাবে রক্ষা

করিবেন জাতি সংক্রান্ত আইনলিখে (racial laws) এবং অত্যন্ত নির্মমভাবে প্রতিহত করিবেন সারা দুনিয়ার জাতিসমূহের বিবদানকারী আন্তর্জাতিক ইচ্ছাবাদকে।”

যুতুর আগেও হিটলারের জাতিবিষয়ে কি ভয়ঙ্কর ছিল, উইলের এই কথাগুলি তার অলস্ত প্রমাণ।

উপরের বর্ণিত এই রাজনৈতিক উইলের পর হিটলারের ব্যক্তিগত উইল তেমন কিছু চমকপ্রদ ছিল না। এই উইলের দ্বারা তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি পার্টিকে এবং পার্টি না থাকিলে রাষ্ট্রকে দান করার নির্দেশ দিলেন। যদি রাষ্ট্রও না থাকে, তা’ হলে কি হইবে, সে কথা আর তিনি উল্লেখ করিলেন না। যে সমস্ত চিত্রকলা তাঁর সংগ্রহশালায় ছিল, সেগুলির দ্বারা তিনি তাঁর জন্মভূমি লিঞ্জ (দানিযুব নদী তীরস্থ) শহরে একটি পিকচার গ্যালারি স্থাপনের প্রস্তাব দিলেন এবং উইলের একজিকিউটার হিসাবে নিযুক্ত করিলেন মার্টিন বোরম্যানকে। ইভ’ ব্রাউনের মাকে এবং হিটলারের ব্যক্তিগত ঋণচরী ও সহকারীদিগকে হিটলারের সম্পত্তি থেকে দান করার অধিকারও মার্টিন বোরম্যানকে দেওয়া হইল।

উইলের উপসংহারে হিটলার পুনরায় ঘোষণা করিলেন যে, আত্মসমর্পণ বা পরাজয়ের লক্ষ্যে এড়াইবার জগ্গ তিনি ও তাঁর স্ত্রী প্রেচারা যত্নবরণ করিতেছেন। ১২ বছর ধরিয়া তিনি যেখানে রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনা করিয়াছেন, সেখানেই যেন অবিলম্বে তাঁদের দুইজনের মৃতদেহ দাহ কর হয়।

ভোর রাজি ৪টার সময় দলিলগুলি প্রস্তুত এবং স্বাক্ষরিত হইল। প্রত্যেকেটি দলিলের শিরোনামটি করিয়া কপি প্রস্তুত হইল। কারণ, এগুলি জার্মানীর নিকট এত মূল্যবান ছিল যে, ভবিষ্যৎ বংশধরগণ যেন এগুলি থেকে বঞ্চিত না হয়। দলিলের সাক্ষী রহিলেন গোয়েবেলস, বোরম্যান, ক্রেবস এবং বার্গডোরফ।

দলিল স্বাক্ষরের পর হিটলার বিশ্রাম করিতে গেলেন। (৫)

কিন্তু বোরম্যান ও গোয়েবেলসের বিশ্রামের অবকাশ ছিল না। কারণ, বোরম্যান অত্যন্ত ক্ষমতাশালী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোক ছিলেন। তিনি এই সুযোগে তাঁর মতলব হাসিল করিতে চাহিলেন। আর গোয়েবেলস হিটলারের প্রতি এত অমুরক্ত ছিলেন যে, ফুরারের যুতুর পর তিনি আর বাঁচিয়া থাকিতে চাহিলেন না। সুতরাং দুইজনে দুই ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিলেন।

বোরম্যান বার্সেলুগ্যাডেনে আগেই নির্দেশ পাঠাইয়া গোয়েরিং ও তাঁর দলবলকে এস এস বাহিনীর দ্বারা গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন। এক্ষণে আর একটি রেডিও-বার্তা পাঠাইয়া তিনি এস এস সদর দপ্তরকে হুকুম দিলেন “২৩শে এপ্রিলের বিশ্বাসঘাতক-দিগকে”—অর্থাৎ গোয়েরিং এবং তাঁর বিমানবাহিনীর স্ট্যাককে ধ্বংস করার জন্ত।

কিন্তু সদর দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি বোরম্যানের এই ধরনের কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা

প্রয়োগের অধিকার আছে বলিয়া স্বীকার করিলেন না। সুতরাং গোয়েরিং ঘাতকের হাত থেকে বাঁচিয়া গেলেন এবং বোরখ্যানের মতলব ফাঁসিয়া গেল।

অপরদিকে গোয়েবেলস এবং তাঁর পত্নী আগেই স্থির করিয়াছিলেন যে, হিটলাঃ শূন্য জার্মানীতে তাঁরা বাঁচিয়া থাকিতে চাহেন না। সুতরাং হিটলারের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি ফুরারের রাজনৈতিক উইলের সঙ্গে একটি নিজস্ব পরিশিষ্ট জুড়িয়া দিলেন এবং তাতে ঘোষণা করিলেন যে, জীবনে তিনি কোন দিন ফুরারের একটি আদেশও অমান্য করেন নাই। এবাং তিনি ফুরারের শেষ আদেশ অমান্য করিতে কিছু বাধ্য হইলেন। কেননা, ফুরারের মৃত্যুর পর তাঁর এবং তাঁর পবিত্রতার আর বাঁচিয়া থাকার কোন অর্থ হয় না। সুতরাং তাঁরাও বার্লিনের ভূগর্ভে থাকিয়া মৃত্যুবরণ করিবেন। ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় ডঃ গোয়েবেলস তাঁর এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দিলেন।...

২০শে এপ্রিল বেলা ৮টার সময় তিন জন বিশেষ দূত মারকত রুগ লাইন ভেদ করিয়া হিটলারের এই মূল্যবান দলিলগুলি কিছু মার্শাল শোয়েরনার এবং গ্রাণ্ড এ্যাডমিরাল ডোয়েনিংসের নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইল। দুপুরবেলা এই তিন জন বিশেষ দূত ভয়ঙ্কর বিপদের খুঁকি মাথায় নিয়া তাঁদের গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা হইয়া গেলেন। বলাবাহুল্য যে, সোভিয়েত বেটনী ভেদ করিয়া তাঁদের এই দুর্গম যাত্রা অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচায়ক ছিল।

হিটলার শেষ মুহূর্তে ২০শে এপ্রিল রাতে সামরিক হাইকমান্ডের প্রধান কিছু মার্শাল কাইটেলের নিকট একটি পত্র পাঠাইবার সঙ্কল্প করিলেন। তখন সম্মিলিত জেনারেল স্টাকের সদর দপ্তর ছিল Schleswig-Holstein বা শেলসভিগ হলষ্টেইন প্রদেশের প্লোয়েন (ploen) শহরে। হিটলারের নির্দেশে কর্নেল কন বিলো (Below) কাইটেলের দপ্তরে এই চিঠি ডেলিভারি দেওয়ার জন্য বার্লিনের সেই বিপদগ্রস্ত অবস্থার মধ্যেও রওনা হইয়া গেলেন। এই শেষ চিঠিতেও হিটলার যথারীতি বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ করিলেন। সেনাপতি ও পদস্থ ব্যক্তিদের নিন্দা করিলেন, কিছু সাধারণ জার্মান সৈন্য ও জনগণের অপরিমিত ত্যাগ স্বীকারের উচ্চ প্রশংসা করিলেন। চিঠির উপসংহারে তিনি তাঁর 'মেইন ক্যাম্পফের' (আত্মজীবনী) বর্ণিত জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পুনরাবৃত্তি করিয়া লিখিলেন :

“এই মুহূর্তে জার্মান জনগণ যে অদ্ভুত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, তাতে আমি বিশ্বাস করি না যে, এই ত্যাগ স্বীকার বুঝা গিয়াছে। বরং এখনও আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত জার্মান জনগণের জন্য পূর্বদিকে ভূমি দখল করা।”—(৬)

অর্থাৎ হিটলার তাঁর জীবনের সর্বাত্মক সর্বনাশের মুখে দাঁড়াইয়াও পবিত্র গ্রাস এবং সোভিয়েতের প্রতি বিবেক ভুলিতে পারিলেন না।

\*

\*

\*

কাইটেলের উদ্দেশ্যে লেখা হিটলারের শেষ চিঠি নিয়া কর্নেল কন বিলো যখন বার্লিনের বাসার থেকে রওনা হইয়া গেলেন, হিটলার তার আগেই জীবনের অন্তিম

মুহূর্তের জন্ত তৈরী হইতেছিলেন। কিন্তু সেদিন ২২শে এপ্রিল অপরাহ্নে হিটলারের নিকট আর একটি ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ পৌঁছিল। তাঁর এতদিনের সহযোগী ও মিত্র এবং ইটালীর প্রাক্তন ক্যাসিষ্ট ডিক্টেটর বেনিটো মুসোলিনী তাঁর উপপত্নী ক্লারা পেতাসিসসহ উত্তর ইটালীর পার্টিজান যোদ্ধাদের হাতে ধরা পড়িয়া নিহত হইয়াছেন। (পূর্ববর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। হিটলার সম্ভবতঃ মুসোলিনীর নিধন হওয়ার বিস্তৃত সংবাদ জানিতেন না। কিন্তু খতটুকু জানিলেন, ততটুকুই তাঁর আত্মনাশের ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। অপরাহ্নে তিনি তাঁর প্রিয় আ. শেসিয়ান কুকুর ত্রিভুকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিলেন। অবশ্য তিনি নিজ হাতে এই কাজ করেন নাই। তাঁর এক সার্জেনকে দিয়া বিষপ্রয়োগ করিয়াছিলেন। বাস্কারের অস্ত্র দুইটি কুকুরকেও গুলি করিয়া মারা হইল।

তারপর হিটলার তাঁর দুই মহিলা সেক্রেটারিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং জরুরী অবস্থায় ব্যবহারের জন্ত তাঁদের দুইজনকে দুটি বিষের বড়ি দিলেন। অবশ্য ফুরার বিষণ্ণ চিত্তে সম্ভব্য করিলেন যে, বিদায়লয়ে তিনি এর চেয়ে কোন ভালো উপহার দিতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখিত। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁদেরকে এই বলিয়া দণ্ডবাদ দিলেন যে, তাঁর জেনারেলদের চেয়ে তাঁরা অনেক বেশি বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়াছেন।

ক্রমেই হিটলারের জীবনের শেষ সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। তিনি তাঁর সেক্রেটারি গার্ট্রুড জঙ্কে তাঁর অবশিষ্ট দলিলপত্র পোড়াইয়া কেলিবার হুকুম দিলেন এবং সেই সঙ্গে এই নির্দেশ দিলেন যে, পরবর্তী আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত বাস্কারের কেউ যেন ঘুমাইতে না যান। স্বভাবতঃই সকলে ভাবিলেন যে, এবার তিনি শেষ বিদায় নিবেন, কিন্তু ৩০শে এপ্রিল রাত্রি আড়াইটার আগে তেমন কিছু ঘটিল না। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলিয়াছেন যে, ফুরার ঐ সময় তাঁর প্রাইভেট কক্ষ থেকে সাধারণ ভোজনাগারের দিকে গেলেন। সেখানে তখন জনা কুড়ি লোক, যাদের অধিকাংশই ছিলেন হিটলারের পার্শ্চর্য ও মহিলা, তাদের প্রত্যেকেই সঙ্গে হিটলার করমর্দন করিলেন এবং অস্পষ্ট স্বরে কিছু বলিলেন। তাঁর চোখ তখন বাষ্পার্ত ছিল। ফ্রাউ জঙ্কের মতে ‘হিটলারের চোখ তখন বাস্কারের প্রাচীর ভেদ করিয়া বহুদূরে তাকাইয়াছিল’। এরপর হিটলার পুনরায় তাঁর কক্ষে চলিয়া গেলেন।

তখন আচম্বিতে এক তাক্ষব দৃষ্টের অবতারণা হইল। বাস্কারের পাতালপুরীর ক্যান্টিনে বাকী লোকগুলি জড়ো হইয়া উদ্ধাম নৃত্য জুড়িয়া দিল। তারা যেন মরীয়া হইয়া উঠিল, কেননা যে কোন মুহূর্তে তারা রক্তদের হাতে পড়িয়া খুন হইতে পারে। এদিকে হিটলারের বহুমুখী শাসনও আর নাই। সুতরাং তারা যা খুশী তাই করিতে পারে। এক সময় সেই উদ্ধাম উল্লাস এত বাড়িয়া উঠিল যে, ফুরারের কক্ষ থেকে সেই উল্লাস কমাইবার নির্দেশ আসিল। কিন্তু সেই নির্দেশ অগ্রাহ্য হইল এবং সারারাত্রি ধরিয়া তারা নাচিতে লাগিল।—(৭)

এদিকে বার্লিনেরও মৃত্যু ঘনাইয়া আসিল। কারণ, পরদিন রক্ত সৈন্যরা চ্যাকেলারির মাত্র কয়েক মহল্লা দূরে আসিয়া পৌঁছিল। কিন্তু এই অবস্থায়ও কিছু কিছু

সেনাপতি বাকারে আসিয়া সামরিক রিপোর্ট দিলেন—যদিও রিপোর্ট দেওয়ার কিছুই ছিল না। কারণ, বার্লিন রক্ষার আর কোন উপায়ও ছিল না। হিটলার নির্বিকার চিত্তে এই বিপর্যয়কর অবস্থার কথা শুনিলেন এবং অন্তিম লগ্নের জন্য প্রস্তুত হইলেন। বেলা প্রায় ২টার সময় তিনি তাঁর লাঞ্চ খাইলেন। কিন্তু তাঁর সন্ত বিবাহিতা ইভার কোন ক্ষুধা ছিল না। সুতরাং হিটলার যথারীতি তাঁর দুই সেক্রেটারি ও পাচিকার সঙ্গে তাঁর জীবনের শেষ আহার গ্রহণ করিলেন। কোন কথাবার্তা তিনি বলিলেন না।

বেলা আড়াইটা নাগাদ হিটলারের এস এস - এ্যাডজুট্যান্ট চ্যান্সেলারির গ্যারেজের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ও হিটলারের ব্যক্তিগত সোকার এরিক কেম্পাকে নির্দেশ পাঠাইলেন চ্যান্সেলারির বাগানে ২০০ লিটার পেট্রোল পাঠাইবার জন্য। এরিক কেম্পকা প্রতিবাদ করিয়া বলিলে—এই নিষাক্ত সময়ে এত পেট্রোল পাওয়া যাইবে না। কিন্তু হুসুম আসিল যেভাবেই হোক যোগাড় করিতেই হইবে। তখন ১৮০ লিটার পেট্রোল সংগৃহীত হইল এবং বাকারের জরুরী নির্গমন পথে এই পেট্রোল রাখা হইল। যখন হিটলারের চিত্তাঙ্গির আয়োজন করা হইতেছিল, তখন তিনি তাঁর শেষ আহার গ্রহণ করিয়া ইভা ব্রাউনকে ডাকিয়া আনিলেন এবং তাঁর ঘনিষ্ঠতম পার্শ্বচরিত্রের কাছ থেকে শেষ বিদায় দিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ডঃ গোয়েবেলস, জেনারেল ফ্রেবস্ এবং বার্গডক, আর সেক্রেটারিগণ ও পাচিক। কিন্তু সুনন্দরী ও ব্যক্তিত্বশালিনী মহিলা শ্রীমতী গোয়েবেলস সেই সময় উপস্থিত ছিলেন না। তিনিও ইভার মত স্বামীর সঙ্গে একত্রে মৃত্যু বরণের জন্য কৃতসঙ্কল্প ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর ৬টি নিষ্পাপ শিশু সন্তানকেও সেই সঙ্গে হত্যা করিতে হইবে, এই চিন্তায় তিনি বিচলিত ছিলেন। গত ৬ দিন যাবৎ তাঁর এই শিশু সন্তানদের বাকারের পাতাল পুরীতে আনন্দে খেলা করিতেছিল। অবোধ শিশুরা জানিতে পারিল না তাদের অদৃষ্টে কি পরিণতি অপেক্ষা করিতেছে। কয়েকদিন আগে তিনি ক্রাউলিন হান্না রিংসের কাছে বলিয়াছিলেন—“হান্না, যদি আমি সন্তানদের জন্য দুর্বলতার ভেদে পড়ি, তবে, তুমি আমাকে সেই চরম মুহূর্তে সাহায্য করো। তারা তৃতীয় রাইখের এবং ফুরারের। সুতরাং তারাই যদি না থাকে, তবে, আমার সন্তানদেরও আরও বেঁচে থাকার দরকার নাই।”

বিদেশ গোয়েবেলস তাঁর একলা ঘরে নিজে ‘সামলাইবার জন্য আশ্রয় চেষ্টা করিতেছিলেন।

কিন্তু হিটলার ও ইভার এই সমস্ত সমস্তা ছিল না। তাদের একমাত্র কাজ ছিল নিজেদের জীবন নাশ। সুতরাং সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়া তারা নিজেদের ঘরে চলিয়া গেলেন। কক্ষের বাইরে যাতায়াতের পথে ছিলেন ডঃ গোয়েবেলস, ব্যারম্যান এবং আরও কয়েকজন। কিছুক্ষণ পর তারা একটি রিভলভারের গুলীর আওয়াজ শুনিলেন এবং আর একটি গুলীর শব্দের জন্য অপেক্ষা করিলেন। কিন্তু সেই শব্দ আর পাওয়া গেল না। সুতরাং ধানিকটা সময় পর তারা ফুরারের আবাসকক্ষে পবেশ করিলেন। তারা দেখিলেন সোকার উপর ফুরারের রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়িয়া আছে

তিনি তাঁর নিজের মুখে গুলী করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। তাঁর পাশেই ইভার মৃতদেহ পড়িয়া আছে। আর মেঝের উপরে দুইটি রিভলভার পড়িয়া আছে। ইণ্ডিয়ার রিভলভার ব্যবহার করেন নাই। তিনি বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছেন।

তখন সময় অপরাহ্ন ৩-৩০ মিনিট সোমবার, ৩শে এপ্রিল ১৯৪৫। গ্রাডলফ হিটলারের ৫৬ তম জন্ম দিবসের ১০ দিন পূর্বে এবং তৃতীয় রাইখের ভাগ্যবিধাতা হওয়ার ১২ বছর ৩ মাস পূর্বে।

(পরবর্তীকালে রাশিয়ানরা কিন্তু প্রচার করিয়াছিলেন যে, হিটলার নিজ হাতে গুলী করিয়া 'বীরের মত' আত্মহত্যা করেন নাই। এই কাহিনী মিথ্যা। তিনিও বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। অবশ্য এই বিতর্কের কোন চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নাই।)

বাকারে হিটলারের কর্মচারীরা চ্যান্সেলারির বাগানে হিটলার ও ইভার মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া গেলেন। হিটলারের মুখ চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। একান্ত একটি কখনো তাঁর মৃতদেহ চাকিয়া নেওয়া হইয়াছিল। চ্যান্সেলারির বাগানে তখন ক্রুসদের গোলা আসিয়া পড়িতেছিল এবং সেই গোলা বর্ষণের শব্দ ছাড়া এত বড় 'ঐতিহাসিক' মৃত্যুর জন্য আর কোন সাড়া শব্দ ছিল না। গোলাবর্ষণের এক ফাঁকে বিরতির সময় হিটলার ও ইভার দেহে পেট্রোল ঢালিয়া দিয়া আগুন ধরাইয়া দেওয়া হইল এবং সেই প্রজ্জ্বলিত শিখা উষ্ণে উঠিতে লাগিল। জরুরী প্রবেশ পথের আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া গোয়েলেস এবং বোরম্যান শবাহুগামীদের ভূমিকায় এ্যাটেনশনের ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং ডান হাত উষ্ণে তুলিয়া নাৎসী কায়দায় স্তানুইট বা অভিবাদন জানাইলেন।

তখনও লালকোজের গোলায় চ্যান্সেলারির বাগান বিধ্বস্ত হইতেছিল এবং হিটলার ও ইভার দেহ আগুনে পুড়িয়া ভস্মীভূত হইতেছিল।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলিয়াছেন যে, দৃশ্যটা বীভৎস ছিল!—(৮)

আর চার্লিস মন্তব্য করিয়াছেন যে, ক্রুস কামান গর্জন ক্রমশঃ প্রবল থেকে প্রবলতর হইয়া হিটলারের চিতাবহিকে এবং সেই সঙ্গে তৃতীয় রাইখের পরিণামকে ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিয়াছিল!—(৯)

(৮) ট্রেভর-রোপার—পৃষ্ঠা ২০৪

(৯) চার্লিস—কন্স্ট ৭৩, পৃঃ—৪৬৪

## নবম পর্ব

### সপ্তম অধ্যায়

#### লালকোজের দখলে বার্লিন

থাস বার্লিন নগরী দখলের যুদ্ধ মাত্র ৭ দিন স্থায়ী হইয়াছিল। ১৯৪৫ সালের ২৬শে এপ্রিল থেকে ২৭ মে-র মধ্যে বার্লিন নগরী লালকোজ কর্তৃক বেষ্টিত এবং জার্মান-বাহিনী ধ্বংস হইল। উত্তর, উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে মার্শাল জুকোভ, মার্শাল রোকোসোভস্কি এবং মার্শাল কোনেভ বিশাল সৈন্তবাহিনী (মোট সৈন্তসংখ্যা ২৫ লক্ষ) ও প্রভূত অস্ত্রসম্ভার (জার্মানীর তুলনায় কয়েক গুণ বেশী) নিয়ে জার্মানীকে তিন দিক দিয়া বেেষ্টন করিল এবং ২৬ এপ্রিল থেকে বার্লিনের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে যে বেেষ্টনী সৃষ্টি হইল নাৎসী বাহিনী কিছুতেই সেই বেেষ্টনী ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া আসিতে পারিল না এবং ২৭ মে-র মধ্যে তারা খতম হইয়া গেল। লালকোজ বার্লিন দখল করিয়া নিল।

কিন্তু এখানে পশ্চিমের মিত্রপক্ষের তরফ থেকে এই মর্মে একটা অভিযান উঠিয়াছিল যে, স্ট্যালিন বা রাশিয়া মিত্রপক্ষীয় হাইকমান্ডেব, সঙ্গে চাতুরী খেলিয়াছেন। কারণ, সোভিয়েত সুর্য্যীম কমান্ডার ইন-চীফ ১লা এপ্রিল ১৯৪৫, মিত্রপক্ষীয় হাই কমান্ডকে জানাইয়া ছিলেন যে, মে মাসের তৃতীয় অর্ধভাগের আগে তাঁরা বার্লিনের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিতে পারিবেন না—অবশ্য যদি ইতিমধ্যে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের পক্ষে ‘অল্প কোন অবস্থা’ দেখা না দেয়।

একথা সত্য যে, এত বড় অভিযান সংগঠিত করার জন্ত মে মাসের প্রথম অর্ধ-ভাগ কাটিয়া যাইত এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটিও অল্পরূপ পরিকল্পনা করিতেছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে পরিস্থিতি অল্পরূপ ধাংগ করিল। মিত্রপক্ষের তরফ থেকে চার্লিস বার্লিন দখলের জন্ত মতলব আটিলেন এবং গোড়া থেকেই তিনি এই কন্দিবাজী করিতেছিলেন। সুতরাং স্ট্যালিনকেও তাঁর আগেকার সিদ্ধান্ত পান্টাইতে হইল।

ব্যাপারট সংক্ষেপে এই : ইয়ান্টা সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, জার্মানীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের পর মিত্রপক্ষীয় তিন শক্তি—বৃটেন, আমেরিকা ও রাশিয়া জার্মানীতে তিনটি দখলীকৃত এলাকা স্থাপন করিবেন এবং একথা ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল যে, সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ জার্মানীর পূর্বাংশ অধিকার করিবেন। কিন্তু জার্মানীর পতনের মুখে চার্লিস বিগড়াইলেন। তাঁর চিরকালের কমিউনিষ্ট বিশ্বাস যেন মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। তাঁর ইতিহাস পুস্তকে (ষষ্ঠ খণ্ডে) তিনি লিখিয়াছেন যে, পূর্ব রণাঙ্গনের যুদ্ধে জার্মানীর সমরশক্তি ধ্বংস হইয়া যাওয়ার কলে “কমিউনিষ্ট রাশিয়া ও পশ্চিমের গণতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্কের মৌলিক পরিবর্তন ঘটয়া গিয়াছে।” সুতরাং পশ্চিমী শক্তিবর্গের উচিত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা। যথা—(১) সোভিয়েত রাশিয়া যুক্ত হুনিয়ার (ফ্রী ওয়ার্ল্ড) পক্ষে মারাত্মক বিপদরূপে দেখা দিয়াছে। (২) সোভিয়েতের আরও সম্মুখদিকে আগাইয়া যাওয়ার বিরুদ্ধে অবিলম্বেই একটি নতুন রণাঙ্গন খুলিতে হইবে এবং (৩) এই রণাঙ্গন ইউরোপের যত পূর্বাধিকে সম্ভব, ততদূরে প্রাতিষ্ঠা করিতে হইবে।”

বিষয় (৩)—৬

তখনও প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বাঁচিয়া ছিলেন। ১লা এপ্রিল, ১৯৪৫, চার্লস রুজভেল্টকে এই মর্মে এক তারবার্তা পাঠাইলেন “রুশরা নিঃসন্দেহে গোটা অস্ত্রাধা দখল করিয়া নিবে এবং ভিয়েনাতে প্রবেশ করিবে। এরপর যদি তারা বার্লিনও দখল করিয়া নেয়, তবে, ভবিষ্যতের পক্ষে ভয়ঙ্কর বিপত্তির সৃষ্টি হইবে। সুতরাং রাজনৈতিক দিক থেকে আমি মনে করি যে, জার্মানীর যত পূর্বে সম্ভব আমাদের আগাইয়া যাইতে হইবে এবং বার্লিনও আমাদের দখল করিয়া নিতে হইবে। সামরিক দিক থেকেও এটাই হইবে সার্বজনীন নীতি।”

কিন্তু চার্লিলের এই সমস্ত প্রস্তাব মার্কিন সরকারী মহল কিংবা পশ্চিম যুগান্তের মিত্রপক্ষের সুপ্রীম কমান্ডার আইজেনহাওয়ার গ্রহণ করিলেন না এবং তিনি লালকোঁজ ও সোভিয়েত রাশিয়ায় সঙ্গে সন্তাবের সম্পর্ক বজায় রাখিতে চাহিলেন। কারণ, সেটাই ছিল প্রেসিডেন্টের নীতি। অপর পক্ষে রুজভেল্টের প্রধান পরামর্শদাতা হ্যারি হপকিন্স মন্তব্য করিয়াছেন যে, ‘যদি সম্ভব হইত, তবে আমরা বার্লিন দখল করিয়া নিতাম এবং আমাদের সৈন্তবাহিনীও পক্ষে সেটা একটা বড় জয় হইত।’ (১)

চার্লিল তাঁর বইতে আরও লিখিলেন যে, তিনি লর্ড মণ্টগোমারীকে নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, দ্রুত জার্মান অস্ত্রশস্ত্র যেন সাবধানে রাখা হয়। কেন না, ইতালী ও ফ্রান্সের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়িতে হইতে পারে। অধিকন্তু কমিউনিষ্ট রাশিয়ার বিরুদ্ধে ‘মুক্ত দুনিয়ার’ পক্ষ থেকে নতুন অভিযানের জন্য জার্মানদের হাতে অস্ত্র তুলিয়া দিতেও হইতে পারে।

পার্টিকলার মনে রাখা দরকার, তখনও জার্মানী সরকারীভাবে আত্মসমর্পণ করে নাই। কিন্তু হিটলার-বিরোধী ক্যাবালিশনের অন্ততম অংশীদার সাম্রাজ্যবাদী ও কমিউনিষ্ট বিদ্রোহী চার্লিলের মনোভাব কিরূপ জব্ব্ব ছিল!

কিন্তু স্ট্যালিনের উপরে টেকা মারা চার্লিলের পক্ষেও সহজ ছিল না। তিনি ও তাঁর সহকর্মীগণ পূর্বাভাসেই এই সমস্ত অল্পমান করিয়াছিলেন এবং মিত্রপক্ষীয় প্রতিক্রিয়াশীল মহলের মতলব সম্পর্কেও সন্দেহ করিয়াছিলেন। সুতরাং বার্লিন সম্পর্কে তাঁদের মতলব ব্যর্থ করার জন্য সোভিয়েত হাইকমান্ড যে মাসের দ্বিতীয় অর্ধভাগের জন্য অপেক্ষা না করিয়া এপ্রিল মাসের মধ্যভাগেই বার্লিনের দিকে অভিযান করিতে বাধ্য হইলেন—যদিও তখন পর্যন্ত প্রস্তুতি সম্পূর্ণ ছিল না। (২)

\*

\*

\*

একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বার্লিন রক্ষার জন্য জার্মানরা মরিয়া হইয়া লড়াই করিয়াছিল এবং অপরিমেয় দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছিল। মার্শাল আইড্যান কোনেভ লিখিয়াছেন—বার্লিনের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের বাড়ীগুলি অবরোধ যুদ্ধের কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। পার্যদেশ রক্ষার জন্য ৪ মিটার পুরু দেওয়াল তৈরী হইয়াছিল, যেগুলি আবার ট্যাঙ্কমারা প্রতিবন্ধকে পরিণত হইয়াছিল। বিশেষ ভাবে

(১) রবার্ট ই শেরউড—পৃষ্ঠা ৮৮৪

(২) দি গ্রেট মার্চ অব লিবারেশন—(সে: জেনারেল টেলিগন) পৃষ্ঠা ২২৬



বার্লিনের মধ্যভাগে কংক্রীটের তৈরী অত্যন্ত শক্ত শেলটার বা আশ্রয় নির্মিত হইয়াছিল এবং বিশেষ ধরনের এমন সমস্ত বাসার তৈরী হইয়াছিল যেগুলিকে অনায়াসে বিমান, ট্যাঙ্ক ও পদাতিকদের আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাইত। প্রতিরক্ষার জন্ত বার্লিনের শহর সীমানার মধ্যে প্রায় ৪০০ বাসার নির্মিত হইয়াছিল এবং কোন কোন বাসার ৬ তলা পর্যন্ত উঁচু ছিল, এই সমস্ত প্রত্যেকটি বাসারে ৩০০ থেকে হাজার সৈন্য বাধা দিয়াছিল। (৩)

২৭ এপ্রিল বার্লিন শহরের কেন্দ্রস্থলে যুদ্ধ শুরু হইল এবং শত্রুসৈন্য পূর্ব থেকে পশ্চিমে ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে আর উত্তর থেকে দক্ষিণে ২ থেকে ৫ কিলোমিটারের সর্পির্ন এককালি জমির মধ্যে আটকা পড়িল। ২৮শে এপ্রিল যে সমস্ত আহত জার্মান সৈন্য ও অফিসার এবং হাজার হাজার স্ত্রীলোক ও শিশু প্রাণভয়ে শহরের ফ্রিডরিশ স্ট্রাসি রেলস্টেশনের ভূগর্ভে আশ্রয় নিয়াছিল হিটলারের আদেশে এস এস বাহিনী সেই পাতালপুরীর আশ্রয় জলগ্রাবনের দ্বারা ডুবাইয়া দিল! হিটলারের নৃশংসতার যে সীমা ছিল না, এটি তার অগ্রতম দৃষ্টান্ত :...

৩০শে এপ্রিল ভোরবেলা থেকে রাইখস্ট্যাগ দখলের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া এই হিংস্র যুদ্ধ অসুষ্ঠিত হইল। প্রত্যেকটি মেঝে ও প্রত্যেকটি কক্ষ প্রাণবাতী সংঘর্ষ হইল। জি কে জাগিটোভ, এ এক লিসিমেকো, ডি এন ম্যাকোভ এবং এস পি মিনি—কমিউনিষ্ট পার্টির এই কয়েকজন সদস্য এই আক্রমণে নেতৃত্ব দিলেন এবং সাব-মেসিনগান ও হাতবোমা হাতে নিষা তাঁরা শত্রুর ভিতর দিয়া পথ কাটিয়া ছাদে গিয়া উঠিলেন এবং লাল পতাকা উড়াইয়া দিলেন।

আর ১লা মে ভোরবেলা ৭৫৬ তম রেজিমেন্টের দুই জন স্কাউট এস এ ইয়েগোরোভ এবং এম ডি কাস্টারিয়া সোভিয়েত রণ-পতাকা (battle banner) উড্ডীন করিলেন রাইখস্ট্যাগের সম্মুখভাগের উপরিস্থিত ত্রিকোণ স্থানটিতে—রাইখস্ট্যাগ দখলের এই যুদ্ধের সময় আর একদল সোভিয়েত সৈন্য গিয়া পৌঁছিল ইম্পিরিয়েল চ্যান্সেলারিতে। এই চূড়ান্ত জয়ের পর বার্লিন দখলের যুদ্ধ শেষ হইল ২রা মে।

হিটলারের 'হাজার বছরের রাইখের' উপর সেই 'বর্বর বলশেভিকদের' লাল পতাকা উড্ডীন হইল, যাদেরকে সমূলে সংহার করার জন্ত হিটলার ও তাঁর নাৎসী সৈন্যবাহিনী চার বছর ধরিয়া মাহুকের ইতিহাসের হিংস্রতম যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। সেই রাইখস্ট্যাগ, সেই চ্যান্সেলারি একং সেই বার্লিন নগরীর সুবিখ্যাত রাজপথ উন্টের-ডেন-লিন্ডেন ও টিয়ারগার্টেনসহ প্রায় ১০০ বর্গমাইল এলাকা ধরিয়া আশুন ও ধ্বংস পরিব্যাপ্ত হইল—যে বার্লিন নগরীকে হিটলারের 'অজের বাহিনী' পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। অবশ্য তার আগেই হিটলার চরম পরাজয় ও চূড়ান্ত অসম্মানের মধ্যে গোটা জার্মান জাতিকে ফেলিয়া রাখিয়া ভূগর্ভের নিরাপদ আশ্রয়ে প্রণয়িনীসহ আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। এর চেয়ে ইতিহাসের প্রচণ্ড বিদ্রূপ আর কি হইতে পারে ?

যদিও বার্লিনের যুদ্ধ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অস্ত্রাস্ত্র ভয়াবহ রণক্ষেত্রের মতই ইতিহাসে প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে, তথাপি বার্লিন বিজয়ী বীর মার্শাল জুকোভ স্বয়ং কিন্তু এই যুদ্ধকে লেনিনগ্রাদ, মস্কো বা স্ট্যালিনগ্রাদের ঐতিহাসিক যুদ্ধের অম্লরূপ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। এই প্রত্যেকটি রণক্ষেত্রেই জুকোভ অসাধারণ রণদক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন এবং অনন্ত সাধারণ খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন। তবে ওডের নদী তীর থেকে বাত্রাবেলা এই ধরনের যুদ্ধকে তিনি এক নতুন টেকনিক বর্ণনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ক্রমাগত ৬ রাত্রি তিনি ঘুমাইতে পাবেন নাই। (৪)

কিন্তু জুকোভের এই মতামত সত্ত্বেও মহাযুদ্ধের সোভিয়েত সরকারী ইতিহাসে বার্লিনের যুদ্ধকে অত্যন্ত গুরুতর ও জটিল বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সরকারী ইতিহাসের মতে এই যুদ্ধে উভয় পক্ষে মিলিয়া ৫৫ লক্ষ লোক জড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ৫০ হাজার কামান ও মর্টার, ৮০০ ট্যাঙ্ক ও মোবাইল গান্ এবং ২ হাজারের বেশী বিমান নিয়োগ করা হইয়াছিল। বার্লিনের এই যুদ্ধে লালকোঙ্ক ৭০টি জার্মান পদাতিক ডিভিসন ১২ টি বর্মাবৃত এবং ১১ টি মোটরায়িত ডিভিসন ধ্বংস করিয়াছিল। ৮ই মে জার্মানীর সরকারীভাবে আত্মসমর্পণের আগে ৪ লক্ষ ৮০ হাজার জার্মান সৈন্য, ১৫০০ ট্যাঙ্ক, ৪০০০ এর বেশী বিমান এবং ১০ হাজার কামান রুশদের হাতে ধরা পড়িয়াছিল। বার্লিনের বিরুদ্ধে এই রণক্রিয়ায় কেবল মার্শাল জুকোভের অধীন ১ নং বেফোরশিয়ান ফ্রন্টই যোগ দেয় নাই, ১ নং উক্রাইনিয়ান এবং ২ নং বেলোরুশিয়ান ফ্রন্টও যোগ দিয়াছিল। কিন্তু এই রণক্রিয়ার অঙ্গসম্পাদে রুশ বাহিনী জার্মানদের তুলনায় কয়েক গুণ বেশী শক্তিশালী ছিল। তথাপি জার্মানরা নান্দসী প্রোপাগান্ডার প্ররোচনায় পড়িয়া মরিয়া হইয়া একেবারে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালাইয়াছিল। ১৬ এপ্রিল থেকে ৮ই মে মধ্য জার্মান রুশ বাহিনীর প্রচণ্ড ক্ষতি করিয়াছিল। বার্লিন যুদ্ধে রুশ পক্ষে হতাহত ও নিৰ্বোজ মিলিয়া ৩ লক্ষ ৫ হাজার সৈন্য নষ্ট হইয়াছিল—ওডের ও নাইসী নদীর ব্যাং ভেদ করিতে গিয়া এবং বার্লিন শহরের অভ্যন্তরের যুদ্ধে এই সমস্ত ক্ষতি সাধিত হইয়াছিল। ২ হাজার ট্যাঙ্ক, ১২ শত কামান ও ৫২৭ টি বিমান নষ্ট হইয়াছিল। একমাত্র বার্লিনের যুদ্ধে যখন রাশিয়ার এই ক্ষতি হইয়াছিল, তখন সারা ১৯৫৫ সালে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের ক্ষতি হইয়াছিল মাত্র ২ লক্ষ ৬০ হাজার সৈন্য। একমাত্র রাইখষ্ট্যাগ দখলের যুদ্ধেই রুশ পক্ষের কয়েক হাজার না হইলেও কয়েক শত সৈন্য নিহত হইয়াছিল।

মার্শাল জুকোভের মতে বার্লিনের রণক্রিয়ায় ৫ লক্ষ জার্মান সৈন্য নিযুক্ত হইয়াছিল। এর মধ্যে ৩ লক্ষ সৈন্য বন্দী হইয়াছিল। ১ লক্ষ ৫০ হাজার নিহত হইয়াছিল এবং বাকী সৈন্যরা পালাইয়া গিয়াছিল। ওডের নদীর যুদ্ধেই জার্মানরা তাদের সমস্ত বিমান বিধ্বংসী কামান নিয়ে গ করিয়া ফেলিয়াছিল। সুতরাং বার্লিনকে বিমান আক্রমণ থেকে রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা জার্মানদের ছিল না।—(৫)

(৪) Alexander Werth— P. 890

(৫) ঐ পুস্তক, ঐ পৃষ্ঠা

সম্রাট হিটলারের আয়তায় পর তৃতীয় রাইখের পরিচালনার কিছু কিছু দায়িত্ব মার্টিন বোবম্যান ও গোয়ে লসের বাড়ে আসিয়া পড়িল। ফুরার তাঁর শেষ 'ইচ্ছাপত্র' গ্রাণ্ড এ্যাডমিরাল ডোয়েনিংসকে তাঁর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই নির্দেশপত্র তখনও বিশেষ বার্তাবাহী মারকৎ ডোয়েনিংসের নিকট পৌছানো সম্ভব ছিল না। বোবম্যান নিজেই ছিলেন ক্ষমতালোভী। সুতরাং চূড়ান্ত ক্ষমতা ডোয়েনিংসের হাতে তুলিয়া দিতে তিনি তখনও কিছুটা ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। তথাপি কোন উপায় ছিল না। সুতরাং শেষ পর্যন্ত রেডিওযোগে নিম্নলিখিত বার্তা তিনি পাঠাইলেন :

"গ্রাণ্ড এ্যাডমিরাল ডোয়েনিংস। প্রাক্তন রাইখ মার্শাল গোয়েনিংয়ের বদলে ফুরার আপনাকে তাঁর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়াছেন। লিখিত আদেশ নিয়া বার্তাবাহী আপনার কাছে পৌঁছবার পথে। আপনি অবিলম্বে অবস্থা অনুযায়ী যে কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।"

লক্ষ্য করা যাইবে, এই বার্তার মধ্যে কোথাও হিটলারের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করা হইল না। ডোয়েনিংস তখন ছিলেন উত্তর দিকের সমস্ত জার্মান বাহিনীর অধিনায়কত্বে এবং তিনি কোনদিন ভাবেন নাই যে, তিনি হিটলারের উত্তরাধিকারী হইবেন। .স সময় তার সদর দপ্তর ছিল শ্লেজবিগের (Schleswig) শ্লোয়েন শহরে এবং তাঁর দায়িত্ব ছিল যে, হিমলার হইবেন হিটলারের উত্তরাধিকারী। সুতরাং বোরম্যান প্রেরিত বেডিওবার্তা পড়িয়া তিনি কিছুটা হতবুদ্ধি হইলেন। কিন্তু জীবনে তিনি কোন দিন হিটলারের অবাধ্য হন নাই। সুতরাং এ্যাডমিরাল হিটলার তখনও বাঁচিয়া আছেন, এই বিশ্বাসে তিনি ফুরারের উদ্দেশ্যেই এই মর্মে এক বার্তা পাঠাইলেন যে, তাঁর প্রতি তিনি শর্তহীন আনুগত্য প্রকাশ করিতেছেন এবং যদি ভাগ্যবশে তিনি ফুরারের উত্তরাধিকারী রূপে রাইখ পরিচালনা করিয়া পাইয়া থাকেন, তবে, তিনি যথাসম্ভব বার্লিন থেকে তাঁকে উদ্ধারের এবং জার্মান জনগণের এই অভূতপূর্ব বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ চালাইয়া যাইবেন।...

সেই রাতে গোয়েবেলস ও বোরম্যানের মাধ্যম আর একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল। তাঁরা বার্লিনে রুশ পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির আলোচনা চালাইবার কথা চিন্তা করিলেন। জেনারেল ফ্রেবস, যিনি আর্মি জেনারেল টাকের প্রধান ছিলেন, তিনি একদা মস্কোতে জার্মান দূতাবাসে ছিলেন এবং সোভিয়েত নেতাদের পরিচিত ছিলেন। তিনি রুশ ভাষাও জানিতেন। সুতরাং তাঁরা ফ্রেবসকে রুশ শিবিরে পাঠাইয়া যুদ্ধবিরতির আলোচনা যেমন চালাইতে চাহিলেন, তেমনি ডোয়েনিংসের গবর্নমেন্টে যোগদানের জন্ত যাতায়াতের নিরাপত্তার প্রস্তাবও করিলেন। যদি রুশ পক্ষ এটা মানিয়া লয়, তবে বিনিময়ে তাঁরা বার্লিনশহরকে রুশদের হাতে সমর্পণ করিবেন।

সুতরাং ৩০শে এপ্রিল মধ্যরাত্রির পর ( ইংরাজী মতে ১লা মে ) জেনারেল ফ্রেবস সোভিয়েত সেনাপতি জেনারেল চুইকোভের দপ্তরে গেলেন একজন অফিসারসহ সাদা পতাকা উড়াইয়া এবং অবিচলিত কণ্ঠে যেভাবে কথাবার্তা শুরু করিলেন, নিঃসন্দেহে তা অশ্রুজনক :

“ক্রেবস্—আজ ১লা মে, আমাদের দু’দেশের পক্ষেই মহাছুটির দিন !

( ইউরোপে ১লা মে তারিখটি আন্তর্জাতিক শ্রমদিবসরূপে পালিত হইয়া থাকে । )

চুইকোভ—আমাদের দেশে অবশ্যই আজ মহাছুটির দিন। তবে, আপনাদের ওখানে অবস্থা কি রকম, বলা বড় কঠিন।” (৬)

যে জার্মান সৈন্ত ও সেনাপতিরা রাশিয়ার অভ্যন্তরে অত্যাচারের চূড়ান্ত করিয়াছে, তাদের পক্ষ থেকে রুশ পক্ষের সেনাপতি চুইকোভের সঙ্গে এভাবে যুদ্ধবিবর্তির কথা-বার্তা আরম্ভ করা একটা অদ্ভুত ব্যাপার ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া আলোচনা কর সত্ত্বেও ক্রেবস্ স্বেীধা করিতে পারিলেন না কারণ, সোভিয়েত পক্ষ ফুরারের বাক্য ও সমগ্র বার্লিনের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ দাবি করিলেন ...

ক্রেবসের প্রত্যাবর্তনে দেবী দেখিয়া বোরম্যান ও গোয়েবেলস অত্যন্ত অস্থির বোধ করিতেছিলেন। বিশেষতঃ গোয়েবেলসের তখন সপরিবারে আত্মহত্যার সময় নিকটবর্তী হইতেছিল। সুতরাং বার্লিনের অবরুদ্ধ বাক্য থেকে গোয়েবেলস্ অপবার ৩১৫ মিনিটের ( ১লা মে ) সময় শেষ রেডিও বার্তা এ্যাডমিরাল ডোয়েনৎসের নিকট পাঠাইলেন এবং তাঁকে “খুব গোপনে” জানাইয়া দিলেন যে, “ফুরার গভকল্য অপরাহ্ন সাড়ে তিনটার মারা গিয়াছেন এবং ১০শে এপ্রিলের টেটামেটের দ্বারা আপনাকে রাইখের প্রেসিডেন্টে পদে নিয়োগ করিয়া গিয়াছেন। আপনি আপনার ইচ্ছানুযায়ী সমগ্র সৈন্তবাহিনী ও সংবাদপত্রের নিকট এই ঘোষণা প্রকাশ করিবেন।”

এই রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের পর গোয়েবেলস দম্পতী ১লা মে সন্ধ্যায় আত্মহত্যার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। ফুরারের কুকুরগুলিকে যে ডাক্তার বিষযোগে হত্যা করিয়া-ছিলেন, সেই চিকিৎসকই গোয়েবেলসের ৬টি নিরপরাধ শিশু সন্তানকে ( বয়স ১২, ১১, ৯, ৭, ৫ এবং ৩ ) বিষপ্রয়োগে নিধন করিলেন। সেই শিশুরা তখন নিশ্চিন্ত মনে বাক্যের প্রাঙ্গণে খেলা করিতেছিল! তারপর গোয়েবেলস্ দম্পতি বাক্যের বাকী লোকজনদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন এবং পূর্ব ব্যবস্থানুযায়ী গোয়েবেলসের নির্দেশক্রমে বাক্যের বাগানে এস এস বাহিনীর একজন সাক্ষী পিছন দিক থেকে মাথায় গুলী করিয়া গোয়েবেলস্ দম্পতিকে হত্যা করিলেন। অতঃপর যুদ্ধদেহ গুলির উপর পেট্রোল ঢালিয়া দিয়া এগুলিকে দাহ করার চেষ্টা করা হইল। কিন্তু দাহ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই রুশ সৈন্তেরা বাক্য দখল করিয়া নিল এবং হিটলারের ভুবনবিখ্যাত প্রচারমন্ত্রী গোয়েবেলসের ও তাঁর পরিবারের দ্বন্দ্ব দেহাবশেষ তাদের হাতে ধরা পড়িল, যাদের সাবাড় করা সম্পর্কে গোয়েবেলস্ চার বছর ধরিয়া এত ক্রুর প্রোপাগান্ডা চালাইয়াছিলেন।.....

১লা মে রাত্রিবেলা ফুরারের বাক্যে যখন আগুন ধরিয়া গেল, তখন বাকী ৫৬ শত ( অধিকাংশই এস এস বাহিনীর ) লোক সেই ভূগর্ভ থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করিল। মার্টিন বোরম্যান তখন ‘চাঁচা আপন বাঁচা’ নীতি অনুসারে বাক্য থেকে দ্রুত হইয়া পলাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু হিটলারের ড্রাইভার কেম্পকার বিবৃতি অনুসারে দেখা যায় যে, বোরম্যান রুশদের নিকটস্থ সোভায় গুলতর আহত

হইয়া রাস্তার একটি সেতুর নীচে মরিয়া পড়িয়াছিলেন। (কিন্তু যুদ্ধের পর বোরম্যান সম্পর্কে দীর্ঘকাল এই ধাবণা প্রচলিত ছিল যে, তিনি পালাইয়া দক্ষিণ আমেরিকায় চলিয়া গিয়াছিলেন।)

এদিকে জেনারেল ফ্রেসসও চুইকোভের সঙ্গে আলোচনায় ব্যর্থ হইয়া অপরাধে বাক্যে কিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং তিনি ও জেনারেল বার্গডোক' (হিটলারের পার্শ্বে) পালাইবার চেষ্টা না করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।.....

এভাবে হিটলারী জার্মানীর নেতৃত্ব হত্যায়, আত্মহত্যায়, অপমৃত্যুতে, পলায়নে, পরাজয়ে এবং হতাশায় ও বিষয়ে ছত্রভঙ্গ হইল এবং ভাঙ্গিয়া পড়িল কিন্তু তখনও সরকারীভাবে মিত্রপক্ষের নিকট জার্মানীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ বাকী ছিল।

\*

\*

\*

যুদ্ধ, চিরকালই নিষ্ঠুর, নির্ধম এবং বর্বর। তবু, যুদ্ধ পরিচালনার নেতৃত্বের মধ্যে যদি কিছুটা আদর্শ, নীতিবোধ এবং জ্ঞায়ত্ব থাকে, তবে বিজিত দেশের উপর অত্যাচার ও অনাচারের মাত্রা অনেকটা কম হইয়া থাকে। কিন্তু ক্যাসিট যুদ্ধযাত্রার নীতি ও নিয়মকানুনের বালাই মাত্র ছিল না। ফলে হিটলারী ক্যাসিট পোলাণ্ডে, সোভিয়েত রাশিয়ার এবং ইহুদীদের বিরুদ্ধে (অশান্ত দেশেও বটে) যে অমানুষিক এবং জঘন্ততম অপরাধ ও অত্যাচার করিয়াছিল ইতিহাসে তার কোন তুলনা ছিল না। লালকৌজকে এই নিদারুণ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া আসিতে হইয়াছিল। সূত্রায় ১৯৪৫ সালে পতনোন্মুখ জার্মান ভূমিতে লাল কৌজেব প্রবেশের আগে সোভিয়েত নেতৃত্বকে এই দিকটা বিশেষভাবে চিন্তা করিতে হইয়াছিল। সে ভিত্তিতে বাহিনী, অস্ত্রতথ্যাত্মক এবং প্রতিভাবান সেনাপতি মার্সাল রকোসোভস্কি লিখিয়াছেন যে, তাঁর ফ্রন্টের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মিলিটারি কাউন্সিল উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, সোভিয়েত রাশিয়ার অধিকৃত এলাকাগুলিতে নাৎসী সৈন্যদের ভয়বহ অত্যাচারের জন্য লালকৌজের সৈন্যেরা স্বভাবতঃই ক্রুদ্ধ এবং প্রতিশোধ গ্রহণ উন্মুখ ছিল। কিন্তু এই ক্ষেত্রও যুগ্ম বাতে সমগ্র জার্মান জাতির বিরুদ্ধে অন্ধ বিবেক ও প্রতিশোধে পরিণত না হই, সেদিকে নজর দিতে হইবে। সূত্রায় আমাদের প্রচার করিতে হইল যে, 'আমাদের যুদ্ধ হিটলারের আর্মির বিরুদ্ধে, জার্মানীর সমস্ত অ-সামরিক জনগণের বিরুদ্ধে নয়। এবং যখন আমরা সৈন্যেরা জার্মানীর সমস্ত আভ্যন্তরীণ করিল, তখন ফ্রন্টের মিলিটারি কাউন্সিল সৈন্য ও সেনাপতিদের উদ্দেশ্যে এক অভিনন্দন বাণীতে এই নির্দেশনামা জারী করিলেন যে, জার্মানীতেও আমরা যুক্তিকৌজ হিসাবে প্রবেশ করিতেছি। যে আর্মি জার্মানীতে আসিয়াছে জার্মান জনগণকে নাৎসী চক্রান্ত ও বিষহুট প্রোপাগান্ডা থেকে উদ্ধারের জন্য। সূত্রায় মিলিটারি কাউন্সিল সমস্ত সেনাপতি ও সৈন্যদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানাইতেছেন সোভিয়েত বাহিনীর উচ্চতম শৃঙ্খলা ও মর্যাদা রক্ষা করার জন্য।'(১)

রকোসোভোভিচ অতঃপর লিখিয়াছেন .যে, আমাদের সৈন্যদের নিকট এই ‘মুক্তি মিশনের’ (Mission of liberation) উদ্দেশ্য অনবরত প্রচার ও ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছিল এবং ‘আমি অবশ্যই স্বীকার করিব যে, আমাদের সৈন্তেরা জার্মান ভূমিতে মৃত্যুকার মানবিক দয়া ও উদারতা দেখাইয়াছিলেন।’

অবশ্য মস্কোর খাস সদর দপ্তর হইতেও সৈন্ত ও সেনাপতিদের উপর এই মর্মে এক নির্দেশ আসিল যে, জার্মান জনগণের সঙ্গে মানবিক আচরণ করিতে হইবে। এবং ওডের ও নাইসী নদীর পশ্চিমে জার্মানদের দ্বারা পরিচালিত সরকারের প্রতিষ্ঠা দিতে হইবে। (৮)

এখানে আরও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সোভিয়েত সাহিত্যিক ইলিয়া এরেনবুর্গ এবং অন্যান্য কয়েকজন লেখক জার্মানদের পাশবিকতার বিরুদ্ধে নির্মম প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যে নির্দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ প্রোপাগান্ডা চালাইয়া আসিতেছিলেন, উচ্চতর কর্তৃপক্ষের আদেশে ১৪ই এপ্রিল থেকে তা’ও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল এবং এরেনবুর্গের এই সমস্ত লেখা নিয়মিত ভিতরকৈরীও মুষ্টি হইয়াছিল।

#### বলাৎকারের কাহিনী

কিন্তু সোভিয়েত সৈন্তবাহিনীর মর্যাদা, নৈতিক মান এবং উচ্চতম শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সাময়িক কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে যত উপদেশ ও নির্দেশই দেওয়া হইয়া থাকুক না কেন, জার্মান ভূমিতে প্রবেশের প্রথম উত্তেজনায় রূপ সৈন্তদের অনেকেই সেই সমস্ত উপদেশ ও নির্দেশ ভুলিয়া গেলেন এবং জার্মান সৈন্তেরা রাশিয়াতে ও অগ্রভূমিতে যে সমস্ত ভয়ঙ্কর অত্যাচার করিয়াছিল, সেগুলি তাঁরা স্মরণ করিলেন। ফলে, জার্মান ভূমিতে আক্রমণের গোড়ার দিকে তাঁরা কোন কোন এলাকার ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি, এমন কি গোটা শহর পর্যন্ত জ্বালাইয়া দিলেন ও লুটপাট করিলেন। আর বহু নারীর উপর বলাৎকার এবং অত্যাচার অত্যাধিক হইয়াছিল।—এই সমস্ত কথা লিখিয়াছেন স্বয়ং আলেকজান্দার ওয়ার্ল, রুশ-জার্মান যুদ্ধে যার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল অপারিসীম এবং যার পুস্তক নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণিক। (৯)

মিঃ ওয়ার্লের নিকট একজন রাশিয়ান মেজর স্বীকার করিয়াছেন যে, অনেক জার্মান স্ত্রীলোকের উপর রুশ সৈন্তেরা বলাৎকার করিয়াছিল ঠিকই, তবে একথাও সত্য যে, জার্মান মেয়েদের অনেকেই ধরিয়া লইয়াছিল যে, ‘এবার রুশদের পালা’, সুতরাং বাধা দিয়া কোন লাভ নাই! বরং তারা যেন এজন্য প্রস্তুতই ছিল। প্রায় চার বছর ধরিয়া রেড আর্মির লোকেরা যৌন ক্ষুধায় কাতর ছিল। অবশ্য অফিসারদের, বিশেষ ভাবে কিস্ট-অফিসারদের তেমন কোন অনুবিধা ছিল না। কেন না, তাঁদের হাতের কাছেই কোনও না কোন ‘কিস্ট-ওয়াইক’—যেমন সেক্রেটারি, টাইপিষ্ট বা নার্স ইত্যাদি সহজলভ্য ছিল। কিন্তু সাধারণ সৈন্যদের তেমন সুযোগ ছিল না।...

(৮) গ্রেট প্যাট্রিষ্টিক ওয়ার অব দি সোভিয়েত ইউনিয়ন—পৃষ্ঠা ৫৮০

(৯) Russia At War (1941—1945)—Alexander Werth. Pan Books Ltd, 1965, London—p. 863

এমন ঘটনাও ঘটেছে যেখানে আমাদের ঘৌন উপবাসী সৈন্তেরা ৬.১৭ বছরের বৃদ্ধাদের উপরেও বলাৎকার করিয়াছে। এ বিষয়ে কাজাক ও অন্তান্ত এশিয় টিঙ্ক সৈন্তদের রেকর্ড' সবচেয়ে খারাপ। (১০)

পরে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে মিঃ আলেকজান্ডার ওয়ার্থ যখন মার্শাল শোকালোভস্কির মত পদস্থ সামরিক নেতার সঙ্গে আলোচনা করিয়াছিলেন, তখন তিনি জবাব দিয়াছিলেন—“হাঁ, অনেক নোংরা জিনিস ঘটেছিল। কিন্তু আপনারা কি আশা করেন?—আপনি নিশ্চয়ই জানেন জার্মানরা ক্রম যুদ্ধবন্দীদের উপর কি কাণ্ড করেছিল, কি ভাবে আমাদের দেশকে ধ্বংস ও লুণ্ঠ এবং লোকজনকে হত্যা ও মেয়েদের উপর বলাৎকার করেছিল? মৈদানেক কিংবা আউশেভিৎস বন্দীশিবিরগুলি কি আপনি দেখেছেন? আমাদের প্রত্যেকটি সৈন্তের ডজন ডজন কমরেড মারা পড়েছে। সুতরাং তাদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগতভাবে জার্মানদের সঙ্গে কিছু হিসাব নিকাশ মিটাবার দরকার ছিল। অতএব জয়লাভের প্রথম উল্লাসে আমাদের সৈন্তেরা কিছু কিছু জার্মান নারীর জীবন উত্যক্ত করে তোলার মধ্যে কিছুটা আত্মতৃপ্তি খুঁজে পেয়েছিল। তবে, এখন (অর্থাৎ জুন, ১৯৪৫) আর সেই অবস্থা নেই এবং একথাও সত্য যে, জার্মান স্ত্রীলোকদের সকলেই অক্ষতঘোনি কুমারী ছিল না।” (১১)



পশ্চিমের আরও কোন কোন লেখক অধিকৃত বার্লিন ও জার্মানীতে এবং অন্তর্জাত ক্রমসৈন্তদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ ও অনাচারের কথা বিশেষ জোরের সঙ্গেই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এদের লেখার মধ্যে অতিরঞ্জনের বিশেষ সম্ভাবনা। কেননা, এরা প্রায় সকলেই সোভিয়েত-বিরোধী এবং বার্লিন লালকোজের দখলে যাওয়ার এদের ক্ষোভেরও সীমা ছিল না। সুতরাং বিজয়ী সোভিয়েত রাশিয়ার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার জন্য এরা বেশ কৌশলে নিন্দা রটনা করিয়াছেন। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট লেখক কর্নেলিয়াস রায়ান তাঁর একটি জনপ্রিয় সামরিক গ্রন্থের গোড়াতেই লিখিয়াছেন :

“প্রায় ছয় বছর যুদ্ধের পর বার্লিন মূলতঃ নারীপ্রধান শহরে পরিণত হইয়াছিল এবং এই শহরের উপর ঘৌন আক্রমণের আশঙ্কা কালোছায়া বিস্তার করিয়া রহিল।”

অর্থাৎ লেখক কৌশলে সোভিয়েতের সুনাম হ্রাস করার জন্য বুঝাইতে চাইয়াছেন যে, বার্লিনের উপর লালকোজের আক্রমণ যেন “ঘৌন আক্রমণের” সমান বিপজ্জনক

অতঃপর মিঃ রায়ান উল্লেখ করিয়াছেন যে, ১৯৩৯ সালে যুদ্ধের সময় বার্লিনের লোক সংখ্যা ছিল ৪৩ লক্ষ ২১ হাজার। কিন্তু যুদ্ধের জন্ত সেই সংখ্যা কমিতে কমিতে শেষ পর্যন্ত পাঁড়াইল ২৭ লক্ষে এবং এর মধ্যে ২০ লক্ষই ছিল স্ত্রীলোক। অপর

(১০) পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৮৬৩

(১১) পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৮৮১

পক্ষে পূর্বদিক থেকে দলে দলে—মোট প্রায় ৫ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী সোভিয়েত অধিকৃত এলাকাগুলি থেকে বার্লিনের দিকে পালাইয়া আসিতেছিল এবং তাদের অধিকাংশই বার্লিন ছাড়িয়া পশ্চিম দিকে ছুটিতেছিল। এই সমস্ত উদ্বাস্ত নরনারী সোভিয়েতের বিরুদ্ধে ভয়াবহ কাহিনী ও গুজব প্রচার করিতে লাগিল এবং সেই সমস্ত গুজব যুখে যুখে ছড়াইয়া পড়িলে বার্লিনে জ্বালার সৃষ্টি হইল। (১২)

অবশ্য রুশ সৈন্য সম্পর্কে এই জ্বালার সৃষ্টির জন্য তিনি রাশিয়াতে এবং বিভিন্ন বন্দী-নিগাসে জার্মানদের ভয়াবহ অত্যাচারকেও দায়ী করিয়াছেন। মিঃ রায়ান লিখিয়াছেন :

Their terror of the Russians was often intensified by a certain guilty knowledge. Some Germans, at least, knew all about the way German troops had behaved on Soviet soil, and about the terrible and secret atrocities committed by the Third Reich in concentration Camps. Over Berlin, as the Russians drew closer, hang a nightmarish fear unlike that experienced by any city since the razing of Carthage. (১৩)

সোভিয়েত-বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও মিঃ রায়ান জার্মানদের ভয়াবহ অত্যাচার, এবং রুশদের উপর তার প্রতিক্রিয়ার কথা কিংবা “জার্মানদের অপরাধ বোধের” কথা গোপন করিতে পারেন নাই। তবু তিনি তাঁর পুস্তকের বহু জায়গায় রুশ সৈন্য কর্তৃক জার্মান নারীদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের বহু কাহিনী (৪৫৩ থেকে ৪৬৩ পৃষ্ঠা) বর্ণনা করিয়াছেন এবং পুস্তকের একেবারে শেষ পৃষ্ঠায় নিজেরই প্রশ্ন করিয়াছেন—কত নারীর উপর বলাৎকার করা হইয়াছিল এবং নিজেরই জবাব দিয়াছেন যে, নির্দিষ্ট সংখ্যা কেউ বলিতে পারে না। ডাক্তারদের মতে ২০ হাজারও হইতে পারে, আবার এক লক্ষও হইতে পারে।

মিঃ রায়ান তাঁর ঘটনাবলীর বর্ণনায় আশ্চর্যকর সমর্থনে ৪৬৩ পৃষ্ঠার পাদটীকায় সোভিয়েত মতামত উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁর মতে সোভিয়েত ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করিয়াছেন যে, বার্লিনের পতনের সময় রুশ সৈন্তেরা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলিয়া গিয়াছিল এবং বলাৎকার অসংখ্য হইয়াছিল। ওডের নদী পর্যন্ত সোভিয়েত বাহিনীর অগ্রগতির পথে যে সমস্ত বন্দীশিখির যুক্ত করা হইয়াছিল, প্রাক্তন যুদ্ধ-বন্দীরা তাদের উপর অত্যাচারের বদলা নিয়াছিল। সাময়িক বাহিনীর পত্রিকা ‘রেড ষ্টার’-এর সম্পাদক স্বয়ং গ্রন্থকারের নিকট স্বীকার করিয়াছেন যে, আমাদের সৈন্তেরা শতকরা ১০০ ভাগ ভুললোক হইতে পারেন নাই স্বাভাবিক কারণেই। কারণ,

(১২) The last Battle—Cornelius Ryan, Pocket Books, New York, 1967, p. 15

(১৩) পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা, ৩১৮



আমরা এত বেশী অভ্যাচার দেখিয়াছিলাম যে, তা অবর্ণনীয়। সোভিয়েতের অপর একজন সামরিক পত্র সম্পাদক বলিয়াছেন যে, জার্মানরা রাশিয়াতে যে বর্বরতা করিয়াছিল, তার তুলনায় আমরা কিছুই করি নাই! যুগোস্লাভিয়ায় লালকোর্জের সৈন্তদের অভ্যাচার নিয়া যুগোস্লাভ মিলিটারি প্রতিনিধি মিলোভান জিলাস (Milovan Djilas) স্ট্যালিনের নিকট অভিযোগ করিলে স্ট্যালিন নাকি জবাব দিয়াছিলেন : ‘আপনারা এটা কেন বুঝতে পারেন না যে, যদি কোন সৈন্তকে হাজার হাজার কিলোমিটার রক্ত ও আগুনের ভিতর দিয়া যেতে হয়, তবে, সে কোন জীলোক নিয়া মজা করবে, এটা এমন কি গুরুতর ব্যাপার?’

অপর পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর একজন জগৎবিখ্যাত সামরিক গ্রন্থকার উইলিয়ম শাইরার তাঁর ‘এণ্ড অব এ বার্লিন ডাইরি’ নামক পুস্তকে এই বিষয় নিয়া তেমন কিছু গুরুত্ব আরোপ করেন নাই—যদিও তিনি ওয়াশিংটনে, নিউইয়র্কে, লণ্ডনে এবং প্যারিসে রুশসৈন্তদের বলাৎকারের অনেক গল্প শুনিয়াছিলেন। পরে তিনি ইউরোপে গিয়া নিজের অহুসঙ্কান করিয়া দেখিয়াছেন যে, বুখাপেটে বেশ কিছু সংখ্যক খারাপ কাজ ঘটিয়াছিল। কিন্তু বার্লিনে তেমন কিছু গুরুতর ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া তিনি মনে করেন না। তবে যে কোন দেশেই সৈন্তেরা যুদ্ধ জয় করিলে কিছু কিছু বলাৎকার ঘটিয়া থাকে। ‘আমাদের নিজেদের (অর্থাৎ আমেরিকার) সৈন্তেরাও কোন কোন সময় তেমন কাজ করিয়াছে।’ কিন্তু জার্মানরা সোভিয়েত রাশিয়াতে যে ভয়াবহ কাণ্ড করিয়াছে, রুশ সৈন্তদের পক্ষে সেটা সম্পূর্ণ তুলিয়া যাওয়া কঠিন। ক্রমাগত দুই তিন বছর ধরিয়া যারা রণক্ষেত্রে লড়াই করিয়াছে এবং বহু জীবনের মূল্যে যারা বার্লিন দখল করিয়াছে তাদের সম্পর্কে এ কথা মনে রাখিলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, রুশ সৈন্তদের দ্বারা অনুষ্ঠিত বলাৎকারের সংখ্যা সাধারণ গড়পড়তা হিসাবের উর্ধ্বে ছিল না।

মিঃ শাইরার অতঃপর লিখিয়াছেন যে, তাঁর সঙ্গে যাত্রা একজন জার্মান জীলোকের সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং সে নিজেই বলাৎকারের কথা স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু তার জন্য সে খুব দুঃখিত বলিয়া মনে হইল না। (১৪)

এই সমস্ত মন্তব্য থেকে বুঝা যাইতেছে যে, যারা ঘোরতর সোভিয়েত-বিরোধী তাঁরাই লালকোর্জের বিরুদ্ধে বেশী নিম্না রটনার চেষ্টা করিয়াছেন।

\*

\*

\*

বার্লিন ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। শহরে খাদ্য, বিদ্যুৎ, উত্তাপ, জল ও গ্যাস এবং রেলওয়ে ট্রান্সপোর্ট ইত্যাদি কিছুই ছিল না। অপর পক্ষে যত মানুষ ও যত পণ্ডর দুর্গন্ধে আবহাওয়া ভারী ছিল। উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থারও অভাব ছিল। কিন্তু সেই শোচনীয় অবস্থার মধ্যেও সোভিয়েত মিলিটারি কর্তৃপক্ষ যথাসম্ভব জার্মান নাগরিকদের জন্য খাদ্য ও সেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। (১৫)

(১৪) End of a Berlin Diary—William L Shirer, p. 139.

(১৫) দি গ্রেট মার্চ অব লিবারেশন, পৃষ্ঠা ২৭৭

বৃটিশ সামরিক লেখক ও গ্রন্থকার মেজর জেনারেল স্চার চার্লস গাইন (Charles Gwynn) বার্লিন যুদ্ধে সোভিয়েত সেনাপতি ও সৈন্যদের রণকৌশল ও রণনীতির উচ্চ প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে, ওডের নদীতীর থেকে মার্শাল জুকোভ বহুপ ক্ষতগতিতে বার্লিনের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তা' বিশ্বস্বকর। ২৫শে এপ্রিলের মধ্যে জুকোভ ও মার্শাল কোনিয়ভ পটসডামের উত্তর-পশ্চিমে পরস্পরের সহিত হাত মিলাইলেন এবং বার্লিনকে সম্পূর্ণ ধরিয়। ফেলিলেন। মিত্রপক্ষের সঙ্গে সোভিয়েত বাহিনীর পূর্বে-পশ্চিমে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। উত্তর দিকে মার্শাল রকোসোভস্কিও দ্রুত জয়লাভের দ্বারা আগাইয়া যাইতেছিলেন এবং পল'য়মান জার্মান সৈন্যেরা ক্লান্ত হাতে ধরা পড়ার চেয়ে জেনারেল মন্টেগোমারীর অফিসারদের কাছে গিয়া আত্মসমর্পণ করিতে চাইলেন। কিন্তু বৃটিশপক্ষ রাজী হইলেন না।...

বার্লিন যুদ্ধে মার্শাল জুকোভের অধীন রেড আর্মি মার্শাল কোনিয়ভের সহ-যোগিতায় অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। ২২। মে মার্শাল স্ট্যালিন মস্কো থেকে প্রচারিত এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করিলেন—“জার্মানীর রাজধানী ও জার্মান সাম্রাজ্যবাদের মর্যাদা এবং জার্মান আক্রমণের উৎস বার্লিনের সম্পূর্ণ পতন ঘটয়াছে। বার্লিন দুর্গের জার্মান অধিনায়ক ও গোলন্দাজ বাহিনীর সেনাপতি জেনারেল উইডলিং (Weidling) তাঁর ষ্টাফসহ অপরাহ্ন ৩টার আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। রাত্রি ২টার মধ্যে আমাদের সৈন্যেরা বার্লিনে ৭০ হাজার জার্মান দৈন্তকে বন্দী করিয়াছেন। তার আগেই আরও লক্ষাধিক সৈন্ত বার্লিন যুদ্ধে ধরা পড়িয়াছে।” ...মার্শাল স্ট্যালিন ও মার্শাল জুকোভের কাছে এটা ব্যক্তিগত জয়ের মত। কিন্তু রাশিয়ার জনগণের কাছে, যাদের দেশ ধ্বংস এবং অজস্র পরিবার নিশ্চিহ্ন বা বন্দী হইয়াছিল, তাদের কাছে বার্লিনের এই পতন আরও অনেক বেশী গুরুত্বব্যঞ্জক ছিল। (১৬)

কিন্তু বার্লিনের এই চূড়ান্ত যুদ্ধে সামরিক ও অ-সামরিক কত লোক বিনষ্ট হইয়াছিল?—মার্কিন গ্রন্থকার কর্নেলিয়াস রায়ান বলিয়াছেন যে, এর সঠিক জবাব দেওয়া কঠিন। কারণ, যুদ্ধাবসানের বিশ বছর পরেও ধ্বংসস্থাপ, বাগান ও পার্কের ভগ্নভূত থেকে মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইতেছে। তবে, সমস্ত সংখ্যাতত্ত্বের হিসাব মিলাইয়া মনে হয় যে, বার্লিনের যুদ্ধে প্রায় এক লক্ষ সিভিলিয়ান বা অ-সামরিক ব্যক্তি প্রাণ হারাইয়াছিল। অন্ততঃ ২০ হাজার লোক স্বঘৃণের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মারা পড়িয়াছিল। প্রায় ৬ হাজার লোক আত্মহত্যা করিয়াছিল। বাকীরা গোলাগুলির বর্ষণে সোজা নিহত কিংবা রাস্তার লড়াইতে আহত হইয়া মারা পড়িয়াছিল। শেষের দিনগুলিতে বার্লিন থেকে যারা পালাইয়া গিয়াছিল, কিংবা জার্মানীর অন্যত্র মারা পড়িয়াছিল তাদের সঠিক সংখ্যা পাওয়াও কঠিন। একমাত্র বোমাবর্ষণেই ৫২ হাজার লোক নিহত হইয়াছিল বলা অসম্ভব। যদি এই সংখ্যা ঠিক হইয়া থাকে, তবে, অ-সামরিক নিহতের সংখ্যা ১ লক্ষ ৫০ হাজারের বেশী। কিন্তু বার্লিনের যুদ্ধে জার্মানীর সামরিক হতাহতের সংখ্যা নির্ণয় করা আরও কঠিন। কারণ এই সংখ্যাটি জার্মানীর

যুদ্ধের সমগ্র হতাহতের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। তবে বার্লিন যুদ্ধে জুকোভ ও কোনিয়েভের মিলিত বাহিনীর নিহতের সংখ্যা অন্ততঃ ১ লক্ষ।— (১৭)

কিন্তু সোভিয়েত পক্ষের মতে বার্লিন যুদ্ধে তিন ক্রণ্টের (জুকোভ, কোনিয়েভ ও রকোসোভস্কি) একত্রে মোট ৩,০৪,৮৮৭ জন সৈন্য হতাহত ও নিখোঁজ হইয়াছিল— নিখোঁজ হইয়াছিল তারা, যারা বাড়ীঘরের ধ্বংসাত্মক নীচে চাপা পড়িয়াছিল কিংবা নদী পার হইতে গিয়া ডুবিয়া মরিয়াছিল। জার্মানরা রুশদের ১,১৫৬টি ট্যাঙ্ক ও ট্যাঙ্কের স্বয়ংচালিত কামান জখম বা ধ্বংস করিয়াছিল। ১,২:০টি কামান ও মর্টার চূর্ণ এবং ৫০৭টি বিমান ধ্বংস করিয়াছিল।

অত্যন্ত সাহসিকতাপূর্ণ এবং প্রভূত রক্তক্ষয়ী এই যুদ্ধে লালকোজের সৈন্যেরা দখল বার্লিন নগরীতে অনেক মনুষ্যদেহও পরিচয় দিয়াছিলেন। একটি চারতলা জলন্ত অট্টালিকার মধ্যে শিশুদের আঁত ক্রন্দন শুনিতে পাইয়া কয়েক জন রুশসৈন্য তাঁদের জীবন বিপন্ন করিয়া সেই শিশুদেরকে মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। (১৮)

অর্থাৎ যে বার্লিনে ক্যাসিটেরা মনুষ্যদেহের চরম সমাধি: ঘটাইয়াছিল, সেখানে বিজয়ী লালকোজ মানবতার ও জীবনের নতুন প্রতিষ্ঠা দিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

(১৭) The Last Battle, p. 490.

(১৮) The Great March of Liberation, p.272 73

## নবম পর্ব অষ্টম অধ্যায় জার্মানীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ

একমাত্র ১৯৪৫ সালের কয়েক মাসেই সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে জার্মান বাহিনীর ১০ লক্ষেরও অধিক সৈন্য নিহত হইল। লালফৌজ ৯৮ ডিভিসন শত্রুসৈন্য ধ্বংস করিল এবং বন্দী করিল ৬ ডিভিসন, যখন যুদ্ধবিরতি ঘটিল তখন আরও ৯০ ডিভিসন সৈন্য আত্মসমর্পণ করিল। প্রবল পরাক্রমশালী নাৎসী বাহিনীর সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ উভাবে নষ্ট হইয়া গেল; নাৎসী জার্মানীর বিশাল সামরিক সংগঠন, গবর্ণমেন্ট এবং পাটি অচল অবস্থায় পড়িল।

হিটলারের উত্তরাধিকারী ডোয়েনিৎস সরকার নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ এড়াইবার এ. প্র. পি.ম.দিকে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের নিকট যত বেশী সম্ভব জার্মান সৈন্যের আত্মসমর্পণ ঘটাইবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ব্যর্থ হইল।

উত্তর ইতালীতে ২০ এপ্রিল, ১৯৪৫, জার্মান বাহিনী আত্মসমর্পণ করিল। অন্ত্যান্ত রণাঙ্গনের আগেই শত্রুবাহিনী এখানে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল উত্তর ইতালীব পাটিজান ও ক্যাসিট-বিরোধী মুক্তিকামী জনগণের তীব্র প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্ত—বাঁহের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন কমিউনিষ্টরা। (১)

চার্চিলের বিবরণীতে প্রকাশ যে, উত্তর ইতালীতে এপ্রিল মাসে জার্মান বাহিনীর অবস্থান খুব খারাপ হইয়া পড়িল এবং ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর—বিশেষভাবে কিউ মার্শাল আলেকজান্ডারের বৃটিশ সৈন্যদলের ভয়যাত্রা শুরু হইল। ২০ এপ্রিল, ১৯৪৫, বলোগনার (Bologna) পতন হইল এবং পোনরী যুদ্ধে জার্মানীর বিপর্যয় ঘটিল। তখন উত্তর ইতালীর জার্মান সৈন্যেরা যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু মিত্রপক্ষ নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ দাবি করিলেন। জার্মান বাহিনীর পক্ষ থেকে দুইজন প্রতিনিধি তাতে সাদা দিলেন এবং ২০শে এপ্রিল তারিখ বৃটিশ সদর দপ্তরে ইঙ্গ-মার্কিন ও সোভিয়েত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে জার্মান পক্ষ নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর দিলেন। প্রায় ১০ লক্ষ জার্মান সৈন্য ধরা পড়িল এবং ইতালীর যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। (চার্চিল, যষ্ঠ খণ্ড)।

\*

\*

\*

১লা মে, ১৯৪৫, জার্মানীর হাভর্গ রেডিও থেকে অর্ধসত্য ও অর্ধমিথ্যা মিথানো এই মর্মে একটি বিবৃতি প্রচার করা হইল যে, “আমাদের ফুরার এ্যাডলফ হিটলার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত বলশেভিজমের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া আজ অপরাহ্নে রাইখ চ্যান্সেলারির সামরিক সদর দপ্তরে জার্মানীর জন্ত জীবন বিসর্জন দিয়াছেন। (অথচ হিটলার কিন্তু আগের দিন ৩০শে এপ্রিল তাঁর ভূগর্ভের বন্ধারে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। এ কথাটি হাভর্গ রেডিওতে গোপন করা হইল।)

এরপর এ্যাডমিরাল ডোয়েনিৎস জার্মান নরনারী এবং সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীর

উদ্দেশ্যে ঘোষণা করিলেন—“আমাদের ফুরার এ্যাডলফ হিটলার তাঁর জীবনদান করেছেন। জার্মান জনগণ গভীরতম শোকে ও শ্রদ্ধায় তাঁর উদ্দেশ্যে মাথা নত করেছেন...ফুরার আমাদের তাঁর উত্তরাধিকারী পদে নিয়োগ করে গেছেন। যে বিপুল দায়িত্ব আমার ঘাড়ে এলো, সে সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন হয়ে আমি জার্মান জাতির এই সঙ্কীর্ণ তঁাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করছি।...”

ঐ দিনই জার্মান সশস্ত্রবাহিনীর উদ্দেশ্যে এক নির্দেশনাময় এ্যাডমিরাল ডোয়েনিংস আবার ঘোষণা করিলেন—

“ফুরার আমাকে রাষ্ট্রের প্রধান নায়ক ও সুপ্রীম কমান্ডারের পদে নিয়োগ করেছেন।... আমি বলশেভিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে কৃতসংকল্প। যতদিন পর্যন্ত বলশেভিকজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ আমাকে বাধা দেবেন, ততদিন তাঁদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেও আমি বাধ্য। ফুরারের নিকট আপনাদের প্রত্যেকের যে শপথ ছিল, ফুরারের নিযুক্ত তাঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে এখন থেকে সেই শপথ সোজামুজি ব্যক্তিগতভাবে আমার উপর বর্তাবে।

‘জার্মান দৈনিকবৃন্দ, আপনাদের কর্তব্য পালন করুন! আমাদের জাতির অস্তিত্ব এখন বিপর্যয়।’

এ্যাডমিরাল ডোয়েনিংস পরাজয়ের সেই অন্ধকারেও সোভিয়েত-বিষেব তুলিতে পারেন নাই এবং তখনও তিনি অস্বাভাবিক জার্মান নেতাদের মতই মিত্রপক্ষ ও রাশিয়ার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছিলেন। ২রা মে, ১৯৪৫, ডোয়েনিংস তাঁর তথাকথিত গবর্নমেন্ট ও সদর দপ্তর প্লান (Plan) থেকে জার্মান-ডেনমার্ক সীমান্তবর্তী পুরাতন শহর ফ্রেন্সবুর্গে স্থানান্তরিত করিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, চার্লিস ও ব্রিটিশ পক্ষ ফ্রেন্সবুর্গের এই নাৎসী ‘গবর্নমেন্টকে’ কয়েক দিনের জন্য পৃষ্ঠপোষকতাও করিয়াছিলেন। কারণ, যুদ্ধ যতই সরকারীভাবে সমাপ্তির দিকে যাইতেছিল রাশিয়ার প্রতি চার্লিসের বিরূপতাও ততই প্রকাশ পাইতেছিল। সোভিয়েত পক্ষ স্বভাবতই এজন্য খুব ক্ষুব্ধ ছিলেন। এই ক্ষোভ একেবারে তীব্রতায় পরিণত হইয়াছিল না। কেন না, নাৎসী নেতাদের মত মিত্রপক্ষের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীও জার্মানীর বিরুদ্ধে রাশিয়ার এই জয়লাভে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন এবং ইউরোপের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত সত্ত্বেও মিত্রপক্ষের দিক থেকে জার্মানীর সঙ্গে পৃথক সন্ধি স্বাক্ষরের কোন অল্পকূল অবস্থা ছিল না। কেননা, ১৯৪৫ সালের বসন্ত কালে ফ্রান্সের সঙ্গে জেনারেল আইজেনহাওয়ারের যে সমস্ত ‘গোপন চিঠির’ বিনিময় হইয়াছিল, তাতে আইজেনহাওয়ার লিখিয়াছিলেন যে, পশ্চিমের সৈন্যবাহিনীর তুলনায় সোভিয়েত সশস্ত্রবাহিনী অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল। সুতরাং রাশিয়াকে বাদ দিয়া জার্মানীর সঙ্গে পৃথক চুক্তি স্বাক্ষরের প্রশ্ন উঠে ন। ওষিকে ব্রিটিশ পক্ষের জেনারেল মন্টগোমারীও আইজেনহাওয়ারের অহরূপ মত পোষণ করিতেন। (মন্টগোমারীর স্বত্বাধীনতা ৩০ পৃষ্ঠার এর স্বীকৃতি আছে)। তারপর আমেরিকার পক্ষে আর একটি গুরুতর প্রশ্ন ছিল। কেননা, জাপানের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধ তখনও বাকী ছিল এবং সেই যুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার সহ যোগদান প্রয়োজন ছিল (২)

২রা মে, ১৯৪৫, ডোয়েনিংস তাঁর নূতন দপ্তর থেকে গ্র্যাডমিরাল ফ্রাইড্‌বুর্গকে (Friedeburg) কিন্তু মার্শাল বার্নার্ড মণ্টগোমারীর নিকট যুদ্ধ বিবর্তিত আলোচনার জন্য পাঠাইলেন এবং এই মর্মে এক প্রস্তাব পেশ করিলেন যে, পশ্চিম দিকে জার্মানী আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু পূর্ব দিকে যথারীতি যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া হইবে।

মণ্টগোমারী এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন -। অধিকন্তু সমস্ত ক্রণ্টে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ দাবি করিলেন। তবে, ৪মে তারিখে একটি চুক্তি অনুসারে নেদারল্যান্ডস, উত্তর-পশ্চিম জার্মানী, প্লেসভিগ, হলস্টাইন এবং ডেনমার্কের জার্মান সৈন্যেরা বৃটিশ সৈন্য বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করিল এবং ব্যাভেলবার্গ দিকেও অল্পরূপ ব্যাপার ঘটিল।

অতঃপর ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের যবনিকাপাত আবও ঘনাইয়া আসিল। ৭মে, ১৯৩৫ রাত্রি টো ৪. মিনিটেব সময় ডোয়েনিংস সরকার প্রেরিত জার্মান প্রতিনিধিগণ মিত্রপক্ষের প্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গে যুদ্ধাবসানের এক প্রাথমিক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিলেন। পশ্চিমের সুপ্রাথমিক কমান্ডার জেনারেল আইজেনহাওয়ারের রেইমস্ (ফ্রান্স) শহরস্থিত সদর কার্যালয়ে একটি সাধারণ কালো রঙের টেবিলের একপাশে সামরিক ইউনিকর্ষ পরিহিত তিনজন জার্মান প্রতিনিধি নাৎসী নৌবহরের প্রধান সেনাপতি গ্র্যাডমিরাল ফ্রাইড্‌বুর্গ, জার্মান জেনারেল ষ্টাফের প্রধান কিন্তুমার্শাল আলফ্রেড জডল (হিটলারের ঘনিষ্ঠতম সহযোগীদের অন্যতম) এবং তাঁর সহকারী মেজর-জেনারেল উইলহেলম অক্সেনিয়াস (Oxenius) আসন গ্রহণ করিলেন।

আর মিত্রপক্ষের তরফ থেকে উপস্থিত ছিলেন বুটেনের লে: জেনারেল স্মার ফ্রেডরিক মরগ্যান, ফ্রান্সের জেনারেল ফ্রাঁকস্ সেভেজ (Francois Sevez), মিত্র নৌবহরের প্রধান গ্র্যাডমিরাল স্মার এইচ এম বারোথ (Burroughs), আইজেনহাওয়ারের প্রতিনিধি লে: জেনারেল বেডেল স্মিথ, মার্কিন বিমান বহরের জেনারেল কার্ল স্পাটজ (Carl Spaatz) এবং সোভিয়েত পক্ষের লে: জেনারেল আইভ্যান স্মলানোভ এবং জেনারেল আইভ্যান স্মলানোভ।

কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই অস্থানে আইজেনহাওয়ার স্বয়ং কিংবা তাঁর ডেপুটি এয়াব চীফ মার্শাল স্মার আর্থার টেভার উপস্থিত ছিলেন না। তাঁরা তখন অন্য একটি আফিসে ছিলেন।

বুটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও রাশিয়া এই চতুঃশক্তির পক্ষ থেকে চারটি পৃথক দলিল তৈরী হইয়াছিল এবং দলিল চারটি চার মিনিটের মধ্যে স্বাক্ষরিত হইয়া গেল। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ দলিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সোজা ভাষায় লেখা ছিল:

“আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যক্তিগণ জার্মান হাইকমান্ডের কাছ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া এতদ্বারা মিত্রপক্ষীয় অভিযাত্রী বাহিনীর সুপ্রাথমিক কমান্ডার এবং সেই একই সঙ্গে সোভিয়েত হাই কমান্ডের নিকট জল, স্থল ও বিমানবাহিনী সহ (যারা এই যুদ্ধে জার্মানীর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রহিয়াছে) নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করিতেছি।”

দলিল স্বাক্ষরের পর কিন্তু মার্শাল আলফ্রেড জডল জার্মানদের পক্ষ থেকে কিছু বলিবার জন্য অহুমতি চাহিলেন এবং লে: জেনারেল বেডেল স্মিথ মাথা নাড়িয়া অহুমতি দিলে জডল প্রায় কান্নার সুরে বলিলেন।

“এই দলিল স্বাক্ষরের দ্বারা জার্মান জনগণ ও সশস্ত্রবাহিনী, ভালো হোক বা মন্দ হোক, বিজয়ী পক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। পাঁচ বছরের অধিক কাল যে যুদ্ধ চলিয়াছিল, সেই যুদ্ধে উভয় পক্ষ সম্ভবত পৃথিবীর অল্প যে কোন জাতির তুলনায় যেমন বেশী অতীষ্টন সাধন করিয়াছে, তেমন বেশী দুঃখভোগও করিয়াছে। এই যুদ্ধের আমি শুধু এই আশাই করিতে পারি যে, বিজয়ীপক্ষ তাদের সঙ্গে উদারভাবে ব্যবহার করিবেন।”

কিন্তু মিত্রপক্ষের গভীর বদন প্রতিনিধিরা জার্মান প্রতিনিধিদের এই কল্প আবেদনে সম্পূর্ণ নিঃশব্দ রহিলেন। সম্ভবত কিছুক্ষণ আগে তাঁরা জার্মান বন্দীনিবাসগুলির যে-সমস্ত বীভৎসতা দেখিয়া আসিয়াছিলেন, তারই প্রতিক্রিয়া তাঁরা চূপ করিয়া রহিলেন।

অতঃপর জার্মান প্রতিনিধিগণকে সুপ্রীম কমান্ডার আইজেনহাওয়ারের কক্ষে লইয়া যাওয়া হইল এবং সেখানে তিনি নির্দেশ দিলেন যে, বার্লিনে সোভিয়েত হাইকমান্ডের নিকট গিয়া জার্মান প্রতিনিধিগণকে যথাবীতি আত্মসমর্পণ এবং দলিলে স্বাক্ষর করিতে হইবে।

জডল অভিবাদন করিয়া সঙ্গীদের সহ নিজস্ব হইলেন এবং সেদিন রাতেই ডোয়েনিংসেব পক্ষ থেকে সমস্ত সশস্ত্রবাহিনীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের কথা ঘোষণা করা হইল। (৩)

কিন্তু ৭ই মে গভীর রাতে রেইমসে যে আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, সেই সংবাদ মস্কোতে প্রকাশিত হইল না। কারণ, তখনও বার্লিনের প্রধান অস্থান বাকী ছিল এবং রেইমসের অস্থান দিল প্রাথমিক পর্যায়ের মাত্র—যদিও পশ্চিমের নিকট ওটাই প্রধান ছিল। ৮ই মে রাত্রি ১২টার একটু আগে সোভিয়েত রাশিয়া ও সমগ্র মিত্রপক্ষের নিকট জার্মানীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত এবং অমুমোদিত (ratified) হইল। ৯ই মে সকালে মস্কো বেতার থেকে নিম্নলিখিত মর্মে এক বিবৃতি প্রচারিত হইল :

বার্লিনের উপকণ্ঠে একটি প্রাক্তন মিলিটারি টেকনিক্যাল কলেজ ভবনে জার্মানীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের ঐতিহাসিক ঘটনা অস্থিত হইয়াছিল। চারটি রাষ্ট্র—সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সের জাতীয় পতাকা হলটির শোভাবর্ধন করিতেছিল। রাত্রি বারোটো বাজবার সঙ্গে সঙ্গে মার্শাল জুকোভ, বৃটিশ সুপ্রীম কমান্ডের মার্শাল টেডার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল কার্ল স্পাঅ (Spaatz), এবং ক্রাসী প্রতিনিধি জেনারেল স্তা লাভ্রে স্তা টার্সিনি প্রভৃতি উপস্থিত হইলেন। তাঁদের সকলের প্রতি সাধর সন্মতি জানাইয়া মার্শাল জুকোভ বলেন যে, ‘মিত্রপক্ষের প্রতিনিধিগণ জার্মানীর বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ গ্রহণের জন্য এখানে সমবেত হইয়াছেন। আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, এখন কাজ আরম্ভ করা হোক এবং জার্মান প্রতিনিধিদের আহ্বান করা হোক’।

এরপর জার্মান হাইকমান্ডের কিন্তু মার্শাল কাইটেল, অ্যাডমিরাল ক্রেডবুর্গ,

কর্নেল জেনারেল ষ্টাম্ফ—অর্থাৎ স্থল, জল ও বিমানবাহিনীর নায়কগণ সেই কক্ষে প্রবেশ করেন এবং সম্পূর্ণ নীরবে আসন গ্রহণ করেন।

মার্শাল জুকোভ পুনরায় বলেন—“মহাশয়গণ, বিন শর্তে আত্মসমর্পণের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের সময় আসন্ন। আমি জার্মান হাইকমান্ডের প্রতিনিধিদের জিজ্ঞাসা করিতে চাই, তাঁরা কি উক্ত চুক্তিপত্র পাইয়াছেন এবং তা পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন? তাঁরা কি এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিতে সম্মত? কিন্তু মার্শাল টেডারও অস্বল্প প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন।

কিন্তু মার্শাল কাইটেল জার্মানদের পক্ষ থেকে অতি নিয়মের জবাব দেন—‘ই, অ.মি সম্মত’।—এই বলিয়া তিনি মার্শাল জুকোভের হাতে গ্রাণ্ড অ্যাডমিরাল ডোয়েনিংস কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি দলিল অর্পণ করেন। এই দলিলে জার্মান প্রতিনিধিদেরকে সোভিয়েত এবং মিত্রবাহিনীর সুপ্রীম কমান্ডের নিকট জার্মানীর পক্ষ থেকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছিল।

আত্মচরিত্রিক নিয়মকানুন সম্পন্ন হইলে মার্শাল জুকোভ প্রস্তাব করেন—‘জার্মান হাইকমান্ডের প্রতিনিধিরা এখন টেবিলে আসিয়া চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিতে পারেন।’

জার্মান প্রতিনিধিরা একে একে আসিয়া চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেন। এদিকে ক্যামেরাগুলি তাঁদের ছবি লইতে থাকে। রাত্রি পৌনে একটার সময় চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইলে মার্শাল জুকোভ ঘোষণা করেন—‘জার্মান প্রতিনিধিদল এখন বাইতে পারেন।’

বালিনে জার্মান প্রতিনিধিদল কর্তৃক এই আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষর পর ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইয়া গেল।

‘আধুনিক ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম একটা জাতির সমগ্র সৈন্তবাহিনী ও সেনাপতিমণ্ডলী প্রাপ্তবয়স্কের হাতে বন্দী হইল।’—এই মন্তব্য করিয়াছেন মার্কিন ঐতিহাসিক ব্রাইডার। তিনি আশ্চর্য লিখিয়াছেন যে, রুশ পক্ষ এই আত্মসমর্পণের একটি বিস্তৃত ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈয়ার করিয়াছিলেন। কিন্তু কয়েক মাস পরে জেনারেল আইজেনহাওয়ার যখন মস্কো পরিদর্শনে গিয়াছিলেন, তখন সচিবস্বয়ে লক্ষ্য করিলেন যে, উক্ত ফিল্মে তাঁর সদর দপ্তর রেইমসে জার্মানদের প্রথম আত্মসমর্পণের ঘটনা কিছুই দেখানো হয় নাই।

অর্থাৎ ইউরোপে পশ্চিমের বিজয় দিবস (V E Day) হইল একদিন আগে এবং পূর্বের বা সোভিয়েতের বিজয় দিবস হইল একদিন পর। যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গে হিটলার-বিরোধী কোয়ালিশন যখন গঠিয়া পড়িল এবং মিত্রপক্ষের দুই তরফের মধ্যে নানা প্রশ্ন (যেমন, বন্দীশালা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের স্বদেশে ফেরৎ পাঠানো) নিষা মনোমালিঙ্গ দেখা দিল, তখন বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের সামান্য তারিখটাও মতান্তরের অন্ততম বিষয় ছিল।

ইউরোপের সর্বত্র জার্মান সৈন্তেরা আত্মসমর্পণ করিতে লাগিল এবং ২ মে থেকে ১৭ মে-র মধ্যে একমাত্র লালকোজের নিকটই মোট ১৩ লক্ষ, ২০ হাজার ২৭৮ জন



জার্মান সৈন্য ও অফিসার এবং ১০১ জন জেনারেল আত্মসমর্পণ করিলেন। আর ঐদিকে পশ্চিমের ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের নিকট তো জার্মানদের আত্মসমর্পণের খুব পড়িয়া গেল। কেননা, বলশেভিক রাশিয়ার তুলনায় ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষকেই তারা বেশী ‘আপন’ বলিয়া মনে করিয়াছিল। ১২ বছর ধবিয়া একচ্ছত্র নাৎসী রাজত্ব ও প্রোপাগান্ডার কলে ‘বলশেভিক’ শব্দটাই যেন জার্মানদের নিকট আভ্যন্তরীণ বস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল!

কিন্তু হিটলারী জার্মানীর পতন এবং ইউরোপে যুদ্ধাবসানের জন্ত সর্বত্র জনগণের মধ্যে আনন্দের বান ডাকিলেও চার্চিল মনে মনে খুব প্রসন্ন ছিলেন না। কারণ, বার্লিন, ভিয়েনা ও প্রাগ যে তিনটি কেন্দ্রবিন্দুকে তিনি ইউরোপীয় ভারসাম্য রক্ষার পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া মনে করিতেন এবং এই মর্যকেন্দ্রগুলি যাতে সম্পূর্ণরূপে রাশিয়ার দখলে চলিয়া না যায়, তার জন্ত প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এবং তাঁর মৃত্যুর পর প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের কাছে পর্যন্ত আবেদন জানাইয়াছিলেন। সেই কেন্দ্রগুলির একটিও ইঙ্গ-মার্কিনের দখলে আসিল না। ১৩ এপ্রিল সোভিয়েত বাহিনী ভিয়েনা দখল করিয়া নিল এবং ২রা মে লালকোঁজের হাতে বার্লিনের পতন ঘটিল। আর মে মাসের গোড়ার দিকে চেকোস্লোভাকিয়ার পশ্চিম সীমান্তের দিকে অগ্রসরমান জেনারেল প্যাটনের মার্কিন বাহিনী, যাদের লক্ষ্য ছিল প্রাগ দখল করা, তাঁরাও ধমকিয়া দাঁড়াইলেন। কেননা, সোভিয়েত হাইকমান্ড জেনারেল আইজেনহাওয়ারকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, পশ্চিম চেক সীমান্তে ইতিপূর্বেই সোভিয়েত ও মার্কিন বাহিনীর অগ্রগতির যে সীমারেখা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তা লঙ্ঘন করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। জেনারেল আইজেনহাওয়ার মান্ত্য হিসাবে খুব ভক্ত ছিলেন এবং সৈনিক হিসাবে রাজনীতি নিয়া মাথা ঘামাইতেন না। সুতরাং সোভিয়েত হাইকমান্ডের অহুরোধে তিনি সাড়া দিলেন। অথচ কিন্তু মার্শাল শোরেরনারের (Schoerner) অধীনে প্রচুর অস্ত্রসম্ভার সহ প্রায় ২ লক্ষ জার্মান সৈন্য চেকোস্লোভাকিয়া দখল করিয়া রাখিয়াছিল—যদিও এই দখলদারির বিরুদ্ধে পার্টিজানরা লড়াই চালাইতেছিলেন। খাস জার্মানীর পতন একান্ত সন্নিকট হওয়া সত্ত্বেও এই অঞ্চলের জার্মানরা আত্মসমর্পণে অস্বীকৃত ছিল। সুতরাং ৬ মে তারিখ থেকে সোভিয়েত বাহিনীর তীব্র আক্রমণ শুরু হইল এবং ১০-১১ মে তারিখের মধ্যে চেকোস্লোভাকিয়ার জার্মান সমরশক্তি চূর্ণ হইল। ৭ লক্ষ ৮০ হাজার নাৎসী সৈন্য ও অফিসার এবং ৫৫ জন জেনারেল বেষ্টিত হইয়া ধরা পড়িল। ২ মে প্রাগ লালকোঁজের দখলে গেল, যদিও প্রভূত প্রাণের বিনিময়ে—১ লক্ষ ৪০ হাজার সোভিয়েত সৈন্য ও অফিসার নিহত হইলেন। কিন্তু বলকান ও পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দরজা খুলিয়া গেল।

সুতরাং ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের যেভাবে অবসান হইল, তাতে চার্চিল এবং রুটেনে ও আমেরিকার চার্চিলপন্থীদের মহলে তেমন আনন্দের বান ডাকিবার কথা ছিল না। বিশেষতঃ আমেরিকার নিকট তখনও জাপানের সমস্যা ছিল।

\*

\*

\*

৮-৯ মে, ১৯৪৫, রাত্রি ১২-১ মিনিটের সময় ইউরোপীয় রণক্ষেত্রের কামান গর্জন শুরু হইল। ৫ বছর ৮ মাস ৭ দিন ধরিয়া ভয়াবহ রক্তাক্ত সংঘর্ষের পর যে যুদ্ধের

শেষ হইল, তার কলে ইউরোপে এবং মিত্রপক্ষের সমস্ত দেশে অগণিত নরনারী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। বিশেষভাবে মস্কো, লণ্ডন এবং ওয়াশিংটনে তো বটেই একমাত্র জাপান ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র অগণিত মানুষ রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল এবং আনন্দ উৎসবে মত্ত হইল। অনেক ক্ষেত্রে নর-নারীর মধ্যে সামাজিক নিয়ম-কানূনের বাধা ভাঙিয়া গেল এবং আলিঙ্গন ও চুম্বনের রোমাঞ্চকর দৃশ্যের অবতারণা হইল। ১৯১৪-১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে প্রথম মহাযুদ্ধ অবসানের পর লণ্ডনের রাস্তায় আনন্দমত্ত নর-নারীর যে মিলন দৃশ্যের অবতারণা হইয়াছিল, আমাদের দেশের পরলোকগত বিখ্যাত সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সেই দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ সরকারে আমন্ত্রণে তিনি তখন লণ্ডনে ছিলেন এবং দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি সেই অভিনব অভিজ্ঞতার এক নাটকীয় বর্ণনা দিয়াছিলেন, যে বর্ণনা পাঠকদের চিত্তে গভীর কৌতুক ও কৌতূহল উদ্ভূত করিয়াছিল। কেননা, আমাদের দেশের সামাজিক প্রথার প্রকাশ্য বাস্তব এই ধরনের ঘটনা তখনও সম্ভব ছিল না এবং আজও সম্ভব নয়।...

মার্শাল ট্যালিন, প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এবং প্রধানমন্ত্রী চার্লিস মিত্রপক্ষের এই তিন শীর্ষ নেতা পরস্পরের প্রতি অভিনন্দনজ্ঞাপক বারবার্তা বিনিময় করিলেন এবং প্রত্যেকেই মিত্রবাহিনীর সৈন্য ও জনগণের বীরত্ব, ত্যাগস্বীকার ও রণনৈপুণ্যের উচ্চ প্রশংসা করিলেন। অধিকৃত ইউরোপের মুক্তি এবং ক্যাসিজম ও সাম্রাজ্যবাদের চূড়ান্ত পরাজয়ের জন্য ব্রুটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের কথা যেমন এই সমস্ত অভিনন্দনবার্তায় উল্লেখ করা হইল, তেমনি আগামী দিনের পৃথিবীতে শান্তি রক্ষার জন্ত এই তিন শক্তির মধ্যে বন্ধুত্বাপূর্ণ সম্পর্কের যে প্রয়োজন সে কথার উপরও জোর দেওয়া হইল। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তাঁর বার্তায় সংক্ষেপে বলিলেন :

We fully appreciate the magnificent contribution made by the mighty Soviet Union to the cause of civilization and liberty.

আর ট্যালিনের বার্তায় সংক্ষেপে বলা হইল :

The joint effort of the Soviet, U. S and British Armed Forces against the German invaders, which has culminated in the latter's complete rout and defeat, will go down in history as a model military alliance between our peoples. (৪)

অর্থাৎ ট্রুম্যান ট্যালিনের উদ্দেশ্যে লিখিলেন যে সভ্যতা ও স্বাধীনতার আদর্শ রক্ষায় মহাপরাক্রমশালী সোভিয়েত রাশিয়া যে অপূর্ব অবদান রাখিয়াছেন আমরা তা পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করি।

নিম্ন ট্যালিন লিখিলেন ট্রুম্যানের উদ্দেশ্যে :

যতদূর আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটিশ সশস্ত্র ইউরোপে মিলিত প্রচেষ্টার ফলে জার্মানীর যে পূর্ণ পরাজয় ঘটিয়াছে, আমাদের তিন

১৭ মে-র ম-

দেশের জনগণের সামাজিক মৈত্রীর আদর্শ হিসাবে ইতিহাসে তা চিহ্নিত হইয়া থাকিবে।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টোন চার্চিলের অভিনন্দনবার্তায় ষ্ট্যালিন ও লালকোজের অক্টোবর প্রশংসার পর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে লেখা হইয়াছিল :

It is my firm belief that on the friendship and understanding between the British and Russian peoples depends the future of mankind.

অর্থাৎ আমার একান্ত বিশ্বাস যে, বৃটিশ ও রুশ জনগণের পারস্পরিক বন্ধুত্ব এবং বোঝাপড়ার উপরই মানবজাতির ভবিষ্যৎ নির্ভব করিতেছে। (৭)

(চূর্ত্যাক্রমে তিন বিশ্বনেতার এই পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সদিচ্ছাপূর্ণ অভিনন্দনবার্তা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা প্রকাশ সত্ত্বেও মহাযুদ্ধ অবসানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মহামৈত্রীরও অবসান হইল এবং বিভেদ ও বিরোধ দেখা দিতে লাগিল)।

\* \* \*

মস্কোতে সোভিয়েত সভাপতি স্টালিনের এক ডিক্রি অনুসারে ২ মে বিজয় দিবস হিসাবে ঘোষিত হইল এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বত্র উৎসব অহুষ্ঠিত হইল। লালকোজের উদ্দেশ্যে অভিনন্দন জানানো হইল জনগণের পক্ষ থেকে। পৃথিবীর নানা দেশ থেকেও বিজয়ী সোভিয়েত রাশিয়ার উদ্দেশ্যে অভিনন্দনবার্তা আসিল। সর্বাপেক্ষা বেশী উল্লাসনার সৃষ্টি হইল রাজধানী মস্কোতে। সেখানে হাজার হাজার নর-নারী রাস্তায় ভিড় জমাইতে লাগিল। সন্ধ্যাবেলা এক হাজার কামান থেকে লালকোজ ও নো-বাহিনীর উদ্দেশ্যে জিহবারতোশ ধ্বনির দ্বারা অভিবাদন জানানো হইল। ১২৪১-১২৪৫-এর স্বদেশাত্মক যুদ্ধে জার্মানীকে পরাজিত করার জন্য এক বিশেষ পদক ও মেডেল তৈয়ারী হইল এবং ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ৬০ হাজার সৈন্যকে সেই পদক উপহারের দ্বারা সম্মানিত করা হইল। ২৪ মে, ১২৪৫, সোভিয়েত গবর্নমেন্ট ক্রেমলিন প্রাসাদে এক বিরাট ভোজ উৎসবের অহুষ্ঠান করিলেন রেড আর্মির সেনাপতিদের সম্মানের জন্য এবং এই উৎসবে কমিউনিস্ট পার্টির নায়কবৃন্দ থেকে শুরু করিয়া সোভিয়েত সমাজের সর্বস্তরের—সাহিত্যিক ও শিল্পীদের এবং শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিনিধিদের পর্যন্ত আপ্যায়িত করা হইল। আর এক মাস পর ২৪ জুন তারিখে রেড স্কোয়ারে ঐতিহাসিক জয়লাভের জন্য যে প্যারেড অহুষ্ঠিত হইল, তাতে সৈন্য ও অফিসারগণ পতাকা সহ মার্চ করিলেন এবং পরাজিত জার্মান বাহিনীর ছুইশত রণপতাকা লেনিনের স্থিতিসৌধের পদে দেশে নিক্ষেপ করিলেন।

এদিকে ৮ মে, ১২৪৫ বিজয় দিবস উপলক্ষে পশ্চিমের মিত্রপক্ষের স্প্রাট্রীম কমান্ডার জেনারেল আইজেনহাওয়ার যুদ্ধে যোগদানকারী সমস্ত জাতির সৈন্যদের বীরত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য প্রশংসা জানান হইলেন এবং বলিলেন, এই জয় কোন একটা বিশেষ দেশের নয়—প্রকৃতপক্ষে মিত্রপক্ষের প্রত্যেকটি নর-নারীই এই যুদ্ধজয়ে

সহায়তা করিয়াছেন। ষায়া এই মহান কর্তব্য পালনের জন্ত মৃত্যুবরণ করিয়াছেন, জেনারেল আইজেনহাওয়ার তাঁদের স্বতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন।

\*

\*

\*

হিটলারের উত্তরাধিকারীরূপে গ্রাণ্ড অ্যাডমিরাল ডোয়েনিৎস স্লেসবুর্গে যে ‘গবর্নমেন্ট’ স্থাপন করিয়াছিলেন, মিত্র শক্তিবর্গ কখনও সেই গবর্নমেন্টকে স্বীকৃতি দেন নাই। ২৩ মে তারিখ মিত্রশক্তির সুপ্রীম কমান্ডারের এক আদেশবলে সেই গবর্নমেন্টের উচ্ছেদ ঘটানো হইল এবং ডোয়েনিৎস ও তাঁর সরকারের সমস্ত সদস্য ও জার্মান হাইকমান্ডের নেতাদেরকে গ্রেপ্তার করা হইল। যখন মিত্রপক্ষের সৈন্যেরা অ্যাডমিরাল ক্রাইডবুর্গকে (যিনি রেইমস ও বার্লিনে জার্মানীর আত্মসমর্পণের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিয়াছিলেন) গ্রেপ্তারের স্ত্রে তাঁর আবাসে হানা দিল, তখন তিনি তাঁর কিছু জামাকাপড় সংগ্রহের নাম করিয়া বাথরুমে ঢুকিলেন এবং ভিতর থেকে বাথরুমের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন— ক্রাইডবুর্গ সেখানে বিষপানে আত্মহত্যা করিলেন।

বড় বড় নাৎসী নেতা ও সামরিক চাঁইদের গ্রেপ্তার করা হইল। গ্রাণ্ড অ্যাডমিরাল ডোয়েনিৎস ছাড়াও কয়েকজন নামজাদা ফিল্ড মার্শালকে গ্রেপ্তার করা হইল, যথা— হিটলারের ‘সারমেয় সদৃশ ভক্ত’ উইলহেলম কাইটেল, কন্ ক্রাইট (যিনি ১৯৪০ সালে ফ্রান্সের যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন), পশ্চিম বণাক্ষরের শেষ জার্মান সেনাপতি আলবার্ট কেসেলিং (যিনি পূর্বে ইতালীতে ছিলেন), কার্ডিনাল কন্ শোয়েন্নার, সিগমুণ্ড উইলহেলম লিট প্রভৃতি। ‘প্যারিসের জন্মদ’ নামে কুখ্যাত এস এস জেনারেল কার্ল ওবার্গ এবং বড় বড় নাৎসী রাজনৈতিক নেতারাও ধৃত হইলেন। জার্মান লেবর ক্রণ্টের নেতা (দাস-শ্রমিক সংগ্রহে যিনি ওস্তাদ ছিলেন) ডঃ রবার্ট লে, কুখ্যাত ইহুদী হত্যাকারী জুলিয়াস ট্রেইচার, পোলাণ্ডের অভ্যাসচারী গবর্নর হান্স ফ্রাঙ্ক, নাৎসী তাত্ত্বিক দার্শনিক আলফ্রেড রোজেনবার্গ, কুটনীতিবিদ কন্ প্যাপেন এবং আরও ছোট বড় অনেক নেতা ধরা পড়িলেন। এদের সঙ্গে জলে প্রেরিত হইলেন উইলিয়াম জয়েস, যিনি লর্ড ‘Haw-Haw’ নামে নাৎসী রেডিওর প্রচারক-রূপে পরিচিত ছিলেন। (তিনি জাতিতে ইংরাজ ছিলেন, তিনি ধৃত হইয়া লণ্ডনে প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং দেশদ্রোহিতার অপরাধে লণ্ডনের এক কারাগারে তাঁকে ফাঁস দেওয়া হইয়াছিল।) (৬)

নাৎসী জার্মানীর ইতিহাসে হিটলারের পরেই যে দুই ব্যক্তি অত্যন্ত দাপটের সঙ্গে ক্ষমতা জাহির করিয়া আসিতেছিলেন, সেই গোয়েরিং ও হিমলারের অদৃষ্টেও দুর্দিন ঘনাইয়া আসিল। ৮ মে, ১৯৪৫, অস্ট্রিয়ার একটি শহরে রাইখ মার্শাল গোয়েরিং নিজের আত্মসমর্পণ করিলেন। লুক্সম্‌বুর্গ বা জার্মান বিমানবাহিনীর একচ্ছত্র অধিপতি জাঁদরেল গোয়েরিং মার্কিন বাহিনীর নিকট ধরা দিলেন এবং ধরা পড়ার পবেই তিনি উপযুক্ত খাদ্য ও মর্যাদার দাবি করিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উচ্চবরে হিটলারকে ‘একজন সর্বাধিকৃত অজ্ঞ লোক’ বলিয়া নিন্দা করিলেন

এবং বিবেচনাপূর্ণ উপদেষ্টা গলাগালি দিয়া বলিলেন—‘ওটা একটা নির্ভেজাল বদমাশ বা স্কাউন্ডেল’। তিনি আমেরিকানদের সহায়ত্ব আকর্ষণের জন্য আরও বলিলেন যে, তিনি নিজ হাতে জার্মান রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া মিত্রপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া ফুরার তাঁর প্রতি যত্নদণ্ডাজ্ঞা দিয়াছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত কথায় ‘চিঁড়া ভিজিল না’। তাঁকে গ্রেপ্তার করিয়া হুরেমবার্গের আদালতে বিচারের অপেক্ষায় রাখা হইল।

ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর খুনী এবং সবচেয়ে নৃশংস গণ-হত্যাকারী গেস্টাপো (রাজনৈতিক পুলিশ) শুণ্ডা বাহিনীর সর্বোচ্চ সর্দার এবং ইহুদীদের সংহারকারী ও লিডিস্ (চেকোস্লোভাকিয়া) গ্রামেব নিশ্চিহ্নকারী হাইনারিখ হিমলার ২০ মে, ১৯৪৫, মিত্রপক্ষের হাতে ধরা পড়িলেন। সারা জার্মানীর লোক এই ব্যক্তিটিকে যমের মত ভয় করিত। বার্সেটসগাভেনের নিকট একটি গোলাবাড়ীতে এই ব্যক্তিটির লুকানো যে ১০ লক্ষ ডলার ছিল, মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদের অত্মসন্ধানের ফলে সেই বিপুল পরিমাণ মুদ্রাও ধরা পড়িয়াছিল। অথচ বাইরে হিমলার এমন ভড়ং দেখাইতেন যে, তিনি একজন অতি সহজ সরল সাধু প্রকৃতির লোক—মদ, জ্বীলোক ও তাম্রকূট স্পর্শও করেন না। অথচ তাঁর দুইটি রক্ষিতা ছিল। মাত্র ২ বছর বয়সে সে একজন বেথ্যা সঙ্গে বাস করিত। এই বেথ্যাটির নাম ছিল ফ্রাইডা ভাগনার (Frieda Wagner) এবং সে আবার হিমলারের চেয়ে সাত বছরের বড় ছিল। কিন্তু একদিন এই গণিকাটিকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। তখন হত্যার অভিযোগে হিমলারকে আদালতে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু উপযুক্ত সাক্ষ্যের অভাবে সে আদালত থেকে মুক্তি লাভ করে। এরপর হিমলার তার চেয়ে ৭ বছরের বড় একজন নার্সকে বিবাহ করে এবং তাঁর টাকা দিয়া মিউনিখের নিকট একটি মুগাঁর কারবার খোলে। কিন্তু এই কারবার কেল পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত বিবাহও ব্যর্থ হয়। এদিকে তাঁর একজন ব্যক্তিগত মহিলা সেক্রেটারি ছিল। হিমলার তার সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতাই শুরু করিলেন যে, সেক্রেটারি মহোদয় দুইবার গর্ভবতী হইলেন—একটি ছেলে ও একটি মেয়ে তিনি প্রসব করিলেন। হিমলারের কিন্তু তখনও বৈধ দ্বী বর্তমান ছিল। (৭)

এহেন ভণ্ড ও অসৎ প্রকৃতির লোক হিমলার কর্তৃক হিটলারের পরেই জার্মানীর দণ্ডযুগের কর্তা ছিলেন। কিন্তু জার্মানীর পতনের পর হিমলার মিত্রপক্ষের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে আত্মগোপন করিলেন—গোঁফ কামাইয়া ফেলিলেন এবং ডান দিকের চোখের উপর এক পোচ কালো কালির রঙ লাগাইলেন। তিনি সিভিলিয়ানের বা অ-সামরিক ব্যক্তির পোশাকে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া যখন হ্যাঙ্গারের নিকট একটি সেতু পার হইতেছিলেন, তখন বৃটিশ সৈন্যেরা তাঁকে ধরিয়া ফেলে। তিনি তাঁর গ্রেপ্তারি এড়াইবার জন্য জাল কাগজপত্র দেখাইলেন। তাতে তাঁর পরিচয় লেখা ছিল নিৎজিংগার (Nitzinger)—জার্মান সিকিউরিটি পুলিশের একজন পদচ্যুত ব্যক্তি। কিন্তু গ্রেপ্তারকারীরা তাতে তুলিলেন না। তাঁর দেহ তল্লাসী করা হইল এবং একজন

ডাক্তার ডাকিয়া যখন তাঁর মুখ খুলিবার চেষ্টা হইল, তখন গেষ্ঠাপো সর্দার তাঁর মুখের মধ্যে লুকানো নীলরংয়ের বিবের ছোট্ট শিশিটি দাঁত দিয়া ভাঙিয়া বাইয়া ফেলিলেন। হিমলার দুই মিনিটের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন। ‘গণ-হত্যাকারীর জীবনের এটাই বোধ হয় ছিল সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন কাজ’—মন্তব্য করিয়াছেন মার্কিন ঐতিহাসিক ব্লাইডার। পাইনের জঙ্গলের মধ্যে তাঁর মৃতদেহ একটা গর্তের মধ্যে গোর দেওয়া হইল এবং তাঁর এই বিদগ্ধটে অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে একজন গোরা দৈন্ত বলিয়া উঠিলেন :

‘Let the worm go to the worms’ !

অর্থাৎ ‘স্বগা কীটকে কীটের দলেই যেতে দাও।’

\* \* \*

নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের ফলে জার্মান রাষ্ট্র ও গবর্নমেন্টের সমস্ত ক্ষমতা বিজয়ীপক্ষ বা দখলকারী শক্তিবর্গের হাতে চলিয়া গেল এবং ৫ই জুন, ১৯৪৫ জার্মানীর পরাজয়ের ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরিত হইল। সোভিয়েত রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স—এই চতুঃশক্তি জার্মানীর সবকার ও হাইকমান্ডেব এবং জার্মানীর অভ্যন্তরস্থ সমস্ত অঞ্চল ও পৌর এলাকার সর্বপ্রকার ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিলেন। জার্মানীর সমস্ত স্থল-বাহিনী ও নৌ-বাহিনীকে নিরস্ত্র করার নির্দেশ দেওয়া হইল এবং সমগ্র জার্মানীকে ভবিষ্যৎ শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে নিরস্ত্র করার অধিকার ও মিত্রপক্ষ নিজেদের হাতে রাখিলেন। জার্মানীর হাতে মিত্রপক্ষের যে সমস্ত যুদ্ধবন্দী ছিল, তাদের সকলকে কেবল দেওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া হইল। প্রধান নাৎসী নেতাদেরকে এবং যথা যুদ্ধাপরাধী বলিয়া সন্দেহ হইল, তাদের সকলকে গ্রেপ্তার করা হইল।

মিত্রপক্ষের মধ্যে চুক্তি অনুসারে সমগ্র জার্মানী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ফ্রান্স—এই চার শক্তির মধ্যে বিভক্ত হইল। নিখিল জার্মানীর শাসন ও নিয়ন্ত্রণের ভার একটি কন্ট্রোল কাউন্সিলের হাতে অর্পণ করা হইল এবং কাউন্সিল দখলদার বাহিনীর চারজন প্রধান সেনাপতিকে নিয়া গঠিত হইল। কিন্তু কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হওয়ার নিয়ম ছিল। কিন্তু জার্মানীর রাজধানী বার্লিন সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইল। কারণ, বার্লিন ছিল পূর্ব জার্মানীর সোভিয়েত অধিকৃত এলাকার মধ্যে। অথচ চতুঃশক্তির কন্ট্রোল কাউন্সিলের সদর দপ্তরও প্রতিষ্ঠিত হইল বার্লিনে। সুতরাং বৃহত্তর বার্লিন ও দখলদার চতুঃশক্তির মধ্যে চারটি সেক্টরে কিংবা খণ্ডাংশে বিভক্ত হইল এবং প্রত্যেকটি খণ্ডাংশ এক-একজন কমান্ডারের পরিচালনাধীনে আনা হইল। এই চারটি অংশের সাধারণ সমস্যাগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য একটি ‘Inter-Allied Commandatura’ (এই শব্দটি রাশিয়ান) গঠিত হইল। কিন্তু সাধারণভাবে এই ‘কমান্ডাটুরা’ কন্ট্রোল কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল। বলা বাহুল্য যে, নাৎসী পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হইল।

কিন্তু খাস জার্মানী রণক্ষেত্রে পরিণত হওয়ার ফলে উহার বিতর্পি অংশ এবং

শহর জনপদ ইত্যাদি ভয়াবহরূপে ধ্বংস হইয়াছিল। পলায়মান জার্মান সৈন্যেরা হিটলারের নির্দেশে বহুস্থানে পাড়ামাটির নীতি অহুসরণ করিয়াছিল। কলে খাদ্য ও জীবনধারণের দৈনন্দিন বস্তু এবং যানবাহন ইত্যাদির প্রচণ্ড অভাব ঘটিল। জনসাধারণের দুর্গতি ও দুর্ভোগের কোন সীমা ছিল না। তথাপি মিত্রপক্ষ এই অবস্থায় জার্মান জনগণকে খাদ্য ও সাহায্য দেওয়ার জন্য বধ্যাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

সোভিয়েত অধিকৃত জার্মানীর পূর্বাংশে এবং পূর্ব বার্লিনের বড় বড় রাস্তার ও রাস্তার মোড়ে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ এই মর্মে নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি টানাইয়া দিলেন :

‘Hitlers come and go, but the German people and German state go on—STALIN’

অর্থাৎ “হিটলারেরা যায় এবং আসে। কিন্তু জার্মান জাতি ও রাষ্ট্র চিরকাল থাকিবে—ইতি, স্ট্যালিন।”

নোটিশে জার্মান স্টেট বা রাষ্ট্র শব্দটি উল্লেখ থাকায় অনেকে ভাবিয়াছিলেন যে, একটি কেন্দ্রীয় জার্মান সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় নাই। তবে, পূর্ব জার্মানীর কোন কোন অংশে সোভিয়েত সৈন্যদেব সঙ্গে জার্মান তরুণ-তরুণী দর বেশ ‘ভাব’ হইয়াছিল এবং রুশরা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সহায়তা দানেরও চেষ্টা করিতেন (১)

\*

\*

\*

অধিকৃত জার্মানীতে ‘গুপ্তধনের’ও সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। মার্কিন বাহিনীর বিশিষ্ট সেনাপতি জেনারেল প্যাটন যখন ফ্রাঙ্কফুর্ট অনু মেনে অঞ্চলের দিকে অভিযান করিয়াছিলেন, তখন ৭৫ মাইল উত্তর-পূর্বে (বিমানপথে) অকস্মাৎ দুইটি জার্মান জীলোকের কথাবার্তা থেকে মার্কাস (Merkers) লবণখনির নিকট এই গুপ্তধনের সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। এই ধর অমুসারে খনির ভূগর্ভে জার্মান সরকারের লুকানো ২০ কোটি ডলার মূল্যের স্বর্ণভাণ্ডার (অর্থাৎ জার্মানীর মজুত সোনার একটা মোটা অংশ) আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং সেই সঙ্গে পাওয়া গিয়াছিল ২৭৫ কোটি রাইখমার্ক, ডলারের হিসাবে যার মূল্য ছিল ৮ কোটি ৪০ লক্ষ। এই বিপুল পরিমাণ অর্থসম্পদ ছাড়াও খনিগর্ভের ২১০০ ফুট নীচে একটি ভণ্টের মধ্যে বার্লিনের একটি নামকরা মিউজিয়মের প্রচুর চিত্রকলা পাওয়া গিয়াছিল, যার মূল্য ছিল অপরিমিত। (২)

এখানে আরও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মার্কিন ঐতিহাসিক উইলিয়ম শাইরারের মতে হিটলার-গোয়েরিং নাৎসীচক্র অধিকৃত ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে এত ধনসম্পদ স্বর্ণ ধাতু এবং কলকারখানা-জাত উৎপন্ন দ্রব্য ও চিত্রকলা ইত্যাদি লুণ্ঠনপূর্বক জার্মানীতে আনিয়াছিলেন যে, কোন মুদ্রার অঙ্কেই তার হুনির্দিষ্ট হিসাব (হাজার হাজার কোটি ডলারের) করা সম্ভব ছিল না। বিভিন্ন ব্যাক থেকে ‘ক্রেডিট’ হিসাবেও অল্প মুদ্রা আদায় করা হইয়াছিল। অধিকন্তু দখলদার সৈন্য

(১) আলেকজান্ডার ওয়ার্ল, পৃষ্ঠা ৮৮৪

(২) দি লাট্ হাণ্ড ডেইজ, পৃষ্ঠা ৪০২

বাংলার রক্ষণাবেক্ষণ ও ক্ষতিপূরণের নাম করিয়া এক একটা দেশকে শোষণপূর্বক প্রায় রক্তশূন্য করা হইয়াছিল। অর্থাৎ জার্মান লুণ্ঠের কোন সীমা-পরিমিতা ছিল না।(১০)

অতরাং নাৎসী জার্মানীর পরাজয় ও আত্মদমর্পণ ইউরোপকে যে অধিকতর সর্বনাশ থেকে রক্ষা করিয়াছে, তাতে কোন সন্দেহ নাই।

(১০, শাইরার, পৃষ্ঠা ১১২২-২২)



## নবম পর্ব

### নবম অধ্যায়

রাষ্ট্রসংঘের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা : সানজোহানসিকোর সম্মেলন

ইউরোপে যখন প্রচণ্ড বেগ যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন থেকেই মিত্রশক্তির নেতারা মহাযুদ্ধের শেষে ভবিষ্যৎ বিশ্বশান্তি রক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার কথা গাণিত্যেছিলেন। ১৯৪৩ সালের ১২ থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত মস্কোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও সোভিয়েত রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনের ভবিষ্যৎ শান্তি রক্ষা ও নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে বিস্তৃত আলোচনার পর যে সাত দফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, তাতে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার প্রস্তাব ছিল এবং এই ইস্তাহারে চীনের বাটুমতও স্বাক্ষর দিয়াছিলেন। সুতরাং কার্যত এটি ছিল চতুর্শক্তির ঘোষণাপত্র (১)

মিত্রশক্তির পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এই প্রস্তাব অনুযায়ী ২১ আগষ্ট থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪৪, ওয়াশিংটনের ডায়াটন ওকস্ ভবনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, সোভিয়েত রাশিয়া ও চীনের প্রতিনিধিদের যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাতে পুনরায় আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটি “বিশ্ব সংগঠন” গড়িয়া তোলা এবং একটি সিকিউরিটি কাউন্সিল গঠনসহ চার দফা প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। ডায়াটন ওকসের এই সমস্ত প্রস্তাব অনুযায়ীই ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রসংঘের কাঠামো তৈয়ারির সূত্রপাত হইয়াছিল এবং সেই উদ্দেশ্যে বৃহত্তম আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইয়ান্টাতে (ক্রিমিয়া) তিন বিশ্বনেতা মার্শাল স্ট্যাালিন, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এবং প্রধানমন্ত্রী চার্চিল যে ঐতিহাসিক বৈঠকে মিলিত হইয়াছিলেন, সেই বৈঠকে মহাযুদ্ধের শেষে অবিলম্বেই আন্তর্জাতিক শান্তি ও স্বস্তি রক্ষার জন্য একটি সংগঠন স্থাপনের কথা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হইয়াছিল। কেননা, তখন জার্মানীর আসন্ন পরাজয় ও পতন সম্পর্কে আর কাহারও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু এই প্রকার মহাবিপর্ষের যাতে আর পুনরাবৃত্তি না ঘটিতে পারে, সেজন্য তিন বিশ্বনেতাই অত্যন্ত উদগ্রীব ছিলেন। সুতরাং ইয়ান্টা সম্মেলনে সিদ্ধান্ত করা হইল যে, ডায়াটন ওকসের প্রস্তাব অনুযায়ী আগামী ২৫ এপ্রিল, ১৯৪৫, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত সানজোহানসিকোতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি সম্মেলন আহ্বান করা হইবে এবং সেখানে প্রস্তাবিত রাষ্ট্রসংঘের একটি চার্টার বা সনদ রচিত হইবে। এই বিষয়ে চার্চিল, রুজভেল্ট ও স্ট্যাালিন একমত ছিলেন এবং যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থাতেই তাঁরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করিত ছিলেন। তাঁরা একথাও

উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, হিটলার-বিরোধী কোয়ালিশনের তিন বৃহৎ শক্তির মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতা না থাকিলে আগামী দিনের পৃথিবীতে শান্তি ও স্বস্তি রক্ষা করা যাইবে না। চার্লস সেই সময় এমন মনোভাবও প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, সোভিয়েত রাশিয়া কমিউনিস্ট রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও তার সঙ্গে পারস্পরিক গ্ৰায়সত্ত্ব স্বার্থ ও নিরাপত্তা রক্ষার পক্ষে কোন অন্ত্রবিধা হইবে না। আর প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫, লিখিয়াছিলেন—“আমরা তিন বাহু যেমন যুদ্ধের সময় সহযোগিতা করিতে পারিয়াছি, তেমনি শান্তির সময়েও সহযোগিতা করিতে পারিব।” (২)

ইয়ান্টা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৫ এপ্রিল, ১৯৪৫ স্তানফ্রানসিস্কা শহরে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু হইল, কুটনীতির ইতিহাসে সেটা ছিল অত্যন্ত বৃহত্তম সম্মেলন এবং সেই ২৫ এপ্রিল তারিখটিও ছিল গভীর তাৎপর্যবাহক। কারণ, ওই দিন জার্মানীর অভ্যন্তরে এলবে নদীর ধারে টোরগাউতে সোভিয়েত ও ইং-মার্কিন বাহিনী পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলাইয়াছিলেন। সেই সময় মিত্রপক্ষের অনেকের নিকট এই মিলন এবং স্তানফ্রানসিস্কা সম্মেলন ভবিষ্যতের শান্তি রক্ষার জন্য বৃহৎ শক্তিবর্গের ঐক্য ও সহযোগিতার প্রতীক রূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল। সম্মেলন ভবনে বিভিন্ন দেশের জাতীয় পতাকা পবলোকগত প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের দৃষ্টির প্রতি অঙ্কা নিবেদনের উদ্দেশ্যে অর্ধনমিত করা হইয়াছিল এবং প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টই যে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর শান্তি রক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশী আগ্রহান্বিত ছিলেন এবং স্ট্যালিন তথা সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাতেও কোন সন্দেহ নাই।

সেই সময় স্তানফ্রানসিস্কা ছিল আমেরিকার প্রাশস্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধযাত্রার সবচেয়ে বড় ঘাটি। সুতরাং এই কর্মস্থল ও জনাকীর্ণ শহরে ৪৬টি (পরে আরও ৪টি) জাতির হাজার হাজার প্রতিনিধি, বিশেষজ্ঞ ও কর্মচারী যখন আসিয়া হাজির হইলেন প্লেন ও ট্রেনযোগে তখন এতগুলি লোকের জন্য আতিথেয়তার প্রস্তুতিও সহজ ছিল না। অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়ম, বলিভিয়া ও “ভারত” (অবশ্যই বৃটিশ সরকারের মনোনীত প্রতিনিধি) থেকে শুরু করিয়া যুগোস্লাভিয়া পর্যন্ত ৪৬টি জাতি (পরে বেলোরুশিয়া, উক্রাইন এবং ডেনমার্ক ও আর্জেন্টিনা—এই চারটি দেশের প্রতিনিধিরাও যোগ দিয়াছিলেন) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ হিসাবে সম্মেলনে যোগ দিলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর জেনেভাতে যে লীগ অব নেশন্স গঠিত হইয়াছিল এবং যদিও সেই সংগঠনেরও উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর শান্তি রক্ষা, তবু শেষ পর্যন্ত সেটা ব্যর্থতার পর্ববসিত হইয়াছিল এবং তদানীন্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসন পশ্চিম ইউরোপীয় কূটনৈতিক নেতাদের চালবাজিতে বিরক্ত ও হতাশ হইয়াছিলেন (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই রাষ্ট্রসংঘে কখনও যোগ দেন নাই)। সেই ব্যর্থতার ইতিহাস থেকে এবারের মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও মিত্রপক্ষের নেতারা সাবধান হইয়াছিলেন। সেবার লীগ অব নেশন্স বা বিশ্বরাষ্ট্রসংঘ গঠিত হইয়াছিল মহাযুদ্ধের অবসানের পর এবং সেই সময় মিত্রপক্ষীয় নেতারা বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বদলে পরাজিত

জার্মানীকে একটা শাস্তিসন্ধি মারফৎ কত বেশী জব্দ করা যায়, যেন সেদিকেই বেশী মনোযোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু এবার তার বিপরীত দৃশ্য দেখা গেল। এবার জার্মানি বা ক্যাসিটে শক্তিবর্গের চূড়ান্ত পরাজয় কিংবা বৃদ্ধাবসানের অনেক আগে থেকেই, এমন কি বলা যাইতে পারে যে, ১৯৪১ সালের ১৪ই আগস্ট চার্লিল-রুজভেণ্ট ঘোষিত অতলা'ন্তিক সনদের অনুচ্ছেদগুলিব মধ্যেই ভাবী পৃথিবীর শাস্তি রক্ষাব বীজ উৎপন্ন করা হইয়াছিল এবং ১৯৪৩ সালের মস্কোতে পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠক থেকে শুরু করিয়া ১৯৭৫ সালের ফ্রুয়ারি মাসের ইয়ান্টাতে মিত্রপক্ষীয় শীর্ষ সম্মেলন পর্যন্ত বারবাব এই প্রশ্নটি নিয়া আন্দোলন করা হইয়া ছিল। সুতবাং প্রথম মহাযুদ্ধের তুলনায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের-তিন প্রধান নেতা রুজভেণ্ট চার্লিল স্ট্যালিন অনেক বেশী বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন।

১৯৪২ সালের ১লা জানুয়ারি ইউনাইটেড নেশন্স বা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষণায় যে সমস্ত রাষ্ট্র স্বাক্ষর দিয়াছিলেন কিংবা পরে যারা এই ঘোষণার শর্ত মানিয়া লইয়া ক্যাসিটে শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। তাবা সকলেই শ্রানজ্ঞানসিঙ্ঘে সম্মেলনে যোগ দিয়াছিল, কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের তুলনায় এবারের মহাযুদ্ধেব রাজনৈতিক চরিত্র সম্পূর্ণ স্ব-স্ব ছিল। কেন না, এবারের মহাযুদ্ধে পৃথিবীর একমাত্র সোসিয়েলিষ্ট রাষ্ট্র সোভিয়েত বা'শয়ার প্রাধান্য ছিল। কলে, হিটলারী জার্মানীর বিরুদ্ধে যোগদানকারী মিত্রপুঞ্জের শাসকমহলে যারা প্রতিক্রিয়াপন্থী ছিল, তাবা নানা ছুতায় ও কোশলে রাশিয়ার বিকলচরণের সুযোগ খুঁজিত। শ্রানজ্ঞানসিঙ্ঘে সম্মেলনেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নাই। যে ৪৮টি রাষ্ট্র বৃহৎ চতুর্ভুজ কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া ছিল, সেগুলিব মধ্যে ১৯টি ছিল লাতিন আমেরিকার দেশ এবং ৫টি ছিল বৃটিশ ডোমিনিয়ন। সুতবাং জাতিপুঞ্জ বা রাষ্ট্রসংঘের সংগঠনে বৃটিশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেব যেকোনো স্থানান্তরিত হইল। এই দেশগুলি ছাড়া তথাকথিত নিরপেক্ষ দেশ, যেমন—আয়ার, আইসল্যান্ড, পর্তুগাল ও সুইডেন আমন্ত্রিত হইল এবং ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া ও গ্রামও বাদ গেল না—যদিও তখন পর্যন্ত এগুলির সকলেই সম্পূর্ণরূপে ক্যাসিটে বাহ্যমুক্ত ছিল না। অপর পক্ষে আলবানিয়া, পোল্যান্ড ও মন্টেনিগ্রান প্রজাতন্ত্রকে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ আমন্ত্রণ জানাইতে অস্বীকৃত হইলেন। কেননা, এই রাষ্ট্র গুলিকে বুটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখনও কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেন নাই। প্রাক্তন শত্রুরাষ্ট্র ইতালী, রুম্যন্যা, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী এবং ফিনল্যান্ড'কও সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয় নাই। ইঙ্গ-মার্কিন কর্তৃক স্বীকৃতি অস্বীকৃতির প্রশ্নে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আমন্ত্রিত ৪২টি রাষ্ট্রের সকলেব সঙ্গেই সোভিয়েত রাশিয়ারও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল না। তবু রাশিয়া এদের উপস্থিতি মানিয়া লইয়াছিল। কিন্তু আর্জেন্টিনার প্রদ্বৈ সোভিয়েত প্রতিনিধি মলোটভ তীব্র আপত্তি জানানাইলেন। কারণ, যুদ্ধের সময় আর্জেন্টিনা সরকার শত্রুপক্ষকে সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাঁর সমর্থকগণ আর্জেন্টিনাকে গ্রাণেব জন্ত জিদ করিলেন। সুতরাং ৩০ এপ্রিল আর্জেন্টিনাকে সম্মেলনে যোগদানের জন্ত আহ্বান জানানো হইল। যে পাঁচটি বৃটিশ ডোমিনিয়ন সম্মেলনে যোগদানের জন্তে আমন্ত্রিত হইল, সেগুলি নিম্নরূপে

সার্বভৌম রাষ্ট্র ছিল না। কিন্তু তারা শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে, এই বৃত্তিতে সম্মেলনে আহুত হইল।

অপর পক্ষে ইয়ান্টাভে প্রস্তাবিত রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে স্ট্যালিন রুজভেল্টের নিকট ১৬টি অতিরিক্ত ভোটের দাবি জানাইয়াছিলেন। কেননা, সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৬টি প্রজাতন্ত্র বা স্বাধীন অঙ্গরাজ্য নিয়া গঠিত। সুতরাং এদের প্রত্যেকের একটি করিয়া ভোটদানের অধিকার থায়া উচিত। এর জবাবে রুজভেল্ট বলিলেন যে, তাঁরও অতিরিক্ত ৪৮টি ভোটের দরকার। কেননা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৪৮টি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র নিয়া গঠিত। সুতরাং তাঁরও অনুরূপ সংখ্যক ভোট চাই। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তাঁর আশ্চর্য্যভর্য্যত লিখিয়াছেন যে, রুজভেল্টের কাছ থেকে তুড়ুক জবাব পাইয়া স্ট্যালিন একেবারে চূপ করিয়া যান। তিনি আর ১৬টি ভোটের নামগন্ধও করিলেন না। তবে, সোভিয়েত ইউনিয়নের ২টি রিপাব্লিককে—উক্রাইন ও বেলোরুশিয়াকে রাষ্ট্রপুঞ্জব সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছিল। চার্চিল ও রুজভেল্ট ইয়ান্টাভেই স্ট্যালিনের এই প্রস্তাবে রাজী হইয়াছিলেন (৩)

(আসলে পাঁচটি বৃটিশ ডোমিনিয়নের ভোটাধিকার 'লাভের জন্তই চার্চিল স্ট্যালিনের প্রস্তাব মানিয়া নিয়াছিলেন।)

সুতরাং স্তানক্রানস্কে সম্মেলনে সোভিয়েত রাশিয়ার ২টি অতিরিক্ত সদস্যপদের দাবি মঞ্জুর হইল। কিন্তু সোভিয়েত-প্রভাবিত পোল্যান্ডকে কিছুতেই গ্রহণ করা হইল না।

\* \* \*

অধিবেশনের প্রথম দিনে বৃহৎ চতুঃশক্তি অর্থাৎ বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া এবং চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রিগণ আগামী দিনের পৃথিবীতে যুদ্ধ নিবারণ এবং নিরাপত্তা বিধানের জন্য জাতিপুঞ্জের পক্ষ থেকে একটি শক্তিশালী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যে গড়িয়া তোলা দরকার, এই তথ্যের উপর বিশেষ জোর দিলেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হিটলার-বিরোধী কোয়ালিশনের মধ্যে যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও ঐক্যের প্রয়োজন সোভিয়েত প্রতিনিধির বক্তৃতায় সেই দিকটা খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিল। বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ ইডেন তাঁর বক্তৃতায় সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলিলেন যে, যদি ভবিষ্যতে শান্তি রক্ষা করিতে না পারা যায় এবং আর একটি বিশ্বযুদ্ধ লাগে, তবে সমগ্র মনুষ্যসভ্যতা ধ্বংস হইয়া যাইবে।

সাধারণত ভাষারটন ওকসের গৃহীত প্রস্তাবাবলীর উপর ভিত্তি করিয়াই সম্মেলনের মূল কর্মসূচী অনুসৃত হইতেছিল বটে, কিন্তু সেই বৈঠক আসলে সীমাবদ্ধ ছিল মাত্র চারটি বৃহৎ শক্তির মধ্যে। সুতরাং এবারের বৃহত্তর সম্মেলনে ছোট ছোট শক্তির পক্ষ থেকে কতকগুলি গুরুতর বিষয়ে যেমন বিতর্কের অনুষ্ঠান হইল, তেমন কোন কোন প্রস্তাবের সংশোধনেরও চেষ্টা হইল। এই সমস্ত বিতর্কের উদ্যোক্তা ছিলেন

অট্টেলিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী জু ইভাচু। তিনি প্রস্তাবিত সিকিউরিটি কাউন্সিলের সমালোচনা করিয়া বলিলেন যে, এই পরিষদের হাতে এত ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে যে, সমগ্র সংগঠনের উপর পরিষদের (কাউন্সিলের) ডিক্টেটরি প্রতিষ্ঠিত হইবে। বৃটেন, সোভিয়েত রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও ফ্রান্স এই পঞ্চাশতাই সিকিউরিটি কাউন্সিলের স্থায়ী সদস্য। এঁরা ছাড়া জেনারেল এসেমবলি কর্তৃক আরও ৬টি জাতির প্রতিনিধি সমস্তপক্ষে নির্বাচিত হইবেন—প্রত্যেকে দুই বছরের জন্য। অর্থাৎ স্থায়ী ও অস্থায়ী সহ সিকিউরিটি কাউন্সিল মোট ১১ জন সদস্য নিয়া গঠিত হইবে। কিন্তু সম্মেলনে দিনের পর দিন গভীর বিতর্ক চলিল সিকিউরিটি কাউন্সিলের ভোটদানের অধিকার ও পদ্ধতি নিয়া এবং যুদ্ধ নিবারণের জন্য আন্তর্জাতিক সংগঠনের মূলনীতি ও সনদ বা চার্টার রচনা নিয়া। সমস্ত আন্তর্জাতিক বিরোধের ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় সিকিউরিটি কাউন্সিলের স্থায়ী পাঁচ সদস্যকে এক মত হইতে হইবে, অল্পখা সেই সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাব বাতিল হইয়া যাইবে। বৃহৎ শক্তিবর্গের এই ভিত্তিতে প্রয়োগের অধিকার নিয়া ছোট ছোট শক্তিসমূহ ভীত সমালোচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৃহৎ পঞ্চাশতীর ভিত্তিতে প্রয়োগের অধিকার মানিয়া লওয়া হইল। কেননা বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠা ছাড়া শান্তিরক্ষা করা কিংবা কোন বিরোধের মীমাংসা করা যে সম্ভব নয়—এই বাস্তব সত্যটা সম্মেলনে স্বীকার করিয়া নেওয়া হইল। সেই সঙ্গে বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে এটাও স্থির হইল যে, “সিকিউরিটি কাউন্সিল কোন বিরোধের আলোচনা উত্থাপনে কোন একটি মাত্র রাষ্ট্র বাধা দিয়া রাখিতে পারিবে না।” (৬)

আগামী দিনের পৃথিবীকে যুদ্ধ, আগ্রাসন বা বলপ্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন থেকে রক্ষা করার জন্য সম্মেলনে উপস্থিত ছোটবড় কোন দেশের প্রতিনিধিরই আগ্রহের অভাব ছিল না এবং বহু তর্ক-বিতর্ক ও সংশোধনের পর ডায়ারটন ওকসের গৃহীত প্রস্তাব ও মূলনীতির উপর সনদ রচনাও কোন বাধা রহিল না।

২৬শে জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নুতন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান অধিবেশনের উপসংহার বক্তৃতায় বলিলেন :

“এই সনদ কোন একটি মাত্র জাতির কিংবা ছোট বড় কোন জাতিগোষ্ঠীর রচিত নয়। এই সনদ রচনা সম্ভব হইয়াছে পরস্পরের দেওয়া-নেওয়ার ভিত্তিতে এবং অপরের মতামত ও স্বার্থের প্রতি সহনশীলতার ভিত্তিতে। এর দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, সাধারণ মানুষের মত জাতিসমূহও তাঁদের মত বৈষম্য প্রকাশ করিতে, সেগুলির মুখোমুখি দাঁড়াইতে এবং মীমাংসাব জন্য একটি সাধারণ ভিত্তিভূমি খুঁজিয়া পাইতে পারেন। গণতন্ত্র এটাই দারবস্ত এবং ভবিষ্যৎ শান্তি রক্ষারও এটাই মূল মন্ত্র।”

পৃথিবীর জনগণের পাঁচভাগের মধ্যে চারভাগের প্রতিনিধি তুলা মোট ৫০টি জাতি ভবিষ্যৎ মহাজাতির বহু সমস্যার মীমাংসার একত্র একাক্ষ করিতে সম্মত হইলেন এবং ৫০টি জাতির প্রতিনিধিরা এই নুতন সনদ বা চার্টারে স্বাক্ষর দিলেন।

চূড়ান্তভাবে গৃহীত সনদের মূখবন্ধে (কিন্তু মার্শাল স্মার্টসের রচিত) ঘোষণা করা হইল ;

We, the peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war...to reaffirm faith in fundamental human rights . to establish conditions under which justice can be maintained...to promote social progress and better standards of life in larger freedom...to practise tolerance and live together in peace with one another, as good neighbours ..to unite our strength to maintain international peace and security...have resolved to combine our efforts to accomplish these aims ..” (৫)

এই সনদের বলে যে আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে, তার সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের সমান সার্বভৌম অধিকার স্বীকার করা হইবে এবং এই সমস্ত সদস্য-রাষ্ট্র হইতেছেন তাঁরা (অন্তত আপাতত সাময়িকভাবে) যারা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যে, তাঁরা সমস্ত আন্তর্জাতিক বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা করিবেন, অস্ত্র কোন রাষ্ট্রকে ভীতিপ্রদর্শন কিংবা বলপ্রয়োগ থেকে ক্ষান্ত থাকিবেন। যদি এই আন্তর্জাতিক সংগঠন সনদের গৃহীত মূলনীতি বিরোধী কার্যকলাপের জন্য কোন রাষ্ট্রের (সদস্য হোক বা নাই হোক) বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য হয়, তবে, সদস্য রাষ্ট্রগণ সর্বতোভাবে সংগঠনকে সাহায্য দিবেন।

এই বিষয় সংগঠনের পাঁচটি প্রধান অঙ্গ বা সেক্রেটারিয়েট থাকিবে এবং সনদ অনুযায়ী প্রত্যেকের সুনির্দিষ্ট কর্তব্য থাকিবে। সমস্ত সদস্য, রাষ্ট্র নিয়া একটি জেনারেল এসেম্বলি গঠিত হইবে এবং সেখানে যে কোন সদস্য যে কোন বিষয় নিয়া (চার্টারের বর্ণিত বিষয় অনুযায়ী) আলোচনা উত্থাপন করিতে পারিবেন। আর সিকিউরিটি কাউন্সিল আগ্রাসন বা যুদ্ধ নিবারণের জন্য সাময়িক সহায়তা পাইবেন এবং এই সাহায্য দেওয়ার জন্য একটি মিলিটারি ট্রাক কমিটি গঠিত হইবে। তবে আগ্রাসন বা যুদ্ধ নিবারণের ক্ষেত্রে সিকিউরিটি কাউন্সিলের স্থায়ী সদস্যসহ ৭ জন সদস্যকেই একমত হইতে হইবে।

সনদের নিয়মামুযায়ী ১৫ জন সদস্য নিয়া একটি আন্তর্জাতিক বিচারালয়ও গঠিত হইল এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে অনুশীলন ও রিপোর্ট করার জন্য একটি সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনোমিক কাউন্সিল গঠিত হইল। পৃথিবীব্যাপী জনগণের পূর্ণ জীবিকার ব্যবস্থা ও জীবনের মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে নিয়াই এই সমস্ত সংস্থা গঠিত হইল।

এগুলি ছাড়াও প্রথম মহামুন্দের জের স্বরূপ যে-সমস্ত ভূমিখণ্ড, অঞ্চল ও দ্বীপপুঞ্জ পরাধীন কিংবা লীগের ম্যাণ্ডেট অনুযায়ী ইজারাভুক্ত ছিল—বিশেষত প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের পরিচালনাধীন ছিল, সেই সমস্ত দ্বীপ ও এলাকা নতুন করিয়া বিলি ব্যবস্থার প্রদত্ত উঠিল। কারণ, জাপানের দখলদারি বা ইজারা থেকে এই সমস্ত

অঞ্চল ও দ্বীপগুলিকে মুক্তি দেওয়া হইবে, এই নীতি আগেই মিত্রপক্ষের তরফ থেকে ঘোষিত হইয়াছিল। কিন্তু সদ্য গৃহীত রাষ্ট্রসংঘের চার্টার অনুযায়ী এগুলির বিনি-ব্যবস্থা করিতে গিয়া দেখা গেল যে, সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রসমূহ এই বিষয়ে খুব উৎসাহী নন। অথচ সনদ অনুযায়ী সকলের সমান অধিকার এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের কথা ঘোষিত হইয়াছিল। এদিক দিয়া সোভিয়েত রাশিয়ার বিবেকবুদ্ধি ও নীতি পরিষ্কার ছিল। কারণ, তাঁরা সর্বপ্রকার সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশিকতার বিরোধী ছিলেন। পরলোকগত প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টও উপনিবেশের বিরোধী ছিলেন এবং যদিও তাঁর উত্তরাধিকারী প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান মুখে অল্পরূপ কথা বলিতেন, তথাপি প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকার বিপুল উপনিবেশিক স্বার্থের (শুয়াম, ফিলিপিন্স ইত্যাদি) কথা মার্কিন প্রতিনিধিরা ভুলিতে পারিলেন না। বিশেষত মার্কাল, ম্যারিয়ানা ও ক্যারোলাইন দ্বীপপুঞ্জ ও অন্যান্য দ্বীপ, যেগুলি জাপানের শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত হইয়াছিল, সেগুলির বিষয়ে মার্কিন নিরাপত্তার প্রশ্ন উঠিল। এছাড়া ব্রিটিশ ও ওলন্দাজদের সাম্রাজ্য ও উপনিবেশের প্রশ্ন তো ছিলই। (৬)

অতীত এই সমস্ত দ্বীপ, ভূখণ্ড ও অঞ্চল সম্পর্কে সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত পশ্চিমী মিত্রবর্গের মতভেদ দেখা দিল এবং রাষ্ট্রসংঘের ট্রাস্টিশিপ বা অর্ধগণিত অধীন আনয়নের প্রশ্নে বিভণ্ডার সৃষ্টি হইল। অবশেষে উভয় পক্ষের মতামতের মধ্যে আপোসরূপ হিসাবে স্থির হইল যে, ট্রাস্ট-এলাকাভুক্ত অঞ্চলগুলির জনগণকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত উন্নয়নের প্রশ্নে সহায়তা দেওয়া হইবে এবং ধাপে ধাপে স্বাধীনতা বা স্বাধিকার অর্জনের সুযোগ দেওয়া হইবে।

সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের রাষ্ট্রসংঘের (ইউ. এন.) সনদে সমস্ত জাতির সমান অধিকার, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, অপর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা এবং সমস্ত আন্তর্জাতিক বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা করার সূচনামূলক ঘোষণা প্রচারিত হইল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়া, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারস্পরিক সহযোগিতার ফলেই যে ইউনাইটেড নেশন্স অর্গেনাইজেশন (ইউ. এন. ও) গঠিত হইতে পারিয়াছিল এবং রাজনৈতিক কল্যাণের দিক থেকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণার এটি অন্যতম ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। (৭)

১১১টি অল্পক্ষেত্রে পূর্ণ এই দীর্ঘ দলিলে স্বাক্ষর দিয়া বিজয়ীপক্ষের নেতা ও সমর্থকগণ মনে করিলেন যে, আগামী দিনের পৃথিবী যুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা পাইল। সংঘর্ষে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ দাঁড়াইয়া উঠিয়া এই দলিলের প্রতি সর্বসম্মত সমর্থন জানাইলেন। (৮)

(৬) Memoirs by Harry S. Truman, p. 305

(৭) অ্যান্টি-হিটলার কোয়ালিশন, পৃষ্ঠা ৩৮১-৮২

(৮) দি সেক্রেট গ্রেট ওয়ার, ২ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২৩৬।

বিবহা (৫) — ৮

## দশম পর্ব

### প্রথম অধ্যায়

মিজলভিবর্গের মধ্যে মতবিরোধ ৪

হপকিন্সের পুনরায় মস্কোযাত্রা

পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে মিত্রশক্তি বর্ত্তৎ আক্রমণের কলে জার্মানী যখন গভীর সঙ্কটে পড়িল, তখন সেনাপতিদেরকে চাঙ্গা করিয়া তোলার জন্য ৩১ আগষ্ট, ১৯৪৪, হিটলার তাঁর সদর দপ্তরে বলিয়াছিলেন :

‘একটা সময় আসিবে যখন মিত্রশক্তিদের মধ্যে বিরোধ এমন প্রচণ্ড হইবে যে, তাদের মধ্যে ভাঙ্গন ধরিবে। ইতিহাসে দেখা যায় যে, সমস্ত কোয়ালিশনই কিছুদিন আগে কিংবা পরে ভাঙিয়া গিয়াছে। সুতরাং ধৈর্য ধরিয়া উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করা উচিত।...’

এর তিন মাস পর পশ্চিম রণাঙ্গনে পাল্টা আক্রমণের (আর্দেনেসের যুদ্ধ) আগে ১২ ডিসেম্বর, ১৯৪৪, হিটলার পুনরায় তাঁর সেনাপতিদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য রাজনৈতিক বিষয়ের অবতারণা করিয়া বলিলেন :

‘ইতিহাসে আমাদের শত্রুদের মত এমন বিচিত্র পাঁচ-শালি এবং নানা উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত কোয়ালিশন আর কখনও দেখা যায় নি। একদিকে অতি-ধর্মিক রাষ্ট্র এবং অন্যদিকে অতি-মার্কসবাসী রাষ্ট্র। একদিকে একটা মুমূর্ষু সাম্রাজ্য বৃটেন, অন্য দিকে উত্তরাধিকার স্বত্রে লাভের জন্য একটা কলোনী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই কোয়ালিশনের প্রত্যেকটি অংশীদারের রয়েছে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা। পূরণের অভিলাষ...আমেরিকা চাইছে ইংলণ্ডের উত্তরাধিকার লাভের জন্য, ইংলণ্ড চাইছে তার উপনিবেশগুলি ও ভূমধ্যসাগরে প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য...এদের পারস্পরিক বন্ধ ক্রমেই বৃদ্ধি পাবে।’ (১)

হিটলার যতই হুশমন হোন এবং এই কথাগুলি যে উদ্দেশ্যেই বলিয়া থাকুন না কেন, তাঁর মন্তব্যের মধ্যে কিন্তু গভীর সন্দেহ নিহিত ছিল। কারণ, মহাযুদ্ধ যতই শেষ হইয়া আসিতেছিল, ততই সোভিয়েত রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন—এই ঐতিহাসিক কোয়ালিশনের মধ্যে ভাঙ্গন ধরিতেছিল এবং এই তিন পক্ষের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন মিল ছিল না—একমাত্র ন্যাসী জার্মানীকে পরাজিত করা ছাড়া। কিন্তু যখন এই তিনপক্ষের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ ও ভাঙ্গন দেখা দিল, তখন হিটলার মস্কোলিনী গতানুগত্য এবং ক্যাস্টে শক্তিবর্গ চূর্ণ। ভাগ্যক্রমে মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে মহামৈত্রী শেষ হইয়া যায় নাই। এর জন্যে সর্বাধিক প্রাথমিক প্রাপ্য বোধ হয় প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের ধৈর্য ও উদারভাব এবং ষ্ট্যালিনের সঙ্গে তাঁর মিজলনোচিভ মনোভাবের দৃঢ়তার। যদিও ইয়ান্টা সম্মেলনে ষ্ট্যালিন চার্লিলকে ‘পৃথিবীর



সবচেয়ে সাহসী সরকারী পক্ষ' বলিয়া চুচুসপুণ স্ততিবাদ করিয়াছিলেন, তথাপি স্ট্যালিন কিন্তু রুজভেনের প্রতিই বেশী অমুদ্রাগম্পন্ন ছিলেন এবং তিনি বর্ষাধি অমুমান করিয়াছিলেন যে, মহাযুদ্ধের শেষে এমন সমস্ত কঠিন মস্তা দেখা দিবে, যার জন্য তিন বৃহৎ শক্তির যুদ্ধের সময়কার মতই ঐক্য ও সহযোগিতার দরকার হইবে। কিন্তু যুদ্ধের অন্তিম লয়েই ঐক্যের মধ্যে ভাঙ্গন ধরিল—রুজভেনের মতাবে রুজভেনের মৃত্যুর প।

মার্কিন সামরিক লেখকগণ ইয়ান্টা চুক্তির প্রতি স্ট্যালিনের 'সোভিয়েত কত'র বহু অভিযোগ করিয়াছেন। কাহারও কাহারও অমুমান এই যে, সোভিয়েত স্ট্যালিন-স্বারোর চরমবাদী নেতাদের বিপ্লবী তত্ত্বের চাপের ফলেই ইয়ান্টার নীতিভাবের পরিবর্তন ঘটয়াছিল—যদিও এর 'বোধগম্য কোন প্রমাণ নেই'। তবে ইয়ান্টার পর সোভিয়েত বাণিজ্যের নীতি পরিবর্তনের অগ্র কারণও ইয়ান্টার মত। যুদ্ধের পর ইউরোপে মার্কিন সৈন্তেরা দুই বছরের বেশী অবস্থান করিবে না, রুজভেনের এই মন্তব্যের তাৎপর্য হয়তো স্ট্যালিন উপলব্ধি করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ ইয়ান্টার পর রুশরা পোল্যান্ডে যে তীব্র ও ভিত্তি শক্ত্যাব সন্ধানী হইয়াছিলেন, তার জন্য স্ট্যালিন হয়তো সেখানে কিংবা পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতে আর কোন 'চাল' না নিতে হয়, সেজন্য দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলেন। তাঁর কঠোরতাব মূলে এই সমস্ত কারণও থাকিতে পারে। (২)

অপর দিকে ফ্যাসিস্ট জার্মানীর আক্রমণের ফলে সোভিয়েত রাশিয়া চার বছর ধরিয়া বিধ্বস্ত হইয়াছিল এবং ১৯৪৫ সালে নিদারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কটে পড়িয়াছিল। কৃষিকার্য ও কলকারখানার উৎপাদনকার্য থেকে অধিকাংশ পুঙ্খ মুদ্রাফেলে বোগদান করিয়াছিল। স্মৃতরাং দেশের সমস্ত কৃষিকার্য একমাত্র মেয়েরদের চালাইতে হইয়াছিল—এই রেকর্ডের গৌরব একমাত্র সোভিয়েত রাশিয়ার। অধিকন্তু যুদ্ধের সময় কলকারখানার শ্রমিকদেরও শতকরা ৫১ ভাগ ছিল স্ত্রীলোক। কিন্তু এই সমস্ত সত্ত্বেও জনগণের অভাব-অনটনের সীমা ছিল না। বিশেষভাবে খাদ্যের অভাবে তাদের অধিকাংশই ক্ষুধার্ত ছিল। স্মৃতরাং স্বভাবতই যুদ্ধের পর এই ভয়াবহ ক্ষতির জন্য সমস্ত দেশের পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে সোভিয়েত নেতারা মিত্র আমেরিকার কাছ থেকে ঋণের আকারে সাহায্যের প্রত্যাশা করিতেছিলেন। কিন্তু মার্চ ও এপ্রিল মাসে (যখন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ হইয়া আসিতেছিল) মার্কিন সরকারী মহল থেকে এই বিষয়ে বাধা আসিল এবং ঠিক এই সময় প্রেসিডেন্ট রুজভেন্ট হঠাৎ মারা গেলেন—১২ এপ্রিল, ১৯৪৫। রুজভেন্টের মৃত্যুতে সোভিয়েত রাশিয়ার জনগণ ও নেতৃবৃন্দ কেবল গভীরভাবে শোকাহত হইলেন না, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কিতও হইলেন। কেন না, রাশিয়ার প্রতি রুজভেন্টের যে সখিচ্ছা ছিল এবং তিনি যে সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে মিত্রতা বজায় রাখিতে উৎসুক ছিলেন, সে বিষয়ে রুশ জনগণও অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। কিন্তু রুজভেন্টের মৃত্যুর পর মার্কিন মিত্রতার নীতি অব্যাহত থাকিবে কিনা, সেই বিষয়ে রাশিয়ার মনে সংশয়

ও শঙ্কা দেখা দিল এবং সেই শঙ্কা একেবারে হাতে হাতে কলিয়া গেল। কেন না, রুজভেল্টের শূন্যপথে ভাইস-প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান যখন প্রেসিডেন্টের গদীতে অভিষিক্ত হইলেন, তখন তিনি তাঁর 'সোভিয়েত নীতিবোধন' করিলেন ইউরোপীয় যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেও ও লীজ বা কর্ত্ত ও ইজারা আইন অস্থায়ী সাহায্য দেওয়া বন্ধ করার দ্বারা। স্বভাবতই স্ট্যালিন এতে অভ্যস্ত ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এমন কি, কর্ত্ত ও ইজারা ব্যবস্থার যিনি মার্কিন বড়কর্ত্তা ছিলেন, সেই ট্রেটনিয়াস পৰ্ব্বত এটাকে 'অসমরোচিত' এবং 'অবিদ্যমান ব্যবস্থা' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন। (৩)

অবশ্য যুদ্ধে জয়লাভের দ্বারা রুশদের মধ্যে জাতীয় গর্বও বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং তাদের মধ্যে অনেকেই মনে করিত যে, তারা একাই জার্মানীকে হারাইয়া দিতে ও ইউরোপ দখল করিয়া নিতে পারিত (যদিও স্ট্যালিন তা' কখনও মনে করিতেন না)। একজন্ত বার্লিনে মিত্রপক্ষের উপস্থিতি ও অবস্থান অনেক রুশ সৈন্তের অপছন্দের কারণ ছিল। এই সমস্ত মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার নিম্নাং দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধের উত্তেজনা সঞ্চারিত হইয়াছিল।

অবশ্য উচ্চতর স্তরে সেনাপতিবৃন্দের মহলে সম্ভাব ও সৌজন্যবোধের কোন অভাব ছিল না। যেমন, মার্শাল জুকোভ জেনারেল আইজেনহাওয়ার ও কিন্তু মার্শাল মণ্টগোমারীকে 'অর্ডার অব ভিক্টোরি' উপাধিতে ভূষিত করিলেন এবং পাক্টা বৃটিশ পক্ষ থেকে মণ্টগোমারী জুকোভকে জি. সি. বি, বকসোভোভিকে কে. সি বি, শকোলোভভিকে ও. বি. ই এবং অ্যান্তান্তকেও অল্পরূপ উপাধির দ্বারা সম্মানিত করিলেন। কিন্তু এর বিপরীত চিত্রও আছে। যেমন, মার্শাল টিটো। টিটো আফ্রিকাতিক উপসাগরের কুলে ট্রিষ্টে (Trieste) বন্দর দখলের চেষ্টা করিলে ভূমধ্যসাগরীয় প্রধান বৃটিশ সেনাপতি কিন্তু মার্শাল আলেকজান্ডার চার্চিলের নির্দেশে যুগোস্লাভদের প্রতি যে 'উদ্ধত' ও 'অসম্মানজনক' ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাতে সোভিয়েত সংবাদপত্রগুলি তাঁর তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন। গ্রীষ্মে বৃটিশ হমননীতিও (স্থানীয় কমিউনিষ্ট পার্টিজানদের বিরুদ্ধে) রুশ সংবাদপত্রগুলির উদ্বার কারণ হইয়াছিল। উত্তর ইতালীতে কমিউনিষ্ট পার্টি নেভা নেন্নি (Nenni) এবং তোগলিয়াত্তিকে (Togliatti) বৃটিশ পক্ষ সাময়িকভাবে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন। এই সমস্ত নানা ঘটনা নিম্নাং পশ্চিমের মিত্রপক্ষ ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে মাঝে মাঝে বিরোধ লাগিয়াই ছিল।

\*

\*

\*

কিন্তু বিরোধের আরও গুরুতর কারণ ঘটয়াছিল। যখন বার্লিন ও হিটলারী জার্মানীর পতনে সারা বিশ্বের স্বাধীনতাকাামী ও গণতন্ত্রীবাদী মহলে আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখা দিয়াছিল এবং বিশেষভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি জনগণের ঐতিপূর্ণ মনোভাব আত্মপ্রকাশ করিতেছিল, তখন লণ্ডন ও ওয়াশিংটনের

প্রতিক্রিয়াশীল মহল সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি চাপ হুইর কোশল খুঁজিতেছিলেন। ১৯৪৫-এর এপ্রিল-মে মাসে কার্গানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে গিয়া ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্ত-বাহিনী কার্গানীর সেই সমস্ত অঞ্চলে ঢুকিয় পড়িল সে অঞ্চলগুলি রাশিয়া, বৃটেন ও মার্কিন স্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে সোভিয়েত অধিকৃত এলাকারূপে বিবেচিত হওয়ার কথা। এই এলাকাগুলির মধ্যে ছিল লাইপজিগ, এরফুট, দ্রাউয়েন ও ম্যাগডেবুর্গ। সামরিক প্রয়োজনে এবং রণক্রিয়ার জন্ত মিজবাহিনীর এই সমস্ত অঞ্চলে প্রবেশে রাশিয়ার আপত্তি ছিল না। কিন্তু এই সামরিক প্রয়োজনকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ষাটাইবার জন্ত বৃটিশ বর্চপক্ষ ইঙ্গ মার্কিন বাহিনীকে প্রস্তাবিত সোভিয়েত অধিকৃত এলাকা থেকে সরাইয়া দিতে চালাইয়া দিতে লাগিলেন। কারণ, চার্লিল তাঁর 'বলকান রণনীতি' ষাটাইতে ইতিপূর্বেই ব্যর্থ হইয়াছিলেন এবং তারপর বালিন, প্রাগ ও ভিয়েনা দখল করিতেও পারিলেন না—গুলি সব লালফোজকর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। সুতরাং ফ্রু চার্লিল সোভিয়েত রাশিয়াকে একটা আপোস মীমাংসায় বাধ্য করার জন্ত ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী মারফৎ চাপ হুইট করিতে চাহিলেন। তিনি বলিলেন—‘আমাদের হাতে এমন কতকগুলি লাভজনক অস্ত্র আছে, যেগুলির দ্বারা আমরা (রাশিয়ার সহিত) একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় পৌছিতে পারি। যেমন, প্রথমত পোল্যান্ডের ব্যাপারে সঙ্কট না হওয়া পর্যন্ত কার্গানীতে আমাদের প্রস্তাবিত দখলীকৃত এলাকার আমরা ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্তবাহিনীকে বর্তমান অবস্থান থেকে প্রত্যাহার করিয়া নিতে পারি না। তারপর আমাদের দেখিতে হইবে কার্গানীতে কুশ অধিকৃত এলাকার চরিত্র কি, কিংবা হানিমুখ উপত্যকার কুশ নিয়ন্ত্রণ বা কুশীকৃত অঞ্চলগুলি, বিশেষভাবে অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া ও বলকানে রাশিয়া কি মুক্তি ধারণ করে, সেটাও আমাদের দেখিতে হইবে। ষিঠীয়ত, আমরা বাণ্টিক সাগর বা কৃষ্ণসাগর দিয়া রাশিয়ার বহির্গমন সম্পর্কে একটা সন্তোষজনক ব্যবস্থা করিতে পারি।’ (৪)

৬ মে তারিখ চার্লিল তাঁর এই সমস্ত মতামত প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানকেও লিখিয়া পাঠাইলেন। “যুগোস্লাভিয়া, অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়াতে এবং ডেনমার্কসহ লুবেক পর্যন্ত আমাদের ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী যে ‘পজিশন’ দখল করিয়া আছে, সেগুলি আমাদের কর্তৃত্বভাবে অব্যাহত রাখা উচিত।”

একই সময়ে জেনারেল ইসমেকে (Ismay) নির্দেশ দিলেন যে, সম্মিলিত সেনানী-মণ্ডলীর প্রধানগণ, যেন ইউরোপের মিজবাহিনীর সেনাপতিদ্বিগকে ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্তদল প্রত্যাহার না করার জন্ত উদ্দেশ্য দেন।

কিন্তু চার্লিল এখানেই থামিয়া থাকিলেন না। যখন মিজবাহিনী কার্গানীকে চারিদিক থেকে আঘাতের পর আঘাত হানিয়া জর্জর করিতেছিলেন এবং হিটলারের শেষ গৈস্তদলের ‘দফা নিকাশ’ করিতেছিল, তখন তিনি নিজের স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি মণ্টগোমারীকে এই বর্ষে এক টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিল যে, ‘কার্গান অস্ত্রশস্ত্র যেন এমনভাবে সংগ্রহ করিয়া রাখা হয় যাতে সোভিয়েতের অগ্রাভিমান

প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে জার্মান সৈন্যদের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য আমরা ওই সমস্ত অস্ত্র সহজেই তাদের হাতে তুলিয়া দিতে পারি।” (৫)

এদিকে পোল্যাণ্ড নিরাশ্রয় রাশিয়া ও পশ্চিমীদের সঙ্গে তীব্র মতবিরোধ চলিতেছিল এবং এই বিবেচনা কর্তা রূপ ধারণ করিল ১৯৪৫ এর গ্রীষ্মকালের প্রথম ভাগে, যখন লণ্ডনে আশ্রয়প্রাপ্ত পোলিশদের গুপ্ত এজেন্টবা এবং জনগণের একাংশ রুশ সৈন্যদের বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ডের অভ্যন্তরেই গুপ্তহত্যা ও সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ চালাইল এবং লুগলিন গবর্নমেন্টের (সোভিয়েত সমর্থিত) প্রতিনিষিদ্ধের বিরুদ্ধে একত্রিত অস্ত্রাশ্রয় অস্বীকার হইল। তখন সোভিয়েত কর্তৃক পোলিশ সন্ত্রাসবাদী দলের (যারা আশ্রয়প্রাপ্ত হইতে) কাজ করিত) ১৫১৬ জন সদস্যকে গ্রেপ্তার করিলেন। স্বভাবতই চার্চিল এই সংবাদে অত্যন্ত বিচলিত হইলেন এবং ২৮ এপ্রিল এই বিষয়ে স্ট্যালিনকে এক পত্র দিলেন। কিন্তু স্ট্যালিন নরম হওয়ার পাত্র ছিলেন না। তিনি ৪ মে চার্চিলকে এক জবাবে জানাইয়া দিলেন যে, যখন পোলিশ সদস্যরা লালকো জর বিরুদ্ধে সাবোতাভ ও সন্ত্রাসমূলক কাজের জন্য দায়ী। অতএব এদেরকে আদালতে অভিযুক্ত এবং বিচার করা হইবে।

আদালতে এদের দ্বিতীয় নেতা ওকুলিসকি (Oulicki) স্বীকার করিলেন যে, সোভিয়েত সরকারে অবিশ্বাস করিয়া তাঁরা ভুল করিয়াছিলেন। তবে, মনে রাখিতে হইবে জারের রাশিয়া ১২৩ বছর ধরিয়া পোল্যাণ্ডে মত্যাচার করিয়াছে। তথাপি লণ্ডনস্থিত পোলিশ সরকারকে তাঁদের বিশ্বাস করা উচিত হয় নাই এবং এই সরকারের পাল্লায় পড়িয়াই তাঁরা পোল্যাণ্ডে আত্মগোপনপূর্বক রাশিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

এই সমস্ত আত্মস্বীকৃতিব ফলে রুশরা মন করিলেন যে, লণ্ডনস্থিত পোলিশ সরকারের আসল চেহারা চার্চিলের নিকট উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। এজন্য স্ট্যালিন খুশী হইয়াছিলেন। ফলে, দ্বিতীয় ও অভিযুক্ত পোলিশদের লম্বুদণ্ড দেয়া হইল, এমন কি নেতৃস্থানীয় ওকুলিসকিকে প্রাণদণ্ডের বদলে মাত্র ১০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হইল।

\*

\*

\*

হারি এস ট্রুম্যান হোয়াইট হাউসে নতুন গদীয়ান হইলেন। কিন্তু তিনি যখন সেনেটর ছিলেন, তখন থেকেই সোভিয়েত বিরোধী ছিলেন। এখন অবশ্য রুজভেল্টের শুল্ক সিংহাসনে অভিযুক্ত হওয়ার তাঁর দায়িত্ব শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু বিশ্বব্যাপী এই দায়িত্ব পালন করিতে গিয়া তিনি গোড়াতেই এক কাণ্ড বাধাইলেন। জার্মানীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি রুজভেল্ট প্রবর্তিত বিশ্বাস লেও লীগ অনুযায়ী রাশিয়াসহ মিত্রশক্তিবর্গকে সাহায্যদানের ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া দিলেন— একথা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের নিজস্ব বক্তব্য নিচেরই উল্লেখযোগ্য এবং সেই বক্তব্য অত্যন্ত কোতূহলকর। তিনি তাঁর

আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন যে, বৈদেশিক অর্থনীতির নিয়ামক বা প্রধান লিও ক্রোলে (Crowley) এবং অস্থায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী গোসেক গ্র (Grew) ৮ মে তারিখ তাঁর নিকট আসিয়া বলিলেন যে, লেও লীজ সম্পর্কে একটি নতুন দলিল প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট অনুমোদন করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু শাস্ত্র দ্বিগ যান নাই। তাঁরা বলিলেন যে জার্মানী! আত্মসমর্পণের পর লেও লীজ কমান্ডিয়া দেওয়া উচিত। 'তাঁরা আমাকে এই নতুন দলিল স্বাক্ষর করিতে বলিলেন। আমিও হাত বাড়াইয়া কনমটা নিলাম এবং দলিলটি না পড়িয়াই স্বাক্ষর করিয়া দিলাম।'

ট্রুম্যান স্বীকার করিয়াছেন যে, এই দলিল স্বাক্ষরের পর যেন একটা বড় ভাবিয়া পড়িল। রাশিয়া ও ইউরোপের অন্ত্যান্ত দেশে এই দলিলে স্বাক্ষরের দ্বারা কার্যাত সমস্ত সরবরাহ পাঠানো বন্ধ হইয়া গেল। বৃটেনও দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। কিন্তু গোভিয়েত রাশিয়া মনে করিল যে, এই আদেশ বিশেষভাবে তাদের বিরুদ্ধেই প্রযোজ্য। প্রচুর খাদ্য, বস্ত্র, জামাকাপড় এই সরবরাহের ফলে রাশিয়া পাইতেছিল। কিন্তু সেখানে যেন ভীমরুলের চাকে খোঁচা পড়িল এবং রুশরা এই কার্যকে 'অমিত্রজনোচিত' বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিল। যে সমস্ত জাহাজ সমুদ্রবন্দে ছিল এই নতুন আদেশের ফলে সেগুলি মাল খালাস করার জন্য আমেরিকার বন্দরে ফিরিয়া আসিতে লাগিল 'আমরা যেন আনন্ডাকৃতভাবে ইটালির হাতে বিরোধের একটা অস্ত্র তুলিয়া দিলাম।' (৬)

ফলে, শেষ পর্যন্ত ট্রুম্যান এই আদেশ বাতিল করিয়া দিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু এখন এই যে, য কিন যুক্তরাষ্ট্রের এত বড় ক্ষমতাবান এবং দায়িত্বশীল প্রেসিডেন্ট এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা দলিল না পড়িয়াই সহি করিয়া দিলেন, এটা কি একটা তাজ্জব ব্যাপার নয়? অথচ তিনি নিজেকে বলিতেছেন যে, ইয়ান্টাতে রুশদের সঙ্গে আমাদের এই মর্মে একটা চুক্তি হইয়াছিল যে, জার্মানীর পরাজয়ের তিন মাস পরেই রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে এবং এই সময় মার্কিন জনমতও রাশিয়ার খুব অগ্রকূলে ছিল। কারণ, রাশিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের দ্বারা বহু আমেরিকান প্রাণও বাঁচাইয়া দিয়াছিল। অপর পক্ষে চীনে তখন দশ লক্ষাধিক জাপানী সৈন্য ছিল এবং তারা অনিদিষ্টকাল পর্যন্ত যুদ্ধ চালাইতে প্রস্তুত ছিল। 'সুতরাং আমরা জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়াকে যুদ্ধে নামাইতে খুব ব্যগ্র ছিলাম। কেন না, রাশিয়ার সহিত চীনের সীমান্তের যোগ রহিয়াছে, আর ইউরোপের সঙ্গে রহিয়াছে রেলপথের যোগাযোগ। অস্ত্রবিক্রে জাপান ভাইরেন থেকে শুরু করিয়া হংকং পর্যন্ত চীনের সমস্ত সমুদ্র-বন্দর নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখিয়াছিল।'

অতএব জাপানী যুদ্ধের কথা মনে রাখিয়া ট্রুম্যান মার্কিন সরকারী নীতির নূতন ব্যাখ্যা করিয়া এই আশ্বাস দিলেন যে, আগেকার সমস্ত চুক্তি ও শর্ত অনুসারে রাশিয়াকে সমস্ত সরবরাহ জোগান দেওয়া হইবে।

বৃটন প্রধানমন্ত্রী চার্চিলও উদ্বিগ্ন হইয়া ব্যক্তিগতভাবে এক টেলিগ্রাম পাঠাইয়া-

হিলেন এবং রাশিয়ার মত বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়ম ও নেদারল্যান্ডসকেও সরবরাহের আশ্বাস দেওয়া হইল।

কর্জ ও ইজারা আইন অহুসারে মিত্রপক্ষীয় শক্তিগুলিকে সাহায্যদান প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান পরলোকগত প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের অসামান্য প্রতিভার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন :

'The story of Lend-Lease is a monument to the genius of Franklin Roosevelt. A President could no more get the Congress to make an outright loan of forty-two billion dollars to foreign countries, even to win a war, than he could fly to the moon, but Roosevelt accomplished the same thing through the idea of Lend-Lease.'

অর্থাৎ কর্জ ও ইজারার কাহিনী ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের অসামান্য প্রতিভার স্মৃতিস্তম্ভের মত। এমন কি কোন যুদ্ধজয়ের জগুও কংগ্রেসকে দিয়া সোজাসুজি চার হাজার দুইশত কোটি ডলার মঞ্জুর করানোর চেয়ে বরং চাঁদে উড়িয়া যাওয়া সহজ ছিল। কিন্তু কর্জ ও ইজারার ব্যবস্থার মারফৎ রুজভেল্ট সেই অসাধ্য সাধন করিলেন। (৭)

ট্রুম্যান তাঁর আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন যে, যুদ্ধের শেষে ইউরোপে বহু জটিল সমস্যা দেখা দিল। গোড়ার দিকে জার্মানী ও অস্ট্রিয়া দখল নিয়া চাপা উত্তেজনার সৃষ্টি হইল এবং উভয় স্থানেই বৃহৎ সমস্যা দেখা দিল কন্ট্রোল মেশিনারি বা উপযুক্ত যন্ত্রঃ ব্যবস্থা স্থাপন এবং মিত্রপক্ষীয় সৈন্তাদিগকে স্ব স্ব নির্দিষ্ট এলাকায় (zone) প্রত্যাহার করিয়া নেওয়া সম্পর্কে। অবশ্য এ জন্তে ইউরোপীয় এ্যাডভাইসরি কমিশন গঠিত হইয়াছিল এবং স্থির হইয়াছিল যে, মিত্রপক্ষীয় শক্তিবর্গের স্ব স্ব দখলদারি এলাক। নির্দিষ্ট হওয়ার পর বৃটিশ, মার্কিন, করাচী ও সোভিয়েত—এই চতুষ্টয়ের প্রধান সেনাপতিদেরকে নিয়া সমগ্র জার্মানীর পরিচালনার জন্ত একটি কন্ট্রোল কাউন্সিল গঠিত হইবে, ...

১১ মে প্রধানমন্ত্রী চার্লিস প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানকে এই মর্মে টেলিগ্রাম করিলেন—  
“আমাদের সৈন্তাদিগকে যেন অগ্রগতির চরম সীমানা পর্যন্ত অবস্থান করিতে দেওয়া হয়।” যদিও চার্লিস দখলীকৃত এলাকা সম্পর্কে একমত হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি ভাগিদ্ব দ্বিতে লাগিলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত রাশিয়ানরা পোল্যান্ড ও অন্তান্ত সমস্তা সম্পর্কে আমাদের সঙ্গে সন্তোষজনক মীমাংসার উপনীত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মিত্র সৈন্তদের ‘পজিশন ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসা উচিত হইবে না।’

কিন্তু ট্রুম্যান এর জবাবে চার্লিসকে জানাইয়া দিলেন যে, তারা দখলীকৃত এলাকা ভাগ করা সম্পর্কে আগে যে সমস্ত কথা দিয়াছেন, সে কথা এখন খেলাপ করিতে পারেন না। বিশেষতঃ গুরুতর সামরিক ঐক্য ও এর সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে।

চার্লিস ও ট্রুম্যানের মধ্যে এই সমস্ত বিষয় নিয়া কয়েকটি বার্তা বিনিময় হইল এবং প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের একটি ভাৱের জবাবে স্ট্যালিন জানাইয়া দিলেন (১৮ মে) যে, অস্ট্রিয়া ও ভিয়েনা সম্পর্কে চার্লিস ও রুজভেল্টের সঙ্গে কথা অহুসারে ‘ইউরোপীয় পরামর্শদাতা কমিশনের’ সিদ্ধান্তই মানিয়া লওয়া হইবে।...

১৬ যে তারিখে চার্লস ও জেনারেল আইজেনহাওয়ারের মধ্যে যে সমস্ত আলোচনা হইয়াছিল, তাতে দেখা যায় যে, চার্লস মিত্রপক্ষকে সমগ্র জার্মানীর স্বাধীনতা নিতে নিবেদন করিতেছেন। মিত্রপক্ষের কেবল এইটুকুই দেখা উচিত যে, জার্মানী যেন আর একটা বৃহৎ বাধাইতে না পারে। কিন্তু তার চেয়ে বেশী কিছু করা ঠিক হইবে না। জার্মানদের ভাগ্য জার্মানীর হাতে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত এবং যে সমস্ত জার্মান সেনাপতি মিত্রপক্ষের হাতে আটক আছেন, তাঁদেরকে জার্মানী শাসনের জন্য নিযুক্ত করা উচিত।

৪ জুন চার্লস পুনরায় টুয়ানকে তাগিদ দিলেন যে, আমেরিকান সৈন্যদেরকে যেন দখলীকৃত এলাকায় প্রত্যাহার করিয়া আনা না হয়। কারণ, অন্তর্গত সোভিয়েত সামরিক শক্তি পশ্চিম ইউরোপের মর্যকেন্দ্রে আসিয়া প্রবেশ করিবে এবং পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে লৌহ ঘবনিকার সৃষ্টি হইবে।

\*

\*

\*

সাম্রাজ্যবাদী চার্লসের কমিউনিজম ও সোভিয়েত-বিরোধিতা সর্বজনবিদিত। কিন্তু প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের গোঁড়ামি ছিল না। তিনি অশুভব করিয়াছিলেন যে, সোভিয়েত রাশিয়ার মত বৃহৎ শক্তির সঙ্গে সম্ভাব ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত না হইলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও স্বস্তি রক্ষা কঠিন হইবে। এজন্য রুজভেল্ট আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হওয়ার পরেই সোভিয়েত রাশিয়াকে স্বীকৃতি দিলেন এবং রাশিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিলেন। তারপর থেকেই কিংবা তৃতীয় দশক থেকেই সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্ক সহৃদয়তাপূর্ণ ছিল এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও গভীর হইল। হিটলারী জার্মানীর বিরুদ্ধে রুজভেল্ট-চ্যাংলিন-চার্লস মহাজোট বা গ্রেট কোয়ালিশন ইতিহাসের নতুন অধ্যায় রচনা করিল এবং তেহরান ও ইয়র্কটার শীর্ষ সম্মেলনগুলিতে তিন শক্তির মৈত্রী ও সহযোগিতা ঘনিষ্ঠতর হইল এবং ভবিষ্যৎ পৃথিবীর শান্তি রক্ষার জন্য ‘ইউনাইটেড নেশন্স অর্গেনাইজেশন’-এর ভিত্তি স্থাপিত হইল এবং রুজভেল্ট বিশ্বাস করিতেন যে, সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধের সময় যে সহযোগিতার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, যুদ্ধান্তর পৃথিবীতে শান্তিরক্ষার জন্য সেই সম্পর্ক গাঢ়তর হইবে। কিন্তু যুদ্ধের চূড়ান্ত জয় বা জার্মানীর আত্মসমর্পণের পূর্বেই রুজভেল্ট যুদ্ধাশুখে পতিত হইলেন। ফলে, লণ্ডনের এবং ওয়াশিংটনের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী যেন একটা ‘সুযোগ’ পাইয়া গেলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এঁদের মধ্যে দ্বারা প্রধান ছিলেন তাঁরা—যেমন, আর্থার ভ্যানভেনবুর্গ, জন কস্টার ডালেস, জেমস এ কয়েস্টার (নৌসচিব) প্রভৃতি সরকারী মহলের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি ‘কঠোর নীতি’ অবলম্বনের জন্য চাপ দিলেন।

এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট ট্রুমান সম্পর্কে দ্রুত রাধা উচিত যে, হিটলার কর্তৃক সোভিয়েত রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার পরেই তিনি (তখন তিনি সেনেটর) প্রকাশ্যে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, রাশিয়া ও জার্মানী পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দ্বারা স্বাস্থ্য হোক, এটা ই তাঁরা দেখিতে চান। সুতরাং ট্রুমান প্রেসিডেন্ট

পরে বৃহৎ হওয়ার পরেই এডমিনকার কন্সভেণ্টের নীতির পুনর্মূল্যায়ন করিতে চাহিলেন। ২৩শে এপ্রিল একত্র তিনি হোয়াইট হাউজে বিশিষ্ট মার্কিন নেতাদের একটি সম্মেলন আহ্বান করিলেন সোভিয়েত সম্পর্কে মার্কিন নীতি নির্ধারণের জন্ত। ওয়াশিংটনের অনেক দায়িত্বশীল শীর্ষস্থানীয় নেতা এত বৈঠকে যোগ দিলেন। যেমন—পররাষ্ট্রমন্ত্রী টেটিনিয়াস, সমরসচিব ষ্টিমসন, নৌ-সচিব কেরেটার, এ্যাড-মিরাল কিং, এ্যাডমিরাল লীহাই, জেনারেল মার্শাল, জেনারেল ডীন, রাষ্ট্রদূত হ্যারিয়ম্যান এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের বিশিষ্ট কয়েকজন অফিসার। নতুন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্ক এবং দুই গবর্নমেন্টের মধ্যে যে সমস্ত প্রশ্ন ও সমস্যা নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়াছে, সে বিষয়ে তাঁদের মতামত আহ্বান করিলেন। বিশেষভাবে পোল্যান্ড সম্পর্কেই তাঁদের মাথাব্যথা বেশী ছিল। কিন্তু উপস্থিত সকলেই সোভিয়েত বিরোধী ছিলেন না। যেমন, সমরসচিব ষ্টিমসন বলিলেন—“এই সমস্ত বিষয়ে আমাদের ধীরে স্নেহেই চলা উচিত এবং সম্পর্ক যাতে ছিন্ন না হয়, তেমন নীতিই অনুসরণ কর উচিত। ক্রমশঃ তাঁদের মুন্ডের দায়িত্ব এবং সামরিক অগ্ৰসার অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে চালাইয়াছেন। স্মরণ্য এই একটি ঘটনা (পোল্যান্ড) উপলক্ষে তাঁদের সম্পর্কের মধ্যে শঙ্কন ধরা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হইবে। কিন্তু নৌ-সচিব কেরেটার সোভিয়েতের প্রতি মার্কিন নীতির পুনর্মূল্যায়নের উপর জোর দিলেন। এ্যাডমিরাল লীহাই ষ্টিমসনের মতামত সমর্থন করিলেন। কিন্তু হ্যারিয়ম্যান কেরেটারের মতামতের প্রতি সমর্থন জানাইলেন। সভার শেষে স্বয়ং ট্রুম্যান রাশিয়ার প্রতি ‘শক্তনীতি’ অনুসরণের পক্ষে মত দিলেন। (৮)

এদিকে অভ্যন্তরীণের ওপারে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এবং তাঁর সমর্থকরা জার্মান সামরিক শক্তির বিনষ্ট এবং সোভিয়েত রাশিয়ার জয়লাভের জন্ত শঙ্কিত হইলেন। চার্চিল আন্তর্জাতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া নতুন রণনীতি ও রাজনৈতিক নীতি ‘বাস্তবতার’ ভিত্তিতে বিচারপূর্বক ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির উদ্বেগে সাত দফা নীতির কথা ঘোষণা করিলেন। যথা—

- (১) সোভিয়েত রাশিয়া মুক্ত দুনিয়ার পক্ষে ভীষণ বিপদস্বরূপ দেখা দিয়াছে।
- (২) তার অগ্রগতির পথ রোধ করার জন্ত অবশ্যই অবিলম্বে একটি নতুন ক্রট খুলিতে হইবে।
- (৩) ইউরোপে এই নতুন ক্রট বড়টা সম্ভব পূর্বদিকে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।
- (৪) ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্যবাহিনীর পক্ষে বার্লিনই হইতেছে সবচেয়ে বড় লক্ষ্য।
- (৫) চেকোস্লোভাকিয়ার মুক্তি বধানে এবং প্রাগে মার্কিন সৈন্তের প্রবেশ কলাকালের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হইবে।

(৬) ভিয়েনা ও অষ্ট্রিয়াকে অবশ্যই পশ্চিমী শক্তিবর্গের নিয়ন্ত্রণাধীন আনিতে হইবে। অন্ততঃ সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত সমান অধিকারের ভিত্তিতে।...

(৭) গণতান্ত্রিক শক্তিবর্গের সৈন্যবাহিনীগুলি বিলুপ্ত হওয়ার আগে পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে সমস্ত প্রধান সমস্ত্রা যীমাংসা করিতে হইবে এবং এই যীমাংসার



আগে অধিকৃত জার্মানীর কোন অংশ কিংবা টোটালিটারিয়ান অভ্যুত্থার থেকে মুক্ত কোন এলাকা পশ্চিমী মিত্রবর্গ কর্তৃক ছাড়িয়া দেওয়া চলিবে না। (২)

বলা বাহুল্য যে, এই নীতিগুলি যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের ঘাড়ে চাপাইবারও চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে ইক-মার্কিন-সোভিয়েতসহযোগিতা ও শান্তিরক্ষার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া রুজভেল্ট ঐগুলি অল্পমোদনে অস্বীকৃত হইলেন। কিন্তু রুজভেল্টের মৃত্যুর পর প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের ‘শক্তনীতির’ প্রবোগ নিতে চাহিলেন চার্চিল

\* \* \*

৫ জুন বার্লিনে চতুঃশক্তির সেনাপতিরা জার্মানীর পরাজয় সম্পর্কে একটি ঘোষণা-পত্রে স্বাক্ষর দিলেন। সেনাপতিদের এই বৈঠকে রুশ পক্ষ যৎ যত্ন অধিকৃত এলাকায় সৈন্য সরাইয়া নিতে অল্পরোধ জানাইলেন। অত্যাধিকার কাউন্সিলের কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি হইবে বলিয়া তাঁরা আশঙ্ক প্রকাশ করিলেন।

এদিকে ট্রুম্যান চার্চিলের মতামত ও অল্পরোধ মানিতে রাজী হইলেন না; কারণ, তাঁর মতে জার্মানীর অধিকৃত অঞ্চল সম্পর্কে রুজভেল্ট চার্চিল-ষ্ট্যালিনের আগেকার চুক্তি মান্ত্য করিয়া চলিতে হইবে। ‘অন্তান্ত সমস্তার মীমাংসার দাবিতে এই বিষয় নিম্না রাশিয়ার উপর চাপ দেওয়া ঠিক হইবে না।’

অপরপক্ষে জেনারেল আইজেনহাওয়ারও রুশ অধিকৃত এলাকায় মার্কিন সৈন্যের অবস্থান বজায় রাখিতে রাজী হইলেন না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে জার্মানীর পরাজয়ের পর সোভিয়েত রাশিয়াকে ঠেকাইয় রাশিয়ার জন্য চার্চিল চেষ্টার কোন ফল করেন নাই। কিন্তু এই বিষয়ে মার্কিন শীর্ষ নেতাদের কাছ থেকে তেমন কোন সমর্থন পাওয়া গেল না। বরং ষ্ট্যালিনের প্রস্তাব অনুসারে স্থির হইল যে, ১লা জুলাই থেকে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদ্বয়কে স্ব স্ব নির্ধারিত এলাকায় প্রত্যাহার করিয়া নেওয়া হইবে। অবশ্য ট্রুম্যান আগে স্থির করিয়াছিলেন যে, রুশ অধিকৃত অঞ্চল থেকে ২১ জুন মিত্র সৈন্যদেবকে সরাইয়া আনা হইবে এবং চার্চিলও ট্রুম্যানের এই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছিলেন। কিন্তু ষ্ট্যালিন জানাইলেন যে, ওই তারিখের মধ্যে সোভিয়েত সেনাপতি মার্শাল জুকোভ বার্লিনে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। সুতরাং ১লা জুলাই থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের প্রস্তাব গৃহীত হইল। (১০)

\* \* \*

জার্মানীর পতন এবং ইউরোপের মুক্তির পর যে সমস্ত জটিল সমস্যা দেখা দিল তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান স্বভাবতই বিব্রত বোধ করিলেন। এজন্য তিনি যে মাসের শেষের দিকে হ্যাগ হপকিন্সের সহিত পরামর্শ এবং তাঁর সাহায্য গ্রহণে উৎসুক হইলেন—যদিও তিনি রুজভেল্টের মৃত্যুর পর সরকারী পদে ইত্তলা দিয়াছিলেন। এদিকে তাঁর স্বাস্থ্যও আগের মতই অত্যন্ত খারাপ ছিল। কিন্তু

(২) উইনস্টোন চার্চিল, বর্ষ ৭৩, পৃঃ ৪।

(১০) ট্রুম্যান পৃষ্ঠা, ৩৩৬-৩৩৭

টুম্যান জানিতেন যে, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও ষ্ট্যালিন এবং যুদ্ধসংক্রান্ত নানাগ্রন্থে হপকিন্সের প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল এবং সেই অভিজ্ঞতা অত্যন্ত মূল্যবান। সুতরাং যুদ্ধ শেষের এই জটিল পরিস্থিতিতে ষ্ট্যালিনের মনোভাব কি, তা জানিবার জন্য তিনি হপকিন্সকে মস্কো বাৎসরিক জন্য অল্পরোধ করিলেন। অবশ্য টুম্যানের সঙ্গে হপকিন্সের আগেই ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল এবং অতীতে একসঙ্গে কিছু কাজও করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁর স্বাস্থ্য অত্যন্ত ধারাপ থাকা সত্ত্বেও টুম্যানের অল্পরোধ তিনি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। টুম্যানও হপকিন্সের গভীর দেশপ্রেম এবং তাঁর আত্মত্যাগ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। অধিকন্তু টুম্যান উপলব্ধি করিলেন যে, রাশিয়া সম্পর্কে তিনি যতই ‘শক্তিনীতির’ কথা ভাবিয়া থাকুন না কেন, পরলোকগত রুজভেল্টের যে নীতি এতদিন ধরিয়া আমেরিকায় এবং আমেরিকার বাহিরের পৃথিবীতে জনসমর্থন লাভ করিয়া আসিতেছিল, সেই নীতিও সহসা পরিভ্যস্ত হইলে তাঁর পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়া যাইতে পারে। সুতরাং সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্ক যাতে সহসা ভাঙিয়া না যায় এবং আগেকার মত সম্ভাব্য বজায় থাকে, সেই লক্ষ্য নিয়াই টুম্যান ষ্ট্যালিনের মতামত জানিবার জন্য হপকিন্সকে মস্কো পাঠাইবার সিদ্ধান্ত করিলেন। কারণ, তিনি একথাও জানিতেন যে, এই বিষয়ে হপকিন্সের চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তিও আর কেহ নাই।...

আশ্চর্য লোক এই হপকিন্স। নাৎসী জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েত রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার পর জুলাই মাসের শেষে হ্যারি হপকিন্স (তখনও পীড়িত) ওয়াশিংটন থেকে লণ্ডন এবং লণ্ডন থেকে অত্যন্ত দুঃসাহসের সঙ্গে একটি বোম্বার্ক বিমানে চড়িয়া উত্তরতম রাশিয়াতে পৌঁছিয়াছিলেন এবং সেখান থেকে মস্কো। মস্কোতে ষ্ট্যালিনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ এবং আলোচনা ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় খুলিয়া দিয়াছিল। এমন কি বলা যাইতে পারে যে, ইঙ্গ-মার্কিন-সোভিয়েতের যে মহাকাট্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তার প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল হপকিন্সের এই দুঃসাহসিক মস্কো যাত্রা থেকে। কারণ, রাশিয়ার সেই ধোরতর ছুঁর্গিনেও তিনি রাশিয়ার আত্মরক্ষা সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের নিকট অল্পকূল রিপোর্ট দিয়াছিলেন।

এবার আর যুদ্ধ ছিল না। সুতরাং অনুষ্ট হপকিন্সের সজিনী ও সহযাত্রী হইলেন তাঁর স্ত্রী। ২৩ মে তিনি ওয়াশিংটন ত্যাগ করিলেন এবং ২৫ মে সঙ্ঘায় মস্কোতে পৌঁছিলেন। পরদিন রাজি চটায় ক্রেমলিনে তিনি ষ্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। প্রারম্ভিক শিষ্টাচার বিনিময়ের পর হপকিন্স ষ্ট্যালিনকে বলিলেন যে, ইয়র্কটা সম্মেলন থেকে কেয়ার পথে অনুষ্ট ও রুগ্ন রুজভেল্ট ষ্ট্যালিনের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যৎ পৃথিবীর শান্তি রক্ষার জন্য সোভিয়েত-মার্কিন সহ-যোগিতার উপর জোর দিয়াছিলেন। তাঁর আশা ছিল যে, যুদ্ধান্তে তিনি বালিনে আবার ষ্ট্যালিনের সঙ্গে মিলিত হইতে পারিবেন। কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর জন্য তাঁর সেই আশা পূর্ণ হইতে পারিল না। কিন্তু রুজভেল্টের নীতির প্রাতি মার্কিন জনগণের যেমন আস্থা ছিল, তেমনই যুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার অন্তত সাকল্যের জন্য রাশিয়ার প্রাতিও তাঁদের মনোভাব আগের মতই অত্যন্ত অল্পকূল। অবশ্য আমেরিকায় একটি দৃষ্ট গোষ্ঠী আছে যারা রুজভেল্ট ও রাশিয়ার বিরোধী।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের প্রতিনির্ধারিত তিনি ষ্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন রুশ-মার্কিন মৌলিক সম্পর্ক আলোচনার জন্ত, যে সম্পর্কের ইহানীৎ অবনতি ঘটয়াছে। কিন্তু একথাও সত্য যে, কক্সটেনের সমর্থকদের সহযোগিতা ছাড়া প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের পক্ষে রুশ-মার্কিন সহযোগিতার নীতি সার্থক করাও সম্ভব নয়।—(১)

এই আলোচনা বৈঠকে সোভিন সঙ্ঘায় উপস্থিত ছিলেন ষ্ট্যালিন, মলোটোভ, প্যান্ডোলাভ (দোভোব্যী) এবং হপকিন্স, হারিয়ান ও বোলেন (Bohlen—দোভোব্যী)।

\* \* \*

এখানে হপকিন্সের মধ্যে মিশন এবং ষ্ট্যালিনের সঙ্গে তাঁর বিস্তৃত আলোচনার বর্ণনা দেওয়া অনাবশ্যক। ২৬ মে তারিখ থেকে ৬ জুন পর্যন্ত জের্মানি পর পর ৬ বার যে সমস্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাতে প্রধানতঃ আলোচিত হইয়াছিল—(১) পোলিশ সমস্যা (২) কর্জ ও ইজারার প্রশ্ন (৩) আর্জেন্টিনা (স্তানক্রানস্কো সম্মেলন) (৪) জার্মান নৌবহর ও বাণিজ্য বহরের ভাগ বাঁটোয়ারা (৫) বার্লনে (পটসডাম) শীর্ষসম্মেলনের প্রস্তাব (৬) জার্মানীর জন্ত কন্ট্রোল কাউন্সিল এবং (৭) প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধ এবং চীন-মার্কিন-সোভিয়েত সম্পর্ক।

এই সমস্ত সমস্যার আলোচনার হপকিন্স ও ষ্ট্যালিন রুশ-মার্কিন মতবৈষম্যের মধ্যে ষাণ্মাস্তব সামঞ্জস্য বিধানের এবং আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আলোচ্য বিষয়ের অত্যন্ত প্রধান প্রশ্ন পোল্যাণ্ড সম্পর্কে ষ্ট্যালিন বলিয়াছিলেন, পোল্যাণ্ড সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা না হওয়ার কারণ চার্লিল ও ব্রিটিশ রক্ষণশীলরা রাশিয়ার প্রতি বন্ধুত্বাবাপন্ন কোন পোল্যাণ্ড চাহেন না। বরং আগের মত রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটা ‘বাহ্যরক্ষার বেটন’ স্থাপিত করিয়া রাখিতে চান।

কর্জ-ইজারা সাহায্যের প্রশ্নে হপকিন্স ষ্ট্যালিনকে বলিয়াছিলেন যে, এই সাহায্যদানের জন্তই রাশিয়া জরাজীর্ণ করিয়াছে, একথা সত্য নয়। রুশ সৈন্যদের অপূর্ব লড়াইয়ের জন্তই রাশিয়া জরী হইয়াছে এবং সরকারী মহলে আইনগত কিছু ভুল-ভ্রান্তির জন্ত যে সরবরাহ প্রেরণ বন্ধ হইয়াছে সেটা আবার শুরু করা হইবে। হপকিন্সের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ষ্ট্যালিনের তখনও ধারণা ছিল যে, বালিনের যুদ্ধ ও পতন সত্ত্বেও হিটলার, বোরম্যান, গোয়েবেলস এবং ফ্রেবস্ জীবিত আছেন এবং তাঁরা পলাইয়া গিয়াছেন। (১২)

ষ্ট্যালিন হপকিন্সের নিকট আমেরিকার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ছাড়া যেমন প্রথম মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষ জরী হইতে পারিতেন না, তেমন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও আমেরিকার সাহায্য ছাড়া জার্মানীর পরাজয় হইত না।...

ষ্ট্যালিন হপকিন্সের নিকট কথা দিলেন যে, ৮ আগষ্ট সোভিয়েত বাহিনী

(১১) রবার্ট ই. শেরউড, পৃষ্ঠা ৮৮৩

(১২) পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৮৩২

মাকুইরিয়া আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকিবে এবং ট্রুম্যানের প্রস্তাব অনুসারে বার্লিনে (পটসডামে) জুলাই মাসের মধ্যভাগে বৃটিশ-মার্কিন-সোভিয়েত শীর্ষবৈঠকের অনুষ্ঠান হইবে। আসলে এই বৈঠকের প্রস্তাব পাকা করার জন্য হপকিন্সের মনো আগমনের অন্তিম উদ্দেশ্য ছিল।

জার্মানীকে নিরস্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে যে কন্টোল কার্ডিনাল গঠিত হইয়াছিল, তাতে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিনিধিরূপে মার্শাল জুকোভকে নিযুক্ত করা হইল—  
 ষ্ট্যালিন একথা হপকিন্সকে জানাইয়া দিলেন এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধ সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করিলেন যে, এই বিষয়ে ইয়ান্টা চুক্তি পূর পূরি মানিয়া চলা হইবে এবং জেনারেল চিয়াং কাইসেকের নেতৃত্বে সমগ্র চীনেও একী, সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তেমন নীতিই অনুসরণ করা হইবে। কিন্তু জাপানী সমরবাদকে ধ্বংস করার জন্য তিনি জাপানের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ দাবির উপর জোর দিলেন এবং সেই প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করিলেন যে, জাপানী সমরশক্তি যদি ধ্বংস করা না হয়, তবে, অনিশ্চয় ভবিষ্যতই জাপান পুনরায় প্রতিশোধাত্মক যুদ্ধে অংশগ্রহণ হইতে পারে।...

\*

\*

\*

জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আলোচনা প্রসঙ্গেই পরাজিত জার্মানীকে নিষা যে অজস্র সমস্তা দেখা দিয়াছে, হপকিন্স ষ্ট্যালিনের নিকট সে কথাও উল্লেখ করিলেন এবং তাঁকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, কিছু দিন আগে তিনি (ষ্ট্যালিন) একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, তিনি জার্মানীকে খণ্ডনের (dismemberment) পক্ষপাতী নন। কিন্তু তেহরান ও ইয়ান্টার শীর্ষ সম্মেলনে ষ্ট্যালিন জার্মানী সম্পর্কে যে সমস্ত মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাঁর অধুনাতন বক্তৃতায় কিছু সেগুলির বিপরীত। জবাবে ষ্ট্যালিন তাঁর বক্তব্যের ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন যে, ইয়ান্টা বৈঠকে জার্মানী সম্পর্কে তাঁর সুপারিশ অগ্রাহ্য করা হইয়াছিল। বিশেষতঃ বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইডেন বলিয়াছিলেন যে, যখন আর কোন উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, একমাত্র তখনই শেষ পন্থা হিসাবে জার্মানীকে খণ্ডন করা হইবে। অবশ্য এই আলোচনা হইয়াছিল লণ্ডনে এবং সেখানে তখন মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ উইনাকটও উপস্থিত ছিলেন। তিনিও ইডেনের বক্তব্যের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি তোলেন নাই। সুতরাং ষ্ট্যালিনের ধারণা হইয়াছিল যে, বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই জার্মানীকে খণ্ডনের বিরোধী। হপকিন্স এর জবাবে ষ্ট্যালিনকে বুঝাইলেন যে, এই ব্যাপারটা সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই প্রশ্নটিকে খোলা রাখিয়াছেন। তিনি প্রধানের আগামী বৈঠকে নিশ্চয়ই এই বিষয়টি আলোচিত হইবে। কিন্তু ইতিমধ্যে ষ্ট্যালিনের এমন ধারণা করা উচিত নয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জার্মানীকে খণ্ডনের বিরোধী। বরং অবস্থাটা বিপরীত হইতে পারে। তিনি মিত্রশক্তি আগামী শীর্ষ বৈঠকে জার্মানীর সমস্তা ও খণ্ডনের বিষয় নিষা নিশ্চয়ই নিজেদের মধ্যে চূড়ান্ত মীমাংসায় পৌঁছিবেন—এই আশা ব্যক্ত করিলেন হপকিন্স। যুদ্ধবন্দী সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে মার্শাল ষ্ট্যালিন

বলিলেন যে, তিনি ঠিক স্থিতিস্থিতিভাবে অবগত নন। তবে, তাঁর ধারণা রাশিয়ার হাতে প্রায় ২৫ লক্ষ বুদ্ধবন্দী আছে। এর মধ্যে ১৭ লক্ষ জার্মান, আর বাকী সব রুমেনিয়, ইতালীয়, হাঙ্গেরীয় প্রভৃতি। (১৩)

\* \* \*

হপকিন্সের মনো পরিদর্শন ও ষ্ট্যালিনের সঙ্গে আলোচনা মোটামুটি সার্থক হইয়াছিল এবং তখনকার মত রুশ-মার্কিন সমঝোতার পক্ষে সহায়ক হইয়াছিল। কারণ, মোটামুটি এই আলোচনার উপর ভিত্তি করিয়াই জুলাই মাসের মধ্যভাগে পটসডাম সম্মেলন অহুষ্ঠিত হইয়াছিল। ১২ জুন হপকিন্স ওয়াশিংটনে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পরদিন তিনি সকালে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের সঙ্গে প্রাতঃরাশের টেবিলে যোগ দিলেন এবং ট্রুম্যান তাঁকে মনোর সাফল্যের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাইলেন এবং পটসডামের আসন্ন সম্মেলনে যোগদানের জন্য তাঁকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু হপকিন্স নান কারণে রাজী হইতে পারিলেন না।

হপকিন্সের এই সমস্ত কূটনৈতিক সাফল্য ও রুজভেল্টের সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্য অনেকেই তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন এবং সমালোচকেরা তাঁকে ‘হোয়াইট হাউজের রাসপুটিন’ বলিয়া বিদ্রোপ করিতেন। কিন্তু সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্কের ইতিহাসে তিনি রুজভেল্টের পরেই শ্রেষ্ঠ কীর্তি অর্জন করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে সমর-সচিব হেনরি স্টিমসন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্ডেল হালের সহযোগীতাও উল্লেখযোগ্য ছিল।

(১৩) শেরউড, পৃষ্ঠা ২০৪-৫

## দশম পর্ব

### দ্বিতীয় অধ্যায়

#### পটসডাম সম্মেলন—(১)

#### ইউরোপীয় কূটনৈতিক পটভূমিকায়

১১১

মিত্রপক্ষের তিন শীর্ষস্থানীয় নেতার মধ্যে পটসডাম কিংবা বার্লিন সম্মেলন সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। ১৭ জুলাই থেকে ২ আগস্ট, ১৯৪৫, পর্যন্ত এই সম্মেলন অস্থিতি হইয়াছিল এবং অল্প সময় নিয়া আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু বিখ্যাত মার্কিন ঐতিহাসিক হার্বার্ট কীজ তাঁর পটসডাম সম্মেলন সংক্রান্ত পুস্তকে (পৃষ্ঠা ১৬৩) লিখিয়াছেন যে, এই সম্মেলন আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল ১৬ই জুলাই। কিন্তু স্ট্যালিন ‘মুহূরুরোগে’ আক্রান্ত হওয়ার সম্মেলন একদিনের জন্য পিছাইয়া গিয়াছিল। স্ট্যালিন একজন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের সঙ্গে দেখা করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, তাঁর চিকিৎসকরা তাঁকে আকাশপথে উড়িতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তাঁর ‘লাংসের দুর্বলতার জন্য’। ‘কিন্তু আসলে তিনি ক্ষুরোগে ভুগিতেছিলেন।’

মহাযুদ্ধের কূটনৈতিক ইতিহাসে পটসডাম সম্মেলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। কারণ, অস্বাস্থ্য বহু প্রকারে মধ্যে এই সম্মেলনে জার্মানী, পোল্যান্ড, পূর্ব ইউরোপ, জাপান ও এ্যাটম বোমা এবং জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়ার বৃহৎ ঘোষণার প্রস্তাব ইত্যাদি প্রাধান্য অর্জন করিয়াছিল।...

রাজধানী বার্লিনের অনতিদূরে (মাইল ২০।২৫ দূর) পটসডাম কেবল অভিজাত শহর নয়, জার্মান সামরিক শক্তির অন্ততম উৎসবস্থল। অর্থাৎ ইম্পেরিয়েল জার্মানীর কাইজারের আমল থেকে তার খ্যাতি। এই শহরের বিখ্যাত সিসিলিয়েনহোফ প্রাসাদে (Cecilienhof Palace) সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের রাজনৈতিক ও সামরিক প্রধানগণ যে আলোচনা সভায় মিলিত হইয়াছিলেন, তার দূরপ্রসারী কলাকল মহাযুদ্ধের পরবর্তী কাল পর্যন্ত প্রতিকলিত হইয়াছিল।\*

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কাইজার (জার্মান সম্রাট) দ্বিতীয় উইলহেলম তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হুব্রাজ বা ক্রাউন প্রিন্সের জন্য এই সিসিলিয়েনহোফ প্রাসাদে ভেরী করিয়াছিলেন ১৯১৪ থেকে ১৯১৬ সালে। কাইজারের রাজত্ববায়ের একজন খ্যাতিনামা স্থপতি-শিল্পী ইংলন্ডের পল্লীভবনের (ইংলিশ কান্ট্রি হাউজ) কারদার বা স্টাইলে এই নরনলোভন এবং ঐশ্বর্যশালী আরামদায়ক প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। সেই প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যখন আজিকার তুলনায় জিনিসপত্রের দাম ছিল অত্যন্ত সস্তা, তখন এই প্রাসাদ নির্মাণে ও সম্বীকরণে খরচ পড়িয়াছিল ৮০ লক্ষ বর্ষ মার্ক। এই প্রাসাদে ১৭৬টি কক্ষ বা রুম আছে এবং এর প্রত্যেকটির অভ্যন্তর

১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে গ্রহকার কর্তৃক দ্বিতীয়বার জার্মান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বা জি ডি আর পরিভ্রমণের সময় পটসডামের সেই বিখ্যাত সম্মেলন-স্থান সম্রাটিক পরিদর্শনের সুযোগ হইয়াছিল।—লেখক।

ভাগই রাজকীয় সাজসজ্জার ও বর্ণাঢ্য সুরম্য অর্পণ ছিল। সুবরাজ উইলহেলম কন হোহেনজোলার্নের বসবাসের জন্য এই পল্লী প্রাসাদপুরীর উদ্বোধন হইয়াছিল ১৯১৭ সালের শরৎকালে—যখন মহাযুদ্ধের কলে সাধারণ প্রজাপুঞ্জের কষ্টের গীতা ছিল না। ১৯১৮ সালের নভেম্বর বিপ্লবের পর পটসডামের এই রাজপ্রাসাদকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৯২৬ সালে পুনরায় সম্রাট পরিবার বা রাজবংশের সম্পত্তিগুলি এক বিশেষ আইন বলে হোহেনজোলার্ন পরিবারের হাতে ফেরৎ দেওয়া হইল। একদিন প্রিন্স বা সুবরাজের পরিবারবর্গ ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে এই সুরম্য প্রাসাদ থেকে যাবতীয় মূল্যবান এবং অস্বাভাব্য সম্পত্তি ও অব্যাহিসহ পশ্চিম জার্মানীতে চলিয়া যান।\*

সাম্রাজ্যবাদী জার্মানীর যুদ্ধবাজ শক্তির শেষ ‘রাজকীয় প্রতিনিধি’ যে সেগিলিয়েন-হোক প্রাসাদে এতদিন সাড়ম্বরে বাস করিতেছিলেন, বার্লিনের পতনের পর সেই প্রাসাদেরই কক্ষে পরাজিত জার্মানীর ভাগ্য নির্ধারণের জন্ত বিজয়ী শক্তিবর্গের তিন প্রতিনিধির ঐতিহাসিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হইল। সুতরাং নিঃসন্দেহে এটা ছিল নাৎসী-বাদ ও সামরিকবাদের আত্মসমর্পণের প্রতীকের মত।...

পটসডাম সম্মেলন স্বকারী দলিলপত্রে অনেক সময় বার্লিন কনফারেন্স নামেও অভিহিত হইয়াছে! প্রাসাদের লাল কার্পেটপাতা সুরম্য কক্ষে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। একটি বৃহৎ গোল টেবিলের উপর তিন প্রধান মিত্রশক্তির তিনটি রাষ্ট্রীয় পতাকা একটি স্বেত পাথরের স্ট্যাম্পে সজ্জিত ছিল। এই পতাকাগুলি যেভাবে সজ্জিত ছিল, তিন প্রধানের নেতারা স্ব স্ব ডেলিগেশনের নামকরূপে গোল টেবিলের চারপাশে সেভাবেই আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। টেবিলের ডানপাশে স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন সোভিয়েত নেতা জে ভি স্ট্যালিন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভি এম মলোটোভ। বাঁ দিকে ছিলেন ব্রিটিশ ডেলিগেশনের পক্ষে প্রধান মন্ত্রী চার্চিল ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইডেন—১৭ই জুলাই থেকে ২৫ জুলাই পর্যন্ত মোট ৯টি অধিবেশনে। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার রক্ষণশীল দল পরাজিত হইয়াছিল (যদিও চার্চিল এবং স্ট্যালিন উভয়েই জয়ের আশা করিয়াছিলেন)। সুতরাং চার্চিলের বদলে নেতারূপে যোগ দিলেন অমিক দলভুক্ত প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেন্ডিন। তাঁরা ২৮ জুলাই থেকে ২ আগস্ট পর্যন্ত সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশ্য সম্মেলনের গোড়া থেকেই অমিক দলনেতা এ্যাটলি বিরোধী পক্ষের নামকরূপে চার্চিলের সঙ্গে “পর্ববেক্ষক” হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান প্রবেশ পথের বিপরীত দিকে টেবিলের সামনে বসিয়াছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেলিগেশনের নামক প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী বার্নস্। এঁরা ছিলেন স্ট্যালিনের ডান দিকে।

এর আগে ইয়ান্টাতে তিন প্রধানের (স্ট্যালিন, চার্চিল ও রুজভেল্ট) চুক্তি অল্পসারে ক্রান্তকণ্ঠে জার্মানীর অংশবিশেষ দখল ও নিয়ন্ত্রণে অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। সেই চুক্তি অল্পসারে করাসী সরকারের প্রতিনিধিরূপে মরিস ডিজঁ (Maurice Dejean) এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

\* ভি ভি আর কর্তৃক প্রকাশিত পটসডাম সংক্রান্ত পুস্তক থেকে।

বিষয় (৩)—১

এই সম্মেলনের রিপোর্ট সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ তথ্য এই যে, পরবর্তীকালে যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টরূপে বিশ্বখ্যাতি অর্জন কবিয়াছিলেন, সেই পরলোকগত (আততায়ীর গুলীতে নিহত) জন এক কেনেডি এবং বিখ্যাত সোভিয়েত লেখক বোরিস পলেন্ডয় স্পেশাল রিপোর্টার হিসাবে পটসডামে উপস্থিত ছিলেন। সময় সময় ৫০ জন পর্যন্ত বৈদেশিক সাংবাদিক এই সম্মেলনের রিপোর্ট করার জন্য উপস্থিত থাকিতেন এবং তাঁরা সবসময় ন করিতেন উপরের দ্বিতল কক্ষের অর্কেস্ট্রা রুমে।

১৭শন সবেমাত্র যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। স্মৃতরাং ব্যাপক ধ্বংসকালের মধ্যে বাসস্থানের খুব অসুবিধা ছিল। একজ্ঞ কনকারেন্সের প্রতিনিধি দল বার্লিন-পটসডামের মধ্যবর্তী ১২ মাইল দূরে ব্যাবেলসবার্গের ওয়েইট ভিলাতে বাস করিতেন। কিন্তু স্থানীয় হেভেল নদীর উপর অবস্থিত সমস্ত সেতু ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। একজ্ঞ সোভিয়েত বাহিনীর ইঞ্জিনিয়াররা এই সম্মেলনের জন্য তাড়াহুড়া করিয়া পটুন ব্রীজ তৈয়ার করিয়া দিয়াছিলেন বিভিন্ন ভৌগোলিক সিসিলিয়েনহোফ প্রাসাদে যাতায়াতের জন্য ...

পটসডাম সম্মেলনে যোগদানের জন্য মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের ওয়াশিংটন-বার্লিন যাতায়াতের জন্য কী বিপুল আড়ম্বরপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, সে কথা ট্রুম্যান তাঁর আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ডে (২১ তম অধ্যায়) অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে বর্ণনা করিয়াছেন। (বোধ হয় প্রেসিডেন্ট হিসাবে নূতন অভিজ্ঞতার জন্যই তিনি এত উল্লসিত হইয়াছিলেন।) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট যখন ওয়াশিংটনের হায়েদান, তখন গারারণ অবস্থাতেই তাঁর নিরাপত্তা ও কাজকর্মের জন্য বিশেষ ধরনের অনেক বাস্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে। স্মৃতরাং তিনি যখন বিভিন্ন রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য—বিশেষভাবে যুদ্ধকালীন অবস্থায় আমেরিকার বাইরে যান, তখন তাঁর গমনপথ ও গন্তব্যস্থলের জন্য এমন সমস্ত ব্যাপক ও অদ্ভুত ধরনের বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়া থাকে যে, তার বর্ণনা দেওয়া কঠিন ট্রুম্যান স্বয়ং লিখিয়াছেন :

**'It is hard to picture all that is involved in getting a President off to a conference such as the one I was about to attend in Potsdam. The fact that this was to be a meeting with heads of other governments called for extraordinary planning of transportation, housing, protection and security, communications protocol and staffs.'**

প্রেসিডেন্ট যেখানেই যান কিংবা যেখানেই থাকুন না কেন, হোয়াইট হাউজের সঙ্গে অবিলম্বে যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। বহু সরকারী কর্মচারী ও অফিসারের কর্মব্যস্ততা ভুলে উঠিয়া থাকে। পটসডাম সম্মেলনের জন্য ক্যাবিনেট অফিসার ও রাষ্ট্রদূতবৃন্দ, সেনানীমণ্ডলীর প্রধানগণ, হোয়াইট হাউজের স্টাফ এবং পররাষ্ট্র, আর্মি, নৌ ও বিমানবাহিনীর প্রধানগণ, ট্রেজারি ও সোয়েদা বিভাগের কর্মচারীগণ প্রমুখ সকলকেই অংশ গ্রহণ করতে হইয়াছিল। সংক্ষেপে বলা বাইতে পারে যে, সম্মেলনের স্থায়ীস্থানের জন্য একটি ছোটখাটো 'হোয়াইট হাউজ' গাড়ি



তুলিতে হইয়াছিল। গোয়েন্দা বিভাগের কিংবা সিক্রেট সার্ভিসের মাঝে মাঝে সমস্ত রাস্তা, যানবাহন এবং প্রেসিডেন্টের আবাসস্থল ইত্যাদি ঘাঁড়ি খোঁজা হইয়া থাকেন। লণ্ডন, মস্কো এবং ওয়াশিংটনের সঙ্গে যাতায়াত অবিরতভাবে এবং অবিলম্বে ক্ষুণ্ণতম যোগাযোগ ও বার্তা আদান-প্রদান ঘটাইয়া দিতে পারে, তেমন বন্দোবস্ত করা হইয়া থাকে। অধিকন্তু প্রেসিডেন্টের সতর্কতা বৃদ্ধি করিয়া পরিচালনার বাত্রে বিন্দুমাত্র বিঘ্নও না ঘটতে পারে, তেমন নিখুঁত ব্যবস্থাও হইয়া থাকে। জার্মানীর রূপ অধিকৃত এলাকায় এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের আয়োজন করা হইয়াছিল। (১)

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এবং তাঁর দলবল যুক্তরাষ্ট্রে আমেরিকা থেকে অভ্যন্তরীণ মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়া ইউরোপের এন্টওয়ার্পে বন্দরে পৌঁছিলেন ৩:৮৭ মাইল অতিক্রমণের পর। বলা বাহুল্য যে, প্রেসিডেন্টের বৃহৎ রণতরী ‘আগাট’তে বহির্পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগের এবং সম্মেলন সংক্রান্ত কাজকর্ম পরিচালনার সমস্ত ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাঁর এই সমুদ্র পাড়ি দিয়া এন্টওয়ার্পে পৌঁছিতে ৯ দিন সময় লাগিয়াছিল। (সমুদ্রযাত্রার কিছু পথ ইউরোপের নিকটবর্তী এলাকার মাইনের ভয়ে খুব ধীর গতিতে অহুষ্ঠিত হইয়াছিল) সেখান থেকে তিনি বিমানযোগে বার্লিন ও পটসডাম পৌঁছিলেন। বিভিন্ন ডেলিগেশনের অবস্থানের সুব্যবস্থা করা হইয়াছিল বার্লিনের দক্ষিণ-পূর্বে ব্যাবেলসবার্গ শহরে। সোভিয়েত বাহিনী এবং নিরাপত্তা রক্ষীদের পক্ষ থেকে শীর্ষনেতা ও তাদের সহকর্মীদের রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত প্রকার ব্যবস্থা হইয়াছিল। আমন্ত্রণ হিসাবে একত্রে সোভিয়েত রাশিয়াকে গভীর দায়িত্ব বহন করিতে হইয়াছিল। শীর্ষনেতা ও তাদের সহকর্মীদের জন্য ইয়ান্টা সম্মেলনের অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল।

\*

\*

\*

১৭ জুলাই, ১৯৪৫, অপরাহ্নে সিসিলিয়েনহোফ প্রাসাদে পটসডাম সম্মেলনের অধিবেশন শুরু হইল। স্ট্যালিনের প্রস্তাবক্রমে ও চার্চিলের সমর্থনে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। তিনি মার্কিন প্রতিনিধি মণ্ডলীর পক্ষ থেকে যে কর্মসূচী পেশ করিলেন, তার মর্ম এই—(১) প্রাক্তন শত্রু রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে শান্তিসন্ধির খসড়া রচনার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের একটি কাউন্সিল গঠন। (২) জার্মানী সম্পর্কে মিত্রপক্ষের পলিসি নির্ধারণের জন্য মূলনীতি স্থিরীকরণ। (৩) যুক্তপ্রাণ্ট ইউরোপ সম্পর্কে ইয়ান্টা সম্মেলনের ঘোষণা কার্যক্ষেত্রে রূপায়ন। (৪) ইটালীর সঙ্গে যুক্তবিরতির সর্ব সহজতর করণ এবং ইতালীকে রাষ্ট্রপুঞ্জের সংগঠনের সদস্যরূপে গ্রহণ।

সোভিয়েত ডেলিগেশনের পক্ষ থেকে (১) জার্মানীর কাছ থেকে দ্রুতপূরণ আদায়ের দাবি সম্পর্কে আলোচনার প্রস্তাব করা হইল। (২) জার্মানীর প্রাক্তন ভাবেদার রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনরায় স্থাপনের (৩) সিরিয়া ও লেবানন সমস্কার এবং (৪) ক্রাফোর স্পেন ও অস্ট্রা প্রদেশের মীমাংসার দাবি করা হইল।

বৃটিশ ডেলিগেশন তাঁদের কর্মসূচীতে পোল্যান্ড ও যুগোস্লাভিয়ার সমস্কার মীমাংসা দাবি করিলেন।

(১) ট্রুম্যান—প্রথম খণ্ড, ৩৬৭-৬৮ পৃষ্ঠা

এই সমস্ত কর্মসূচীর সংশ্লিষ্ট বহু প্রসঙ্গ নিয়া পটসডাম সম্মেলনে বহু তর্কবিতর্ক ও বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছিল। তবে, অধিবেশনের গোড়াতেই মার্কিন প্রস্তাব অমুযায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের যে কাউন্সিল গঠিত হইল, সেই কাজটা ছিল গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, যুদ্ধের শেষে ইউরোপীয় মহাদেশে অনেক জটিল প্রশ্নের উদ্ভব হইয়াছিল এবং একজন্ত শান্তিসন্ধির খসড়া রচনার প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক। প্রধান পক্ষশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের নিয়া যে কাউন্সিল গঠিত হইল, তার উপর দায়িত্ব দেওয়া হইল ইতালী, রুম্যানিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি ও ফিনল্যান্ডের সঙ্গে শান্তিসন্ধির খসড়া রচনা ও রাষ্ট্রসংঘে তা পেশ করার জন্ত। যদি জার্মানীর জন্ত কোন উপযুক্ত গবর্ণমেন্ট গঠিত হয়, তবে সেই গবর্ণমেন্টের জন্ত শান্তিসন্ধির একটা খসড়া রচনার প্রস্তাব করা হইল।

পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের এই কাউন্সিল যুদ্ধোত্তর ইউরোপের অনেক সমস্ত মীমাংসার পক্ষে খুব সহায়ক হইয়াছিল। অবশ্য এই কাউন্সিল গঠনের আগে 'ইউরোপীয় পরামর্শদাতা কমিটি'র কার্যলাপও বিবেচনা করা হইয়াছিল। ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত এই কমিটি অনেক মূল্যবান কাজ করিয়াছিল—যেমন, ১২টি চুক্তিপত্রের খসড়া তৈরী করা হইয়াছিল, জার্মানীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের প্রস্তাব রচনা করিয়াছিল এবং জার্মানীতে ও অস্ট্রিয়ার মিত্রপক্ষের দখলদারির এলাকা নির্দিষ্ট করিয়াছিল এবং সেই সঙ্গে মিত্রপক্ষের তরফ থেকে এই দুই দেশের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পাটাইবার জন্তও একটি সংস্থা গঠন করা হইয়াছিল।

ইউরোপীয় পরামর্শদাতা কমিটির এই সমস্ত কাজ মিত্রপক্ষের নেতাদের নিকট সমস্তোৎসাহক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। অতঃপর বার্লিন ও ভিয়েনার জন্ত নতুন কাউন্সিল ও কমিশন গঠিত হওয়ার ইউরোপীয় পরামর্শদাতা কমিটি বাতিল করিয়া দেওয়া হইল।

\*

\*

\*

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পটসডামে সবচেয়ে দীর্ঘ কুটনৈতিক সম্মেলনের অস্থান হইয়াছিল এবং যদিও তিন প্রধান শক্তির মধ্যে বাহ্যতঃ একটা ঐক্যের রূপ রাখা হইয়াছিল, তথাপি বিরোধ ও মতান্তর হইয়াছিল যথেষ্ট এবং এই দীর্ঘতম সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়ও ছিল অনেক রকমের। সম্মেলনের শেষে ২০ পৃষ্ঠাব্যাপী যে দীর্ঘ ইন্ডাহার প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই দলিলটি ১৫টি খণ্ডে বিভক্ত ছিল। যথা—(১) যুদ্ধবন্দ বা প্রস্তাবনা (২) পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের কাউন্সিল গঠন (৩) জার্মানী (৪) জার্মানীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ (৫) জার্মানীর নৌবহর ও বাণিজ্যবহর (৬) কোলিসবার্গ (৭) যুদ্ধাপরাধীদের প্রায় (৮) অস্ট্রিয়া (৯) পোল্যান্ড (১০) শান্তিসন্ধিগুলির খসড়া এবং ইউ এন ও'র সদস্যগণ (১১) ট্রাস্টিশিপ বা অধিগণিত অধীন জুডগসমূহ (১২) রুম্যানিয়া, বুলগেরিয়া ও হাঙ্গেরীর মিত্রপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের পদ্ধতির সংশোধন। (১৩) জার্মান বাসিন্দাদের অপসারণ (১৪) সম্মেলনের মিত্রপক্ষীয় সেনানীতিগুলির প্রধানগণের আলোচ্য সামরিক সমস্তাসমূহ এবং (১৫) প্রতিনিধিত্বগুলির তালিকা।

পটসডাম সম্মেলনের মোট ১০টি পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হইয়াছিল এবং উপরে বর্ণিত বিষয়গুলির দীর্ঘ তালিকা ছাড়াও কতকগুলি কমিটি ও সাবকমিটিতে আরও বহু বিষয় আলোচিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ জাপানের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে দীর্ঘ ইত্তাহারে কিছু উল্লেখ ছিল না। কারণ, দোড়িয়েত রাশিয়া তখনও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল না। এবং সামরিক গোপনীয়তা রক্ষার খাতিরে পারমাণবিক বোমা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ইঙ্গিতও ছিল না। ..

সম্মেলনে জার্মানীর সমগ্ৰা স্বভাবতঃই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বার্লিনে এই জুনের স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী পরাজিত জার্মানীর শাসন ও পরিচালন কিংবা বিলি ব্যবস্থা সংক্রান্ত সর্বময়ক্ষমতা দখলকারী চার শক্তির হাতে অর্পিত হইল। কিন্তু এই চূড়ান্ত ক্ষমতা সত্ত্বেও অধিকৃত জার্মানী মিত্রশক্তিবর্গের কাহারও রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল না। কিন্তু জার্মানী চতুঃশক্তির দখলদারির মধ্যে বিভক্ত হইল এবং দোড়িয়েত দখলীকৃত এলাকা থেকে ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত হইল।

যদিও লালকোজের হাতে বার্লিনের পরাজয় ও পতন ঘটয়াছিল, তথাপি শহরতলীসহ বৃহত্তর বার্লিনও চতুঃশক্তির দখলে গেল এবং দখলদার শক্তিগুলির মধ্যে বার্লিন পূর্বে ও পশ্চিমে বিভক্ত হইল। অবশ্য বার্লিন একান্তরূপে পূর্ব জার্মানীর (বর্তমান জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বা জি ডি আর) ভৌগোলিক সীমানার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পশ্চিম জার্মানীর সীমানা থেকে তার দূরত্ব ছিল ১১০ মাইল। কিন্তু জার্মানীর শাসন ও পরিচালনার জন্য চতুঃশক্তির সেনাপতিদেরকে নিয়া যে কন্ট্রোল কাউন্সিল গঠিত হইয়াছিল, তার সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হইল বার্লিনে এবং মার্কিন, ব্রিটিশ ও ফরাসী সৈন্তেরাও পশ্চিম বার্লিনে বাঁটি স্থাপন করিল—যেমন, পূর্ব বার্লিনে লালকোজের বাঁটি প্রতিষ্ঠিত হইল। জার্মানীকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সমস্ত প্রকার হিটলারী ও ন্যাৎসী সংগঠন, নানা প্রকার নামধারী আধা-সামরিক সংস্থা, গেটাপো ও অন্যান্য গোয়েন্দাচক্র, মিলিটারি ক্লাব, ন্যাৎসী পার্টি এবং জেনারেল স্টাক বা সেনানীমণ্ডলী ও সামরিক সংস্থা প্রভৃতি বাতিল ও বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইল। সম্মেলনের শেষে প্রচারিত ইত্তাহারে আরও বলা হইল যে, জার্মানী থেকে সামরিকবাহ ও ন্যাৎসীবাদের সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ ঘটানো হইবে এবং ভবিষ্যতে আর কোনদিন জার্মানী যাতে কোন প্রতিবেশীকে আক্রমণ ও পৃথিবীব্যাপী শাস্তি নষ্ট করিতে না পারে, তার জন্য যে কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। তবে, জার্মানীতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমস্ত গণতান্ত্রিক পার্টিগুলিকে সভাসমিতি করার অধিকার দেওয়া হইবে। কিন্তু মনোপলি, ট্রাষ্ট, সিণ্ডিকেট ইত্যাদির মারক্কে যে অর্থনৈতিক শক্তি এতদিন কেন্দ্রীভূত ছিল সেগুলি ভাঙিয়া দেওয়া হইবে। (২)

কিন্তু জার্মানীকে চতুঃশক্তির দখলদারিতে পরিণত করার প্রস্তাব সত্ত্বেও প্রকাশিত ইত্তাহারে কিন্তু জার্মানীর পার্টিশনের বা বিভক্তকরণের কোন উল্লেখ ছিল না।

There was no mention of any partition of Germany, but the communique stated that, for the present, no central German Government would be formed. There would, however, be certain central German administrative departments, acting under the guidance of the Allied Control Council.—(৩)

অর্থাৎ জার্মানীকে বিভক্তকরণের যেমন উল্লেখ ছিল না, তেমনি কোন কেন্দ্রীয় জার্মান সরকার গঠনের প্রস্তাব ছিল না। তবে, মিত্রশক্তিবর্গের কন্ট্রোল কাউন্সিলের অধীনে জার্মানীর কিছু কিছু কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক বিভাগ বজায় রাখার কথা হইয়াছিল।

কিন্তু জার্মানীকে গণ্ডন করা না করা সম্পর্কে মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে নানা বৈঠকে নানা ধরনের প্রস্তাব ও বিতর্ক হইয়াছিল এবং মিত্রশক্তিগণ শীঘ্র নেভারা চার্চিল, রুজভেল্ট (পরবর্তী কালে ট্রুম্যান) ও স্ট্যালিন নিজেদের মধ্যে সর্বসম্মত কোন প্রস্তাব বা পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। একত্রিত হুঙ্ক সংজ্ঞাস্ত নানা পুস্তকে নেতৃবৃন্দের মধ্যে মত সামঞ্জস্যের অভাব দেখা যায়। মহাযুদ্ধের সময় স্ট্যালিন তাঁর একাধিক বিবৃতিতে এবং তারপর পটসডাম সম্মেলনে তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন যে, নাৎসীবাদকে নিশ্চয়ই ধ্বংস করিতে হইবে; কিন্তু জার্মান জাতিকে নয়। জার্মান জাতির অধঃপতন রক্ষার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। তেহরাণ সম্মেলনের (১৯৪৩ সালের ২৮ নভেম্বর থেকে ১লা ডিসেম্বর) প্রস্তাব অনুযায়ী জার্মানীকে পাঁচটি অংশে বিভক্ত করার পরিকল্পনা হইয়াছিল। এই পাঁচটি অংশ ছাড়াও হামবুর্গ ও কিরেল-খাল অঞ্চলকে রাষ্ট্রসভ্যের বা চতুঃশক্তির শাসনাধীনে আনার এবং অনুরূপভাবে রুড ও সার অঞ্চলকে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে আনার প্রস্তাব হইয়াছিল। এছাড়া ১৯৪৪ সালে ইঙ্গ-মার্কিন কুইবেক কনফারেন্সে মার্কিন ট্রেজারার সচিব হেনরি মর্গেনথো (Morgenthau—জুনিয়ার) জার্মানীকে দুই অংশে ভাগ করিয়া পশ্চিমাংশে আর একটি পৃথক আন্তর্জাতিক এলাকা সৃষ্টির পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। এছাড়া সার সহ রাইন নদীর বাঁ দিকের অঞ্চল ফ্রান্সকে দেওয়ার এবং কলকারগানা ধ্বংস করার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। উদ্দেশ্য ছিল 'নথরস্ট্রাহীন' জার্মানীর খণ্ডিত অংশগুলিকে কৃষি-প্রধান এলাকায় পরিণত করা। অবশ্য স্ট্যালিনের মত রুজভেল্টও এই উদ্ভট পরিকল্পনা ব্যতীল করিয়াছিলেন। অপর পক্ষে চার্চিলও জার্মানীকে ষাণ্ড বিখণ্ড করিয়া এবং কয়েকটি অংশ নিয়া একটি 'দানিয়ুর ফেডারেশন' গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। স্ট্যালিন এই সমস্ত প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন।

কিন্তু পটসডাম সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান জার্মানীকে উত্তরে, দক্ষিণে ও পশ্চিমে বিভক্ত করার প্রস্তাব আনিয়াছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ভিয়েনাকে রাজধানীর বর্ধায়া দিয়া দক্ষিণ জার্মান টেট গড়ার যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল, তা ছিল যুদ্ধোত্তর বাধীন অস্ট্রিয়ার সার্বভৌমত্বের বিরোধী এবং ট্রুম্যানও শেষ পর্যন্ত এই সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া নিজে বাধ্য হইয়াছিলেন। আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, পটসডাম সম্মেলনের পর ২ আগস্ট, ১৯৪৫, ট্রুম্যান-স্ট্যালিন

এ্যাটলি কর্তৃক স্বাক্ষরিত ইত্তাহারে জার্মানীকে পার্টিশান বা বিভক্ত করার কোন প্রস্তাব ছিল না।

তথাপি কার্যতঃ জার্মানী শণ্ডিত বা পার্টিশান হইল কি ভাবে? এর মূল রহিয়াছে জার্মানীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের দাবির মধ্যে। ইয়ান্টোতে ত্রিশকটির শীর্ষ সম্মেলনে সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষ থেকে ষ্ট্যালিন ১০ হাজার মিলিয়ন ডলার (বা দুই হাজার কোটি ডলার) ক্ষতিপূরণ বাবদ আদায়ের দাবি তুলিয়াছিলেন। এই বিশ হাজার মিলিয়ন ডলারের অর্ধেক পাইবেন মিত্রশক্তি এবং বাকী অর্ধেক বা শতকরা ৫০ ভাগ পাইবে সোভিয়েত রাশিয়া এবং সোভিয়েত রাশিয়ার অংশ থেকেই পোল্যান্ডের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে। (পোল্যান্ডের ক্ষণ ছিল অবর্ণনীয় এবং জনসংখ্যার বিচারে সবচেয়ে বেশী। অতএব ক্ষতিপূরণ লাভের যোগ্যতাও তার ছিল অনেক বেশী।) যদিও ক্ষতিপূরণ অঙ্কের তীব্র বিরোধিতা করিয়াছিলেন বৃটিশ ও মার্কিন মহল এবং বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের ক্ষতিপূরণ অঙ্কের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত আমেরিকার ঘাড়ে এই দায় দাঁড়ায় বর্তাইয়াছিল জার্মানীকে সহায়তা দান করিতে গিয়া, তথাপি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ইয়ান্টো বৈঠকে ক্ষতিপূরণের মূল নীতি মানিয়া নিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যতে বিবেচনার কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু পটসডাম বৈঠকে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ও মার্কিন প্রতিনিধিগণ জার্মানীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ২ হাজার কোটি ডলার আদায়ের এই অঙ্কে 'সম্পূর্ণ অবাস্তব' বলিয়া অগ্রাহ্য করিলেন। এই প্রস্তাব নিষা বহু তর্ক বিতর্কের শেষে স্থির হইল যে, দখলদার চতুঃশক্তি তাঁদের নিজ নিজ অধিকৃত এলাকা (zone) থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ কলকারখানার যন্ত্রপাতি, চলতি উৎপন্ন দ্রব্য এবং অন্যান্য মালপত্র অপসারণ করিতে পারিবেন। আর বিদেশে, যেমন বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, রুম্যানিয়া, কিমল্যাণ্ড এবং পূর্ব অস্ট্রিয়াতে জার্মানী যে সমস্ত মূলধন (সম্পত্তি) নিয়োগ করিয়াছিল, সেগুলি থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারিবেন। পশ্চিমী মিত্র-পক্ষীয়রাও তাঁদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ অল্পরূপভাবে আদায় করিতে পারিবেন। কিন্তু ইজ-মার্কিন পক্ষ একদিক দিয়া লাভবান ছিলেন, তাঁদের হাতে জার্মানীর প্রচুর সোনা ধরা পরিয়াছিল। কিন্তু রাশিয়া এই সোনার কোন অংশ দাবি করে নাই। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়াতে হিটলারের জার্মানী যে সীমাহীন ধ্বংসকার্য চালাইয়াছিল, সেই ভয়াবহ ক্ষতির কথা বিবেচনা করিয়া সোভিয়েত গণগণমেন্ট পশ্চিমীদের অধিকৃত এলাকা থেকে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ আদায়ের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু ইজ-মার্কিন মহল থেকে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি তোলা হইল। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন পশ্চিমী এলাকা থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ কলকারখানার যন্ত্রপাতির শতকরা ১৫ ভাগ পাইবে। কিন্তু এর পরিবর্তে সোভিয়েত অধিকৃত এলাকা থেকে ধাতুদ্রব্য ও অন্যান্য বস্তু দিতে হইবে। কারণ, পশ্চিমাত্মে ধাতুদ্রব্যের অভাব অভাব ছিল। জার্মানীর কাছ থেকে এই ক্ষতিপূরণ আদায়ের প্রসঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়া জার্মানীর বিখ্যাত রুড অকলের শিল্পসমৃদ্ধ এলাকার উপর

অন্তাগ্র পশ্চিমী শক্তির সঙ্গে নিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবী করিয়াছিলেন। কিন্তু এই দাবী বৃটিশ ও মার্কিন পক্ষ সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিলেন। (৪)

চতুঃশক্তির মধ্যে ক্ষতিপূরণের এই বন্টনব্যবস্থা থেকেই মূলতঃ প্রত্যেকটি দখলি কৃত এলাকা স্বতন্ত্র অংশে পরিণত হইয়াছিল এবং জার্মানী চতুঃশক্তির মধ্যে খণ্ডিত হইল। চার্লিল-ষ্ট্যালিনের প্রস্তাব অনুসারে এই খণ্ডনের ভিত্তি ধরা হইল জার্মানীর ১২৩৭ সালের ভৌগোলিক সীমানা। কলে, পশ্চিম থেকে সোভিয়েত রাশিয়া পূর্বদিকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল এবং পূর্ব জার্মানী ও পূর্ব ইউরোপের উপর তাঁর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ ঘটিল। পরবর্তী কালের ঠাণ্ডা যুদ্ধের মূল উৎসও ছিল এখানে।...

পটসডাম সম্মেলনে সোভিয়েত ডলিগেশনের প্রস্তাব অনুসারে জার্মানীর নৌবহর ও বাণিজ্যবহরগুলির বন্টনেরও একটা সুব্যবস্থা হইল। অর্থাৎ বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে সমভাবে বন্টনের প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং জার্মান সাবমেরিনগুলির অধিকাংশই ডুবাইয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত হইল।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল প্রধান প্রধান যুদ্ধাপরাধীদের আন্তর্জাতিক আদালতে (ছারেমবার্গ) অভিযুক্ত ও বিচার করার সম্পর্কে। এই বিষয়ে তিন প্রধান শক্তিই একমত হইয়া ঘোষণা করিলেন এবং স্থির হইল যে, লা সেন্টেবর, ১৯৪৫, তারিখের মধ্যে যুদ্ধাপরাধীদের প্রথম তালিকা প্রকাশ করা হইবে।

কোনিসবার্গ এবং পূর্ব প্রুশিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন জানাইলেন।

কিন্তু পোল্যান্ড ও পূর্ব ইউরোপ নিয়া পশ্চিমী মিত্রপক্ষের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরোধ পটসডাম সম্মেলনে তীব্র উত্তাপের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই বিষয়ে ইং-মার্কিন মহল 'কঠোর নীতি' অনুসরণ করিলেন এবং স্পষ্ট বলিলেন যে, ইং-মার্কিন প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ব ইউরোপীয় গবর্নমেন্টগুলির পুনর্গঠন না হইলে এই সমস্ত সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়া 'হইবে না এবং তাদের সঙ্গে কোন শান্তিসন্ধিও স্বাক্ষরিত হইবে না। বিগত ইয়ান্টা বৈঠকে তিন প্রধানের পক্ষ থেকে যুক্তিপ্রাপ্ত ইউরোপে গণতন্ত্র ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অল্পষ্টানের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, সেগুলি হাতে-কলমে প্রাণোদিত করিতে হইবে। অথচ ইতিমধ্যে এই সমস্ত দেশে 'জনগণের ইচ্ছানুযায়ী' নতুন গবর্নমেন্ট গঠিত হইয়াছিল এবং উপরের তলার যে সমস্ত লোক নাৎসীদের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়াছিল, তারা অপসারিত হইয়াছিল। অথচ ষ্ট্যালিন কিন্তু অনেকটা আন্তরিকতার সঙ্গেই পশ্চিমের মিত্রপক্ষীয় নেতাদের সঙ্গে গণতন্ত্র ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের নীতি মানিয়া লইয়াছিলেন। তিনি স্বরণ করাইয়া দিলেন যে, ইতালীকে স্বীকৃতি দিতে ও রাষ্ট্র-সংঘের সদস্যপদে গ্রহণ করিতে মিত্রপক্ষের উৎসাহের কোন অভাব ছিল না। তবে, অন্তের বেলা এই আপত্তি কেন?

আসলে স্থূলল বাধিল গণতন্ত্র ও নির্বাচনের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য নিয়া।

(৪) দি এ্যাসিট হিটলার কোয়ালিশন—পৃষ্ঠা ৪০৬-৭

অর্থাৎ যুক্তিপ্রাপ্ত ইউরোপে গণতন্ত্র ও অবাধ নির্বাচন অর্থে পশ্চিমীরা 'বুর্জোয়া গণতন্ত্র' এবং সেই গণতন্ত্রের সমর্থক নির্বাচকমণ্ডলীর কথা ধরিয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং ক্যাপিটালিস্ট যেহেতু এই গণতন্ত্রের পক্ষে স্বভাবতই সোভিয়েতের বিরোধী হওয়ার কথা। কিন্তু ষ্ট্রা লিন গণতন্ত্র অর্থে নাস্তীবিরোধী এবং সোভিয়েতের প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন জনগণের গবর্নমেন্টের কথা ভাবিয়াছিলেন। অথচ পশ্চিমী মিত্রপক্ষ ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, 'কার্জন লাইন' (পোল্যান্ড) ও বেসারাবিয়ার সীমানা (ক্রমানিষা) পর্যন্ত পশ্চিমী ধনতন্ত্রবাদী গণতন্ত্র ও অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা হইবে— পরবর্তী কালে এই মার্চ, ১৯৪০ নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন পত্রিকার এই মন্তব্যই ছিল সমীচীন। (৫)

পটসডাম বৈঠকে এই সমস্ত প্রশ্ন নিষা উভয় শিবিরের প্রতিনিধিদের মধ্যে বহু বাগবিতণ্ডার পর স্থির হইল যে, ক্রমানিষা, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া ও কিনল্যান্ডের সঙ্গে শান্তিসন্ধি স্বাক্ষরিত এবং তাদেরকে বাটুসংঘে গ্রহণ করা হইবে।

অপরদিকে পটসডাম কনকারেন্সের আগেই সোভিয়েত রাশিয়া পোল্যান্ডের পশ্চিম সীমানা স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। রাশিয়া পোল্যান্ডের যে সমস্ত ভূমি দখল করিয়া নিয়াছিল (পূর্বদিকে) তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ জার্মানী থেকে পোল্যান্ডকে উপযুক্ত পরিমাণ জমি দেওয়া হইবে। যেমন—পূর্ব প্রাশিয়াবু তিন-চতুর্থাংশ, সাইলেশিয়ার (প্রমসমুদ্র অঞ্চল) বাকী অংশ, পোমেরানিয়া এবং ব্রাণ্ডেনবুর্গের এক টুকরো—অর্থাৎ নাইসী ও ওডের নদী পর্যন্ত সমস্ত জমি এবং ওডের নদীর অপর তীরস্থ ষ্টেটিন সহর পর্যন্ত। এই সমস্ত মূল্যবান জার্মান ভূমি পোল্যান্ডের শাসনাধীনে অর্পিত হইল এবং পূর্ব ইউরোপে যে ২০ লক্ষ জার্মান বাসিন্দা ছিল, তাদের মধ্যে ২০ লক্ষ ছাড়া বাকী সকলেই পলায়নপর জার্মানবাহিনীর সঙ্গে পশ্চাদভ্রমণ করিয়াছিল। (৬)

বাকী জার্মান বাসিন্দাগণকে 'মানবতাবোধ ও শৃঙ্খলার সঙ্গে' অপসারণের প্রস্তাব গৃহীত হইল। এই সমস্ত জার্মানদের বাসভূমি ছিল পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া ও হাঙ্গেরীতে।

'জাতীয় ঐক্যের অস্থায়ী পোলিশ সরকার' গঠিত হইয়াছিল ২৮ জুন, ১৯৪৫, এবং মিত্রপক্ষের দিক থেকে এই ব্যবস্থা স্বীকার না করিয়া উপায় ছিল না। সুতরাং ৫ জুলাই বৃটেন, যার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের গবর্নমেন্ট এই নূতন সরকারকে ফুটনৈতিক স্বীকৃতি দিলেন। ফলে, বৃটেন ও আমেরিকার পৃষ্ঠপোষিত লণ্ডনের 'দেশান্তরিত' পোলিশ সরকার বাতিল হইয়া গেল। অর্থাৎ যে পোল্যান্ড নিষা ইউরোপীয় মহাবুদ্ধি শুরু হইয়াছিল, সেই পোল্যান্ডের 'নবতম সংস্করণ' নিষা মহাবুদ্ধির অবগদ হইল এবং নূতন পোল্যান্ড 'সোভিয়েতের বন্ধুরূপে' প্রতিষ্ঠিত হইল।

ইতিমধ্যে বৃটেনে নতুন সাধারণ নির্বাচন অঙ্গীকৃত হইল। চার্চিলের স্বাক্ষরিত হল

(৫) দি কোল্ড ওয়ার—১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৫

(৬) পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ২৪০

পরাজিত ও অধিকতর বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হইল। ( একথা গোড়াতেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ) চার্টিলের পরাজয়ে যদিও সোভিয়েত রাশিয়া স্বত্তির নিঃশাস ফেলিয়াছিল এবং ২৮শে জুলাই থেকে চার্টিল পটসডাম সম্মেলন থেকে বাদ গেলেন, তবু রুশ প্রতিনিধরা অধিক নেতাদের নিয়া যেন ছুঁচো গেলার অবস্থায় পড়িলেন। কারণ, প্রধানমন্ত্রী এ্যাট্‌লি এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী বোভিন রক্ষণশীল দলের চেয়েও রুশ বিরোধিতায় বেশী উৎসাহ দেখাইলেন। এ্যাট্‌লি ও বোভিন জার্মানী, পোল্যান্ড ও সোভিয়েত রাশিয়ার নতুন সীমানা নিয়া ভীত বিরোধিতা করিলেন।...

ইতিমধ্যে আমেরিকাব শূণ্যস্তকারী অ্যাটম্‌ বোমা পরীক্ষিত ও আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং সেই সংবাদ অভ্যস্ত 'অম্পষ্টভাবে' ষ্ট্যালিনকে দেওয়া হইয়াছিল বটে, কিন্তু ষ্ট্যালিন তার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে ব্যর্থ হইলেন। পটসডাম সম্মেলনে পারমাণবিক বোমার কূটনৈতিক প্রতিজ্ঞা এবং জাপানের প্রতি চরমপত্র নিয়া পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে।



## দশম পর্ব তৃতীয় অধ্যায়

পটসডাম—(২) এ্যাটম বোমার পটভূমিকায়

আগের অধ্যায়ে পটসডাম (বার্লিন) সম্মেলন সম্পর্কে প্রধানতঃ ইউরোপীয় কূটনৈতিক পটভূমিকায় একটি সাধারণ রেখাচিত্র দেওয়া হইয়াছে এবং মোটামুটি মিত্র-পক্ষীয় তিন শীর্ষনেতার মধ্যে আপোষমূলক প্রস্তাবগুলির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবতঃ আপোষমূলক প্রস্তাবগুলির অন্তরালে তিন পক্ষের মধ্যে - বিশেষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার যে মতবিরোধ ঘটিয়াছিল এবং এ্যাটম বোমার সাকল্যজনক পরীক্ষার পর প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ও তাঁর পরামর্হ-দাতাগণ রাশিয়ার প্রতি যে কঠোর মনোভাব অংলবন করিয়াছিলেন, মহাযুদ্ধের ইতিহাসে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি মহাযুদ্ধের পরবর্তী আন্তর্জাতিক জগতে ১৯৫০-১৯৬০-এর দশকে পশ্চিমী শক্তিবর্গের সঙ্গে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক শিবিরের যে নিদারুণ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সংঘর্ষ হইয়াছিল, তারও মূল ছিল এখানে—বিশেষভাবে পারমাণবিক বোমার বিস্তারণে। সুতরাং কোন কোন ঐতিহাসিক এর নাম দিয়াছেন ‘এ্যাটোমিক ডিপ্লোমাসি’ বা পারমাণবিক কূটনীতি, যে কূটনীতি ভিতরে ভিতরে পটসডাম সম্মেলনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং ঈশ-মার্কিন পক্ষ প্রায় এককোটি হইয়া বাশিয়াকে কোণঠাসা করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল। এই পারমাণবিক কূটনীতির সাময়িক লক্ষ্য কেবল জাপান ছিল না ছিল সোভিয়েত রাশিয়াও। সুতরাং ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সবিশেষ আলোচনা প্রয়োজন। এখানে স্মরণীয় যে, স্থায়ী ট্রুম্যান ব্যক্তিগতভাবে কখনো সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন না, বরং অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। ১৯৪১ সালে হিটলার কর্তৃক সোভিয়েত রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার র প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট যখন কর্তৃ-ইন্সারা আইন অঙ্কণারে সোভিয়েতের সাহায্যদানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তখন সেনেটর ট্রুম্যান যতব্য করিয়াছিলেন—“যদি আমরা দেখি যে, যুদ্ধে জার্মানী জয়লাভ করছে, তা’ হলে আমাদের উচিত হবে রাশিয়াকে সাহায্য দেওয়া। অপর পক্ষে যদি দেখা যায় যে, রাশিয়া জয়লাভ করছে, তাহলে আমাদের উচিত হবে জার্মানীকে সাহায্য দেওয়া এবং এভাবে দু’ পক্ষকে কাটাকাটি করে মরতে দেওয়া উচিত।” সুতরাং এহেন ট্রুম্যান যখন রুজভেল্টের মৃত্যুর পর প্রেসিডেন্টের গণ্যতে আসীন হইলেন, তখন রুশ-মার্কিন সম্পর্কের যে অবনতি ঘটবে, সেটা আর আশ্চর্য কি?...

রুশ-মার্কিন সম্পর্কের এই অবস্থা সম্পর্কে একজন মার্কিন বিশেষজ্ঞ—ডঃ গ্যার আলপেরোভিৎস (Gar Alperovitz) তাঁর পুস্তকে পারমাণবিক কূটনীতির বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ও তাঁর উপদেষ্টাগণ পটসডাম সম্মেলনে তিন পক্ষের কূটনৈতিক রণনীতি অঙ্কণ করিতে চাহিয়াছিলেন। যথা—

- (ক) অবিলম্বেই রাশিয়ার প্রতি শক্তি প্রদর্শন বা ‘শো ডাউন’।
- (খ) বিলম্বিত শক্তি প্রদর্শন।

(গ) শেষ পর্বন্ত ট্যালিনের মুখোমুখি হওয়ার বা কনকনট্রেশনের রণনীতি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত।

পটসডাম সম্মেলনে আমেরিকার পক্ষ থেকে এই তিন প্রকার কূটনীতির রণ-কোশলই দেখা গিয়াছিল এবং এই সমস্তই ঘটিয়াছিল এ্যাটম বোমার পরীক্ষা ও বিস্ফোরণের পটভূমিকায়।

\*

\*

\*

অবজ্ঞা হারবার্ট ফীজের মত (Herbert Feis) বিখ্যাত মার্কিনবিশেষজ্ঞ (সোভিয়েত বিরোধী) বলিয়াছিলেন যে, ট্রুম্যান পরলোকগত রুজভেল্টের নীতির প্রতি পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিতে চাহেন নাই। কিন্তু ডঃ আলপেরোভিৎস তাঁর পুস্তকে এই মতবাদের খণ্ডন করিয়াছেন এবং পটসডাম সংক্রান্ত দলিলপত্র ইত্যাদি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পারমাণবিক শক্তি পরীক্ষার পটভূমিকায় প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান রুজভেল্টের নীতির বদলে রাশিয়ার প্রতি কঠোর নীতি অহুসরণ করিতে এবং ইউরোপে সোভিয়েত প্রভাব হ্রাস বা দূর করিতে চাহিয়াছিলেন রুজভেল্টের মৃত্যুর (১২ এপ্রিল ১৯৪৫) মাত্র ১১ দিন পবে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এক ‘শক্তিশালী’ মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির প্রয়োগ করিতে চাহিলেন এবং ২৩ এপ্রিল ট্রুম্যান নবগঠিত পোলিশ সরকারের (সোভিয়েত পক্ষপাতী) পুনর্গঠন দাবী করিয়া সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটোভকে কর্কশ ভাষায় বলিয়াছিলেন যে, রুশরা যদি এই বিষয়ে সহযোগিতা করিতে না চায়, তবে তারা গোলায় ঘাউক! জবাবে মলোটোভ মন্তব্য করিয়াছিলেন ‘আমার জীবনে আমার সঙ্গে কেউ কখনও এমনভাবে কথা বলেন নি।’

ট্রুম্যান কোড়ন কাটিলেন—‘আপনার চুক্তি আপনারা পালন করুন, তা’ হলে আর এই ধরনের কথা শুনিতে হবে না।’—(১)

অথচ ইয়াল্টা বৈঠকে চার্লিস-রুজভেল্ট ‘সোভিয়েতের প্রতি বন্ধুত্বাপন্ন’ পোলিশ সরকার গঠনের মূল নীতি মানিয়া লইয়াছিলেন এবং পটসডাম বৈঠকে ট্যালিন আপোষ মীমাংসার উদ্দেশ্যে মধ্যপন্থা অহুসরণ করিতে চাহিয়াছিলেন। সুতরাং যুগোশ্লাভিয়ার দৃষ্টান্ত অহুসরণ করিয়া তিনি ওয়ারশ’র (পোল্যান্ড) মন্ত্রিসভার প্রতি চারজন মন্ত্রী পিছু একজন করিয়া নূতন মন্ত্রী গ্রহণের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু ট্রুম্যান সোভিয়েত পক্ষপাতী পোলদের শক্তিবৃদ্ধির প্রস্তাব গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। ট্রুম্যানের এই মনোভাব দেখিয়া চার্লিস পর্বন্ত অবাক হইয়াছিলেন— যদিও তিনি মনে মনে ট্রুম্যানের তারিফ করিলেন। আসলে পূর্ব ও মধ্য ইউরোপে রাশিয়ার কর্তৃত্ব বিস্তার নীতির বিরুদ্ধে পোল্যান্ড নিয়া ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের এই বাধা দান ছিল একটা প্রতীকী বা ‘পাঁচলের’ মত। রুজভেল্টের মৃত্যুর পর কিভাবে মার্কিন নীতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছিল, তার অন্ততম প্রমাণ এই যে, মরোক্কোয় মার্কিন রাষ্ট্রদূত আন্ডারেল হারিম্যান পর্বন্ত ট্রুম্যানকে পরামর্শ দিলেন যে, তাঁর বিশ্বাস রাশিয়া ভল নীতি

(১) Atomic Diplomacy: Hiroshima and Potsdam—Gar Alperovitz, Vintage Books, New York, 1967, P. 19, P. 23.

অহুসরণ করিতেছে—একদিকে ইক-মার্কিনের সঙ্গে সহযোগিতা, কিন্তু অন্যদিকে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির উপর প্রভাব বিস্তার। তাঁর বিশ্বাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'ইউরোপে বর্বরতার আক্রমণের সম্মুখীন।'

যেখানে দায়িত্বশীল এবং অতিজ্ঞ মার্কিন কূটনীতিকদের মনোভাব এই, সেখানে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে নবাবগত প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের পক্ষে কঠোর নীতির দিকে ঝুঁকিয়া পড়া খুব অভিনব ছিল না। কিন্তু একটা প্রশ্ন বিবেচনার ছিল : স্তানক্ৰাফিস্‌কোতে রাষ্ট্রসংঘের সনদ গ্রহণ সম্মেলনের তারিখ ছিল ২৫ এপ্রিল। যদি এই সময় রাশিয়ার প্রতি কঠোর নীতি অল্পমত হয়, তা হলে সোভিয়েত সরকারের অসহযোগিতার কলে সেই ঐতিহাসিক সম্মেলন পণ্ড হইয়া বাইতে পারে। কিন্তু অপর পক্ষে জার্মানদের যুক্তি ছিল এই যে, যুদ্ধবিধ্বস্ত রাশিয়ারও আমেরিকার কাছে ঠেকা আছে। কারণ অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্ত আমেরিকার কাছ থেকে সোভিয়েত রাশিয়ার ৬০০ কোটি ডলার ঋণের দরকার হইতে পারে।...

ট্রুম্যান পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে প্রায় আনাড়ি ছিলেন বলিলে অতিরঞ্জিত করা হইবে না। কলে, অস্বামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোসেফ সি গ্রু (Grew) ছিলেন তাঁর একজন পরামর্শদাতা এবং গ্রু ছিলেন অত্যন্ত রক্ষণশীল ও সোভিয়েত বিরোধী। (কলভেন্টের পক্ষপাতী পররাষ্ট্রমন্ত্রী টেটিনিয়াস সেই সময় ওয়াশিংটনের বাইরে ছিলেন এবং তাঁর কার্যকালও শেষ হইয়া আসিয়াছিল।) ট্রুম্যান এই সমস্ত ব্যক্তির পরামর্শে স্থির করিলেন যে, সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে আমেরিকার এ পর্যন্ত একতরফা নীতি চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং এই সম্পর্কে নূতন ভিত্তির উপর দাঁড় করাইতে হইবে। কিন্তু তখন আর একটি প্রশ্ন দেখা দিল। জাপানের বিরুদ্ধে তখনও যুদ্ধ শেষ হয় নাই এবং এই যুদ্ধে রাশিয়ার সহযোগিতা দরকার। সুতরাং 'কঠোর নীতি' অহুসরণ করিলে রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে কোন সাহায্য নাও দিতে পারে। কিন্তু এপ্রিলের মধ্যভাগে মার্কিন সেনানীমণ্ডলী দেখিলেন যে, জাপানী সমুদ্রের উপর মার্কিন নৌ-আধিপত্য এতটা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, চীন বা মালুকুরিয়ার থেকে জাপানী সৈন্যবাহিনীকে খাস জাপানে অপসারণ করা সম্ভব নয়। অতএব রুশ সাহায্য না পাইলেও ক্ষতি নাই এবং তাঁদের পরামর্শক্রমে জয়েন্ট চীফস্ অফ্ টাফ্ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিলেন যে, খাস জাপানী ভূমি আক্রমণের জন্ত রাশিয়ার সহযোগিতার দরকার নাই। সুতরাং ট্রুম্যান শক্ত হইলেন এবং স্তানক্ৰাফিস্‌কো সম্মেলনে 'ওয়ারশ' সরকারকে মানিয়া নিতে অস্বীকৃত হইলেন। এমন কি, বর্তমান 'ওয়ারশ' সরকারের ভিত্তিতে পোলিশ গবর্নমেন্টের পুনর্গঠনেও মার্কিন সরকার রাজী ছিলেন না। সুতরাং ১০ মে ট্যালিন ট্রুম্যানকে জানাইয়া দিলেন যে, এই অবস্থায় পোলিশ সমস্তার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয়।

অতএব "অবিলম্বে শক্তি প্রদর্শনের" ট্রুম্যানীয় নীতি ব্যর্থ হইল। কারণ, ট্যালিন নত বা নরম হইলেন না।

এই সময় ১৪ মে বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইডেন ট্রুম্যানকে জানাইলেন যে, ভিন প্রধানের বৈঠক ছাড়া পোলিশ সমস্তার কোন মীমাংসা হইবে না। অপরপক্ষে বৃটিশ ইম্পিরিয়েল জেনারেল টাকের প্রধান জেনারেল ইজমে (Ismay) জার্মানীর

রুশ অধিকৃত এলাকা থেকে মিত্রসৈন্য অপসারণ না করার সমালোচনা করিলেন। কেন না, এর দ্বারা মিত্রপক্ষের মধ্যে স্বীকৃত চুক্তির অমর্যাদা করা হইতেছিল এবং এই বিষয়ে মার্কিন সেনাপতি জেনারেল আইজেনহাওয়ারও অনুরূপ অভিমত পোষণ করিতেন। তথাপি ২৩ এপ্রিলের (১৯৪৫) পর টুম্যান ও চার্চিল যেন একজোট হইয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধাচরণ করিতে উদ্যত হইলেন এবং যদিও হার্বার্ট কীজ লিখিয়াছেন যে, ‘রাশিয়ার সঙ্গে দলভেদে সমস্ত চুক্তি টুম্যান যুদ্ধের সঙ্গে পালন করিয়াছিলেন,’ তথাপি একথা সত্য নয়—অন্ততঃ ডঃ আলপেরোভিৎসের এই অভিমত। তিনি তাঁর বইতে টুম্যানের ২৭শে এপ্রিল তারিখের বার্তা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, অষ্ট্রিয়া ও ভিয়েনায় দখলীকৃত এলাকাগুলি এবং অষ্ট্রিয়ার পরিচালনা সম্পর্কে একটি সুমীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত জার্মানীর সোভিয়েত এলাকা থেকে সৈন্য অপসারণ করিতে টুম্যান অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। (২)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমরসচিব ষ্টিমসন রক্ষণশীল হইলেও অত্যন্ত বাস্তববাদী ছিলেন। তিনি পোল্যান্ড, মধ্য ইউরোপ এবং সোভিয়েত রাশিয়ার পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি সম্পর্কে রুশনীতির সারবত্তা উপলব্ধি করিলেন এবং ‘অবিলম্বেই শক্তি প্রদর্শনের’ টুম্যানীয় নীতির বিরোধিতা করিলেন। পরপর দুটি মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝা গিয়াছিল যে, ইউরোপীয় শক্তির উপর আমেরিকার নিরাপত্তাও নির্ভরশীল। সুতরাং ষ্টিমসনের মতে বিশ্বশান্তি, নিরাপত্তা কিংবা ইউরোপের স্থায়িত্ব বিধান করিতে হইলে রুশ-মার্কিন সহযোগিতা প্রয়োজন।

সমরসচিব হিসাবে মার্কিন মহলে ষ্টিমসনের ‘পজিশনের’ গুরুত্ব ছিল অসাধারণ। কারণ, পারমাণবিক বোমার গোপনীয়তার সমস্ত খবর ছিল তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। তাঁর মতে আর চার মাসের মধ্যেই গ্র্যাটম বোমার পরীক্ষা শেষ হইয়া যাইবে এবং এই বোমা বিভিন্ন দেশের সঙ্গে মার্কিন সম্পর্কের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে। সুতরাং জুলাই মাসের প্রথম ভাগে এই বোমার পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত তিনি টুম্যানকে অপেক্ষা করিতে এবং তিন প্রধানের বৈঠক স্থগিত রাখিতে পরামর্শ দিলেন। বিশেষতঃ ইউরোপে তখন মিত্রপক্ষের ৩০ লক্ষ সৈন্য ছিল এবং গ্রীষ্মকালের শেষে মাসে ৫০ হাজারের বেশী সৈন্য অপসারিত হইবে না। অতএব ‘বিলম্বিত শক্তি প্রদর্শনের’ নীতিতে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই। ষ্টিমসনের এই সমস্ত মতামতের ফল ফলিল। কারণ, চার্চিলের একটি ভাবের জবাবে টুম্যান ১৪ই মে জানাইলেন যে, তিন শীর্ষ নেতার বৈঠক প্রয়োজন বটে, কিন্তু আগামী দুইমাস তিনি এত ব্যস্ত থাকিবেন যে, ওয়াশিংটনের বাইরে বাইতে পারিবেন না। অর্থাৎ জুলাই মাসের প্রথম ভাগের আগে নয়। কারণ, ঐ সময় পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরীক্ষা হওয়ার কথা।

সুতরাং টুম্যানের তিন নব্বই নীতি—অর্থাৎ ট্যালিনের দুখোমুখি হওয়ার বা

‘কনক্লুসিওনস’ নীতি ইতিমধ্যে পরিত্যক্ত হইল। এটাই ছিল ট্রুম্যানের পক্ষে ১৯৪৫ সালের বসন্ত কালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। (৩)

এই পরিস্থিতির মধ্যেই রুশ ও ব্রিটিশ মনোভাব বৃদ্ধিবার জন্য ট্রুম্যান হপকিন্সকে মস্কোতে এবং জোসেফ ডেভিসকে (যেদ্বারা প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত) লণ্ডনে পাঠাইবার মতলব করিলেন। কিন্তু এই দুই মিশনের ব্যবস্থা ‘অত্যন্ত গোপনে’ অর্জিত হইল। এমন কি পররাষ্ট্র দপ্তরের কাউকেও পৰ্ব্ব জানানো হইল না—এক মাস পর যাত্রার ঠিক পূর্বাঙ্কে ছাড়া।

‘This unusual secrecy is further indirect evidence of the relationship of the trips to the secret atomic project; it would have been in conceivable, except in extraordinary circumstances, for Truman to send Hopkins to discuss the most important outstanding diplomatic questions without consulting, or at least notifying, the Secretary of State’ - (৪)

সহজ স্বাভাবিক, অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সমস্যাগুলির আলোচনার জন্য পররাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে বিন্দুমাত্র আলোচনা না করিয়া কিংবা পররাষ্ট্র মন্ত্রীর নাকানাইয়া এভাবে হপকিন্সকে পাঠানো এবং সেজন্য অভূতপূর্ব গোপনীয়তার অবলম্বন—এর দ্বারা ই গোপনীয় পারমাণবিক প্রকল্পের সঙ্গে এই মস্কোযাত্রার অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কারণ, সাধারণ অবস্থায় এ কথা কল্পনা করাও বাইত না।

হপকিন্সের মস্কোযাত্রার সংকল্পের কিংবা পোল্যাণ্ড ইত্যাদি সমস্যার আপোস মীমাংসার কথা আগের অধ্যায়েই বর্ণনা করা হইয়াছে। আসলে সমস্যাটি চিহ্নিত-সনের নীতিও এই মীমাংসা চেষ্টার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে এবং সেই মীমাংসার ক্ষেত্র ছিল চার রকম। যথা—

(১) পারমাণবিক পরীক্ষা শেষ না হওয়া পৰ্যন্ত স্ট্যালিনের সঙ্গে যুগ্মমুখি হওয়ার নীতি স্থগিত রাখা।

(২) পোল্যাণ্ড সম্পর্কে রাশিয়ার অধিকাংশ প্রস্তাব মানিয়া লওয়া।

(৩) চার্লিলের নীতি ও ব্যক্তিগত থেকে মার্কিন নীতিকে বিচ্ছিন্ন করা এবং যথ্য ইউরোপ সম্পর্কে রাশিয়ার সঙ্গে একটা সমঝোতার আসা।

আপোস-মীমাংসার বাস্তবিক মনোভাবের প্রমাণরূপ ট্রুম্যান সোভিয়েত সরকারকে ১০০ কোটি ডলার ঋণদানেরও প্রস্তাব করিয়াছিলেন। অপরপক্ষে এ্যাটম বোম্বার পরীক্ষা শেষ না হওয়া পৰ্যন্ত দূরপ্রাচ্য বা জাপান সম্পর্কেও ‘বিলম্বিত রণনীতি’র কৌশল অবলম্বিত হইল।

এদিকে ট্রুম্যান স্ট্যালিনের নিকট ১৫ জুলাই থেকে পটসডাম সম্মেলন আরম্ভ করার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন এবং যদিও চার্লিল চাহিয়াছিলেন তখন মাসের দ্বাদশবারি তারিখ, তথাপি ট্রুম্যান তাতে রাজী হইলেন না। কারণ, জুলাই মাসের

(৩) পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৬৮

(৪) পূর্বোক্ত পুস্তক (আলপেরোভিৎস), পৃষ্ঠা ১১

আগে পারমাণবিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। সেই সময় ট্যালিন অবশ্য এই সমস্ত গোপন রহস্যের কথা জানিতেন না। সুতরাং পটসডাম সম্মেলন সম্পর্কে ট্রুম্যানের প্রস্তাবিত তারিখই মানিয়া লওয়া হইল।

কিন্তু পটসডাম সম্মেলনের আগেই ২৮ মে তারিখ প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের পক্ষ থেকে হপকিন্স ও হ্যারিম্যান ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া চীন, মাঝুরিয়া ও কোরিয়া সম্পর্কে এই আশ্বাস আদায় করিলেন যে, চিয়াং কাইসেকের নেতৃত্বেই চীনের ঐক্য ও সংগতি মানিয়া লওয়া হইবে। তাঁর মতে চীনে এমন কোন কমিউনিষ্ট নেতা নাই, যিনি চীনের ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা রাখেন। ট্যালিন আরও বলিলেন-যে, চীনের বিরুদ্ধে তাঁর কোন ভূমিগত দাবি নাই এবং সিনকিয়াং ও মাঝুরিয়া সম্পর্কে চীনের সার্বভৌমত্বই স্বীকার কর' হইবে। রুশসৈন্যের মাঝুরিয়ার প্রবেশ করিলে চিয়াং কাইসেকের প্রতিনিধিরা তাঁদের সঙ্গে অহুগমন করিতে পারিবেন। চীনে আমেরিকার 'খোলা দরজার' নীতি মানিয়া লওয়া হইবে এবং কোরিয়ার জন্য ট্রিটশিপ গঠন করা হইবে। (৫)

চীন সম্পর্কে ট্যালিনের সঙ্গে আলোচনার জন্য ট্রুম্যান চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী টি. ভি. সুনকে (Sung) জুলাই মাস আরম্ভ হওয়ার আগেই মস্কোতে পাঠাইতে সম্মত হইলেন। আর জুলাই মাসে পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা সাকল্যমণ্ডিত হওয়ার পর ট্রুম্যান মনে করিলেন যে, পূর্বদিকে জাপান আর পশ্চিমে ইউরোপ সমস্ত সমস্তার মীমাংসা সহজতর হইবে। সুতরাং ট্রুম্যানের বিলম্বিত রণনীতির আসল ভিত্তি ছিল পারমাণবিক বিস্ফোরণের সাকল্য। অবশ্য ট্রুম্যান আগেই মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, রণক্ষেত্রে অ্যাটম বোমার পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত ট্যালিনের কাছে কোন গুপ্ত কথা ফাঁস করা হইবে না এবং এই বিষয়ে চার্লিসও একমত ছিলেন।

\*

\*

\*

চার্লিস-রুজভেল্ট ট্যালিন এতদিন পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে যে নীতি ইয়ান্টা পর্যন্ত অহুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন, সেটাকে পাণ্টে দেওয়ার মনস্থ করিয়া প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান 'কর্কণ ভাষায় রচিত' একটি দলিলের খসড়া নিয়া পটসডাম যাত্রা করিয়াছিলেন। এর ফলে গোড়ার দিকে বৃটিশ ডেলিগেশন পটসডামে মার্কিন মনোভাব নিয়া বিভ্রান্তির মধ্যে পড়িয়াছিলেন, যতক্ষণ না তাঁরা জানিতে পারিয়া ছিলেন অ্যাটম বোমার কথা, কারণ, সম্মেলনে উত্থাপিত প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান প্রস্তাবই আমেরিকার পক্ষ থেকে স্বীকৃত রাখার চেষ্টা হইতেছিল। ট্রুম্যান ১৫ই জুলাই অপরাহ্নে পটসডামে পৌঁছিয়াছিলেন এবং পরদিন ১৬ই জুলাই নিউ মেক্সিকোর আলামোগোরডো থেকে প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণের সাকল্যের সংবাদ সাংকেতিক ভাষায় পৌঁছিল মার্কিন সময়সচিত্র টিমসনের কাছে এবং তিনি

(৫) মার্কিন প্রতিনিধি দলের রিপোর্ট থেকে (এ্যাটমিক ডিমোন্সট্রেশন, পৃষ্ঠা, ১০২)

ভৎসনাৎ সেই সংবাদ জানাইলেন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী বার্নসকে (Byrnes)। যদিও এই প্রাথমিক সংবাদ খুব স্থিতিশীল রকমের ছিল না, তবু দুই মার্কিন রাষ্ট্রনেতাই গভীর ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন। কিন্তু আসল সংবাদ পাওয়া গেল পরদিন ১৭ই জুলাই পটসডাম সম্মেলন আরম্ভের দিন।

চার্লিস তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস-গ্রন্থে লিখিয়াছেন—“১৭ই জুলাই সেই বিশ্ব-কম্পনকারী সংবাদ এলো। অপরাহ্নে মার্কিন সমরসচিব ষ্টিমসন আমার বাস ভবনে এলেন এবং আমার সম্মুখে একটি কাগজের শীট মেলে ধরলেন, যার মধ্যে সাক্ষাতিক ভাষায় লেখা ছিল—

‘Babies satisfactorily born, অর্থাৎ ‘শিশুরা সন্তোষজনক ভাবেই জন্ম গ্রহণ করেছে।’ ষ্টিমসনের ভাবভঙ্গী দেখে আমার মনে হল যে, অসাধারণ কিছু ঘটে গেছে। তিনি ব্যাখ্যা করে আমাকে বুঝালেন যে, মেক্সিকোর মরুভূমিতে পরীক্ষা সকল হয়েছে—‘The atomic bomb is a reality’ অর্থাৎ পারমাণবিক বোমা এখন বাস্তব সত্য।

“যদিও কিছু কিছু টুকরো খবর আমবা আগেই জানতাম, তথাপি চূড়ান্ত পরীক্ষার তারিখ আমাদের জানা ছিল না। এক্ষণে বুঝতে পারছি—শিশুরা সন্তোষজনক ভাবেই জন্মেছে ” (৬)

পরদিন প্লেনযোগে আরও বিস্তৃত খবর আসিল। মাহুঘের ইতিহাসে এই প্রথম এবং ভয়ঙ্করতম বিস্ফোরণ সম্পর্কে বলা হইল যে, ৫০ মাইল দূর থেকে এই বিস্ফোরণের শব্দ শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল এবং ২৫০ মাইল দূর থেকে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।...

তৃতীয় কিস্তির রিপোর্টে পারমাণবিক প্রকল্পের ‘ডাইরেক্টর জেনারেল লেসলি গ্রোভস যে বিস্তৃত তথ্য জানাইলেন, তার সার কথা এই যে, নিউ মেক্সিকোর আলামোগোরডোর বিমানঘাঁটির এক দূরবর্তী অংশে পারমাণবিক বোমার পুরাপুরি পরীক্ষা করা হইয়াছে :

“For the first time in history there was a nuclear explosion...The test was successful beyond the most optimistic expectations of any one...I estimate the energy generated to be in excess of the equivalent of 15,000 to 20,000 tons of T N T; and this is a conservative estimate...”

The feeling of the entire assembly was...profound awe...”

অর্থাৎ ‘ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিল। যারা চরমতম আশাবাদী ছিলেন, তাঁদের প্রত্যাশাকেও এই পরীক্ষা ছাড়াইয়া গেল। আমার হিসাবে যে শক্তি এই বোমা বিস্ফোরণে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা ১৫ হাজার থেকে ২০ হাজার টন টি-এন-টি বা অর্থাৎ বিস্ফোরককেও ছাড়াইয়া গিয়াছে এবং এই হিসাবও নূনতম পরিমাণে ধরা হইয়াছে। যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা এর ভীষণতম হতব্যাক হইয়া গিয়াছিলেন।’ (৭)

(৬) চার্লিস, বই ৭শ, পৃষ্ঠা ৫৫১-৫২

(৭) এ্যাটোমিক ডিমোন্সট্রেশন, পৃষ্ঠা ১৫০

বিবহা (৩)—১০

২১ শে জুলাইয়ের এই রিপোর্ট পাওয়ার পরেই পটপডাম সম্মেলনের মনস্তাত্ত্বিক আবহাওয়া ঘুরিয়া গেল এবং ষ্টিমসনের মতে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান যেন এক নতুন আত্মবিশ্বাসের দ্বারা উদ্ভূত হইলেন এবং তিনি এমন এক শক্তির অধিকারী হইয়াছেন বলিয়া মনে করিলেন, যার দ্বারা তাঁর কূটনৈতিক উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করা সহজ হইবে। এর প্রমাণ এই যে, এই রিপোর্ট পাওয়ার পর ট্রুম্যান সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে স্ট্যালিন কর্তৃক উত্থাপিত বলকান সমস্যার জবাবে সাক্ষর ঘোষণা করিলেন যে, এই সমস্ত তাবোদার াষ্ট্রের গবর্নমেন্টগুলির গঠনের পরিবর্তন করা না হইলে মার্কিন সরকার এই সমস্ত গবর্নমেন্ট মানিয়া লইবেন না...এই বিষয়ে তিনি নিশ্চয়ই সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে একমত হইবেন না। বরং তিনি অল্প কোন বিষয় নিয়া আলোচনা করিতে রাজী আছেন।

চার্লিস পর্বন্ত ট্রুম্যানের এই নতুন ভঙ্গী ও আত্মবিশ্বাস দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। ষ্টিমসন বলিয়াছেন যে, এই রিপোর্ট পাওয়ার পর ট্রুম্যান যেন এক 'পরিবর্তিত মানুষে' পরিণত হইয়াছিলেন। (৮)

\* \* \*

বলা গেল যে, ট্রুম্যানের চেয়ে চার্লিসের আনন্দ কম ছিল না। বিশেষভাবে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা নিয়া ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ যে দুশ্চিন্তায় ছিলেন, এই ব্রহ্মান্ত্র আবিষ্কারের কালে তারা সেই দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাইলেন। ট্রুম্যানের সঙ্গে চার্লিস অবিলম্বেই পরামর্শ বৈঠকে মিলিত হইলেন। এতদিন পর্বন্ত ইঙ্গ মার্কিন পক্ষের ধারণা ছিল যে, জাপানকে হারাইতে গেলে ক্রমাগত বোমাবর্ষণ এবং প্রচুর সৈন্যসহ জাপানী দ্বীপ আক্রমণ করিতে হইবে। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে অল্প প্রাণবলির দরকার হইবে। কেন না, সাম্প্রতিক কালের (এপ্রিল ১৯৪৫) ওকিনাওয়া দ্বীপ দখলের যুদ্ধে যে তীব্র ও তিক্ত অসুখতা হইয়াছিল, তাতে দেখা গিয়াছে যে, হাজার হাজার জাপানী সৈন্য এবং তাদের সেনাপতিরা পর্বন্ত হারিকিরি করিবে, তবু হার মানিবে না কিংবা যুদ্ধে ও ক্ষান্ত দিবে না। এই মৃত্যুপণ লড়াইয়ের ভয়ঙ্কর বাণী অতিক্রম করিয়া যদি জাপানের প্রতি ইঞ্চি জমি দখল করিতে হয়, তবে চার্লিসের মতে আমেরিকার ১০ লক্ষ সৈন্য এবং বুটেনের তার অর্ধেক বা ৫ লক্ষ সৈন্য বলি দিতে হইবে। কিন্তু এই অল্প পূর্ব প্রাণ হ্রাসের আর দরকার হইবে না। বিভীষিকাপূর্ণ ছুঃখণ যেন কাটিয়া গেল—যেন একটা 'মিরাক্যুল' বা অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়া গেল। পরমাণবিক বোমার একটি বা দুইটি ভয়ঙ্কর আঘাতেই সমগ্র জাপানী যুদ্ধ বশম্ হইয়া যাইবে, আর রাশিয়ারও সহযোগিতা বা সাহায্যের দরকার হইবে না। আমেরিকা নিশ্চয়ই আর রুশ সাহায্যের ভয়সংগ থাকিবে না।



ইক-মার্কিন পক্ষের আগে যাতে সোভিয়েত রাশিয়া চীনের বা ম'কুরিয়ার কিংবা জাপানের কোন অংশ দখল করিয়া নিতে না পারে কিংবা আগেই আক্রমণ করিতে না পারে পারমাণবিক বিস্ফোরণের পর ইক-মার্কিন পক্ষের নেতারা তেমন জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিলেন। স্বয়ং ট্রুম্যান মনে করিলেন এতদিন পর রুজভেল্টের রাশিয়া সংক্রান্ত নীতি পরিবর্তনের শক্তি তিনি অর্জন করিয়াছেন এবং পটসডাম বৈঠকে ২১ জুলাইয়ের পর কোন সমস্তা নিয়া আপোষ-মীমাংসার জন্য রাশিয়ায় উপর আর চাপ দেওয়ারও দরকার নাই। কিন্তু স্ট্যালিনও নরম হইলেন না এবং বলকান সমস্তার কোন মার্কিনী কয়সালাও হইল না। তখন ২৪ জুলাই ট্রুম্যান সমর-সচিব স্টিমসনকে বলিলেন যে, তিনি কনকারেন্স বন্ধ করিয়া দিয়া স্বদেশে কিরিয়া বাইতে রাজী আছেন। আর এদিকে উল্লিসিস চার্লিস অহুত্তব করিলেন যে, তাঁরা 'অপ্রতিরোধ্য শক্তি'র অধিকারী হইয়াছেন। সুতরাং বলকান নিয়া তিনি আগে স্ট্যালিনের সঙ্গে যে ভাগাভাগির চুক্তি করিয়াছিলেন, তিনি নিজের সেই চুক্তি নিজেই ভঙ্গ করিতে উৎসুক হইলেন। অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই সময় চার্লিসের বলকান নীতির বিরোধী ছিলেন। কিন্তু এবাং ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়া গেল এবং ট্রুম্যান চার্লিসের দলে আসিলেন। আর লর্ড এ্যালান ক্রকের মতে চার্লিস এতদূর পর্যন্ত মনে করিলেন যে, সমস্ত রুশ শিল্পক্ষেত্র ও জনগণকে সাবাড় করার এবং স্ট্যালিনের উপর ডিক্টেটরি করার শক্তি তাঁর হাতেব মুঠোয় আসিয়া গিয়াছে!

কিন্তু আমেরিকার পারমাণবিক বিজ্ঞানীরা জাপানের বিরুদ্ধে এর ব্যবহার নিষেধ করিয়াছিলেন এবং সোভিয়েত রাশিয়াকে এই বোমার অস্তিত্ব জানাইবার জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন। কাবণ, অত্যাধিক আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতা বিপর্য হইতে পারে।

এমন কি পটসডামে জেনারেল আইজেনহাওয়ারও পর্যন্ত জাপানের বিরুদ্ধে পারমাণবিক বোমা ব্যবহারের বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন। কারণ, তাঁর মতে জাপান ইতিমধ্যেই পরাভূত হইয়াছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত নয় এভাবে বিশ্বজন-মতকে গভীরভাবে আহত করা। (২)

\*

\*

\*

তখন আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখা দিল চার্লিস - ট্রুম্যানের কাছে—স্ট্যালিনকে আদৌ এই নতুন অস্ত্র এ্যাটম বোমার সংবাদ দেওয়া হইবে কিনা এবং দেওয়া হইলে কতটুকু দেওয়া হইবে? অথবা সমগ্র ব্যাপারটাই স্ট্যালিনের কাছ থেকে গোপন করা হইবে? যদি তাঁকে সংবাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়, তবে লিখিতভাবে দেওয়া হইবে কিংবা মৌখিক ভাবে? চার্লিস লিখিয়াছেন যে, তিনি ও ট্রুম্যান এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলেন যে, জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্যের আর কোন প্রয়োজন নাই। বিগত ইয়ান্টা বৈঠকে তাঁদের অবস্থান ছিল দুর্বল এবং রাশিয়া ছিল শক্তিশালী। সুতরাং ইয়ান্টাতে রাশিয়া আমেরিকানদের কাছ থেকে যথেষ্ট সুবিধা আদায় করিয়া নিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু পটসডাম বৈঠকে ইক-মার্কিন

পক্ষের অবস্থানই ছিল অধিকন্তর শক্তিশালী। সুতরাং রাশিয়াকে আর আগের মত খাতির না করিলেও চলিবে। তথাপি চার্চিল মনে করেন যে, হিটলারী জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়া ছিল এক বিরাট শক্তিশালী মিত্রপক্ষ। সুতরাং এই নূতন অস্ত্রের কথা সম্পূর্ণ চাপিয়া যাওয়া ঠিক হইবে না, তবে, বিজুত কোন ধবরও দেওয়া হইবে না। ট্রুম্যান ও চার্চিল পারস্পরিক পরামর্শক্রমে স্থির করিলেন যে, কোনও একটি বৈঠকের শেষে ট্রুম্যান কথায় কথায় স্ট্যালিনকে এই নূতন অস্ত্রের কথা বলিবেন বটে, তবে পারমাণবিক বোমা সম্পর্কে কোন তথ্য দিবেন না। কিন্তু একথা বলা হইবে যে, একটা নতুন ধরনের অসাধারণ শক্তিশালী বোমা প্রস্তুত হইয়াছে, যার কলে জাপানের পক্ষ থেকে যুদ্ধ চালাইবার শক্তি চূড়ান্তরূপে ব্যাহত হইবে। (১০)

ট্রুম্যান চার্চিলের সঙ্গে একমত হইলেন এবং ২৪ জুলাই, ১৯৪৫, যখন তিনি যত ভাড়াভাড়ি সম্ভব কনকারেন্স বন্ধ করিয়া দিয়া বাড়ী ফিরিতে রাণী ছিলেন, সেই সময় একটি বৈঠকের শেষে তিনি কথায় কথায় স্ট্যালিনকে বলিলেন যে, তাঁরা একটি অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন নূতন অস্ত্র তৈয়ার করিয়াছেন। তবে তিনি 'নিউক্লিয়ার' বা 'এ্যাটোমিক'—এই দুইটি শব্দের একটিও ব্যবহার করেন নাই। চার্চিল অবশ্য অদূরে দাঁড়াইয়া সর্কোতুকে এবং গভীর আগ্রহে ভরে ব্যাপারটা লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি (চার্চিল) পরে বলিয়াছেন যে, তিনি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, ট্রুম্যানের বক্তব্যের আসল তাৎপর্য স্ট্যালিন স্থিতিতে পাবেন নাই—

'Churchill was sure that Stalin had no idea of what he was being told.'

ট্রুম্যান স্ট্যালিনের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর যুহুর্ভেই চার্চিলের কাছে আসিয়া গর্বভাবে মন্তব্য করিলেন, 'স্ট্যালিন কোন প্রশ্ন করেন নাই।' (১১)

অর্থাৎ চার্চিল ও ট্রুম্যান চাতুর্য নীতি অবলম্বন করিলেন। তাঁরা তাঁদের সময়-সঙ্গী ও মিত্র স্ট্যালিনের কাছ থেকে সমস্ত কিছু গোপন করিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে এমন অভিযোগ যাতে না উঠে, একান্ত কৌশলপূর্বক একটা 'অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন নূতন অস্ত্র সম্পর্কে' ইঙ্গিত দিলেন বটে, কিন্তু অস্ত্রটা যে এ্যাটম বোমা, সেই আসল কথাটাই চাপিয়া গেলেন। পটপডামে ট্রুম্যান ও চার্চিল রাশিয়ার প্রতি বিরূপ মনোবৃত্তি নিয়াই স্ট্যালিনের কাছ থেকে পারমাণবিক অস্ত্রের কথা গোপন করিয়া রাখিলেন। অস্ত্রখা এমন আচরণের অর্থ কি এবং উদ্দেশ্যই বা কি?

\*

\*

\*

পারমাণবিক শক্তি করারস্ত্র হওয়ার পর ট্রুম্যান সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি কড়া নীতি অবলম্বন করিলেন এবং রুডের শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চল কিংবা রাশিয়ার ক্ষতিপূরণ দাবী অথবা বলকান বা পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ কিংবা ভবিষ্যৎ জার্মানীর সামরিক পুনরুত্থান, অথবা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধবাজার রাশিয়ার সহযোগিতা ইত্যাদি কোন ব্রহ্ম প্রদ্বৈ ট্রুম্যান রাশিয়াকে কোন 'কনসেশন' দিতে কিংবা কোন আগোদ

(১০) চার্চিল—ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫৪

(১১) এ্যাটোমিক ডিপ্লোম্যাটিস—পৃষ্ঠা ১৫৩

মীমাংসা করিতে রাজী ছিলেন না। যদি মীমাংসা করিতে হয়, তবে আমেরিকার দাবী অনুসারেই করিতে হইবে। অথবা সমস্তাণ্ডল ভবিষ্যৎ বিবেচনার জন্য স্থগিত রাখিতে হইবে—অন্তথা তিনি সম্মেলন বন্ধ রাখিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে প্রস্তুত আছেন। ট্রুম্যান বারবার এই ভয় দেখাইতে লাগিলেন।

পটসডাম সম্মেলনে পারমাণবিক কুটনীতির এই পরোক্ষ বা অন্তরালবর্তী প্রভাব সত্ত্বেও সোভিয়েত পক্ষ কিন্তু তাঁদের পত্র-পত্রিকায় পটসডামের সাকল্য সম্পর্কে উচ্চাশা প্রকাশ করিলেন। অপর পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধিরাও দাবী করিলেন যে, পটসডামে আমেরিকাই সাকল্য অর্জন করিয়াছে।

আসলে পটসডামে একমাত্র সেই সমস্ত বিষয়েরই মীমাংসা হইয়াছিল যেগুলি সম্পর্কে মূলনীতিগত কোন বিরোধ ছিল না। যেমন, যুদ্ধোত্তর জার্মানী সম্পর্কে মূল রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণ। কিন্তু রাশিয়ার সঙ্গে বিতর্কিত অনেক প্রশ্নেরই কোন চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নাই।

\*

\*

\*

এদিকে ষ্ট্যালিন পটসডাম বৈঠকে মিত্রপক্ষের শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে জানাইলেন যে, মস্কোস্থিত জাপানী রাষ্ট্রদূতের মারফৎ জাপানের সম্রাটের পক্ষ থেকে সোভিয়েত সরকারের নিকট শাস্তি প্রস্তাব পাঠানো হইয়াছে মিত্রপক্ষের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এই প্রস্তাবে জাপানের পক্ষ থেকে বলা হইয়াছে যে, তাঁরা ‘নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে’ রাজী নন, তবে অল্প কান শর্তে আপোষ মীমাংসা করিতে রাজী আছেন। কিন্তু ষ্ট্যালিন ইতিমধ্যেই এই ধরনের অস্পষ্ট প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া দিয়াছেন।।...

জাপানী শাস্তি প্রস্তাবের এই পটভূমিকায় ট্রুম্যান ও চার্চিলের মধ্যে জাপানের নূতনতম পরিস্থিতি নিয়া আলোচনা ও পরামর্শ হইল এবং ইঙ্গ-মার্কিন নেতারা উপলব্ধি করিলেন যে, জাপানের অবস্থা অত্যন্ত কাহিল। কিন্তু যুদ্ধের জয়ীবাহী একটি গে গী এখনও জাপানে ক্ষমতা দখল করিয়া আছে। এরা ছাড়া আর বাকী সকলেই এই আত্মঘাতী যুদ্ধ বন্ধ করিতে ইচ্ছুক। সুতরাং স্থির হইল জাপানের উদ্দেশ্যে একটি চরমপত্র দেওয়া হইবে এবং সেটা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হইবে। এই চরমপত্রে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ দাবী করা হইবে। ইঙ্গ মার্কিন মহলের এই পরামর্শ অনুসারে অবিলম্বে যুদ্ধে ক্ষান্ত দেওয়া এবং নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দাবী জানানো ২৬ জুলাই জাপানের উদ্দেশ্যে একটি চরমপত্র প্রচার করা হইল। আশ্চর্য এই যে, পটসডাম থেকেই এই চরমপত্র প্রচার করা হইল বটে, কিন্তু তার আগে ষ্ট্যালিনকে একবার জিজ্ঞাসা করাও হইল না। অবশ্য অজুহাত স্বরূপ পরে একথা বলা হইয়াছিল যে, রাশিয়াতো তখন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল না।

১৩ দশা শর্ত সম্বলিত এই চরমপত্র ঘোষণা করা হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, রিপাব্লিক চীনের জাতীয় সরকারের প্রেসিডেন্ট এবং গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে এবং এই চরমপত্রে জাপানী গবর্নমেন্ট ও জাপানের সৈন্তবাহিনীদ্বয়কে অবিলম্বে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণের জন্য আহ্বান জানানো হইল।

২৬ জুলাই, ১৯৪৫, তারিখে প্রচারিত এই গুরুত্বপূর্ণ চরমপত্রের মর্ম ছিল এই :

১। আমরা ( মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও বৃটেনের তিন রাষ্ট্রনাযক ) আমাদের কোটি কোটি দেশবাসীর পক্ষ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিরূপে ঘোষণা করিতে চাই যে, যুদ্ধ শেষ করার জন্য জাপানকে একবার সুযোগ দেওয়া উচিত ।

২। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটিশ সাম্রাজ্য এবং চীনের জল, স্থল ও বিমানবাহিনীর বহুগুণ শক্তিগৃহীত বৃটিয়াছে এবং এই বর্ধিত শক্তি লইয়া আমরা জাপানের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি । সমগ্র মিত্রশক্তি সামরিক বল ও স্নুদ্র সঙ্কল্পের সঙ্গে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাইবে, যতক্ষণ না জাপান রণে স্তম্ভ হইবে ।

৩। জাপানের জনগণ যেন জার্মানীর দৃষ্টান্তের কথা স্মরণ রাখে । কে-না, সারা পৃথিবীর স্বাধীন জাতিসমূহের বিরুদ্ধে নির্বোধের মত শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ চালাইতে গিয়া জার্মানী শেষ হইয়া গেল ।

এই দৃষ্টান্তের পরেও জাপান যদি জার্মানীর মত নিঃস্বাসভূমে প্রতিরোধ চালাইতে চায়, তবে জার্মানীর মত জাপানেরও কলকারখানা, ভূমি ও জনগণের জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং সৈন্তবাহিনী চূর্ণ হইবে ।

৪। জাপানের পক্ষে এখন চিন্তা করার সময় আসিয়াছে যে, যুক্তিমূলক জীবাবাদীদের দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়া তারা জাপানী সাম্রাজ্যকে যেভাবে ধ্বংসের মুখে আনিয়া ফেলিয়াছে, সেই যুদ্ধ তারা চালাইবে কিংবা যুক্তির পথ ধরিতে ।

৫। নীচে আমাদের শর্তগুলি উল্লেখ করিতেছি । এই সমস্ত শর্ত থেকে আমরা বিচ্যুত হইব না এবং এগুলির কোন বিরুদ্ধও নাই । আর আমরা বিলম্বও সহ্য করিব না ।

৬। জাপানের জনগণকে বিভ্রান্ত ও প্রভাবিত করিয়া তারা পৃথিবী জয় করার চুরাকাজ্জব্ব বাঁপাইয়া পড়িয়াছে, সেই সমস্ত লোকের কর্তৃত্ব ও প্রভাব নিশ্চিতরূপেই চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া হইবে । কারণ, এই বিষয়ে আমরা নিশ্চিত যে, দায়িত্বজ্ঞানহীন জীবাবাদ যতক্ষণ পৃথিবী থেকে দূর না হইতেছে, ততক্ষণ জনগণের জন্য শাস্তি নিরাপত্তা ও স্ত্রাববিচারের ব্যবস্থা করা অসম্ভব হইবে ।

৭। যতক্ষণ পর্যন্ত জাপানের যুদ্ধ চালাইবার ক্ষমতা ধ্বংস না হইতেছে এবং যতক্ষণ নতুন নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে, ততক্ষণ মিত্র শক্তিবর্গ জাপানের অভ্যন্তরে কেন্দ্রবিন্দুগুলি দখল করিয়া রাখিবে এই সমস্ত মৌলিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ।

৮। কাইরো থেকে প্রাপ্ত দ্বাষণ্য শর্তগুলি কার্যক্ষেত্রে পালন করা হইবে এবং জাপানের সার্বভৌমত্ব কবলমাত্র হেনস্ত, হোকাইডু, কিয়ুশু, শিকোকিউ এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র দ্বীপের মধ্যে আমাদের বিবেচনা অনুসারে সীমাবদ্ধ রাখা হইবে ।

৯। জাপানের সৈন্তবাহিনীগুলিকে সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত করা হইবে এবং তাদেরকে যতদূর গৃহীত হইতে দেওয়া হইবে শান্তিপূর্ণ ও কলপ্রসূ জীবন যাপনের জন্য ।

১০। জাপানের জনগণকে আমরা নিশ্চয়ই দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ রাখিতে চাই না কিংবা জাতি হিসাবেও তাদেরকে ধ্বংস করিতে চাই না । কিন্তু তারা আমাদের

বন্দীদের উপর নিষ্ঠুরতা করিয়াছে, তাদেরকে এবং যুদ্ধ-অধিকারীদেরকে যথোপযুক্ত বিচার ও দণ্ড দেওয়া হইবে। ধর্ম, চিন্তা ও মতামত প্রকাশে স্বাধীনতা এবং মৌলিক মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

১১। যে সমস্ত শ্রমশিল্প জাপানের অর্থনৈতিক জীবনের পক্ষে প্রয়োজন, সেগুলি বজায় রাখা হইবে। কিন্তু যুদ্ধের উপকরণ ও অস্ত্রাদি তৈয়ারির কারখানা রাখিতে দেওয়া হইবে না। উপযুক্ত ক্ষতিপূরণও দ্রব্যমূল্যে আদায় করা হইবে।

১২। এই সমস্ত উদ্দেশ্য যখন পূর্ণ হইবে, তখন মিত্রপক্ষের দখলদার বাহিনীগুলি প্রত্যাহার করা হইবে এবং জাপানী জনগণের স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী শান্তিকামী দ্বারিদ্বেশীল গবর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা করিতে দেওয়া হইবে।

১৩। আমরা এক্ষণে জাপানের গবর্নমেন্টকে তাদের সমস্ত সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ঘোষণা করার জন্ত আহ্বান জানাইতেছি এবং তাদের সদিচ্ছা প্রমাণের জন্ত দাবী করিতেছি। এর বিকল্প হইতেছে জাপানের সম্পূর্ণ এবং সর্বাত্মক ধ্বংস।...

কিন্তু জাপানের সামরিক শাসকেরা এই চরমপত্র অগ্রাহ্য করিলেন। সুতরাং পরিকল্পনা অনুযায়ী মার্কিন বিমানবাহিনী হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোম্ব বর্ষণের সিদ্ধান্ত করিলেন। (১২)

পটসডাম সম্মেলনে পারমাণবিক কূটনীতি ও রণনীতির এই সমস্ত কলাকল ভাবী ইতিহাসের পক্ষেও গুরুতর ছিল। কেন না, সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতা ও স্ফূর্ত রক্ষা করিয়া পৃথিবীর শান্তি স্থানিষ্ঠিত করার যে উদ্যম ও মানবিকনীতি রুজভেল্ট অহুসরণ করিতেছিলেন, ট্রুম্যানের এ্যাটম্ বোম্ তার দ্ববসান ঘটাৎল এবং পটসডাম সম্মেলনে তাব ভূমিকা রচিত হইল।

## দশম পর্ব

### চতুর্থ অধ্যায়

#### পতনের মুখে জাপান

হিটলারী জার্মানীর পতনের পর জাপানেরও আয়ু শেষ হইয়া আসিতেছিল— যদিও টোকিওর সংবাদপত্রগুলিতে তখনও জাপানের বীরত্ব ও জয়গৌরবের গাথা প্রচারিত হইতেছিল। কিন্তু রাস্তার লোকেরা এবং শহরবাসীরা দেখিতেছিল যে, তাদের দেশের জনপদ ও নগরগুলি শত্রুপক্ষের নিদারুণ বোমাবর্ষণে একে একে ধ্বংস হইয়া যাইতেছিল এবং দলে দলে লোক শহর ছাড়িয়া দূরবর্তী গ্রাম দেশে পলায়ন করিতেছিল। আর চাষীরা ভবিষ্যতের আশঙ্কায় চাউল মজুত করিতেছিল এবং শহরবাসীরা ক্রমশ উপবাসের মুখে পড়িতেছিল……

জাপানীরা এত দ্রুত এত বিশাল সাম্রাজ্য দখল করিয়াছিল যে, ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সালে আমেরিকার পাণ্টা অভিযান শুরু হওয়ার পর জাপান আর ভাল সামান্যইতে পারিতেছিল না। অতিরিক্ত ভোজন করিলে যেমন ঔদরিক পীড়ায় আক্রান্ত হইতে হয়; জাপানেরও প্রায় সেই দশা হইয়াছিল। ১৯৪৫-এর প্রথম ভাগ থেকে তার আর যুদ্ধ চালাইবার কিংবা চার হাজার মাইল দীর্ঘ পেরিমিটার বা পরিসীমা পাহারা দেওয়ার ক্ষমতা অব্যাহত থাকিতেছিল না। কারণ, আকাশপথে ও সমুদ্রপথে মার্কিন সামরিক শক্তির ক্রমাগত প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে জাপান একে একে তাঁর ঘাঁটিগুলি ও অধিকৃত দ্বীপসমূহ হারাইতেছিল এবং আকাশ ও সমুদ্রপথের যোগাযোগ বিপর্যস্ত হইয়া পড়িতেছিল।

রণশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ ক্যাপ্টেন লীডেল হার্ট বলিয়াছেন যে, সমুদ্র ও আকাশ, এই দুই পথের আক্রমণই জাপানের পতনের অগ্রতম মূল কারণ। কারণ, মূলতঃ জাপানী সাম্রাজ্য ছিল 'সামুদ্রিক সাম্রাজ্য' (সী এম্পায়ার)—বৃটিশ সাম্রাজ্যের চেয়েও সে বেশী নির্ভরশীল ছিল বৈদেশিক সরবরাহের উপর। কিন্তু তার বাণিজ্যিক নৌবহরের শক্তি বৃটেনের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশেরও কম ছিল। ১৯৩৯ সালে যুদ্ধারম্ভের সময় বৃটেনের বাণিজ্যিক নৌবহরে জাহাজের সংখ্যা যখন ছিল প্রায় ২,৫০০ কিংবা ২ কোটি ১০ লক্ষ টনের, তখন জাপানের বাণিজ্যপোত ছিল মোট ৬০ লক্ষ টনের। অথচ দুই বছর সময় হাতে পাইয়াও জাপান তার সমুদ্রপথের নৌবহর ও বাণিজ্যবহর রক্ষা করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা—যেমন, কনভয় প্রথা এবং পাহারাধার বিমানবাহী জাহাজের শক্তি উপযুক্তভাবে গড়িয়া তোলে নাই। অথচ যুদ্ধ চালাইবার জন্য জাপানকে বিদেশ থেকে পেট্রোল, আকরিক লোহা, বক্সাইট, কোক কয়লা, নিকেল, ম্যাঙ্গানিজ, এলুমিনিয়াম, এবং টিন, কোবাল্ট, দস্তা, কসকেট, গ্রাফাইট, পটাশ, কার্পাস, লবণ ও রবার আমদানি করিতে হইত। এগুলি ছাড়া তাদের খাদ্যবোরও একটা বড় অংশ সমুদ্র পারবর্তী দেশগুলি থেকে আনিতে হইত। কিন্তু সমুদ্র পথের উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ ও পাহারাধারির অভাবে প্রশান্ত মহাসমুদ্রে জাপান মার্কিন গ্লেন, টর্নেডো ও সাবমেরিনের সহজ শিকারে পরিণত হইল।

কিন্তু তার জাহাজী শক্তি যখন প্রচণ্ড রকমে ক্ষয় পাইয়া গেল, তখন সে প্রাণপণে চেষ্টা করিল এই জাহাজী ক্ষতিপূরণের জন্য। প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে জাপানের যে ৮০ লক্ষ টনের জাহাজী শক্তি নষ্ট হইয়াছিল, তার ৬০ ভাগ শক্তি নষ্ট হইয়াছিল একষাট মার্কিন সাবমেরিনের দ্বারা। (১)

মিত্রশক্তি কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে অবরোধ স্থিতির ফলে সমুদ্র পথের যোগাযোগ বিপর্যস্ত হইয়া গেল। দক্ষিণ চীন সমুদ্র থেকে জাপানী কনভয় অদৃশ্য হইয়া গেল এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে টোকিও যাওয়ার সেই বিখ্যাত জলপথে সিঙ্গাপুরের ঘাঁটি আর কোন কাজে লাগিল না। অবশ্য জাপানের সৈন্যশক্তি তখন প্রায় অটুট ছিল—মোট ৬০ লক্ষ সৈন্যের অধিকাংশই ছিল জাপানী স্বীপে। কিন্তু প্রশান্ত মহাসমুদ্রের বিভিন্ন স্বীপে ও স্বীপপুঞ্জে আরও প্রচুর জাপানী সৈন্য অবস্থান করিতেছিল। মার্কিন বাহিনী এই সমস্ত স্বীপকে এড়াইয়া কিংবা এগুলির পক্ষে কাটাইয়া খাস জাপানের নিকটবর্তী স্বীপগুলির দিকে আগাইয়া বাইকোঁছিল সংক্ষিপ্ততম পথে আক্রমণের আশায়। ফলে, বিভিন্ন স্বীপে, যেমন—নিউগিনি ও সলোমোন স্বীপপুঞ্জে ১ লক্ষ, ক্যারোলাইনস্ স্বীপে ৮০ হাজার, পলায়ুস স্বীপে ৩০ হাজার, মার্শাল স্বীপে ১৫ হাজার, মার্কাস ও ওয়েক স্বীপে ১০ হাজার এবং নায়ুক স্বীপে ৪ হাজার জাপানী সৈন্য আটকা পড়িয়াছিল এবং তারা উদ্ধারলাভের আশায় দিন গণিতেছিল। কিন্তু এই উদ্ধারলাভ তাদের অদৃষ্টে আর ঘটিল না। কারণ, জাপানী নৌ ও বিমান শক্তি ততদিনে প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

কিন্তু এখানে একটি কথা উল্লেখ করা দরকার। যুদ্ধের শেষদিকে জাপানী সৈন্ত-সংখ্যা এবং তাদের অবস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন পুস্তকে বিভিন্ন রকমের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। যেমন, মার্কিন ঐতিহাসিক স্নাইডার বলিয়াছেন মোট জাপানী সৈন্ত-সংখ্যা ছিল ৬০ লক্ষ (উপরে উদ্ধৃত)। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান বলিয়াছেন চীন ও জাপান ইত্যাদি সহ ৪০ লক্ষাধিক। বিখ্যাত মার্কিন লেখক হার্বার্ট কীজ বলিয়াছেন জাপানের হোম আর্মিতে বা স্বদেশের সৈন্তবাহিনীতে ১৫ লক্ষাধিক। ইংরাজ লেখক বসিল কোলিয়ারের মতে ১৯৪৪ সালের আগষ্ট মাসে প্রধান প্রধান সংগঠনের মোট জাপানী সৈন্ত ছিল ১০১ ডিভিসন এবং বিমান সৈন্ত ৩১ ডিভিসন। আর যেকো থেকে প্রকাশিত (১৯৭০ সালে) একটি নূতন গ্রন্থে ‘সফির’ জাপানী সৈন্তের সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে ৭০ লক্ষ এবং ইজ-মার্কিন পক্ষের ১৮ লক্ষ। আর তার জন স্কায়ারটন সম্পাদিত গ্রন্থে (নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৮৩৩) বলা হইয়াছে যে, জাপানের বাইরে অধিকৃত দেশ বা স্থানগুলিতে ১লা সেপ্টেম্বর তারিখ জাপানী স্থল ও নৌ-সৈন্তের মোট সংখ্যা ছিল ৩৪ লক্ষ, যাদের মধ্যে কিরিয়া যাওয়ার কোন সুযোগ ছিল না এবং খাস জাপানে মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল ৪০ লক্ষ। স্বয়ং মার্কিন সমরসচিব ট্রুম্যান অজ্ঞান করিয়াছিলেন যে, ৫০ লক্ষ জাপানী সৈন্য তখনও অপরাধিত ছিল এবং এর মধ্যে চীনের মূল ভূখণ্ডে ছিল ২০ লক্ষ।

বিভিন্ন বিখ্যাত লেখকগণের পুস্তকে জাপানী সৈন্য সংখ্যার এই তারতম্য সত্ত্বেও

একটি কথা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, জাপানী নৌ ও বিমান বল প্রচণ্ডভাবে ক্ষয় পাওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যায়ে জাপানের মোট 'সক্রিয়' সৈন্যসংখ্যা বোধ হয় ৭০ লক্ষের কম ছিল না।

\*

\*

\*

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের খ্যাতিমান মার্কিন সেনাপতি জেনারেল ডগলাস ম্যাক-আর্থার তাঁর স্মৃতি-পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, এই এপ্রিল প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মার্কিন সৈন্যবাহিনীগুলির পুনর্গঠন করা হইল। ম্যাক-আর্থারকে দেওয়া হইল সমস্ত স্থলবাহিনীর অধিনায়কত্ব এবং এ্যাডমিরাল নিমিৎস (Nimitz) নিযুক্ত হইলেন সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবাহিনীর প্রধান নায়কের পদে। আর জেনারেল এইচ্. এইচ্. আর্নল্ড ভার পাইলেন ২০ নং বিমান বাহিনীব-কার্যতঃ 'অর্ধেক পৃথিবীর দূরত্ব' বা ওয়াশিংটন থেকে তিনি এই বর্ণনৈতিক বিমান কমান্ড চালাইতেন। তখন থেকে তিনটি পৃথক বিমান বাহিনী গঠিত হইল প্রশান্ত মহাসাগরের একই অঞ্চলে রণক্রিয়ার জন্য। অথচ উচিত ছিল প্রশান্ত মহাসাগরের এই সমস্ত রণক্রিয়ার জন্য একটি একাবধি সেনাপত্য গঠন করা এবং একজন সুগ্রীম কমান্ডার নিযুক্ত করা। কিন্তু কার্যতঃ তা সম্ভব হইল না। তবে, ম্যানিলার (কিলিগিল) পতনের অল্প কিছু কাল পবেই মধ্য প্রশান্ত মহাসাগর থেকে দুইটি সেকেন্ডারি আক্রমণ ঘটনা হইল—প্রথমতঃ আইও জিমা (Iwo Jima) এবং দ্বিতীয়তঃ ওকিনাওয়ার (Okinawa) দিকে। এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ দখল করিতে মার্কিন বাহিনীকে প্রচুর খেসারৎ দিতে হইয়াছিল ...

ম্যাক-আর্থার বলিয়াছেন যে তিন বছর ধরিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে জাপানের ৮টি আর্মি খণ্ডম্ কিংবা অকেজে, হইয়া গিয়াছিল এবং খাস জাপানী দ্বীপের বিরুদ্ধে অভিযানের পথ উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আর একটি অভিনব দৃষ্টের অবতারণা হইয়াছিল। লক্ষ লক্ষ জাপানী সৈন্য বিভিন্ন দ্বীপে আটকা পড়িয়াছিল এবং তারা পশ্চাতেও হটিতে পারিতেছিল না, কিংবা অন্তর্ভূতের দিকে সরিয়া গিয়া খাস জাপানের প্রতিরক্ষাও যোগ দিতে পারিতেছিল না।

'It was a situation unique in modern war. Never had such a large number of troops been so outmaneuvered, separated from each other, and left tactically impotent to take an active part in the final battle for their homeland.' (২)

'আধুনিক যুদ্ধের ইতিহাসে এমন পরিস্থিতি অভূতপূর্ব, সন্দেহ নাই।'—মন্তব্য করিয়াছেন ম্যাক-আর্থার।

\*

\*

\*

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের নিউগিনি থেকে জাপান পর্যন্ত দ্বীপ থেকে

(২) Reminiscences—Douglas MacArthur, Jaico Publishing House, Bombay, 1968, p 368-70.



দ্বীপান্তরের যুদ্ধে শেষ দুইটি দ্বীপ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—আক্রমণ বা আত্মরক্ষা উভয় প্রদেয়। আইওজিমা এবং ওকিনাওয়া (অষ্টম পর্বের সপ্তম অধ্যায়ে খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে)—এই দ্বীপ দুইটি ছিল জাপানের খুব কাছাকাছি। আইওজিমা টোকিও থেকে ৭৫০ মাইল এবং ওকিনাওয়া জাপান থেকে মাত্র ৩৬২ মাইল। সুতরাং মার্কিন বোম্বার্ক অভিযানের পক্ষে এই দ্বীপ দুইটি দখল করা ছিল অপরিহার্য যেমন অপরিহার্য ছিল জাপানের পক্ষেও আত্মরক্ষার জন্ত।

যদিও আইওজিমা ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র দ্বীপ, মাত্র ৮ বর্গমাইল আয়তন, তবু এর রণনৈতিক গুরুত্ব ছিল জাপানের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান আর পাহাড়, আগ্নেয়গিরি ও জঙ্গলের জন্ত এর স্বাভাবিক প্রতিরক্ষা যেমন অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল, তেমনই জাপানীরা ম্যাজিনো লাইনের (ফ্রান্স) ধরনে এই ক্ষুদ্র দ্বীপটিকে এমন একটু চূর্তে কেল্লায় পরিণত করিল। লেঃ জেনারেল টাডা মর্চি কুইবায়ামিব নেতৃত্বে ২০ হাজার উৎকৃষ্ট জাপানী সৈন্য মার্কিন আক্রমণ প্রতিরোধেব জন্ত প্রস্তুত ছিল। মার্কিন নৌ ও বিমানবহর ক্রমাগত ৭৪ দিন ধরিয় এই ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর বোমা ও গোলাবর্ষণ করিল। ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে আক্রমণের আয়োজন হইল এবং ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫, ৬টি যুদ্ধ জাহাজ (ব্যাটলশিপ) ও কয়েকটি ক্রুজার এবং ডেইয়াব নিয়া যে টাস্ক কোর্স গঠিত হইল, সেগুলি যেন এই ক্ষুদ্র দ্বীপটিকে ধরিয় ধরিল। মেজর-জেনারেল হ্যারি স্মিড্ট (Schmidt) ৩০ হাজার নৌ-সৈন্য নিয়া ২শে ফেব্রুয়ারী দ্বীপটিকে আক্রমণ করিলেন। এখানকার এক নির্বাপিত আগ্নেয়গিরি জাপানী সৈন্যদের প্রতিরক্ষার প্রধান দুর্গে পরিণত হইল এবং ২৬ দিন ধরিয় ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর দ্বীপটি আমেরিকানদের দখলে গেল। মার্কিন পক্ষে হতাহত হইল ২০১২৬ জন সৈন্য (এর মধ্যে নিহত ৪১৮২) আর মৃত্যুপা লভাইতে জাপানীদের নিহত হইল ২১ হাজার, আহত অনেক, কিন্তু বন্দী হইল মাত্র দুই শতের কিছু বেশী। একজন মার্কিন সাংবাদিক এর্নি পাইল (Ernie Pyle) এই যুদ্ধে রিপোর্ট করিতে গিয় নিহত হইয়াছিলেন। তিনি সৈন্যদের খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন। এজন্য তাঁর মৃত্যুর স্থানে একটি স্মৃতিস্তম্ভও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। (৩)

আইওজিমা আমেরিকানদের দখলে যাওয়ার জাপানের বিপর্যয় আরও ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। কারণ, এর পর ওকিনাওয়ার পাল্লা কিন্তু জাপানী সৈন্তেরা আত্মহত্যা করিবে, তবু যুদ্ধে ক্ষান্ত দিবে না কিংবা আত্মসমর্পণ করিবে না। এজন্য জাপানীরা মধ্যযুগের এক 'দিব্য তুফান' বা 'কামিকাজে'র (Kamikaze) কাহিনী প্রচার করিল। ১২৮১ খৃষ্টাব্দে দুর্ধর্ষ মোঙ্গল দ্বিধিজয়ী কুবলাই খান এক বিরাট নৌবহর নিয়া জাপান আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেন। কিন্তু সেই সময় জাপানের সূর্য দেবতা এক 'দিব্য তুফান' বা 'কামিকাজে' সৃষ্টি করিলেন এবং কুবলাই খানের আগ্রাসী নৌবহরকে ধ্বংস করিয়া দিলেন। কামিকাজে এই 'দিব্য তুফান'-এর কাহিনী অবলম্বন করিয়া সৈন্যদের যুদ্ধোত্তম জাপানে সৃষ্টি হইল শত্রুকে বাধা দেওয়ার জন্ত একদল আত্মহত্যাকারী বিমান যোদ্ধা—অবশ্যই দেশ ও সম্রাটের

প্রতি অঙ্গাগ প্রকাশের জন্য। এই আত্মহননকারী সৈন্যদের বর্ণসঙ্গীতও ছিল উল্লেখযোগ্য—যার ইংরাজী ভাষ্য নিম্নরূপ :

“In Serving on the seas, be a Corpse  
Saturated with water.  
In Serving on land, be a corpse  
Covered with weeds.  
In Serving the sky, be a  
corpse that challenges the clouds.  
Let us all die close by the  
Side of our Sovereign.”

এই সমস্ত সৈন্য স্বগৃহেও এই মর্মে চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন, “আমাদের মৃত্যু বসন্ত কালের চেঁচাইফুলের বয়ে পড়ার মত সুন্দর ও নির্মল হোক !” (৪)

এই প্রকার বে-পরোয়া এবং মৃত্যুভয়হীন জাপানী সৈন্যদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া নিঃসন্দেহে কঠিন ছিল। ইতিহাসে এই প্রথম আত্মহত্যাকে একটা সরকারী সামরিক অস্ত্র পরিণত করা হইল—‘For the first time in history a nation at war used suicide as an official military weapon and called upon its warriors to go in to combat with the prospect of certain death’ (৫)

ওকিনাওয়া যুদ্ধের পূর্বাঙ্কে জাপানের প্রধানমন্ত্রী কুনিয়াকি কয়সো (Kuniaki Koiso) এই মর্মে সর্বত্র বাণী প্রচার করিলেন,—“হে আমার দশ কোটি দেশবাসী, শত্রু ঘরের দুয়ারে এসে পৌঁছেছে। আমাদের দেশের ইতিহাসে এমন বিপদের মুহূর্ত আর আসে নাই !” (৬)

কিন্তু সেই মুহূর্তে আর একটা বিপদ ঘটিল। সোভিয়েত রাশিয়া জাপানের সঙ্গে ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে স্বাক্ষরিত নিরপেক্ষতার চুক্তি বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিল। ফলে, এই এপ্রিল ১৯৪৫, কয়সো মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিলেন এবং প্রাণ্ডি কাউন্সিলের সভাপতি এ্যাডমিরাল সুজুকি প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। তিনি বুদ্ধ হইলেও সাহসী, দুর্ধর্ষ এবং সোজা-সুজি ধরনের মানুষ ছিলেন। সম্রাট তাঁকে পছন্দ করিতেন এবং যদিও স্বয়ং সম্রাটও অস্থত্ব করিতেছিলেন যে, পরাজয় বরণ করা ছাড়া আর উপায় নাই, তথাপি অস্থত ওকিনাওয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলে সম্ভবতঃ ‘নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ’ দাবির কিছুটা সংশোধন হইতে পারে—এমন চিন্তা তাঁর মাথায় ঘুরিতেছিল। (৭)

এজন্তই ওকিনাওয়াতে মার্কিন আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য বেপরোয়া পদা অবলম্বিত হইল। আত্মবিনাশী জাপানী পাইলট বোম্বার্ডি ছোট ছোট প্লেন নিয়া

(৪) লুই ব্রাইডার—পৃষ্ঠা, ৫৮৫

(৫-৬) লুই ব্রাইডার—পৃষ্ঠা, ৫৮২

(৭) A History of Modern Japan—Richard Storry, p. 226.

মার্কিন জাহাজগুলির উপর বাঁপ দিয়া য়িরবার এবং য়িরবার জন্ত প্রস্তুত হইল। এই রণক্রিয়াকেই ‘কাষিকেক’ নামে সামরিক ইতিহাসে অভিহিত করা হইয়াছে।

সম্ভবতঃ একমাত্র জাপানীরা ছাড়া এমন আত্মবিনাশী যুদ্ধ আর কোন শক্তি চালাইতে পারিত না।

এই আত্মবিনাশী জাপানী সৈন্তেরা আইও জিমার যুদ্ধে মার্কিন নৌবাহিনীর প্রচুর ক্ষতিসাধন করিয়াছিল। ৩৪টি মার্কিন জাহাজ নিমজ্জিত, ২৮৮টি জখম হইয়াছিল। এর মধ্যে ৩৬টি বিমানবাহী জাহাজ, ১৫টি যুদ্ধজাহাজ, আর ৮৭টি ডেট্রয়ার। সুতরাং জাপানী বেপরোয়া যুদ্ধের কলাকল কষ মারাত্মক ছিল না—যদিও জাপানীদেরও ক্ষতি হইয়াছিল প্রচুর প্লেন ও পাইলট, অল্পমান ১২ শত থেকে ৪ হাজারের মধ্যে।

\*

\*

\*

জাপানের প্রায় ষারদেশে অবস্থিত ওকিনাওয়া দ্বীপের রণনৈতিক গুরুত্ব ছিল অসামান্য। কারণ, এই দ্বীপ অধিকৃত হইলে জাপানে প্রবেশের পথ খুলিয়া যাইবে এবং রিউকিউ দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত এই দ্বীপটি ছিল সর্ববৃহৎ—৬৭ মাইল লম্বা এবং ৩ থেকে ২০ মাইল চওড়া। কিন্তু এই দ্বীপের কর্কশ পাহাড়িয়া ভূমিতে জনবসতি ছিল সবচেয়ে ঘন। ম্যালেরিয়ার উৎপাত সঙ্গেও ৫ লক্ষ লোক এখানে বাস করিত। আইও জিমা দ্ব্বল হওয়ার আগেই ওকিনাওয়া অভিযানের জন্ত আমেরিকা প্রস্তুত হইতেছিল এবং এই অভিযানের সাক্ষিতিক নাম রাখা হইয়াছিল ‘অপারেশন আইসবার্গ’। এই দ্বীপের অবস্থান ছিল ক্রমোজ্ঞা ও জাপানের ঠিক মধ্যস্থলে এবং চীন উপকূল থেকেও মাত্র ৩৬০ মাইল দূরে। সুতরাং এই দ্বীপ আমেরিকানদের হাতে আসিলে কার্যতঃ তিনটি লক্ষ্য বস্তুই মার্কিন আক্রমণের পাল্লায় মধ্যে আসিবে। কর্কশভূমি, জঙ্গল ও শৈলশিয়ার জন্ত দ্বীপটি স্বাভাবিক আত্মরক্ষার পক্ষে জাপানের খুব অল্পকূল ছিল। তবে, দক্ষিণ দিকের খানিকটা অংশ খোলা ছিল এবং সেখানে ছিল বিমান ঘাঁটি, আর সমুদ্রের ধারে ছিল দ্বীপের রাজধানী নাহা। জাপানীরা প্রাকৃতিক বিয়ের সঙ্গে দ্বীপটির প্রতিরক্ষার জন্ত দুর্ভেদ্য কেল্লা তৈয়ার করিল। জেনারেল উসিজিমার (Ushijima) অধীন ৩২ নং আর্মির ৭৭ হাজার লড়িয়ে সৈন্তের সঙ্গে যুক্ত হইল ২০ হাজার সার্ভিস বা সেবক সৈন্য—মোট প্রায় এক লক্ষ। আর সেই সঙ্গে ৫০০ গোলন্দাজী কামান।

মার্কিন হাইকমান্ড পূর্বাঙ্কেই অল্পমান করিয়াছিলেন যে, ওকিনাওয়াতে জাপানীদের পরাজিত করা আরো সহজ হইবে না। সুতরাং প্রশান্ত মহাসমুদ্রের বৃহত্তম নৌ-যুদ্ধের তারা আয়োজন করিলেন—১৫০০ যুদ্ধজাহাজ ও লক্ষাধিক সৈন্ত প্রস্তুত হইল। কারণ, সংখ্যাশক্তিতে অনেক বেশী শ্রেষ্ঠতা অর্জন করিতে না পারিলে এই দ্বীপে অবতরণ ও যুদ্ধ চালানো যাইবে না। লেঃ জেনারেল বাকনারের অধীনে ১ লক্ষ ১৬ হাজার সৈন্ত প্রথম অবতরণের জন্ত প্রস্তুত হইল এবং ক্রমে এই শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া মূল ও নৌ-সৈন্তসহ লড়িয়ে সৈন্তের সংখ্যা দাঁড়াইল ১ লক্ষ ৭০ হাজার, আর সার্ভিস বা সেবক সৈন্তের সংখ্যা দাঁড়াইল ১ লক্ষ ১৫ হাজার। এ্যাভিয়ারাল টার্নার সমগ্র ওকিনাওয়া বাহিনীর প্রধান আধিনায়ক পদে নিযুক্ত হইলেন। ১লা

এপ্রিল ইষ্টার দিবসে সমুদ্র ও আকাশ থেকে ক্রমাগত তিন ঘণ্টা ধরিয়া প্রচুর গোলাগুলি ও বোমা বর্ষণের পব মার্কিন বাহিনীর তীরে অবতরণ শুরু হইল এবং প্রায় বিনা বাধায় ৬০ হাজার মার্কিন সৈন্য তীরভূমির ২ মাইল এলাকা দখল করিল।...

জাপান তার বৃহত্তম যুদ্ধজাহাজ বা ব্যাটলশিপ 'ইয়ামাতো'কে নিয়োগ করিল এই মার্কিন অভিযানে বাধা দেওয়ার জন্য। কিন্তু বিচিত্র এই যে, এই বিরাট যুদ্ধজাহাজকে পাহারা দেওয়ার জন্য কোন বিমানবহর নিয়োগ করা হইল না। সুতরাং ঘটনাটা জাপানীদের পক্ষে প্রায় আত্মহত্যার তুল্য ছিল। কেন না, ৭ই এপ্রিল দুপুর বেলা মার্কিন বিমানবাহী জাহাজ থেকে ২৮০টি বোমারু ইয়ামাতোকে আক্রমণ করিল এবং টর্পেডো ও বোমার দ্বারা দুই ঘণ্টা ধরিয়া যুদ্ধ ও আঘাত হানার পর ইয়ামাতো বহু সৈন্য ও লঙ্ঘরসহ মহাসমুদ্রের গর্ভে ডুবিয়া গেল। এর বড় বড় কামান থেকে জাপানীরা শত্রুর বিরুদ্ধে আঘাত হানার জন্য একটা গোলা নিক্ষেপেরও সুযোগ পাইল না। জাপানী যুদ্ধজাহাজের ইতিহাসে এত বড় ট্রাজেডি খুব কমই হইয়াছে। (৮)

তথাপি ওকিনাওয়া দ্বীপের স্থলভাগে প্রচণ্ড ও তিক্ত লড়াই চলিল সুরক্ষিত ঘাঁটি ও পাহাড়ের গুহা থেকে দুই মাস (লীডেল হার্টের মতে মোট ৩ মাস) ধরিয়া এবং শেষ পর্যন্ত এই ভয়াবহ বক্তশ্রাবী যুদ্ধে জাপানীরা পরাজিত (আত্মবিনাশী জাপানী বৈমানিকদের বেপরোয়া আক্রমণ সত্ত্বেও) হইল—ওকিনাওয়া দ্বীপ আমেরিকার দখলে চলিয় গেল। কিন্তু দ্বীপ দখলীকৃত হওয়ার আগে ১১ই জুন মার্কিন সেনাপতি জেনারেল বাকনার একটি প্রবাল পাহাড়ে চূড়ায় বসিয়া যখন সহাস্রমুখে যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করিতেছিলেন, তখন হঠাৎ একটি গোলা আসিয়া তাঁকে মারাত্মক আঘাত করিল। কিন্তু সেই অবস্থায়ও এবং মৃত্যুমুখে পড়িয়াও তাঁব যুদ্ধের হাসি লাগিয়াই ছিল।

এদিকে ২২শে জুন, ১৯৪৫, যখন দেখা গেল যে, যুদ্ধজয়ের আর আশা নাই, তখন জাপানী সৈন্যদের ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি লে: জেনারেল উসিজিমা এবং লে: জেনারেল ইসামা চো তাঁদের সৈন্যপত্নের সমস্ত সাজপোশাক বা ইউনিকর্ম এবং পদক ও পদমর্যাদার স্মারকসিঁহগুলি ধারণ করিয়া তাঁদের সহকর্মী ও সহচরদের সঙ্গে সদর দপ্তরের গুহায় আসিয়া হাজির হইলেন। বেলা তখন ৫-৪০ মিঃ, তাঁদের হাঁটু গাড়িয়া বসিবার স্থানে মৃত্যুর প্রতীকস্বরূপ সাধা কাপড় বিছাইয়া দেওয়া হইল এবং তাঁরা সামুয়াই ক্রীতজ্ঞ অল্পসারে আত্মহত্যার জন্য নিজেকে উদর কাটিয়া (হারিকিরি) ফেলিলেন। তখন একজন পদস্থ সৈনিক তরোয়াল দিয়া তাঁদের মৃত্যুচ্ছেদ করিয়া ফেলিলেন। সেই সময় মার্কিন সৈন্যেরা তাদের 'সুগালগর্ভে' মাত্র ১০ গজ দূরে ছিল। জাপানী যুদ্ধের এই সাময়িক ক্রীতজ্ঞ ভয়াবহ সন্দেহ নাই।...

সারা প্রশান্ত মহাসাগরের ওকিনাওয়ার যুদ্ধ প্রাণনাশের দিক থেকে আমেরিকানদের কাছে সবচেয়ে গুরুতর ছিল। আমেরিকার ক্ষতি হইয়াছিল ৪২ হাজার সৈন্য (নিহত ১২ হাজার ৫ শত) এবং জাপানীদের ১ লক্ষ ১০ হাজার সৈন্য। শত শত

আত্মবিনাশী জাপানী সৈন্য বা 'কামিকাজ' আমেরিকানদের বিরুদ্ধে যে বেপরোয়া আক্রমণ চালাইয়াছিল, তার ফলে ৩৪টি নৌ-ভরী নিমজ্জিত এবং ৩৬৮টি জাহাজ হইয়াছিল। এই নিদারুণ এবং রক্তসিক্ত অভিজ্ঞতার পর মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষ খাস জাপান আক্রমণের জন্য কী মূল্য দিতে হইবে, সে কথা চিন্তা করিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন। (২)

কিন্তু ওকিনাওয়া দ্বীপের যুদ্ধে প্রচুর রক্তের মূল্য দিতে হইলেও আমেরিকানদের পক্ষে খাস জাপান আক্রমণের দরজা খুলিয়া গেল এবং ১৯৪৫ এর নভেম্বর মাসে জাপান আক্রমণের পরিকল্পনাও স্থির হইয়াছিল, যদিও তার আগেই জাপানী যুদ্ধ থতম্ হইয়াছিল।...

কিন্তু জাপানের উপর পারমাণবিক বোমা বর্ষিত হওয়ার আগেই জাপানের দুর্গতি রমে উঠিতেছিল। কারণ, ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকাল থেকে অধিকৃত ম্যারিয়ানা দ্বীপের দ্বীপটি হইতে জাপানের বিরুদ্ধে রণনৈতিক বোমাবর্ষণ (ট্রাটেক্টিক বম্বিং) আরম্ভ করা হইয়াছিল। এই অভিযানের প্রধান অস্ত্র ছিল বোয়িং বি ২৯ সুপার কোর্টরেস বোমারু—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বৃহত্তম বোমারু—যেগুলির প্রত্যেকটি বহন করিতে পারিত প্রায় ৮ টনের কাছাকাছি পরিমাণ বোমা। এগুলির গতি ছিল ঘণ্টায় ৩৫০ মাইল। ৩৫ হাজার ফুট উচ্চ আকাশ দিয়া উড়িতে পারিত এবং একটানা ৪ হাজার মাইলের বেশী চলিতে পারিত। এগুলি বর্ম আচ্ছাদনের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল এবং ১৩টি মিসাইলগনও বহন করিতে পারিত। সোজাভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এগুলি ছিল রাকুসে ধরনের বোমারু এবং জাপানের বিভিন্ন শহরে বন্দরে ও জনপদে এগুলি হানা দিতে লাগিল।

কিন্তু ১৯৪৫-এর মার্চ মাসে মার্কিন বিমানবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল কার্টিস লিমে (Curtis Le May) সাধারণ বিস্ফোরক বোমার বদলে আগুনে বোমা বর্ষণ শুরু করিলেন। ২ই মার্চ তারিখ ২৭৯ খানা বি ২৯ বোমারু টোকিওর উপর আগুনে বোমা নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং টোকিও শহরের ১৬ বর্গমাইল এলাকা ধরিয়া যেন 'লন্ডাহন' পর্ব অমুষ্ঠিত হইল। শহরের প্রকাণ্ড অংশ একেবারে জলিয়া গেল। ২ লক্ষ ১৭ হাজার গৃহ দগ্ধ হইল। প্রায় ১ লক্ষ ৮৫ হাজার অ-সামরিক লোক হতাহত হইল এবং অন্তান্ত্র শহরও অল্পরূপভাবে অক্রান্ত হইল। ১০ দিনে ১০ হাজার টন আগুনে বোমা নিক্ষেপ হইল, ফলে আগুনে বোমার ঠিক ফুরাইয়া গেল।

টোকিওর এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর জনগণের নৈতিক শক্তি ভাঙিয়া গেল এবং ৮৫ লক্ষ নরনারী শহর ছাড়িয়া গ্রামের অভ্যন্তরে পলাইয়া গেল। ৬০০ ব্রহ্ম যুদ্ধোত্তের কারখানা ধ্বংস হইয়া গেল। ফলে, জাপানের শ্রমশিল্পের উৎপাদন শতকরা ৬০-৭০ থেকে ৮০ ভাগের অধিক পর্বন্ত কমিয়া গেল। এই অবস্থার একমাত্র যুদ্ধোদ্ভাদ ছাড়া আর সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, আত্মসমর্পণ ছাড়া জাপানের আর রক্ষা পাওয়ার উপায় নাই। (১০)

(২) লীডেল হার্ট, পৃষ্ঠা ৬৮৬

(১০) লীডেল হার্ট, পৃষ্ঠা ৬২০-২১

মধ্য প্রশান্ত মহাসমুদ্রে জাপানের বিরুদ্ধে যখন দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরের এই সমস্ত যুদ্ধ অন্তর্ভুক্ত হইতেছিল, তখনও এ্যাটম বোমার ব্রহ্মাণ্ড আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং আইও জিমা ও ওকিনাওয়া দ্বীপ দখলের অভিজ্ঞতায় (এপ্রিল-মে-জুন, ১৯৪৫) প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান উপলব্ধি করিলেন যে, জাপানের যত কাছে অগ্রসর হওয়া যাইবে, জাপানীদের বাধাদানের ভীষণতাও তত বৃদ্ধি পাইবে। যদিও এই সমস্ত দ্বীপ থেকে জাপানের উপর সরাসরি আক্রমণ চালানো যাইবে, কিন্তু অত্যধিক প্রাণের মূল্য দিতে হইবে। কারণ প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের মতে তখনও জাপানী দ্বীপ, মাকুরিমা এবং উত্তর চীনে জাপানীদের ৪০ লক্ষের বেশী সৈন্য ছিল। এছাড়া খাস জাপানের শেষ আত্মরক্ষার জন্য 'জাতীয় বেচ্ছাসেবক বাহিনী' গঠিত হইবে। সুতরাং ট্রুম্যান অনুভব করিলেন যে, মার্কিন সৈন্তেরা প্রশান্ত মহাসমুদ্রের পথে যতই জাপানের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, ততই লক্ষ লক্ষ আমেরিকান সৈন্তের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার যুদ্ধে যোগদানের প্রস্তাব জরুরী হইয়া উঠিতেছিল। মার্কিন সেনানীমণ্ডলীরও এই মত। ট্রুম্যান লিখিয়াছেন :

'There was no way for us to get troops into China to drive the Japanese from the Chinese mainland. Our hope always was to get enough Russian troops into Manchuria to push the Japanese out. That was the only way it could be done at this time.'

অর্থাৎ 'চীনের অভ্যন্তরে সৈন্য পাঠাইয়া চীনের মূল ভূমি থেকে জাপানীদেরকে বিভাড়নের কোন উপায় আমাদের হাতে ছিল না। সুতরাং আমাদের সর্বদাই আশা ছিল মাকুরিমাতে প্রচুর পরিমাণ কশসৈন্য পাঠাইয়া জাপানীদেরকে বহিষ্কার করা হইবে। এই সময় একমাত্র এই পন্থা অনুসরণ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।' (১১)

কিন্তু জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য গ্রহণ ছাড়াও আমেরিকার পক্ষে আর একটা উদ্বেগের প্রশ্ন ছিল কুওমিনটাং বা জাতীয়তাবাদী চীনেব নায়ক জেনারেল চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির বিরোধ ও সংঘাত। ট্রুম্যান তাঁর স্বত্বিকথায় বলিয়াছেন যে, যুদ্ধ চলাকালীন সমগ্র সময়টিতেই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল জাপানের বিরুদ্ধে চীনের জনগণের ঐক্য রক্ষা করা। ২০শে মে চীনের মার্কিন রাষ্ট্রদূত হারলি (Hurley) প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানকে জানাইলেন যে, আমেরিকানদের চেষ্টার ফলে চিয়াং কাইশেক গবর্নমেন্ট সশস্ত্র কমিউনিষ্ট পার্টিকে একটা রাজনৈতিক পার্টি হিসেবে স্বীকার করিয়া নিয়াছেন এবং একজন চীনা কমিউনিষ্টকে জাতীয় গবর্নমেন্টের প্রতিনিধিত্বপূর্ণ স্থানক্যামিসকোতে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং কমিউনিষ্ট পার্টিও এই নিয়োগ মানিয়া লইয়া জাতীয় গবর্নমেন্টকে স্বীকার করিয়াছেন।

ট্রুম্যানের মতে চীনের জাতীয় গবর্নমেন্ট ও কমিউনিষ্ট পার্টির বিরোধে মার্কিন সরকার দুটি নীতিকে প্রাধান্য দিয়াছিলেন :

(১১) ট্রুম্যানের স্বত্বিকথা (ইং), প্রথমখণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪০

(১) যে গৃহযুদ্ধ একেবারে আগুন বলিয়া মনে হইতেছিল, সেটা এড়ানো।

(২) জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য কমিউনিষ্ট ও সোশ্যাল গবর্নমেন্টের সৈন্যবাহিনীদিগকে একজন অধিনায়কের অধীনে একীভূত করা।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে ট্রুম্যান উপলব্ধি করিলেন যে, চীন ও রাশিয়ার মধ্যে আলোচনার ফলাফলের উপরই জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যোগদান অনেকটা নির্ভর করিতেছে। সুতরাং চীন সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ টি ডি স্বেঙ্ক ৩০শে জুন, ১৯৪৫, ম.স্বাভে উপস্থিত হইলেন স্ট্যালিনের সঙ্গে আলোচনার জন্য।

কিন্তু মস্কোতে চীনা প্রতিনিধি স্বেঙ্ক এবং স্ট্যালিনের মধ্যে এই সমস্ত আলোচনা ছিল গতানুগতিক মাত্র কিংবা বাহ্যতঃ চিয়াং কাইসেকের গবর্নমেন্টের প্রতি মর্যাদা দেখাইবার জন্য। কারণ, জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়া কর্তৃক যুদ্ধে যোগদানের শর্ত স্বরূপ ইয়ান্টাতে রুজভেল্ট ও স্ট্যালিনের মধ্যে (এই বৈঠকে চার্চিল বা চিয়াং কাইসেকের কোন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না। এই সম্পর্কে এবং ইয়ান্টার প্রস্তাবিত চুক্তি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা ১৪ম পর্বের ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) যে সমস্ত কথাবার্তা পাকা হইয়াছিল, সেগুলি চূড়ান্তে জেনারেল চিয়াং কাইসেককে জানাইয়া দেওয়া এবং তাঁর সম্মতি 'আদায়' করাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। যদিও মস্কোতে মাঞ্চুরিয়ার উপর কুওমিনট্যাং সরকারের সার্বভৌম অধিকার, বহির্মংগোলিয়ার স্বাধীনতা, ডাইয়েন বন্দর ও পোর্ট আর্থার নৌবাড়ি এবং চাইনিজ রেলপথ ইত্যাদি নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছিল, তথাপি চিয়াং কাইসেকের পক্ষে স্ট্যালিনের এই সমস্ত প্রস্তাব না মানিয়া উপায় ছিল না। কেন না, পরলোকগত প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আগেই এগুলি সমর্থন করিয়াছিলেন এবং এক্ষণে নুতন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানও জানাইয়াছিলেন যে, মার্কিন গবর্নমেন্টের পক্ষ থেকে তিনিও ইয়ান্টা প্রস্তাবগুলি সমর্থন করিতেছেন এবং তিনি আশা করিতেছেন যে, চিয়াং কাইসেকও এগুলি গ্রহণ করিবেন। অপর পক্ষে ট্রুম্যানের এক তারের জবাবে প্রধান মন্ত্রী চার্চিলও জানাইয়াছিলেন যে, তিনিও প্রস্তাবগুলি সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিতেছেন এবং প্রস্তাবগুলিকে স্বাগত জানাইতেছেন। (১২)

সুতরাং মিত্রশক্তির তিন প্রধান যে সমস্ত প্রস্তাব ও রাশিয়ার দাবী সমর্থন করিতেছেন, চিয়াং কাইসেক সেগুলি অগ্রাহ্য করিবেন কোন ভরসা? অবশ্য জুলাই মাসে মস্কোতে স্ট্যালিনের সঙ্গে টি ডি স্বেঙ্কের আলোচনার কিছুটা 'দর কবাকষির' মনোভাব দেখা গিয়াছিল। এটা অবশ্য অস্বাভাবিক ছিল না। কেন না, চিয়াং কাইসেক এবং ট্রুম্যান উভয়েই মনে মনে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরোধী ছিলেন এবং চিয়াং কাইসেক চাহিতেছিলেন রাশিয়া যেন চীনা কমিউনিষ্ট পার্টিকে কোন সাহায্য না দেন! অবশ্য স্ট্যালিনও চিয়াং কাইসেককে চীনের একায়ত্বকারী এবং মাত্র শক্তিরূপে স্বীকার করিয়া নিয়াছিলেন এবং জানাইয়াছিলেন যে, চীনের বিরুদ্ধে তাঁর কোন ভূমিগত দাবী নাই। চীনে আমেরিকার 'খালি দরজার' নীতিও ('ওপেন ডোর পলিসি') তিনি সমর্থন করিয়াছিলেন এবং কোরিয়ার জন্য চীন, বৃটেন,

(১২) পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৩০০-৩০১

বিষয় (৩)—১১

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়া—এই চতুঃশক্তির ট্রাষ্টিশিপ (অছিগিরি) গঠনের প্রস্তাবও নীতি হিসাবে মানিয়া লইয়াছিলেন। (১৩)

কিন্তু পরবর্তী কালে আমেরিকা কর্তৃক আইও জিমা ও ওকিনাওয়া দখল এবং এ্যাটম্ বোমা তৈয়ারির পর অনেক মার্কিন সেনাপতি ও রাজনীতিবিদ কন্জভেন্ট ও ই্যালিন চুক্তির সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, জাপানের পরাজয়ের জন্য রাশিয়ার সাহায্যের কোন প্রয়োজন ছিল না। মার্কিন নৌ ও বিমান শক্তির প্রচণ্ড আক্রমণে জাপান আগেই কাবু হইয়া পড়িয়াছিল।

---

(১৩) পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ২০০



## দশম পর্ব

### পঞ্চম অধ্যায়

এ্যাটম্ বোমা—হিরোশিমা ও নাগাসাকি

অবশেষে মানুষের সর্বকালের ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অস্ত্রের আবিষ্কার হইল। পৃথিবীতে এক নতুন যুগ—পারমাণবিক বা অ্যাটমিক যুগের স্বাক্ষর পড়িল। কিন্তু ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট হিরোশিমার (জাপান) বিরুদ্ধে এই নতুনতম দানবিক অস্ত্র প্রয়োগের দ্বারা অপারিসীম বর্ষভতা ও হিংস্রতার মধ্যে এই পারমাণবিক যুগের বোধন হইল এবং সারা পৃথিবীর চিন্তাশীল ও বিবেকবান মানুষ বিশ্ববে ও ত্রাসে হতভম্ব হইয়া গেল। এমন কি, বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের অবসান সংবাদও এই দানবিক শক্তির ক্রুরতার মধ্যে ঢালা পড়িয়া গেল। একজন মার্কিন ঐতিহাসিকই মন্তব্য করিয়াছেন—

'The incredible blasts of atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki knocked Japan out of the conflict. So great was the shock among all humanity that even the end of the global war became secondary news,' (১)

কিন্তু পারমাণবিক বোমার আবিষ্কার ও নির্মাণের পিছনে রহিয়াছে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মৌলিক শক্তির গোপন রহস্যের উদ্ঘাটন দ্বারা জন্ম পৃথিবীর নানা দেশের খ্যাতিনামা বিজ্ঞানীরা যুগের পর যুগ ধরিয়া গবেষণা করিয়া আসিয়াছেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁদের অভাবনীয় কৃতিত্বের ফলে যে ব্রহ্মাস্ত্র তৈরী হইল, তার ভয়াবহ মারমূর্তি দেখিয়া বিজ্ঞানীরা নিজেরাই হতবাক ও স্তম্ভিত হইলেন। এ যেন আরব্য উপস্তাসের সেই বোতল থেকে দৈত্যের আবির্ভাবের মত এক অবিশ্বাস্য গল্প। বিজ্ঞানীরা পারমাণবিক শক্তির রহস্য সন্ধান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অজস্র মানুষের মৃত্যু ও হত্যার দ্বারা বিজ্ঞানের পবিত্র মন্দিরকে কলুষিত করিতে চাহেন নাই। অধিকাংশ বিজ্ঞানীই চাহিয়াছিলেন 'মত্যের অহুসন্ধান'। কিন্তু সেই অহুসন্ধানের ফল যে, এভাবে মিলিটারি চক্রের হাতে গিয়া পড়িবে এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্বজুগসী প্রলয়ঙ্কর অস্ত্রে পরিণত হইবে, তার জন্ম অনেকেই প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু মহাযুদ্ধের কুটনীতি ও রণনীতির জটিল চক্রে এমন এক অবস্থার উদ্ভব হইল যে, বোতলের যুগ থেকে নির্গত দৈত্যকে আর বোতলের মধ্যে কিরাইয়া নেওয়া সম্ভব হইল না। বরং সেই থেকে আজ (১৯৭৭ সাল) পর্যন্ত সেই দৈত্যের শক্তি লক্ষণে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং মানুষের জগৎ জীবন-মৃত্যুর এক চরম সঙ্কটক্ষেপে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। \* যে পরমাণু বা atom শব্দটি ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাস থেকে সারা দুনিয়ার শিক্ত সমাজে এত প্রচার লাভ করিয়াছে, তার

(১) লুই রাইডার, পৃষ্ঠা ৫৯২

\* ১৯৭০ সালের আগস্ট মাসে জার্মান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত মারশাল প্রিভিযোগিতা (দি আর্দস রেস্) সংক্রান্ত একটি পুস্তিকার দেখানো হইয়াছে কিভাবে পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণে এই প্রিভিযোগিতা আজ সমগ্র মহত্ত্ব জাতির অস্তিত্বকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। একটি প্রামাণ্য রিপোর্ট উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে :

উৎপত্তি কিন্তু গ্রীক 'atoms' শব্দ থেকে, যার অর্থ অবিভাজ্য বা indivisible—একত্র দীর্ঘকাল পর্যন্ত পরমাণু বা অ্যাটম অবিভাজ্য বলিয়া বিশ্বাস ছিল। কিন্তু উনিবিংশ শতকের শেষভাগে করাচী বিজ্ঞানীরা ইউরেনিয়াম ও রেডিয়াম নিয়া গবেষণা করিতে গিয়া যে ডেজেন্ডারতার সন্ধান পাইলেন, তার ফলশ্রুতি পরমাণুর অবিভাজ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিয়াছিল এবং সেই সন্দেহ ক্রমে দূরীভূত হইল বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে বহু নামকরা বিজ্ঞানীর গবেষণার ফলে। প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হিসাবেই হোক কিংবা সমরাত্মক দিক থেকেই হোক অ্যাটমিক বোমার মত এমন যান্ত্রিক উদ্ভাবন অল্প মাহুবেই ইতিহাসে ইতিপূর্বে আর কখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। এতদিন পর্যন্ত বুদ্ধিবৃত্তি বা রণকৌশল মাহুয় রাসায়নিক শক্তি ('কেমিক্যাল পাওয়ার') থেকে আরম্ভ হইয়া, বিশ্বের ক্রিয়া এবং জালানী ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তির বিভাজন থেকে যে এমন প্রলয়ঙ্কর ধ্বংসকর কাণ্ড ঘটানো যাইতে পারে, এমন কল্পনা আগে মাহুবেই ছিল না। ১৯১১ সালে স্বনামখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী (নিউজিল্যান্ডের অধিবাসী) লর্ড রাদারফোর্ড পরমাণুর গঠন প্রকিয়া আবিষ্কার করিলেন। ১৯১৯ সালে তিনি অ্যাটমকে ভাঙ্গিবার পদ্ধতিও বাহির করিলেন এবং ১৯৩২ সালে অল্পতম খ্যাতিনামা ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জেমস্ চ্যাডউইক (James Chadwick) নিউট্রন বা পরমাণু পিণ্ডীভূত অংশ আবিষ্কার করিলেন।...

বিজ্ঞানের এই নতুন গবেষণা বিজ্ঞানী এবং সামরিক উভয় মহলেই প্রভূত কৌতূহলের উদ্ভেক করিল। পারমাণবিক বোমা সংক্রান্ত একটি বিশ্ববিখ্যাত পুস্তকের গোড়াতেই লর্ড রাদারফোর্ড সম্পর্কে নিম্নলিখিত গল্পটি উল্লেখ করা হইয়াছে :

"It is said that during the last year of the First World War Ernest Rutherford, already famous for his work on atomic research, failed to attend a meeting of the British Committee of experts appointed to advise on new systems of defence against enemy Submarines. When he was censured for his absence, the vigorous New Zealander retorted without embarrassment: 'Talk softly, please. I have been engaged in experiments which suggest that the atom can be artificially disintegrated. If it is true, it is of far greater importance than a war.'"

"In the United States alone, the explosive power of stockpiles exceeds that of 600,000 Hiroshima bombs. These reserves are more than enough to annihilate the present world population twelve times over." (Weltgewerkschaftsbewegung, Berlin 9/1975, p. 6)

একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যদি এই প্রকার পারমাণবিক ধ্বংসকর শক্তি থাকিয়া থাকে, তবে সোভিয়েত রাশিয়ার পৃথিবীর মোট পাঁচটি পারমাণবিক রাষ্ট্রশক্তি, প্রলয়ঙ্কর শক্তি কোথায় গিয়া পৌঁছিয়াছে তা কল্পনা করাও কঠিন।

এর ভাবার্থ—“শুনা যায় প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ বছরে শত্রু সাবমেরিনের উৎপাত থেকে প্রতিরক্ষার নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে পরামর্শ দেওয়ার জন্য বিশেষজ্ঞদের একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল। এই কমিটিতে উপস্থিত থাকিবার জন্য আর্নেস্ট রাডারফোর্ডকে আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছিল। তিনি ইতিপূর্বেই তাঁর পারমাণবিক গবেষণার জন্য প্রভূত খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সভায় তিনি সময় মত উপস্থিত না হওয়ার যখন তাঁকে ভৎসনা করা হইয়াছিল, তখন সেই বলিষ্টমনা বিজ্ঞানী বিন্দুমাত্র সঙ্কোচবোধ না করিয়া তুড়ু করে জবাব দিলেন : ‘আমি এমন একটা গবেষণা নিয়া ব্যস্ত ছিলাম, যাতে প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, পরমাণুকে কৃত্রিমভাবে বিভীর্ণ বা বিভাজন করা সম্ভব। যদি এটা সভা হয়, তবে, আপনাদের দুই একটা যুদ্ধে চেয়েও এই ব্যাপারটা অনেক, অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ হইবে!’—(২)

ত্রিশের দশকে এই গবেষণা নানা দেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যে যে প্রেরণা জোগাইল তারই ফলে শেষ পর্যন্ত ১৯৩৮ সালে বার্লিনের ক’ইজার উইলহেলম ইনষ্টিটিউটের একদল জার্মান বিজ্ঞানী প্রথম হাতে-কলমে পরমাণু বিভাজন (split the atom) ঘটাইলেন। এই ঘটনার ফলে আমেরিকানদের মনে ভয় ঢুকিল যে, মহাযুদ্ধে যথেষ্ট জার্মানরা পরমাণু বোমা তৈয়ার করিয়া ফেলিবে। তখন থেকে আন্তর্জাতিক জগতে এ্যাটম্ বোমা তৈয়ারির প্রতিযোগিতা শুরু হইয়া গেল—যদিও গোড়ার দিকে আমেরিকানরা পারমাণবিক বোমাকে অজ্ঞানতাবী গল্প বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞান জগতের ঋষিভূলা সাধক বসুবিখ্যাত আলবার্ট আইনষ্টাইন ১৯৩৯ সালের ২রা আগস্ট প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডিল্লোভেটের নিকট যে ঐতিহাসিক চিঠি লিখিয়াছিলেন (এবং যে চিঠির জন্য তিনি পরবর্তীকালে অহুতাপ করিয়াছিলেন) তার ফলেই কিন্তু এ্যাটম্ বোমা তৈয়ারির ব্যাপারটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গুরুত্ব লাভ করে। সেই ঐতিহাসিক চিঠিটা নিম্নরূপ :

‘In the course of the last four months it has been made probable through the work of Joliot in France, as well as (Enrico) Fermi and (Leo) Szilard in America, that it may become possible to set up a nuclear chain reaction in a large mass of uranium, by which vast amounts of power and large quantities of new radium-like elements would be generated. Now it appears this could be achieved in the immediate future.

‘This new phenomenon would also lead to the construction of bombs, and it is conceivable, though much less certain—that extremely powerful bombs—of a new type may thus be constructed. A single bomb of this type, carried by boat and exploded in a

(২) Brighter than a Thousand Suns—Robert Tungk, Pelican book, 1970, P. 15.

port, might very well destroy the whole port, together with some of the surrounding territory...' (৩)

অত্যন্ত শক্তিশালী এবং উচ্চ ধ্বংসকর ক্ষমতাসহ পারমাণবিক বোমা যে, অনতিদূর ভবিষ্যতেই নির্মাণ করা সম্ভব, আইনষ্টাইন তাঁর চিঠিতে সে কথা স্পষ্ট করিয়া বলিলেন। অবশ্য বুটেনে, ফ্রান্সে জার্মানীতে, ইতালীতে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বনামধন্যত পদার্থ বিজ্ঞানীগণ ইতিপূর্বেই পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কে গভীরভাবে গবেষণা ও অনুসন্ধান শুরু করিয়াছিলেন। কার্যতঃ এই সমস্ত বিজ্ঞানীদের মধ্যে যেন একটা প্রতিযোগিতাও শুরু হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আইনষ্টাইনের চিঠি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে বোমা তৈয়ারিতে উৎসাহাশিত করিয়া তুলিল। রুজভেল্ট তাঁর জীবিত কালে এই বোমা দেখিয়া যাঁহাতে পারেন নান। কিন্তু উদ্ভোগ তিনি নিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে নতুন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তাঁর আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, 'সম্পূর্ণরূপে সামরিক কারণেই এই বোমা তৈয়ার করিতে হইয়াছিল।' কিন্তু রুজভেল্ট বোমা তৈয়ারির প্রেরণা পাইয়াছিলেন আইনষ্টাইনের কাছ থেকে। ট্রুম্যানের ভাষায়—

'The idea of the atomic bomb had been suggested to President Roosevelt by the famous and brilliant Dr. Albert Einstein, and its development turned out to be a vast undertaking. It was the achievement of the combined efforts of science, industry, labour and the military, and it had no parallel in history. The man in charge and their staffs worked under extremely high pressure, and the whole enormous task required the services of more than one hundred thousand men and immense quantities of material. It required over two and a half years and necessitated the expenditure of two and a half billions of dollars'. (৪)

এর মর্ম এই যে, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের নিকট পরমাণু বোমা নির্মাণের এই প্রস্তাব দিয়াছিলেন সুবিখ্যাত এবং প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিক ডঃ আলবার্ট আইনষ্টাইন। কিন্তু এ বিকাশ সাধনে বিশাল এক সংগঠনের প্রয়োজন হইয়াছিল। বিজ্ঞান, অশিল্প (কলকারখানা), শ্রমিকমণী এবং মিলিটারি সকলের সম্মিলিত চেষ্টার ফলে এই অসাধ্য সাধন সম্ভব হইয়াছিল এবং ইতিহাসে এর কোন ছুঁড়ি ছিল না। তারপ্রাপ্ত কর্ণচারা এবং তাদের ঠাককে কর্তব্যবতম উচ্চ চাপের মধ্যে কাজ করিতে হইয়াছিল। এই বিরাট দায়িত্ব পালন করিতে গিয়া লক্ষাধিক লোকের যেমন কর্বে আত্মনিয়োগ করিতে হইয়াছিল, তেমনি অল্প পরিমাণ ত্রব্যাদিরও প্রয়োজন হইয়াছিল। এই বোমা নির্মাণে আড়াই বছরের বেশী সময় লাগিয়াছিল এবং খরচ পড়িয়াছিল ২৫০ কোটি ডলার।

(৩) লুই ব্রাইডার—পৃষ্ঠা ৫২৪

(৪) Memories by Harry S. Truman, Signet book, Vol. 1, 1965, p. 460.

ঐতিহাসিক লাইডার ও বলিয়াছেন যে, এই ধরনের বিরাট কাজের কোন নজির ইতিহাসে নাই। বড় বড় কলকারখানা তৈয়ার করিতে প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার কর্মীর প্রয়োজন হইয়াছিল এবং সেগুলি ‘অপারেট’ করিতে দরকার হইয়াছিল অন্ততঃ ৬৫ হাজার লোকের। অথচ অত্যন্ত সঙ্কোপনে কম্পার্টমেন্টে ভাগ ভাগ করিয়া প্রত্যেকটি কর্মীকে এমন ভাবে কাজ করিতে দেওয়া হইয়াছিল, যেন অপর কোন কর্মী টের না পায় এবং তার নিজের পক্ষেও বতুটুকু না জানিলে নয়, তার চেয়ে বেশী তাকে জানিতে দেওয়া হইত না। মহাযুদ্ধের এটা ছিল সবচেয়ে গোপনতম কাজ। সুতরাং হিরোশিমায় প্রথম বোমা বর্ষণের সংবাদ যখন প্রকাশিত হইল, তখন এই সমস্ত কর্মীরা বিশ্বয়ে হতবাক হইয়া গিয়াছিলেন এবং ওক রিজ অফিসের একজন সংবাদপত্র বিক্রেতা একটি স্থানীয় ধব্বের কাগজের ১৬০০ কপির প্রত্যেকটি এক ডলার ( বর্তমান বিনিময় হার অনুসারে সাড়ে ৮ টাকা ) মূল্যে ৩৫ মিনিটের মধ্যে বিক্রী করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কারণ, এই সমস্ত কর্মী জানিতেন না যে, তারাই এতদিন ধরিয়া এই বোমা প্রস্তুত করিতেছিলেন !

এই গোপনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়া ট্রুম্যান ও লিথিয়াছেন যে, হাজার হাজার লোকের মধ্যে খুব মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোকই জানিতেন এই সমস্ত কলকারখানায় কি কাজ চলিতেছে। এমন কড়াকড়ি গোপনীয়তা অবলম্বন করা হইয়াছিল যে, ওয়াশিংটনের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদেরও অনেকের বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না যে, কলকারখানাগুলিতে কি কাজ চলিতেছে। এমন কি, প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে ট্রুম্যানও জানিতেন না। তবে, ১৯৩৯ সালের আগে সাধারণতঃ বিজ্ঞানীমণ্ডলে এই তথ্য জানা ছিল যে, তত্ত্বগত ভাবে পরমাণু থেকে শক্তি নির্গত করা সম্ভব। সেই সময় বুটেনে যুদ্ধের পক্ষে প্রয়োজনীয় যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যের অন্বেষণ চলিতেছিল, ১৯৪০ সালে আমেরিকানরাও সেগুলির সঙ্গে একত্র হাত মিনাইলেন—বাঁদ ও আমেরিকা তখন যুদ্ধরত ছিল না।

কিন্তু জার্মানী যে একটা গোপন অস্ত্রের সন্ধানে আছে, এই শুভব তখন মিত্রপক্ষীয় মহলে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ১৯৪২ সালে স্তনা গেল যে, জার্মানী পারমাণবিক শক্তি যুদ্ধের অস্ত্র হিসাবে কাজে লাগাইবার চেষ্টায় আছে। আমেরিকানদের তখন বিশ্বাস হইল যে, জার্মানী যে নূতনতম ডি—১ এবং ডি—২ রকেট ছুড়িতেছে, সেগুলিকে পারমাণবিক শক্তির দ্বারা সজ্জিত করা হইবে এবং এই সমস্ত অস্ত্রের দ্বারা জার্মানী বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখিতেছে। কিন্তু সেই স্বপ্ন তাদের বুঝা গেল, তারা তেমন কোন অস্ত্র আবিষ্কার করিতে পারিল না। মিত্রপক্ষের কপাল ভালো যে, হিটলার তেমন কোন ব্রহ্মাস্ত্রের সন্ধান পাইলেন না। কিন্তু যে সমস্ত জার্মান বিজ্ঞানী পারমাণবিক গবেষণায় লিপ্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই হিটলারের পক্ষপাতী ছিলেন না এবং তাঁদের মনে মনে এমন ইচ্ছা ছিল না যে, হিটলার এই ভয়ঙ্কর শক্তির অধিকারী হোক। বিশেষতঃ ন্যাৎসী পার্টির জাতিবিশেষ ও ইহুদী বিবেকের লজ্জা অনেক নাশ করা বিজ্ঞানী ইংলণ্ড ও আমেরিকার পলাইয়া গেলেন। স্বয়ং আইনস্টাইন আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাসিত হইয়াছিলেন। তারপর ক্যাসিট ইতালীর স্থাবিথ্যাড বিজ্ঞানী এনারিকে

ফের্মি (Fermi) এবং অধিকৃত ডেনহার্ক থেকে স্বনামপ্রসিদ্ধ নীলস্ বোরের প্রভৃতি আমেরিকার বা ইংলণ্ডে পলায়ন করিয়াছিলেন। অথচ এরা তিন জনই ছিলেন পরমাণু বিজ্ঞান বিশারদ এবং অ্যাটম্ বোমা নির্মাণে এদের সাহায্য ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু হিটলার অধিকাংশ বিজ্ঞানীর সাহায্য ও সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হইলেন। তথাপি মিত্রপক্ষ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। জার্মানী কর্তৃক অ্যাটম্ বোমা নির্মাণের বা গবেষণার সম্ভাব্য স্থানগুলিতে বৃটশ ও নরওয়েজান বিমান-ক্রমাগত একত্রে দুঃসাহসিক হানা দিতে লাগিলেন। ১৯৪২-৪৩ সালে: শীতকালে অধিকৃত নরওয়েজি জার্মানীর ‘ভারী জলের’ (heavy water) ক’রখানার হানা দিলেন এবং নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে সেই কারখানা ধ্বংস করিয়া দিলেন। কেন না, অ্যাটম্ বোমা নির্মাণে ‘ভারী জল’ ছিল একটা মূল্যবান উপাদান। আব তা ছাড়া পরমাণু বোমা তৈয়ারির মত উপযুক্ত সম্পদ এবং আবুয্যিক বিরাট ব্যবস্থাও তখন নাৎসী জার্মানীর ছিল না।...

উইলিয়াম শাইবার লিখিয়াছেন যে, জার্মানীর পারমাণবিক বোমার পরিকল্পনা সম্পর্কে লন্ডন ও ওয়াশিংটন অত্যন্ত চুপ্চিস্তাগ্রস্ত ছিল। কিন্তু এই ব্যাপারে ‘হিটলারের তেমন কোন বিশেষ আগ্রহ না থাকায়’ এই পরিকল্পনার কোন অগ্রগতি ঘটিল না। অধিকন্তু গেষ্টাপো পুলিশের প্রধান হিমলার জার্মানীর পরমাণু বিজ্ঞানীদেরকে স্বদেশের প্রতি অতুরন্ত দায়বলিয়া সন্দেহ করিতেন এবং তাঁদেরকে গ্রেপ্তার করিলেন। ফলে, ১৯৪৪ সাল শেষ হওয়ার আগেই মার্কিন ও বৃটশ গবর্নমেন্ট জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন যে, জার্মানী এবারের যুদ্ধে অ্যাটম্ বোমার সন্ধান পাইবে না। পশ্চিম ইউরোপে জেনারেল আইজেনহাওয়ারের আক্রমণ ও অগ্রগতির পর অধ্যাপক সায়ুয়েল গাউডস্মিট (Goudsmit) এক গোয়েন্দা মিশনসহ জার্মানীর পারমাণবিক গবেষণা সম্পর্কে অনুসন্ধানও করিয়াছিলেন।—(৫)

এই অনুসন্ধানের ফলে এমন প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল যে, জার্মান বিজ্ঞানীদের মধ্যে ক্ষুদ্র একদল পারমাণবিক অস্ত্র আবিষ্কারের চেষ্টার ছিলেন। কিন্তু ১৯৪৪ সালে মিত্রপক্ষের ক্রমাগত বোমাবর্ষণ ও জার্মানীর ক্রমাগত পরাজয়ের ফলে সেই সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়।

\*

\*

\*

অসম্ভব গোপনীয়তার মধ্যে পরমাণু বোমা তৈয়ারীর চেষ্টা হইতেছিল বটে, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সময় সচিব ষ্টিমসন এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী ব্যারনেনস্ (Byrnes) তাঁদের পদাধিকার বলেই এই পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং ট্রুম্যান প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হওয়ার কিছুকাল পরেই তাঁরা তাঁকে জানাইলেন যে, এমন এক ব্রহ্মাস্ত্র তৈয়ারী হইতেছে, যেটা সকল হইলে আমেরিকা যুদ্ধের পর এমন ক্ষমতার অধিকারী হইবে যে, সে ইচ্ছামত অপরকে ডিস্টেট করিতে পারিবে।

কিন্তু অ্যাটম্ বোমা পরীক্ষার একমাস আগেও মার্কিন রণনেতাগণ জাপানকে খুব

(৫) দি রাইজ অ্যাণ্ড ফল অব দি বার্ড রাইজ—পৃষ্ঠা ১৩০৬

ক্রম ধরাশায়ী কর সম্পর্কে আশাবিত ছিলেন না। বরং তাঁরা এই মর্মে এক পরিকল্পনা স্থির করিয়াছিলেন যে, জেনারেল ওয়াশটার জুপারের নেতৃত্বে মার্কিন বঠ আর্বি ১৯৪৫ সালের শেষ ভাগে শাস জাপানের দক্ষিণতম অংশে কিয়ুহু (Kyushu) দ্বীপে প্রথম অবতরণ করিবে। এর চারমাস পর টোকিওর নিকটবর্তী এলাকায় ক্যান্টো সমতল ভূমিতে দ্বিতীয় আক্রমণ ঘটবে এবং ১৯৪৬ সালের শেষ ভাগে জাপান নতশির হইবে—অবশ্য তার আগেও জাপান কার হইতে পারে তার বিমান ও নৌ শক্তির পতনের জন্য। কিন্তু জেনারেল মার্শাল অনুমান করিলেন যে, এই সমস্ত অভিযানের ফলে ৫ লক্ষ আমেরিকানের প্রাণ যাইতে পারে।

সুতরাং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ও মার্কিন প্রাণহানি এড়াইবার জন্য ১৯৪২ সাল থেকেই (যখন জার্মানী উড়ন্ত বারকেট বোম্ব ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে নিক্ষেপ করিয়াছিল) মিত্র পক্ষ যেন পারমাণবিক শক্তির গবেষণার জন্য দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু করিলেন, যার নাম দওয়া যাইতে পারে 'ল্যাবরেটোরির যুদ্ধ'। এই যুদ্ধ আগেই বৃটিশ বিজ্ঞানীর শুরু করিয়াছিলেন। কিন্তু বুটেন জার্মানীর আক্রমণের পাল্লায় মধ্যে ছিল বলিয়া গবেষণা কেন্দ্রগুলি নিরাপদ ছিল না। সুতরাং রুডল্ফ ও চার্লিস কিংবা মার্কিন ও বৃটিশ বিজ্ঞানীরা পরস্পরের সহিত হাত মিলাইলেন এবং দূরবর্তী আমেরিকার নিরাপদ ও নিভৃত কেন্দ্রে গবেষণাগার ও কারখানাগুলি প্রতিষ্ঠিত হইল।

ইতিমধ্যে জার্মানীর পতন ঘটিল বটে, কিন্তু দূরবর্তী প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলিতে অত্যন্ত তিক্ত ও তীব্র যুদ্ধে মার্কিন সৈন্যদের প্রাণবলি হইতে লাগিল। সুতরাং সমস্ত শক্তি ও সম্পদ নিয়োগ করিয়া পারমাণবিক বোমা তৈয়ারির চেষ্টা আরম্ভ হইল। সমর বিভাগে আমি ইঞ্জিনিয়ারদের একটা বিশেষ শাখার উপর এই বোমা তৈয়ারির দায়িত্ব দেওয়া হইল। এভাবেই সুবিখ্যাত 'ম্যানহাটান প্রজেক্ট' এর জন্ম হইল, যার ভারপ্রাপ্ত হইলেন মেজর-জেনারেল লেসলি আর গ্রোভ্‌স। অবশ্য বলাই বাহুল্য যে, ল্যাবরেটোরিতে আসল গবেষণার কাজ করিতেছিলেন বৃটিশ ও মার্কিন বিজ্ঞানীগণ একত্রে। তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ হইল পৃথিবী-বিখ্যাত আর একটি নাম—কালিকোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য পরমাণু বিজ্ঞানী ডঃ জে রবার্ট ওপেনহাইমার (Oppenheimer)—তিনিই পরবর্তীকালে এ্যাটম্ বোমার জন্মদাতা কিংবা জনকরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। কারণ এই বোমা তৈয়ারিতে তাঁর অবদান সবচেয়ে বেশী ছিল। তিনি একাধারে বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, প্রেমিক, সংস্কৃতজ্ঞ এবং কৃতী অধ্যাপক ও দক্ষ সংগঠক ছিলেন। আর পরিভ্রম ক্ষমতাও ছিল তাঁর অসাধারণ। সুতরাং তাঁর গুণগ্রাহী ও ভক্তের সংখ্যা ছিল অকল্প্য। নিউ মেক্সিকোর মরুভূমিতে লস্‌ অ্যালামোস (Los Alamos) নামক স্থানে মূল সংগঠন গড়িয়া তোলা হইল। এছাড়া টেনাসি অঞ্চলের শুষ্ক এলাকা এবং ওয়াশিংটন থেকে ১৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমের একটি বিচ্ছিন্ন এলাকায় রিচল্যান্ড শহরে দুইটি প্রকাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এ্যাটম্ বোমা নির্মাণের জন্য।

হারি ট্রুম্যান প্রেসিডেন্টের গরিবে আনোহনের পর এই সমস্ত তথ্য জানিতে পারিলেন এবং ষ্ট্রিমসন তাঁকে বলিলেন যে, আর চার মাসের মধ্যেই বোমা তৈয়ারি সম্পূর্ণ হইতে পারে। এই বোমার কলাকল কি হইতে পারে, সেই সম্পর্কে প্রেসিডেন্টকে

পরামর্শ দেওয়ার জন্য সময় সচিব ট্রিমসনের সভাপতিত্বে মার্কিন সরকারের ও সময় বিভাগের কয়েকজন শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিকে নিয়ে একটি 'ইন্সট্রুমেন্ট কমিটি' গঠিত হইল। এই কমিটিতে আমেরিকার তিনজন প্রখ্যাতনামা বিজ্ঞানী (যারা প্রকৃত দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন)—যেমন, ডঃ ভ্যানেভার ব্রশ, ডঃ কার্ল টি কম্পটন এবং ডঃ জেমস বি কোনাট সদস্যরূপে গৃহীত হইলেন।

এই কমিটিকে সাহায্য দেওয়ার জন্য বিজ্ঞানীদের আর একটি পৃথক গ্রুপ গঠিত হইল এবং পরমাণু বিজ্ঞানে তাঁরাও ছিলেন অসাধারণ খ্যাতি সম্পন্ন। এঁরা হইলেন ডঃ ওপেনহাইমার, ডঃ আর্থার এইচ কম্পটন, ডঃ ই ও লরেন্স এবং ডঃ এনার্কে ফের্মি যিনি ইতালী থেকে পলাইয়া আসিয়াছিলেন।—(৬)

ট্রুম্যান লিখিয়াছেন যে, এই দুইটি বিশেষজ্ঞ কমিটিই যথাশীঘ্র সম্ভব শত্রুর বিরুদ্ধে এই বোমা ব্যবহারের জন্য সুপ রিশ করিয়াছিলেন। কোন নির্জন স্থানে এই বোমা কাটাওয়া এর শক্তি প্রদর্শন করিলে শত্রু কারু হইবে বা যুদ্ধে ক্ষান্ত দিবে, এমন বিশ্বাস তাদের ছিল না। সুতরাং এর ধ্বংসক ক্ষমতা প্রমাণের জন্য পূর্বা হু কোন সতর্কতা ছাড়াই শত্রুর বিরুদ্ধে এর প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। ট্রুম্যান বলিতেছেন যে, তিনি এর অপরিমিত ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।

\* \* \*

১৬ই জুলাই, ১৯৪৫, আমেরিকার নিউ মেক্সিকোর মক্কুমিতে আলামগারদার নিকট বিশ্বের প্রথম অ্যাটম বোমার পরীক্ষা সফল হইল—ভূতীয় অধ্যায়ে পোসডাম সম্মেলনের দ্বিতীয় দফার আলোচনায় সে কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু মনুষ্য জাতির ইতিহাসে পারমাণবিক শক্তির এই আবির্ভাব ও বিস্তার এক অভাবনীয় যুগের সূচনা করিয়াছে। সুতরাং পরমাণু বোমার জয়লগ্নের অতি নাটকীয় কাহিনীর বর্ণনা একজন বিশিষ্ট বাঙালী বিজ্ঞানীর রচনা থেকে এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।\*

“বিশ্বের প্রথম পরমাণু বোমাটি কাটানো হইয়াছিল আমেরিকাতে। ১৯৪৫ সালের জুলাইয়ের এক নিশীথে আমেরিকার নিউ মেক্সিকোর এক বিজন প্রান্তরের একটি পরিত্যক্ত খামার বাড়ীর অভ্যন্তর গোপন আবহাওয়ার মধ্যে বিশ্বের প্রথম পরমাণু বোমাটিকে পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই করার জন্য জুড়ে তোলা হইছিল। সোমবার ১৬ জুলাই ১৯৪৫ সালের শেষ রাত্রিতে সেটিকে আলামগারদোর বিজন মক্কুমির বৃক্ষে কাটানো হয়। মক্কুমির মধ্যে বড়সড় পাথরের একটি টিলার উপর নিরেট লোহার ভৈরী একটি বক্স—ভাতেই বসানো—হয়েছে অ্যাটম বোমাটিকে—মঞ্চের সার্থকতক নাম ‘পয়েন্ট জিরো’। সেখান হতে মাইল দশেক দূরে স্থল নিয়ন্ত্রণ শিবির—সেখানে বিশেষ পোষাকে সজ্জিত, যুগ্ম এবং শরীরের অন্তান্ত উন্নত অংশে থকথকে ক্রিম লাগানো অবস্থায়, চোখে গাঢ় রঙের বিশেষ চশমা পরে বৈজ্ঞানিকের দল উপস্থিত।

(৬) ট্রুম্যানের আত্মস্মৃতি (ইং) পৃষ্ঠা ৪৩২

\* এই লেখকের নাম উক্তের দ্রব্য মার্জিত। ইনি পরার্থ বিজ্ঞানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ, ডি। স্পেকট্রোস্কপি সম্পর্কে এর উচ্চতর গবেষণা দেশে ও বিদেশে উচ্চ প্রশংসিত। তিনি একজন বিশেষজ্ঞ গবেষক এবং এর প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছিল বাংলা ১৩৬৩ সালের বৈশাখ সংখ্যার বিখ্যাত ‘উষোদন’ মাসিক পত্র।



হয়ে শুয়ে আছেন। দূরের যেকের দিকে সকলের দৃষ্টি—সকলের যেকের মধ্যে যা পড়ছে। অদ্ভুত এক আশা-নিরাশার দ্বালায় সবাই ছলছেন। সারারাত্রি ধবে প্রভাতি পর্ব চলেছে - চরম মুহূর্তের জন্ত।

“মাইকে ঘোষকের গলা শোনা যাচ্ছে—চার-ভিন-দুই—তারপর লাল কমলা সবুজ নীল বেগুনী আলোকের সে কি অবর্ণনীয় বলকানির সঙ্গে কানের পর্দা কাটানো আঁতি দীর্ঘস্থায়ী অমাহুযিক এক শব্দনহরী আয়েরগিরির লাভার মত গলিত যুক্তিকা পাথর আর খাতব খনিজের রূপালি গলিত স্রোত তথা উজ্জল রক্তবর্ণের ধূমায়িত ভস্মবাশি ব্যাঙের ছাতার স্বাকারে উপবের দিকে উঠে চলেছে ধীরে ধীরে। এক সময় সেই ব্যাঙের ছাতার উচ্চতা দাঁড়লো সাত মাইলেরও বেশী। এত সব কিছু যেন মুহূর্তের মধ্যেই ঘটে গেল—অনেকেই পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের প্রথম বলকানিটা দেখতেই পেল না—তবে দূরে পাহাড়ের গায়ে ঠিকরে পড়া উজ্জল আলোর ছটা যা চোখে পড়ল—চিরকালের মত চোখের ছাতি ছিনিয়ে নিতে সে আলোই যথেষ্ট। উত্তেজনায় অনেকেই চোখের চশমা খুলে একবার খালি চোখে সেই “দ্বিব্য” আলোক দেখতে চাইলেন—সঙ্গে সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্ত অন্ধ হয়ে রইলেন। হায় নিয়তি! এতগুলি বছর ধরে পরমাণু বোমার যে দ্বিব্য আলোক বলকানি প্রত্যক্ষ করার জন্ত তাঁরা সবসঙ্গে অপেক্ষা করছেন—আজ তাঁরা এই চরম মুহূর্তের বিশেষ ক্ষণটিতে এসেও সেই দ্বিব্য ছাতি দেখতে পেলেন না।

“পরমাণু বোমার পিতা—ওপেনহাইমার নিয়ন্ত্রণ-কক্ষের একটি জানালায় পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর নবজাতকের অস্তিত্বের ক্রন্দন এবং তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার ক্ষণটিকে অভ্যস্ত মনোবেগ সহকারে লক্ষ্য করছিলেন—অন্ধকার রাজির বুক চিরে হঠাৎ বলসে উঠলো আলো—তীব্র আলোক ছটার উদ্ভাবিত হয়ে উঠল তাঁর চোখমুখ—হয়ত হৃদয়ও। ওপেনহাইমারের হৃদয় আজ বিহ্বল—শান্ত কণ্ঠে তিনি আবৃত্তি করছেন—

দ্বিব্য সূর্যসহস্রস্ত ভবেদ্ যুগপদুখিতা।

যদি ভাঃ সদৃশী সা স্তাদ্ ভাসন্তস্ত মহায়ন্ ॥—১১।২

—যদি কখনও স্বাক্ষরে এক সঙ্গে সহস্র সূর্যের প্রভা উদ্ভিত হয়, তাহলে সেই দীপ্তি পরমাণুর প্রভার কিঞ্চিৎ তুলনাব্যোগ্য হলেও হতে পারে।

“বাতাসে বাকদের গন্ধ—মৃত্যুর গন্ধ চারদিকে। মৃত্যুর এই চরম ক্ষমতাধর ব্রহ্মাণ্ডটি তৈরী হয়েছে তাঁর হাত দিয়েই। পরমাণু বোমার ভয়াবহতার ওপেনহাইমারের হৃদয় অস্থির—তিনি সাক্ষ্যনা খুঁজছেন। কিন্তু তাঁর জন্ত কি সাক্ষ্যনাই বা আছে! ওপেনহাইমার হয়ত শ্রীকৃষ্ণের কাছে তাঁর শেষ সাক্ষ্যনা চাইছেন—বিড় বিড় করে তিনি পুনরায় আবৃত্তি করলেন গীতার একাংশ অধ্যায়ের আর একটি শ্লোক :

শ্রীভগবানুবাচ—

কলোহ্মি লোকক্করক্কং প্রবুদ্ধো

লোকান্ সমাহতু’মিহ প্রবৃত্তঃ।

ঋতেহপি ত্বা ন ভবিষ্যতি সৰ্বে  
যেহবস্বিতাঃ প্রত্যনীকেষু বাধাঃ ॥

—আমি লোকক্ষয়কারী প্রবু-কাল, বর্তমানে লোকসংহার করতে প্রবৃত্ত হয়েছি। তুমি যুদ্ধ না করলেও বিপক্ষ দলে যে বীরগণ আছেন, তাঁরা কেউ আর বেঁচে থাকবেন না।

ওপেনহাইমার একটু আশস্ত হইলেন—তিনি তাহলে উপলক্ষ মাত্র, একাজ তিনি না করলে ভগবান অস্ত্র কারকে দ্বিগে করাতেন !”

\*

\*

\*

“দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে; হিটলারের ক্যাসীবাদী জার্মানী আত্মসমর্পণ করেছে—জাপান আত্মসমর্পণ করার মুখে। এমন সময় হঠাৎ ১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট সকাল ৮:১৫ মিনিটে জাপানের কয়েক লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ করলেন সমগ্র আকাশ জুড়ে তীব্র নীল-বেগুনী আলোর অতি উজ্জ্বল ঝলক, আর সেই সঙ্গে শুনলেন কান-বধির হওয়া একটান! প্রচণ্ড শব্দ লহরী—বিশ্বের দ্বিতীয় পরমাণু বোমাটির বিস্ফোৰণ ঘটানো হলে হিরোশিমা। তার কয়েকদিন বাদে তৃতীয়টিও অনুরূপ আলোক এবং শব্দেব বজ্রার মধ্যে প্রকটিত হলো নাগাসাকিতে। জাপানের মাথার উপরে অতি উজ্জ্বল রক্তবর্ণ দন বাষ্পের ব্যাঙের ছাতা গজিয়ে উঠলো। প্রায় চার মাইল উঁচু হয়ে এই অদ্ভুত এবং বিকটদর্শন ব্যাঙের ছাতা (Mushroom cloud from Atomic Explosion) পরমাণু বোমার প্রতীকরূপে আজ চিহ্নিত। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দু’লক্ষ মানুষ মারা গেলেন—প্রায় দশ লক্ষ মানুষ হলেন বীভৎস রকমের বিকলাঙ্গ। চারিদিকে শুধু আগুন আর আগুন। হাজার হাজার মানুষ দিশেহারা হয়ে ছুটছুটি করছে—সেই ব্যাপক অগ্নিকণ্ড হতে বের হবার আশায়। তাদের কেউ কেউ মুহূর্তের মধ্যে সাত-আট ফুট লম্বা হয়ে যাচ্ছেন, আবার কান্নর দেহ ছমড়ে মুচড়ে এঁএবারে ছোট হয়ে যাচ্ছে। কান্নর চোখ দুটি ঠেলে বেরিয়ে আসছে, কান্নর গায়ের চামড়া উঠে গিয়ে লোল হয়ে গায়েরই ঝুলছে। কাছাকাছি পাখাডুলো দাঁড় দাঁড় করে জলছে—মহাসাগরের বুকে লেগেছে প্রচণ্ড ধাক্কা আর তার উদ্ভাল জল হয়ে পড়েছে উদ্ভল। ক্রন্দন আর আর্তনাদে সোদিনের সেই ভয়ঙ্কর শারদপ্রভাত মুগ্ধরিত হয়ে উঠেছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষের অশ্রুতে যা চিরসিক্ত, তাদের মর্মান্বিত বেদনার যা ভারাক্রান্ত—এমন কোন কল্প দৃশ্যের বর্ণনা করা সহজ সাধ্য নয়।

শীক ওয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব যে হয়েছিল, তার কিছুটা হয়তো বোঝা যাবে যারা সোদিন ঐ অবস্থার মধ্যেও বঁচে গিয়েছিলেন তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে। তাঁদের ক’জনের মুখ হতে শোনা যাক সোদিনের বর্ণনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাকোশ ইতো সোদিন ছিলেন একজন স্কুলের বিদ্যার্থী। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—‘একসর ইতো, কি দেখেছিলেন আপনি, মনে আছে কিছ?’

একটুখানি ভেবে নিয়ে অধ্যাপক বললেন—মনে না থাকার কিছু নেই স্পষ্টই মনে আছে সব কিছু। আগুন জলছে, বৌদিকে ডাকানো বার-শু আগুন।

সেই অগ্নিকুণ্ডের ভিতর হতে বেরিয়ে আসা যে সে কি প্রাণাঙ্কুর প্রচেষ্টা! বোমার আঘাতে গলে গিয়ে সব কিছু জেলি হয়ে গেছে। একটা আন্ডার গ্রিনিস—বিবাস করুন প্রথম দিকে কিন্তু কোন সোরগোল ছিল না। কিন্তু কয়েক মিনিট বাদে—উঠল এক তুফান আতনাদ—যে চিংকারের কোন তুলনাই হয় না।’

“একজন শ্রমিক বললেন—‘রাত্রে এবং সকালে একটি কারখানায় কাজ করি। কারখানায় সকালের ভোঁ বেজে গেছে। হঠাৎ বেঙুনি আলোক ঝলক দেখে সবাই চমকে উঠলাম। যেখানটিতে বোমাটি বিস্ফোরিত হলো, তার ভিন মাইলের মধ্যেই ছিল আমার কারখানা।’ ছুটে গেলাম কারখানার গেটের দিকে—কিন্তু গেটের কাছে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই বাতাসের ঝটকা এসে আমার সামনের সব কিছু ভূমিসাৎ করে দিল। কয়েক শত শ্রমিক কারখানার বাড়ীর নীচে চাপা পড়ে প্রাণ হারালো—দেয়াল ধসে পড়লো, আর তা সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত এক ধরনের ছাই হয়ে উড়ে গেল। ঝড় বইছে তখন সাইক্লোনের মত। দূরে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে রক্তবর্ণ লেলিহান অগ্নিশিখা। ওদিকে শহরের মধ্য হতে রক্তবর্ণ বাষ্পপুঞ্জ পৃথিবী হতে সোজা আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। তার দিকে তাকায় কার সাধ্য!’

“ঠিক তখন পরমাণু বোমার স্রষ্টারা কি করছিলেন, কি ভাবছিলেন? সেদিন তাঁদের মাথার উপরের আকাশ অর্থাৎ অবশ্যই নিরাপদ ছিল, কোন ভেলকিইর ভয়ংগী তো তাঁদের মাথার ঝরে পড়ছিল না। সুতরাং হয়তো ধরে নেওয়া হবে সেদিন তাঁরা ছিলেন একেবারেই নিশ্চিন্ত অথবা এই মহান সৃষ্টির উল্লাসে কিঞ্চিৎ বিশেষহার। কিন্তু—না, তাঁরা সেদিন কোন বিজয় উল্লাসে কেটে পড়েন নি। বিশ্বের বিজ্ঞানীকুল সর্বদা ভেবেছেন—আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতি তাঁরা একি বেইমানি করে কেমন—তঁরা দিক্কার তাঁদের অন্তর জর্জরিত করছিল—তিত মূর্তে। পদার্থ-বিজ্ঞানের স্রষ্টা মনোবী—বিজ্ঞানী সমাজের ‘পোপ’ মহান আইনষ্টাইন তখন আমেরিকার প্রিন্সটনে। ‘সেক্টার অব এ্যাডভান্সড্ টাডিজি’ গবেষণায় রত শ্রান্য যার পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের দিনটিতে তিনি বেদনায় নির্বাক নিম্পন্দ হয়ে কপালের শিরা চেপে ধরে বসেছিলেন নির্জনে একাকী। সেদিনটিকে বলা যায় আইনষ্টাইনের ‘ক্লক দিবস’—পরমাণু গবেষণার প্রথম দিকেই তিনি সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন—‘পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ভাঙ্গন ঘটিয়ে মালুকের কতটা মদল করা সম্ভব, তা আগে হতে চিন্তা করা গেলেও—এর দ্বারা যে মালুকের কত অকল্যাণ হতে পারে, তা চিন্তাও করা যায় না।’

“আনবার্ট আইনষ্টাইনের ‘ক্লক দিবসের’ কথা সত্য হোক আর নাই হোক—তবু একটা কথা আমরা কল্পনা করে নিতে পারি, সেদিন তাঁর হয়তো মনে হয়েছিল তাঁরই আবিষ্কৃত পদার্থ বিস্তার সেই বিশেষ সূত্রটির কথা—তাঁর সেই সুবিদিত ‘শক্তি-ভর—সমীকরণের’ কথা, যাতে বলা হয়েছে পদার্থের মধ্যে যে বিপুল শক্তি সঞ্চিত আছে, তার পরিমাণ পদার্থের ভরের সঙ্গে আলোকের গতির বর্গগুণ করলে যত হয় তার সমান। এ সূত্রের এমন ভয়ঙ্কর সমর্থন গবেষণাগারে অথবা বিমূর্ত শূন্যে না ঘটিয়ে ঘটানো হলো হিরোশিমা এবং নাগাসাকির নিত্যন্ত করুণ এক মানবিক পরিবেশের মধ্যে—হয়তো এই বিবাদেরটাই তাঁকে দিক্কার জানাচ্ছিল বেশী করে এবং সেটাই আমাদের কাছে তাঁর ‘ক্লক দিবস’। তাঁর দুখে ও হতাশার হয়তো আর একটি

কারণও ছিল—তা হল তাঁর প্রেসিডেন্ট কুজভেন্টসকে লেখা সেই ঐতিহাসিক চিঠি; যাতে তিনি প্রেসিডেন্টকে পরমাণু বোমা নৈরী করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন।\*

“নিউক্লিয়ার তথা পরমাণু পদার্থ বিজ্ঞান কোন একক মহান বৈজ্ঞানিকের মানসপুঞ্জ নয়। অনেক বিখ্যাত বিজ্ঞানীর নাম করা যেতে পারে, যারা এই বিজ্ঞানের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। বিশ্বের প্রায় সকল জাতির লোক এর উন্নতির জন্য কাজ করেছেন। লবার নাম করতে গেলে একটা ‘Who’s Who’ ধরনের বই হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তবু—মহান আইনস্টাইন এবং পরমাণু বোমার পিতা রবার্ট ওপেনহাইমার ছাড়াও নিজেদের কীর্তিতে যারা দুঃখবোধ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বিখ্যাত বিজ্ঞানীর নাম উল্লেখ না করে পারা যায় না—এরা পরমাণু পদার্থ বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সকলেই প্রায় সমান বিখ্যাত :

ব্রুটনের পল অ্যাড্রিয়ন মরিস ডিরাক, লর্ড র‍্যাডক্লেফ, স্যার জেমস চ্যাডউইক, ডেনহার্কেইর নেলস হেনরিক বোর, তাঁর ছেলে অ্যাগে বোর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কার্ল অ্যাণ্ডারসন, হানসবেথে, গ্রীন সীবার্গ, ইভা নোডাক, অ্যালিসন, রিচার্ড ফাইনম্যান, জন নিউম্যান, রোসেনবার্গ, আর্থার হোলি কম্পটন, আর্নেস্ট অরল্যাণ্ডো লরেন্স, হইলার, হ্যারল্ড উরে; জার্মানীর আটো হান, ফ্রাইটজ ট্রানম্যান, অটো ক্রিশ, ওয়ারনার হাইসেনবার্গ; ইতালীর এনারিকো ফের্মি, এমিলিও সের্গে; হাঙ্গেরীর লিও সেলার্ড, ইউগেনী ভিগনার, এডওয়ার্ড টেলর, রাশিয়ার পিটার কাপিৎজা, লেভ সেগুভ কুর্চাতভ, সাখারভ, তামম, চেরেনকভ, স্পেনের আলভারেজ, অস্ট্রিয়ার এরউইন শ্রুডিনবার্গ, উলফগাং পাউলি, কুমারী লিজা মাইটনার; ভারতবর্ষের সত্যেন্দ্রনাথ বসু; ফ্রান্সের জঁ ব্রয়েগলী, জুলিয়েট কুরী সম্পতি; জাপানের হিদাকী ইউকোওয়া, জোলিওনিশানা; হল্যান্ডের ভন-দ্য-গ্রাফাক; মেক্সিকোর ভল্ভার্তা প্রতুভিকী’র্তমানবিখ্য-বিখ্যাত বিজ্ঞানীর দল। এইসব শান্তিকামী বিজ্ঞানীদের মধ্যে যারা সমগ্র আমেরিকার সময় ধপ্পরে পেটগাণের সময় বিশারদদের হাতে এই ব্রহ্মাণ্ডটি তুলে দিয়েছিলেন, তাঁরা সোঁদন যা কিছু করেছিলেন, তা দেশের স্বার্থে, আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে নেশার এবং সর্বোপরি পরমাণু বোমার ব্যাপারটি সম্পর্কে যথেষ্ট অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে। পরমাণু বোমার মর্যাস্তক তাৎপর্য কিছুটা উপলব্ধি করে তাঁরা প্রায় সবাই নিজেদের কীর্তির ভয়াবহতায় আতর্জন করে উঠেছিলেন। আর সেই পরমাণু বোমার পিতা, বিচক্ষণ প্রশাসক, স্বচ্ছ কবি, দার্শনিক, বহু ভাবাবিধ, গীতা বিশারদ এবং সর্বোপরি প্রথম বুদ্ধিমান পদার্থ-বিজ্ঞানী রবার্ট ওপেনহাইমার, যার সুযোগ্য নেতৃত্বে পাওয়া গেল সর্বকালের অজুতম জ্যেষ্ঠ এই মরণাঙ্কটি, সেই ওপেনহাইমারও সোঁদন ক্ষুণ্ণমনে ভাবছিলেন লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষকে নিহত আর পঙ্ক করে নগরকে নগর উড়িয়ে দিয়ে মাইলের পর মাইল শত শ্রমল উর্বর ভূমিক্ষেত্রকে বহু করে কি লাভ হলো? এর কি সম্ভাব্য কোন প্রয়োজন ছিল? বিজ্ঞান কি শুধুই অজুত আর যুত্মর হাহাকারের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেবে এখন হতে? দুঃখ হয়েছিল হয়তো ওপেন-

\* এই অধ্যায়ের গোড়ার দিকে সেই ঐতিহাসিক চিঠির উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য।

হাইমারেরই সবচেয়ে বেশী। কারণ, নাসী ওয়া হিটলার বিরোধীরা তাঁকে দিয়েই এই চরম বিরোধ ভারাক্রান্ত অধ্যায়টি রচনা করিয়েছিল।”

পারমাণবিক বোমা পরীক্ষার এই নবযুগ পর্বকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্মরণ করা হইয়াছিল ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৯৭০ সালের ১৬ই জুলাই তারিখ। সেদিন ওয়াশিংটন থেকে নিম্নলিখিত ইংরাজী রিপোর্টটি কলকাতার সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হইয়াছিল :

Washington, July 16--The atomic age began at exactly 5-30 in Alamogordo, New Mexico, 25 years ago.

To-day the USA recalls the event in sombre terms. Dr. J. Rober Oppenheimer, one of the authors of the nuclear bomb project conceived the events in the words of the Bhagvat Gita :

‘If the radiance of a thousand suns  
Were to burst at once in to the sky  
That would be like the splendour of the one...  
I am become death,  
That shatterer of worlds.’

The New York Times reported the bursting of the first bomb in these unforgettable words written by William L. Laurence who witnessed the burst of the atomic age.

‘Just at that instant there rose from the bowels of the earth a light not of this world, the light of many suns in one. It was a sunrise such as the world had never seen, a great, green super sun climbing in a fraction of a second to a height of more than 8000 feet, rising even higher until it touched the clouds, lighting up the earth and the sky all around with a dazzling luminosity.

‘It went, a great ball of fire about a mile in diameter, changing colours as it kept shooting upwards, from deep purple to orange, expanding growing bigger, rising as it was expanding, as an elemental force freed from its bonds after being chained for billions of years.

‘For a fleeting instant the colour was unearthly green, such as one sees only in the corona of the sun during a total eclipse. It was as though the earth had opened and the sky had split.

\* দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হলো। সুপরিচিত লেখক পারমাণবিক বোমাংক্রান্ত প্রামাণিক গ্রন্থসমূহের (যেমন Brighter than Thousand Suns by Jungk, R.) রেকার্ডের দ্বারা রচনাটিকে সম্বল করেছেন। এই বোমার জটিল টেকনিক্যাল দিক সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনা ‘উষোখন’ মাসিকের দ্ব্যৈষ্ঠ সংখ্যায় (১৯৬১ সাল) প্রকাশিত হয়েছিল।

“One felt as though he had been privileged to witness the birth of the world—to be present at the moment of creation when the Lord said : Let there be light.,”

(স্টেটসম্যান, কলিকাতা,  
১৭ই জুলাই, ১৯৭০)

পারমাণবিক যুগারম্ভেব ‘রক্তজয়ন্তী’ (!) উল্লেখ বিখ্যাত নার্সিং পত্রিকা ‘নিউইয়র্ক টাইমস’ এর এই রিপোর্টের বিশদ বাংলা অনুবাদ দেওয়া সম্ভবতঃ অনাবশ্যক। কেন না, বোমা বিস্ফোরণের আসল প্রতিক্রিয়াগুলির বর্ণনা আগেই দেওয়া হইয়াছে। তবে, প্রত্যক্ষদর্শী একটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলিয়াছেন—তারা যেন পৃথিবীর প্রথম জন্ম এবং আলোকের প্রথম আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিলেন।

কিন্তু জাপানের বিরুদ্ধে অ্যাটম্ বোমা নিক্ষেপের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব কার উপর দৃষ্ট ছিল? ট্রুম্যান তাঁর স্বত্বিকথায় লিখিয়াছেন যে, সেই দায়িত্ব তাঁর উপরই দৃষ্ট ছিল।

“কখন এবং কোথায় পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করিতে হইবে, সেই সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার আমার উপরেই ছিল। এ বিষয়ে কাহাবও যেন কোন ভুল ধারণা না থাকে—‘Let there be no mistake about it’—আমি এই বোমাকে সাময়িক অস্ত্র বলিয়াই মনে করিতাম এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। প্রেসিডেন্টের শীর্ষস্থানীয় সাময়িক উপদেষ্টাগণ এর ব্যবহার সুপারিশ করিয়াছিলেন এবং যখন আমি এই বিষয়ে চার্চিলের সঙ্গে কথা বলিয়াছিলাম, তখন তিনি নিঃসংশয় চিত্তে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, যদি এই বোমার দ্বারা যুদ্ধ শেষ করা যায়, তবে নিশ্চয়ই এর ব্যবহার কবিত্তে হইবে।” (৭)

চার্চিল যে এই বিষয়ে ট্রুম্যানের সঙ্গে একাত্ম এবং একমত হইবেন, সে কথা উল্লেখ করা বাহ্যিক মাত্র। ‘তিনিও তাঁর মহাযুদ্ধের গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, প্রশান্ত মহাসাগরের ওকিনাওয়া দ্বীপে ‘মাসুদাশিমা’ জাপানী সৈন্তদের ভয়াবহ বেপরোয়া লড়াই দেখিয়া তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছিলেন। কেননা, এভাবে জাপানকে জয় করিতে গেলে ১০ লক্ষ মার্কিন সৈন্ত এবং ৫ লক্ষ বৃটিশ সৈন্তের প্রাণ বাইতে পারে। এই অবস্থায় অ্যাটম্ বোমা আবিষ্কারের সংবাদে চার্চিল যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। কারণ, এই অতি-প্রাকৃত (super natural) অস্ত্র যুদ্ধও তাড়াতাড়ি শেষ করিবে এবং ‘বীর জাপানী সৈন্তগণ’ অল্প প্রাণক্ষয় বেকে রেহাই পাইবে। আর জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়ার কোন সহযোগিতা না সাহায্যও প্রয়োজন হইবে না। সুতরাং পরীকার আগেই ৪ঠা জুলাই তারিখ এই বোমা জাপানীদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য বৃটিশ পক্ষ নীতিগত ভাবে মত দিয়াছিলেন।

চার্চিল তাঁর বলিষ্ঠ ভাবায় অত্যন্ত জোরের সঙ্গে লিখিয়াছিলেন যে, ‘অ্যাটোমিক

বোমা জাপানের বিরুদ্ধে ব্যবহারের দ্বারা তাকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা হইবে কিনা, এটা আমাদের মধ্যে কখনও বিতর্কের বিষয় পর্বন্ত ছিল না। সকলেই এই প্রশ্নে স্বেচ্ছাকৃতভাবে ও স্বাভাবিকভাবেই সম্পূর্ণ একমত ছিলেন এবং আমাদের অল্প কিছু করা উচিত, এমন কোন সামান্ত্র্য প্রস্তাবও ‘আমি করার মুখে তিন নাই।’ (৮)

ইতিমধ্যে জাপানের পক্ষ থেকে মস্কোতে শান্তি স্থাপনের জন্য জাপানী রাজদূতের মারফত একটি বার্তা ট্যালিনের হাতে পৌঁছিয়াছিল বটে, কিন্তু তার মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ছিল না বলিয়া সেটা গ্রাহ্য হইল না। তবে, সেই বার্তায় একথা বলা হইয়াছিল যে, জাপান ‘নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের’ দাবী মানিয়া লইতে পারে না। তবে, অন্ত্যস্ত প্রশ্নে আপোষ মীমাংসা করিতে রাজী আছে। পটসডাম সম্মেলনের পূর্বাঙ্কে জাপানের সম্রাটের পক্ষ থেকে মস্কোতে এই বার্তাটি পৌঁছিয়াছিল এবং ট্যালিন সে কথা চার্লিসকে জানাইয়াছিলেন। চার্লিস এই বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের সঙ্গে যখন আলোচনা করিয়াছিলেন, তখন তিনি জাপান সম্পর্কে ‘নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের’ দাবী নিষা জেদ প্রকাশ করিতে রাজী ছিলেন না। তখন মার্কিন নেভারা পুনরায় বিষয়টি বিবেচনা করিলেন এবং জাপানকে আত্মসমর্পণের সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ‘জাপানী সৈন্তবাহিনীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ’ দাবী করিয়া ২৬শে জুলাই পটসডাম থেকে একটি চরমপত্র প্রচার করা হইল। (তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষ এই চরমপত্র অগ্রাহ্য করিলেন এবং ২৮শ জুলাই রেডিও টোকিও মিত্র শক্তির চরমপত্রের কোন জ্ঞান না দিয়া ঘোষণা করিল যে, জাপানী গবর্নমেন্ট যুদ্ধ চালাইয়া যাইবেন। তখন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান স্থির করিলেন যে, ৩রা আগস্টের পর জাপানের বিরুদ্ধে এ্যাটম্ বোমা প্রয়োগ করা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। ‘সামরিক প্রয়োজনে’ এবং ‘সৈন্তিকর ভ্রাস করার জগুই’ এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। মার্কিন সমর কর্তারা জাপানী সামরিক উৎপাদন কেন্দ্রের যত কাছাকাছি সম্ভব এই বোমা নিক্ষেপের সঙ্কল্প করিলেন এবং এজন্য পূর পূর চারটি শহরের নাম স্থির করা হইল, যথা—হিরোশিমা, কোকুরা, নাইগাটা এবং নাগাসাকি। রণনৈতিক বিমানবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল স্পাট্‌স (Spaatz) নিযুক্ত হইলেন লক্ষ্য বস্তুর উপর বোমা নিক্ষেপের ব্যবস্থা করার জন্য। আবহাওয়ার অবস্থা অনুসারে তারিখ নির্দেশের স্বাধীনতা তাঁকে দেওয়া হইল—তবে, ৩রা আগস্টের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। বোমাবাহী বিমান ছাড়া আর একটি পৃথক বিমানে সামরিক ও বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষকের দল কয়েক মাইল তফাতে থাকিয়া বোমাবর্ষণের কলাম্ব ও প্রতিফলনা পর্যবেক্ষণ করিবেন—এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হইল। কিন্তু সমর সচিব ও রাষ্ট্রপতির অহুমতি ছাড়া এই বোমা ব্যবহারের কোন সংবাদ প্রকাশ করা চলিলে না। সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরের ব্যারিয়ারা দ্বীপপুঞ্জের টিনিয়ান দ্বীপে জাহাজ ও প্লেনযোগে বোমার উপযুক্ত মালমশলা, পাইলট, লক্ষ্য ও বিশেষজ্ঞের দ্রুত সমাবেশ ঘটানো হইল। বি-২২ স্থপার কোর্টরেস জেঞ্জীর একটি বিশেষ ইউনিট এই উদ্দেশ্যে গঠিত হইল এবং তারা টিনিয়ান দ্বীপ থেকে আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হইল।

(৮) চার্লিস, বর্ষ ৭৩, পৃষ্ঠা ৫৫২-৫৫৩

বিবহা (৩)—১২

কর্নেল পল টিব্বেটস্ (Tibbets) নামক একজন তরুণ বৈজ্ঞানিক এই দুঃসাহসিক কার্য সম্পন্ন করার ভার পাইলেন এবং হিরোশিমার আকাশে বি-২০ জেটীর যে বিমানটি তিনি পাইলট হিসাবে পরিচালনা করিলেন, তার নামকরণ করা হইল ‘এনোলা গে’ (Enola Gay)। ‘এনোলা গে’র মাতা তিনজন আরোহী—কর্নেল টিব্বেটস্, নেভী ক্যাপ্টেন উইলিয়াম পারসন এবং মেজর টমাস ফেরেবী (Ferebee) আসল ব্যাপারটা জানিতেন, আর বাকী লঙ্ঘনের এই বোমা বিষয়ে কিছুই জানিতেন না। শুধু এইটুকুই জানিতেন যে, তাঁরা একটি গুরুতর ‘গোপনীয়’ সামরিক অভিযানে যাইতেছেন।...

এই আগস্ট (ইংরাজী মতে ৬ই) রাত্রি ২-৪৩ মিনিটের সময় ‘এনোলা গে’ সেই কালান্তক বোমাটি নিয়া টিনিয়ান দ্বীপ থেকে দীর্ঘ যাত্রায় বাহির হইল জাপানের দিকে। দুইটি পর্ববেক্ষক বিমান তাকে অনুসরণ করিল। এই বিমান দুইটিতে ছিল ব্যামেরা, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পর্ববেক্ষক দল। কিন্তু এই বিমানের উড্ডয়ন এবং উর্ধ্ব আকাশে আরোহণ বেশ বিপজ্জনক ছিল। কারণ, বোমাটি খুব ভারী ছিল এবং এর আগে তিনটি বি-২০ বিমান এখান থেকে উড়িতে গিয়া ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। আমেরিকার সর্ভাভ্যাক্রমে ‘এনোলা গে’ বিমান নিরাপদেই জাপানের দিকে উড়িয়া গেল এবং ভোর ৭ টার সময় (হিরোশিমা সময়) দক্ষিণ জাপানের দিকে মুখ করিল। জাপানী রাডার যন্ত্রে তা’ ধরা পড়িল এবং সমগ্র হিরোশিমা অঞ্চলে বিমান আক্রমণের সতর্কতাস্বরূপ সাইরেন বাজিয়া উঠিল। এর কিছুক্ষণ পরেই আবহাওয়া পর্ববেক্ষণকারী একটি মার্কিন বিমান হিরোশিমার আকাশের উপর উড়িয়া চলিয়া গেল। কোন বোমা বর্ষিত হইল না। সুতরাং যথারীতি সাইরেন ‘মোক্ক্ষিনি’ (অল ক্লিয়ার) বাজিয়া উঠিল এবং লোকেরা মনে করিল বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। অভাব হিরোশিমা শহরের লোকেরা (বাসিন্দার সংখ্যা ৩ লক্ষ ৪৩ হাজার) যথারীতি কলকারখানার ও অফিসের কাজকর্মে যোগ দিতে শুরু করিল এবং অনেক দুলের শিশুরাও রাস্তায় বাহির হইল।

৬ই আগস্ট, সোমবার, সকাল ৮টা—হিরোশিমার উর্ধ্ব আকাশে দুইটি প্লেন দেখা গেল। কিন্তু শহরের লোকেরা মনে করিল ৬ই দুইটি পর্ববেক্ষণকারী বিমান, বোমাক নয়। সুতরাং তারা কেউ নিরাপত্তার আশ্রয় গ্রহণ করিল না। ওদিকে ‘এনোলা গে’ বিমানের মধ্যে বোমাটি শহরের উপর নিক্ষেপ করার জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতি ঘটানো হইল—মার্কিন আবহাওয়া বিমান থেকে আবহাওয়া অহুতুল বলিয়া রিপোর্ট পাওয়া গেল। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ তখনই হিরোশিমার ‘ভাগ্য চূড়ান্তরূপে নির্ণীত’ হইয়া গেল। সুতরাং পাইলট কর্নেল টিব্বেটস্, বোমা নিক্ষেপকারী এবং নেভিগেটর ও রাডার অপারেটর ৩১, ৬০০ ফুট উপর থেকে বোমাটি নিক্ষেপের দায়িত্ব নিলেন। সকাল ৮টা ১১ মিনিটের সময় ‘এনোলা গে’ হিরোশিমার উপরে আসিয়া হাজির হইল এবং বোমাটি নীচে নিক্ষেপ হইল। (১)



এই কালান্তক বোমা হিরোশিমাতে কী নিদ রূপ এবং অবর্ণনীয় বিপর্যয় ঘটানো, তার কিছু বর্ণনা আগেই দেওয়া হইয়াছে। এবার ‘এনোলা গে’র পাইলট কর্নেল টিবেটের এবং অন্যান্য বৈমানিকের অভিজ্ঞতার বর্ণনা থেকে কিছুটা পুনরাবৃত্তি করা যাইতে পারে। বোমাটি মাটি স্পর্শ করার আগেই বিস্ফোরিত হইয়াছিল এবং ‘এনোলা গে’ সেই আঘাতের তরঙ্গ এড়াইবার ক্ষমতায় সিরিয়া গেল—পর্ব-বক্ষণকারী বিমান দুটিও নিরাপদ দূরত্বে ছিল। এই বোমা বর্ণনের কলাকল সম্পর্কে বিমান থেকে কটো গ্রহণ করা হইয়াছিল।

বোমাটি নিক্ষেপ হওয়ার পর হঠাৎ হিরোশিমা শহর যেন অতি ভীক, ভীক এবং চোখ ধাঁধানো উজ্জল স্বর্ষলোকে উদ্ভাসিত হইল, উঠিল :

“Suddenly a piercing, blinding light, as bright as the Sun, burst over the city. There was an instant of deadly silence. Then an earth-shaking shock thundered violently down over the centre of the city, crumbling everything in its range to rubble and dust.”

অর্থাৎ শহরটি আকস্মিক ভীক আলোকে উদ্ভাসিত হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুর নিশ্চয়তা সেখানে নামিয়া আসিল। তারপর শহরের কেন্দ্রস্থলে ভূমিকম্পের আলো-ডনের মত প্রচণ্ড আঘাত অহতুত হইল এবং তার পাল্লার মধ্যে যাহা কিছু ছিল, সমস্তই একেবারে ধ্বংস হইয়া শুঁড়া শুঁড়া হইয়া ধুলার ও আবর্জনার পরিণত হইল। (১০)

বিস্ফোরণের দ্বারা থেকে নানা রকমের আলো—নীল, কমলা, বেগুনী ও ধূসর রং বিচ্ছুরিত হইতেছিল। নীচের সেই ভয়াবহ দৃশ্য বর্ণনার অতীত ছিল। ‘এনোলা গে’র একজন বৈমানিক সেই দৃশ্য দেখিয়া ‘মাই গড’ বা ‘হা ঈশ্বর’ বলিয়া চৈতন্যহীন হইয়া উঠিয়াছিলেন।

ব্যাঙের ছাতার মত অদ্ভুত আকৃতি নিয়া নিবিড় ধূস্রজাল উর্ধ্বে আকাশের দিকে উঠিতেছিল। মাটি থেকে হাজার ফুট পর্বন্ত ধূলা ও বালির বুদ্ধিঝড় যেন বহির্ভূত ছিল এবং তারপর শহরের দিকে দিকে আগুন জ্বলিতে আরম্ভ করিল। ২৩ মিনিটের মধ্যেই সেই ভয়াবহ ধূস্রজাল ৪০ হাজার ফুট উর্ধ্বে উঠিয়া গেল।

হিরোশিমার উপর নিক্ষেপ এই বোমা ২০ হাজার টন টি-এন-টি বা বিস্ফোরকের সমান ছিল এবং এই দানবিক বোমা প্যারাসুট যোগে পাঁচ মাইল পর্বন্ত নামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করিবার আগেই কাটিয়া গিয়াছিল।

বোমা বিস্ফোরণের প্রচণ্ড ঝাপ্টায় বড় বড় গাছ ও টেলিকোনের ধাম বা পোলগুলি দাঁতন কাটির মত ভাঙিয়া চূরমার হইয়া গেল। বিভিন্ন অট্টালিকার লোহ বা ধাতু নিষিদ্ধ চাদর বা শীটগুলি ও রাস্তার মোটরগাড়ীগুলি যেন উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া উড়িয়া গেল। ধূলায় ও ধোঁয়ায় চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং হাউ হাউ করিয়া সর্বত্র আগুন জ্বলিতে লাগিল। হিরোশিমা শহর ধ্বংসস্তপে পরিণত হইল, অন্ততঃ শহরের ৬০ ভাগ অদৃশ্য হইয়া গেল। পাঁচটি বড় বড় রাস্তাসে কারখানা নিশ্চিহ্ন হইল এবং হাজার হাজার লোক জানিতেই পারিল না তারা কিভাবে মারা পড়িল। অন্ততঃ ঘটনাস্থলেই ৭৮ হাজার লোক সোজাশুঁক নিহত

হইল। ১০ হাজার লোক চিরকালের জন্য নিখোঁজ হইয়া গেল এবং প্রায় ৮০ হাজার আহত হইল। আরও হাজার হাজার কিংবা অসংখ্য লোক মারাত্মক গামা রশ্মির প্রতিক্রিয়ায় দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইল। শহরের চারদিকে ব্যাপক ‘অগ্নিবর্ষণ’ জন্ত বিদ্রোহ, বিমূঢ় ও ভ্রাস্রান্ত নরনারী চারদিকে ছুটছুটি করিতে লাগিল। কাহারও কাহারও দেহের চামড়া ধসিয়া ঝুলিয়া পড়িতে লাগিল। কাহারও বা চোখ ঠেলিয়া বাহিরে আসিতে লাগিল। অসহ্য যন্ত্রণায় লোকে পাগলের মত চীৎকার করিতে লাগিল। একপ্রকার ভীত গন্ধে বাতাস আচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং বহু লোক টলিতে টলিতে বসি করিয়া কেলিল। ৬০ হাজার অট্টালিকা ধ্বংস হইল। আর বাকী অল্প অট্টালিকা জ্বলম্বল হইল।

সোজা কথায় হিরোশিমার সেই নারকীয় বীভৎস ও বিপর্যয়কর দৃশ্যের কোন বিশদ বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু হিরোশিমার পরও জাপানী সামরিক হাইকমান্ড আত্মসমর্পণ না করায় তিন দিন পর বা ২ই আগষ্ট নাগাসাকিতে দ্বিতীয় পরমাণু বোমা বর্ষিত হইল। হিরোশিমার চেয়েও নাগাসাকির এই বোমা আরও উন্নত ধরনের ছিল এবং এর ধ্বংসকর ক্ষমতা আরও বেশী ছিল। শহরের অধিকাংশ কলকারখানা ও সামরিক দ্রব্য সরবরাহের কেন্দ্রসহ ৩ মাইল লম্বা ও ২ মাইল চওড়া এলাকায় একমাত্র ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছু রহিল না। নাগাসাকিও হিরোশিমার মতই শ্মশানে পরিণত হইল।...

কিন্তু শিল্প-প্রধান নাগাসাকি শহরে সকাল বেলা ১১টার পর (২ই আগষ্ট ১৯৪৫) যে বোমা বর্ষিত হইয়াছিল, তাতে ওই শহরের ২ লক্ষ ৬০ হাজার বাসিন্দার মধ্যে ১ লক্ষের কম লোক বিস্ফোরণের ঝাপ্টার মধ্যে পড়িয়াছিল। কারণ, শহরের অগ্ন্যস্ত্র অংশ প.হাডের দ্বারা ‘সুরক্ষিত’ ছিল। ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে আমেরিকান মেডিক্যাল মিশন ভদ্রস্তের পর ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, নাগাসাকিতে ৪০ হাজার মৃত ও ২৫ হাজার আহত হইয়াছিল।

হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে এই বর্বর এ্যাটম্ বোমা নিক্ষেপের ফলে অন্ততঃ ২ লক্ষ মানুষ নিহত হইয়াছিল, বহিঃ আমেরিকানরা হিরোশিমার মাত্র ৬৬ হাজার লোকের মৃত্যুর কথা স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু ২৫ বছর পর হিরোশিমা দিবস উপলক্ষে ১৯৭০ সালে জাপানীরা বলিয়াছিলেন যে, একমাত্র হিরোশিমাতেই দুই লক্ষ মানুষ মারা পড়িয়াছিল।

কিন্তু পারমাণবিক বোমা এমন অমাহুবিৎ ব্যাপার যে, সেই বোমা বর্ষণের ত্রিশ বছর পরেও জাপানের বহু লোক ভেজক্রিয়াজনিত কঠিন ব্যাধিতে হুঃসহ যন্ত্রণা ভুগিতেছিল।

[এই দানবিক কাণ্ডের ফলে হতাহত ও মৃত (ভেজক্রিয়াজনিত রোগে) এবং কতিপয় বাসগৃহ ও সম্পত্তি ইত্যাদি ধ্বংসের চূড়ান্ত হিসাব নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন। কেননা, এই সম্পর্কে নানা সময় অন্তঃসন্ধানের ফলে যে সমস্ত হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলির মধ্যে সংখ্যাগত গরমিল আছে। যেমন, ১৯৭৭ সালের জাভহারী হাসের

প্রথম সপ্তাহে 'অমৃত' সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত জাপানী বিজ্ঞানীদের নূতনতম তদন্তের যে ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে, তাতে দেখা যায় যে, হিরোশিমায় বিস্ফোরিত প্রথম পরমাণু বোমাটি ছিল ১,২৫.০০ টন টি-এন-টি'র সমতুল্য। সেই সময় হিরোশিমায় অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ৬০ হাজার এবং বোমা বিস্ফোরণের ক্ষত প্রাণ হারাইয়াছিল ১ লক্ষ ৪১ হাজার লোক, আহতদের মধ্যে ১০ হাজার মারা গিয়াছিল।

আর নাগাসাকিতে নিক্সপ্ত দ্বিতীয় পারমাণবিক বোমাটি ছিল ২২০০০ টন টি-এন-টি'র সমতুল্য। ২ই আগষ্ট তারিখ এই বোমাটি মাটি থেকে ৫০০ মিটার উচ্চতায় কাটানো হইয়াছিল। এর ফলে নাগাসাকিতে প্রাণ হারাইয়াছিল ৭০ হাজার লোক। জাপানী বিজ্ঞানীদের নূতনতম রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, হিরোশিমা ও নাগাসাকি দুই নগরের মোট অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ৭০ হাজার—১৯৪৫ সালের পরমাণু বোমার মারা গিয়াছিল এই দুই শহরের মোট ২,২০,০০০ মানুষ। কিন্তু পরবর্তী বছরগুলিতে মারা অকালে মারা গিয়াছিল, তাদের সংখ্যা যোগ দিলে দুইটি পারমাণবিক বোমার নিহতের সংখ্যা ২ লক্ষ ৫০ হাজারেরও বেশী দাঁড়াইবে।]

\*

\*

\*

কিন্তু ৬ই আগষ্ট, ১৯৪৫, এ্যাটম্ বোমা বর্ষণে হিরোশিমায় যখন নরকের সৃষ্টি হইয়াছিল, তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এবং ব্রুটেনের স্বনামধন্য উইন-স্টোন চার্চিল যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস কেলিয়া বাঁচিলেন।

ট্রুম্যান তখন পটসডাম সম্মেলন থেকে 'আগষ্ট' যুদ্ধতাহাজ যোগে ওয়াশিংটনে ফিরিবার পথে। চতুর্থ দিনে তিনি জাহাজে বসিয়া মার্কিন সমরসচিবের কাছ থেকে পৃথিবী কম্পনকারী এ্যাটম্ বোমা বর্ষণের সংবাদ পাইলেন।

এই সংবাদে ট্রুম্যান অভিভূত হইলেন এবং জাহাজের অভ্যন্তরেই পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্যারনেসকে (Byrnes) টেলিকোনযোগে খবর দিলেন। যে সমস্ত লঙ্ঘর তাঁর চারিদিকে ছিলেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে ট্রুম্যান বলিলেন :

'This is the greatest thing in history. It's time for us to get home'

'ইতিহাসের এটা সর্ববৃহৎ ব্যাপার। এখন আমাদের ঘরে ফেরার সময় এলো'।

তারপর জাহাজের রেডিও যোগে এই বোমাবর্ষণের আরও বিস্তৃত খবর পাওয়া গেল এবং ট্রুম্যান ভোজনকক্ষে সমবেত লঙ্ঘর ও অফিসারদের নিকট (তখন তাঁরা মধ্যাহ্ন ভোজন করিতেছিলেন) এবং পরে জাহাজের রিপোর্টারদের এক বৈঠকে সন্ত নিক্সপ্ত এ্যাটম্ বোমার ফলাফল ও গুণ-গুণ ব্যাখ্যা করিয়া এক বক্তৃতায় মন্তব্য করিলেন যে, ইতিহাসে বিজ্ঞানের সত্ত্ববদ্ধ চেষ্টায় এত বড় কাজ আর কখনও হয় নাই। যদি জাপান এর পরেও আত্মসমর্পণ না করে, তবে জাপান সংস হইয়া যাইবে। (১১)

চার্লিস লিখিয়াছেন যে, পটসডাম থেকে প্রচারিত চরমপত্র জাপান অগ্রাহ্য করিতেই হিরোশিমা ও নাগাসাকির উপর পরমাণু বোমা নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। এই বোমা বর্ষণের আগে নুপার কোর্টরেন্স জেনারী মার্কিন বোমাবাহিনী জাপানের শহরগুলির উপর নিদারুণ বোমাবর্ষণ চালাইতেছিল। কিন্তু প্রাণহানি হ্রাস করার উদ্দেশ্যে মিত্রপক্ষ ১১টি জাপানী শহরকে সতর্ক করিয়া দেওয়ার জন্য প্রতিদিন বিমান থেকে ১৫ লক্ষ ইস্তাহার এবং চরমপত্রের ৩০ লক্ষ কপি বিতরণ করিয়াছিলেন।

চার্লিসের দ্বারা আছে, সন্দেহ নাই! যিনি এ্যাটম্ বোমা পরীক্ষার আগেই জাপানের বিরুদ্ধে উহা ব্যবহারের জন্য টুয়ানের নিকট সম্মতি দিয়া রাখিয়াছিলেন এবং যে নৃশংসতার জয় তাঁর বিবেকে বিন্দুমাত্র ব্যাধা লাগে না, সেই ব্যক্তিই আবার জাপানীদের সতর্ক করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ ইস্তাহার বিলি করার জন্য যেন মানবিক করুণা বোধ করিতেছেন!

অথচ এ্যাটম্ বোমা বর্ষণের খবর পাওয়ার পর উইনস্টোন চার্লিস এই মর্মে এক বিবৃতি দিলেন যে, 'ঈশ্বরের অপরিণামী অমুগ্রহ' যে, জার্মানদের পরিবর্তে বৃটশ ও আমেরিকান বিজ্ঞানীরা পারমাণবিক শক্তির গোপন রহস্য আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন!

আর শুভিত জাপানী সংবাদপত্রসমূহ এই আক্রমণকে 'মানবিক, বর্বর ও পাশবিক' বলিয়া তীব্র বিদ্রোহ দিলেন এবং আমেরিকাকে মনুষ্যজাতি ও ন্যায়বিচারের হত্যাকারী বলিয়া নিন্দা করিলেন। আর টোকিও রেডিও ঘোষণা করিল:

'The impact of the bomb is so terrific that practically all living things, human and animals, literally were scared to death by the tremendous heat and pressure engendered by the blast. All the dead and injured were burned beyond recognition.... The effect of the bomb is widespread. Those outdoors burned to death, while those indoors were killed by the indescribable pressure and heat.' (১২)

অর্থাৎ সোজা কথায় হিরোশিমায় এই এ্যাটম্ বোমা বর্ষণের ফল এমন সাংঘাতিক হইয়াছিল যে, কার্যত: সমস্ত জীবন্ত বস্তু—পশু ও মানুষ সকলেই অতীতপূর্ব উত্তাপ ও চাপের জন্য মারা পড়িয়াছিল। নিহত এবং আহত সকলেই এমনভাবে পুড়িয়া গিয়াছিল যে, তাদেরকে আর চেনা যাইত না। এই বোমার ফল বহু দূর বিস্তৃত হইয়াছিল। যারা ঘরের বাইরে ছিল, তারা দগ্ধ হইয়া মারা গেল, আর যারা ঘরের ভিতরে ছিল, তারা অবর্ণনীয় চাপ ও উত্তাপের জন্য মারা পড়িল।...

হিরোশিমা ও নাগাসাকি উভয় শহরেই পারমাণবিক বোমার আঘাতে জনজীবন ও কলকারখানা স্তব্ধ হইয়া গেল। মৃতদেহের অপসারণ একটা কঠিন সমস্যা মত দেখা দিল। কেননা, সমস্ত কিছুই যেন একটা বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া গিয়াছিল। একমাত্র কংক্রিট এবং লৌহ ও ইস্পাতের ভৈরী বাড়ীগুলির কাঠামো

দাঁড়াইয়াছিল, আর সব ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। অনেক যুতধেহ রাস্তার পড়িয়াছিল এবং কোন কোন এলাকা যেন ভূতুড়ে ছায়ার আকার ধারণ করিয়াছিল। এ্যাটম্ বোমা রশ্মির প্রতিক্রিয়ায় এবং তেজস্ক্রিয়তার কলে অল্প লোক নানা প্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিল। রক্ত-পাইথানা, বমি, জ্বর, চুল উঠিয়া যাওয়া এবং দেহের অভ্যন্তরে রক্তক্ষরণের জন্ত বহু লোক ১ থেকে ৮ সপ্তাহের মধ্যে ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িতেছিল। আর একটা ভয়াবহ প্রতিক্রিয়াও উল্লেখযোগ্য। বিস্ফোরণের কলে বহু নারীর গর্ভপাত হইয়াছিল এবং অকালে সন্তান প্রসূত হইয়াছিল। অনেক স্ত্রী-পুরুষের প্রজননক্ষমতাও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। (১৩)

\*

\*

\*

কিন্তু ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে জাপানকে পরাজিত করার জন্ত সত্যই কি পারমাণবিক বোমা ব্যবহারের কোন প্রয়োজন ছিল? হিরোশিমার পর এই প্রশ্ন বিশেষভাবে বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছিল। ষায়া ট্রুম্যান ও চার্চিলের মত এ্যাটম্ বোমা বর্ষণের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁদের মতে এই বোমা নিক্ষেপের দ্বারা কেবল কয়েক লক্ষ আমেরিকান জীবনই রক্ষা পায় নি, জাপানীদের জীবনও রক্ষা পাইয়াছে। কারণ, যুদ্ধ অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি শেষ হইয়াছিল। কিন্তু সুবিখ্যাত মার্কিন গ্রন্থকার মি: ডি এক ক্রেমিং লিখিয়াছেন যে, পটসডাম সম্মেলন সম্পর্কে ২ই আগস্ট প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন, তাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, জাপানী সামরিক বাঁটি হিসাবে হিরোশিমার উপর পৃথিবীর প্রথম এ্যাটম্ বোমা নিক্ষেপ হইয়াছিল। জাপানকে সতর্ক ও সমঝাইয়া দেওয়ার জন্তই এই বোমা বর্ষিত হইয়াছিল। “এর পরেও যদি জাপান আত্মসমর্পণ না করে, তাহলে তার সামরিক কল-কারখানাগুলির উপর আরও বোমা বর্ষিত হইবে এবং দূর্ভাগ্যক্রমে তার কয়ে হাজার হাজার অসামরিক লোক মারা যাইবে।”

প্রকৃতপক্ষে হিরোশিমা দক্ষিণ জাপানের সামরিক বাঁটি হইয়া থাকিলেও এবং পারমাণবিক আক্রমণের সময় সেখানে কয়েক হাজার সৈন্ত থাকিয়া থাকিলেও সৈন্তদের উপর লক্ষ্য করিয়া কিন্তু বোমা বর্ষিত হয় নাই, নিহত হইয়াছিল অল্প অ-সামরিক লোক এবং এর উদ্দেশ্য ছিল ভয় দেখাইয়া জাপানকে যুদ্ধে ক্ষান্ত দিতে বাধ্য করা। ‘যুদ্ধের যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়া এবং হাজার হাজার মার্কিন যুবকের প্রাণ রক্ষা করাই’ ট্রুম্যানের উদ্দেশ্য ছিল এই বোমা নিক্ষেপের পিছনে।

অবশ্য সেই সময়ের মার্কিন জনমতও এই বোমাবর্ষণ সমর্থন করিতেছিল। কারণ, জাপানীরা বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক যেভাবে পার্ল হারবার আক্রমণ করিয়াছিল এবং মার্কিন যুদ্ধবন্দীদের উপর যে বর্বর ব্যবহার করিয়াছিল, তার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্তও মার্কিন জনমত উৎসুক ছিল। (১৪)

সোজা কথায় আমেরিকার জনগণের একট: বিপুল অংশ তাড়াতাড়ি যুদ্ধের অবসান দাবি করিতেছিল। বিশেষতঃ ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসানের পর মার্কিন সৈন্ত ৬

(১৩) স্তার জন হ্যামারটন সম্পাদিত ‘দ্য সেকেন্ড গ্রোট ওয়ার’, ১ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২১৩

(১৪) দ্য কোমন্ড ওয়ার, পৃষ্ঠা, ২২৬

অকিসারবুদ্ধ আবার 'সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া' দূরবর্তী জাপানী রণক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়ার জন্য আত্মী উৎসাহ বোধ করিতেছিলেন না। সুতরাং পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করিয়া যদি তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শেষ করা যায়, তাতে জনমতের কোন আপত্তি ছিল না।

অর একটা প্রস্তাব চিন্তা করার ছিল। এত অল্প কোটি টাকা (ষোট ২৫০ কোটি ডলার) ব্যয় করিয়া মালুয়ের ইতিহাসে যে ভয়ঙ্করতম অস্ত্র তৈয়ার করা হইল, রণক্ষেত্রে তার কার্যকারিতা কতটুকু, সেটাও যাচাই করিয়া দেখার ইচ্ছা ছিল। কেননা, এত ব্যয়বহুল অস্ত্র নির্মাণের সার্থকতা সম্পর্কে জনমতের নিকট কৈফিয়ৎ দেওয়ার দায়িত্বও ছিল সরকার পক্ষের। এখানে স্মরণীয় যে, বিজ্ঞানচর্চা আইনস্টাইনের কাছ থেকে সেই ঐতিহাসিক চিঠি (১৯৩৯ সালের ২রা আগস্ট) পাওয়ার পর প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়াই অ্যাটম বোমা নির্মাণের ব্যয়বহুল বিরাট পরিকল্পনায় হাত দিয়াছিলেন। সুতরাং এত বছর পর এত মালুয়ের চেষ্ঠা, গবেষণা ও পরিশ্রমের ফলে যে বোমা প্রস্তুত হইল, শত্রু বিরুদ্ধে বাস্তবক্ষেত্রে তা কতখানি কাজে লাগিতে পারে, সেই পরীক্ষারও প্রয়োজন ছিল। অ্যাটম বোমা বর্ষণের এটাও ছিল অন্যতম কারণ।

তথাপি হিওশিমায় পর আমেরিকার শীর্ষস্থানীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ স্বীকার করিয়াছিলেন যে, জাপানের বিরুদ্ধে পরমাণু বোমাবর্ষণ অপরিহার্য ছিল না। বিমানবাহিনীর প্রধান অধিনায়ক জেনারেল হেনরি আর্নল্ড বলিয়াছেন—'জাপানীরা বিমানপথের উপর কতৃৎ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। সুতরাং তারা আর বেশীদিন টিঁকিয়া থাকিতে পারিত না।' অল্পরূপভাবে নৌবিভাগের বড় কর্তা ফ্রিট অ্যাডমিরাল উইলিয়াম হালসি (Halsey) মন্তব্য করিয়াছেন—'এভাবে প্রথম পরমাণু বোমার পরীক্ষা অনাবশ্যক ছিল। এই বোমা নিক্ষেপ অত্যন্ত ভুল ছিল। যে অস্ত্রের কোন প্রয়োজন ছিল না, সেই অস্ত্র দুনিয়ার সামনে এভাবে জাহির করার কি দরকার ছিল?' কারণ, মার্কিন নৌ-সেনাপতির মতে জাপানী নৌবহর ইতিপূর্বেই ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং এই বোমা নির্মাণের জন্য তিনি বৈজ্ঞানিকদের উপর দোষারোপ করেন। আর মার্কিন বিমান বিভাগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'স্ট্রাটজিক ব্লিং সার্ভে' এর রিপোর্টের উপসংহারে মন্তব্য করা হইয়াছিল যে, সমস্ত ঘটনার বিস্তৃত তদন্ত এবং যে সমস্ত জাপানী নেতা এই সমস্ত ব্যাপারে জড়িত ছিলেন, তাঁদের মতামত গ্রহণের পর রিপোর্ট রচয়িতাগণ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলেন যে, ১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের আগেই জাপান অ্যাটম বোমা ছাড়াই আত্মসমর্পণে বাধ্য হইত। এমন কি, একান্ত রাশিয়ারও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের দরকার ছিল না এবং আমেরিকার পক্ষ থেকে খাস জাপানী দ্বীপ আক্রমণের পরিকল্পনারও দরকার ছিল না।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ ব্যাররেন্স (Byrnes) বলিয়াছেন যে, অ্যাটম বোমার জন্য যুদ্ধ শেষ হয় নাই। আসলে এই বোমা বধন নিক্ষেপ হইতেনি, জাপান সেই সময়ই পরাজিত হইয়াছিল এবং সন্ধি প্রার্থন করিতেছিল। (১৫)

স্বয়ং চার্লিস বিনি গ্যাটম্ বোমার এত উক্ত ছিলেন, তিনি পর্যন্ত তাঁর মহাযুদ্ধের স্মৃতিগ্রন্থে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, একমাত্র পারমাণবিক বোমার জন্তই জাপান পরাজয় স্বীকার করে নাই। আসলে জাপানের ভাগ্য আগেই নির্ধারিত হইয়া গিয়াছিল। বুটেনের মত জাপান ছিল ‘দ্বীপবাসী শক্তি’ (Island Power), সুতরাং নৌবহরের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু জাপানের সেই নৌশক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। (১৬)

আমেরিকার অন্ততম শীর্ষস্থানীয় সামরিক নেতা ও প্রেসিডেন্টের প্রধান উপদেষ্টা এ্যাডমিরাল লেহাই (Leahy) অভ্যন্তরীণ কঠোর ভাষায় পরমাণু বোমা বর্ষণের ঘটনাকে নিন্দা করিয়াছেন—“হিরোশিমা ও নাগাসাকির উপর এই বর্বর অস্ত্রের ব্যবহারের দ্বারা জাপানের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধের প্রকৃত কোন সহায়তা হয় নাই। কারণ, জাপানের বিরুদ্ধে সমুদ্রপথের অবরোধ সৃষ্টি এবং গভ্যুগভ্য বোমাবর্ষণের প্রচণ্ডতার দ্বারাই জাপান পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল এবং আত্মসমর্পণে উত্তোঙ্গী হইয়াছিল।”

শীর্ষস্থানীয় মার্কিন সামরিক নেতৃবৃন্দ এবং স্বয়ং চার্লিসের যখন এই অভিমত, তখন এ্যাটম্ বোমা আর্দ্র বর্ষিত হইল কেন? ক্যান্টেন লীডেল হার্ট এর ব্যাখ্যাস্বরূপ বলিয়াছেন যে, এই বোমাবর্ষণের পিছনে দুইটি কারণের সন্ধান পাওয়া যায়—প্রথমতঃ ১৯ই জুলাই পটসডামে (যখন এ্যাটম্ বোমার সাফল্যজনক পরীক্ষার রিপোর্ট পৌঁছিল) চার্লিস ট্রুম্যানকে বুঝাইয়াছিলেন যে, জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণের আর প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয়তঃ পটসডাম সম্মেলনে ট্যালিন যেভাবে জাপানের দখলদারিত্ব অংশ চাহিতেছিলেন, তাতে আমেরিকা অভ্যন্তরীণ বিব্রত বাধা করিলেন। সুতরাং এই বিব্রত অবস্থা ও দ্বিতীয় সাহায্য এড়াইবার জন্ত সোভিয়েত বাহিনী কর্তৃক মাকুরিরাতে স্বাক্ষরপত্রের আগেই এ্যাটম্ বোমা বর্ষণের দ্বারা জাপানকে ধমকানোর করার সঙ্কল্প হইয়াছিল।

আর দ্বিতীয় কারণ ছিল—এ্যাটম্ বোমা তৈয়ারির বিপুল অর্থব্যয়ের সার্বকথা কার্যক্ষেত্রে প্রমাণ করা এবং সেই ইচ্ছা পারমাণবিক বিজ্ঞানীদেরও ছিল। অন্তর্গত জনমতের নিকট তাঁরা কি কৈফিয়ৎ দিতেন? এ জন্তই হিরোশিমা ও নাগাসাকির উপর এ্যাটম্ বোমা নিক্ষেপ হইয়াছিল। (১৭)

মার্কিন ঐতিহাসিক ডি এক ফ্রেমিং লিখিয়াছেন যে, হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপের পিছনে চারি প্রকারের কারণ ছিল :

(ক) মার্কিন সৈন্যদের জীবন বাঁচাইবার স্বাভাবিক তাগিদ।

(খ) মহাযুদ্ধের স্থায়ীস্থল হ্রাস।

(গ) যুদ্ধক্ষেত্রে বোমার কার্যকারিতা প্রমাণ করা এবং

(ঘ) সোভিয়েত রাশিয়াকে দুরপ্রাচ্যে আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ না দেওয়া।

এমন কি, বুটেনের ও সামরিক মহলের কোন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রকার বর্বর অস্ত্র কিংবা গণহত্যাকারী অস্ত্র প্রয়োগের বিরোধী ছিলেন। যেমন—বুটিন

(১৬) চার্লিস—৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫১

(১৭) ক্যান্টেন লীডেল হার্ট, পৃষ্ঠা ৬৩৭

নৌবহরের এ্যাডমিরাল ভাইকাউন্ট ক্যানিংহাম ১৯৪১ সালের ১৪ই মে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, জাপানের উপর পারমাণবিক বোমা বর্ষণের জন্য তিনি সর্বদাই দুঃখ বোধ করিয়াছেন। কারণ, ওই বোমা ছাড়াই জাপান আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইত। কিন্তু যে পারমাণবিক শক্তি মানুষের কল্যাণের জন্য প্রয়োগ করা যাইত, তা' এভাবে অস্ত্রের মাধ্যমে ব্যবহার করায় সেই কল্যাণের দিকটা চাপা পড়িয়া গেল। (১৮)

জাপানের বিরুদ্ধে পারমাণবিক বোমা বর্ষণের সংবাদে সোভিয়েত রাশিয়ার তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল—বিশিষ্ট এই সংবাদ প্রথমে চাপা দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছিল। সোভিয়েত থেকে প্রকাশিত (১৯৭০) একটি নুতনতম পুস্তকে বলা হইয়াছে যে, হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে এ্যাটম বোমা বিস্ফোরণের ফলে মোট ৪ লক্ষ ৪৭ হাজার অসামরিক ব্যক্তি নিহত বা পঙ্গু হইয়াছিল এবং “মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী মহল এখন এক অপরাধের অহুষ্ঠান করিয়াছিল, পৃথিবীর ইতিহাসে যার তুলনা নাই। এটা কেবল নিরর্থক নিষ্ঠুরতাই ছিল না, ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে মার্কিন গবর্নমেন্টের রণনৈতিক সুবিধালাভের চেষ্টা। জাপানী লেখকেরা যথার্থই মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, এ্যাটমিক বোমা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ অস্ত্র ছিল না, বরং ওটা ছিল পরবর্তী কালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের প্রথম অস্ত্র।” (১৯)

(১৮) দ্বি কোল্ড ওয়ার, পৃষ্ঠা ৩০৬

(১৯) Great Patriotic War of the Soviet Union, p 415-16.



## দশম পর্ব ষষ্ঠ অধ্যায়

জাপানের বিরুদ্ধে রুশ আক্রমণ : রণনীতি ও কূটনীতির প্যাঁচ

১৯০১ সালের ১২শে সেপ্টেম্বর জাপান চীনের মাঞ্চুরিয়া প্রদেশ আক্রমণ এবং তারপর দখল করিয়া নিল। সেই থেকে জাপান চীনের বিরুদ্ধে যে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িল, কার্যতঃ সেই যুদ্ধই কিন্তু জাপানের কাল হইয়া দাঁড়াইল। কারণ, প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধেব উৎপত্তি সেই থেকে এবং ১৯৪৫ সালের ৮ই আগষ্ট রাশিয়া কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মাত্র ১৪ দিনের মধ্যে সেই ১৪ বছরের দখলীকৃত মাঞ্চুরিয়া জাপানের হাতছাড়া হইয়া গেল—জাপান চূড়ান্ত রূপে পরাস্ত ও পরাজিত হইল। অবশ্য তার আগেই জাপান আমেরিকার প্রচণ্ড প্রত্যাবাধে এবং হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমার বজ্রাঘাতে প্রায় ধরাশায়ী অবস্থায় পৌঁছিয়াছিল। কিন্তু জড়বাদ ও ক্যাসিজমের পাক্কায় পড়িয়া জাপান যে ‘পাপ’ করিয়াছিল, জার্মানীর মত অহরূপভাবেই তাকে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল। সোভিয়েত রাশিয়া কিংবা কমিউনিষ্ট মতবাদের প্রতি বিবেচনায় হইয়া জাপানী সামরিক নেতারা চীন ও সোভিয়েত সীমান্তে দীর্ঘকাল যাবত হামলা করিতেছিলেন এবং পার্ল হারবারের (ডিসেম্বর ১৯৪১) পর যে বিশাল সাম্রাজ্য তাঁরা গ্রাস করিয়াছিলেন, সেই সাম্রাজ্য হজম করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ, সেই শক্তি ও সম্পদ তাঁদের ছিল না। অথচ নাৎসী জার্মানী ও ক্যাসিষ্ট ইতালীর মিত্ররূপে জাপান যেমন ইহা মার্কিন শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল, তেমনই সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে নিরপেক্ষতার চুক্তি স্বাক্ষর (এপ্রিল ১৯৪১) সত্ত্বেও রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানীকে সহায়তা করিয়া আসিতেছিল। যদিও হিটলার কর্তৃক রাশিয়াকে আক্রমণের পর জাপান সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে হাতে-কলমে কোন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় নাই, তবু সেটা তার কোন ‘সুবিবেচনা’ বা তথাকথিত নিরপেক্ষতার কারণ সজ্ঞাত ছিল না। আসলে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে মস্কোর যুদ্ধ এবং ১৯৪২ সালের স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধে জাপান হিটলারের হাতে রাশিয়ার পরাজয়ের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু সেটা যখন ঘটিল না, বরং হিটলারী বাহিনীর পরাজয় ঘটিতে লাগিল, তখন সোভিয়েত রাশিয়ার মত বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে জাপান ঝাঁপাইয়া পড়িতে সাহস পাইল ন—যদিও এই প্রসঙ্গ নিয়া জাপানী নেতাদের মধ্যে অনেক বার শলাপরামর্শ হইয়াছিল।

তথাপি একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, রুশ-জার্মান যুদ্ধে জাপান হিটলারকে অন্ততঃ পরোক্ষভাবে যে সাহায্য দিয়া আসিয়াছে, তার গুরুত্ব কম নয়। কারণ, মাঞ্চুরিয়াতে জাপানের ১০ লক্ষ সৈন্য নিয়া গঠিত শক্তিশালী কোয়ার্টাং বাহিনীর (মাঞ্চুরিয়ার কোয়ার্টাং উপবংশের নামানুসারে) জন্ত রাশিয়াকে সর্বদাই সশঙ্ক থাকিতে এবং ৪০ ডিভিসন সৈন্য সড়ক পাহারায় রাখিতে হইয়াছিল। যদিও যুদ্ধো

এবং ট্যালিনগ্রাদের নিদারুণ সঙ্কটময় যুদ্ধে দূরপ্রাচ্যের এই সমস্ত বাহিনী থেকে রাশিয়াকে কয়েক ডিভিশন দুর্দান্ত সাইবেরিয়ান সৈন্য আমদানি করিতে হইয়াছিল, তথাপি সেটা ছিল জরুরী অবস্থার বিপদের ঝুঁকি গ্রহণের মত। কিন্তু জাপান সম্পর্কে সোভিয়েত রাশিয়ার সর্বদাই একটা অস্বস্তিকর কিংবা ভয়ের মনোভাব ছিল। কেননা, সোভিয়েত নেতারা জাপানকে বিশ্বাস করিতেন না এবং জাপানের জঙ্গীবাদী নেতারাও সোভিয়েত কমিউনিষ্ট নেতাদের বিষেষ ও সন্দেহের চোখেই দেখিতেন। সুতরাং দুইপক্ষ থেকেই একটা সঘাতের মনোভাব ছিল এবং সমগ্র পরিস্থিতির উপর বাধ্য হইয়াই সোভিয়েত নেতাদের অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে আর্মি জেনারেল এস এস স্তেমেনকো (Shtemenko) লিখিয়াছেন যে, ১৯৪২ সালের সঙ্কটের দিনগুলিতে দূরপ্রাচ্যের জেনারেল ষ্টাকহোফের জন্ত ডেপুটি চীফের পদ সৃষ্টি করিতে হইল এবং সময় বিভাগের রণক্ৰিয়া দপ্তরে একটি ফার্ম ইন্টার সেক্টর স্থাপিত হইল এবং মেজর-জেনারেল এফ আই শেভচেঙ্কোর মত একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ সনাপতিকের তার ভার দিতে হইল।

কিন্তু মহাযুদ্ধের আগেই ১৯৩৮ সালে দূরপ্রাচ্যের এবং ১৯৪১ সালে ট্রান্সবাইকাল মিলিটারি ডিস্ট্রিক্ট দুইটির পুনর্গঠন করিতে হইয়াছিল। ১৯৪৩ সালের দ্বিতীয় অর্ধের পর যখন সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গন সোভিয়েতের অল্পকালে বাইতে লাগিল, তখন মিত্রপক্ষের বৃত্তিতে বাকী রহিল না যে, জার্মানীর পতনের পর জাপানেরও পতন অনিবার্য হইয়া উঠিবে। সুতরাং পশ্চিমী মিত্রেরা রাশিয়াকে জাপানের বিরুদ্ধে দলে টানিতে চাহিলেন। কিন্তু তেহরান সম্মেলনে (নভেম্বর ডিসেম্বর, ১৯৪৩) তিন বিশ্বনেতার বৈঠকে যখন ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার স্মূর্নিধিষ্ট প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল, একমাত্র তখনই ট্যালিন নীতিগতভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষ থেকে জঙ্গীবাদী জাপানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সম্মত হইলেন। অবশ্য এই অস্ত্র ধারণ করা হইবে হিটলারী জার্মানীর পরাজয়ের পর। (১)

\*

\*

\*

১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে যখন সত্য সত্যই ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হইল, তখন জাপান নিয়া রাশিয়ার উপর আর একবার চাপ দেওয়া হইল। কিন্তু ট্যালিন জবাব দিলেন যে, জার্মানীর পরাজয়ের আগে জাপানের বিরুদ্ধে অভিযান সম্ভব নয়। কিন্তু ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সোভিয়েত সুরক্ষিত কম্যাণ্ডের পক্ষ থেকে দূরপ্রাচ্যের সৈন্যদের সমাবেশ এবং সরবরাহ ইত্যাদি সম্পর্কে পরিকল্পনা তৈরী করার জন্য খোদ সদর দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হইল। কারণ, ট্যালিন ইকিত দিলেন যে, শীঘ্রই এটার দরকার হইতে পারে।

এই সময় অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি একদিন চার্লিস ও ইডেন মস্কোতে আগিয়া হাজির হইলেন।

জেনারেল স্তেমেকো লিখিয়াছেন যে, সদর দপ্তরে তিনি ৬ জেনারেল আস্তোনোভ (জেনারেল ষ্টাকের বড়কর্তা) যথারীতি তাঁদের রিপোর্ট পেশ করিতে গিয়াছিলেন এবং সেই সময়েই তিনি প্রথম ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে দেখিয়াছিলেন। অবশ্য সদর দপ্তরে তাঁদের পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদেরকে সর্ক করিয়া দেওয়া হইল যে, পাশের ঘরে চার্লিস ট্যালিনের সঙ্গে কথা বলিতেছেন এবং সুপ্রীম কমান্ডার নির্দেশ দিয়া রাখিয়াছেন যে, তাঁরা যেন আসিবা মাত্র তাঁর সঙ্গে দেখা করেন।

এই নির্দেশ অনুসারে স্তেমেকো এবং আস্তোনোভ পাশের কক্ষ প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, চার্লিস ও ট্যালিন পরস্পরের মুখোমুখি আরাম কেদারায় বসিয়া আছেন এবং ‘ভয়ানকভাবে ধোঁয়া ছাড়িতেছেন।’ অর্থাৎ চার্লিস একটা মোটা চুরুট এবং ট্যালিন যথারীতি তাঁর পাইপ টানিতেছিলেন। আর দোভাষী প্যাভলোভ তাঁর ভেঞ্চে বসিয়া আছেন।

স্তেমেকো এবং আস্তোনোভকে ট্যালিন চার্লিসের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। চার্লিস তখন রণাঙ্গনের অবস্থা জানিতে চাহিলেন এবং জেনারেল আস্তোনোভ সংক্ষেপে ষ্টেশর থেকে দক্ষিণ পর্বন্ত রণক্ষেত্রের অবস্থা বুঝাইয়া দিলেন। চার্লিস তখন টেবিলের উপর পাতা মানচিত্রের উপর হুঁকিয়া পড়িয়া থাা মন দিয়া অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিলেন এবং একটি মাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন—‘আইজেনহাওয়ারের বিরুদ্ধে জার্মানরা কত সৈন্য নিয়োগ করিয়াছে?’

আস্তোনোভ সেই সংখ্যা বলিলেন। এরপর তাঁদের দুইজনকে সেই কক্ষ থেকে নিষ্কাশ্য হইতে দেওয়া হইল। কিন্তু তাঁরা দুইজনেই পাশের কক্ষ গিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন চার্লিসের বিদায় নেওয়ার আশায়। কেনন, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দলিলে সুপ্রীম কমান্ডারের স্বাক্ষরের প্রয়োজন ছিল।

মিনিট কুড়ি পর চার্লিস চলিয়া গেলেন। ট্যালিন তখন একজন অফিসারকে ডাকিয়া বলিলেন :

‘চার্লিস যে সমস্ত হুঁকি ও সিগার আমাকে উপহার দিই গিয়েছেন, সেগুলি সামরিক লোকদের মধ্যে বিতরণ করে দাও।’

তারপর আস্তোনোভ ও স্তেমেকোর দিকে তাকাইয়া ট্যালিন মন্তব্য করিলেন—  
“আপনারা খেয়ে দেখবেন কিন্তু, আমার বিশ্বাস জিনিসগুলি খুব ভালো।” (২)

বলা বাহুল্য যে, ট্যালিনের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার আগে চার্লিস তাঁর সঙ্গে জাপানী যুদ্ধের বিষয় নিয়া আলোচনা করিয়াছিলেন।

\* \* \*

জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার আক্রমণ যে অনিবার্য তার প্রথম আভাস পাওয়া গেল ৫ এপ্রিল ১৯৪৫, যখন সোভিয়েত গবর্নমেন্ট রুশ-জার্মান নিরপেক্ষতার চুক্তি বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিলেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রী মলোটোভ জাপানী গবর্নমেন্টকে জানাইয়া দিলেন যে, ১৯৪১ সালে এই চুক্তি স্বাক্ষরের পর পরিস্থিতির ‘আমূল পরিবর্তন’ ঘটিয়া গিয়াছে, জার্মানী সোভিয়েত রাশিয়াকে আক্রমণ করিয়াছে এবং জাপান জার্মানীকে সহায়তা করিয়াছে। অধিকন্তু জাপান যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে সেই ব্রুটন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের মিত্র। ‘সুভরাং

স্বাক্ষরিত চুক্তির তৃতীয় অনুচ্ছেদ অনুযায়ী চুক্তির মেয়াদ ফুরাইবার এক বছর আগে চুক্তি বাতিল করার জন্ত বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার যে নিয়ম আছে, সেই অনুযায়ী সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৩ এপ্রিল, ১৯৪৫ তারিখ থেকে এই বিজ্ঞপ্তি দিতেছে।'

কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের এই কার্য আইনের দিক থেকে সঠিক ছিল না। কারণ, আইন অনুযায়ী ১৩ এপ্রিল, ১৯৪৬ পর্যন্ত এই চুক্তির মেয়াদ ছিল। সুতরাং আগষ্ট মাসে (১৯৪৫) রাশিয়া কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে আক্রমণ কার্যত চুক্তিভঙ্গের তুল্য ছিল। (৩)

কিন্তু জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ারও অনেক নালিশ জমিয়া উঠিয়াছিল। হিটলার কর্তৃক রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার পর মস্কোস্থিত জাপানী রাষ্ট্রদূত জার্মানীকে অনেক মূল্যবান সংবাদ সরবরাহ করিয়াছেন। দূরপ্রাচ্যে অনেক রুশ সৈন্ত তো সতর্ক ভাবরূপ রাখিতেই হইয়াছিল, অধিকন্তু “১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকাল থেকে ১৯৪৪ সালের শেষ পর্যন্ত জাপানী সশস্ত্র বাহিনী বে-আইনী ভাবে ১৭৮টি সোভিয়েত পণ্যবাহী জাহাজ আটক করিয়াছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের দূরপ্রাচ্যের সীমায় জাপানীরা ক্রমাগত উত্থান দিমাছে এবং ৩০ বার সোভিয়েত ভূমির উপর গোলাবর্ষণ করিয়াছে।” (৪)

ষ্ট্যালিনগ্রাদ পর্যন্ত রাশিয়ার প্রতি জাপানের আসল মনোভাব কি ছিল তা জানা রাশিয়ার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। কেননা, ১৯৪২ সাল পর্যন্ত টোকিওতে সোভিয়েত রাশিয়ার একজন অত্যন্ত দক্ষ গোয়েন্দা ছিল—নাম রিচার্ড সোর্জ। ইনি নিজেই ছিলেন একজন জার্মান সাংবাদিক এবং টোকিওস্থিত জার্মান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে তাঁর ছিল প্রগাঢ় বন্ধুত্ব (প্রথম খণ্ডে এঁর বিবরণ দেওয়া হইয়াছে)। এই গোয়েন্দার মৃত্যুদণ্ডের পর ১৯৪৩, ১৯৪৪ সালে রুশ-জাপান সম্পর্ক মোটামুটি ‘ঠাণ্ডা’ ছিল। কিন্তু জার্মানীর পরাজয়ের পর ইয়ান্টা চুক্তি অনুসারে রাশিয়া আগষ্ট মাসে (১৯৪১) মালুরিয়াতে জাপানকে আক্রমণে উত্তত হইল।...

এদিকে জাপান কিন্তু রাশিয়ার মারকং মিত্রশক্তির সঙ্গে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে আলোচনা আরম্ভ করার জন্ত বিষয় চেষ্টা করিতে লাগিল—যে কথা আগেই (পটসডাম সম্মেলন উপলক্ষে) উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ, জাপানের অবস্থা কাহিল হইয়া উঠিতেছিল। আধুনিক ঐতিহাসিক হার্বার্ট কীজ লিখিয়াছেন যে জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী টোগো মস্কোস্থিত জাপানী রাষ্ট্রদূত স্মাটোকে বারবার তাগিদ দিতেছিলেন মলোটোভের সঙ্গে দেখা করিয়া আলোচনা আরম্ভ করার জন্ত। কারণ, ‘যুদ্ধের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটময় এবং আর কয়েক দিনের মধ্যেই এই যুদ্ধ শেষ করিয়া ফেলিতে হইবে, হাতে আর সময় নেই।’

“Since the loss of one day relative to this present matter may result in a thousand years of regret, it is requested that you immediately have a talk with Molotov.”

(৩) আলেকজান্ডার ওয়ার্ল, পৃষ্ঠা ১১৮

(৪) Great Patriotic War of the Soviet Union—Moscow, 1970, p. 411.

অর্থাৎ ‘বর্তমান বিবরণটি এমন জরুরী যে, এই সম্পর্কে মাত্র একটি দিন নষ্ট হইলেও হাজার বছর ধরিয়া দুঃখ করিতে হইতে পারে। সুতরাং অবিলম্বে মলোটোভের সঙ্গে কথা বলার জন্য আপনাকে অগ্ররোধ করা যাইতেছে।’

মিঃ কিজ এই ঘটনার উপর মন্তব্য করিতেছেন : ‘Poor Sato ! Stalin and Molotov were just starting back from Potsdam, and they traveled by train and did not reach Moscoow until the plane carrying the bomb had left Titian.’ (৫)

অর্থাৎ মন্দভাগ্য স্ত্রীটো ! টগোর বার্তা নিয়া তাঁর আর আলোচনার সুযোগ হইল না। কারণ, পটসডাম থেকে ষ্ট্যালিন ও মলোটোভ যখন ট্রেনে করিয়া মস্কোর দিকে রওনা হইলেন, তখন মস্কোতে তাঁদের পৌঁছবার আগেই মার্কিন প্লেন টিটিয়ান ঘাঁপ ( গুয়ামের অদূরবর্তী ) থেকে এ্যাটম বোমা হিরোশিমার দিকে রওনা হইয়া গেল !...

৬ই আগষ্ট, ১৯৪৫, প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ঘোষণা করিলেন যে, হিরোশিমার উপর এ্যাটম বোমা নিক্ষেপ করা হইয়াছে।

এই ঘোষণার দুই দিন পর ৭-৮ই আগষ্ট অত্যন্ত তাড়াহুড়া করিয়া সোভিয়েত সরকারের পক্ষ থেকে মলোটোভ জাপানী রাষ্ট্রদূত স্ত্রীটোকে ডাকিয়া আনিয়া সোভিয়েত সরকার কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কথা জানাইয়া দিলেন।

৯ই আগষ্ট থেকে সোভিয়েত রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত বলিয়া ঘোষিত হইল এবং ৮ই আগষ্ট রাজ্যে মলোটোভ এক প্রেস কনফারেন্সে অত্যন্ত গম্ভীর ও শুষ্ক মুখে সে কথা জানাইয়া দিলেন। কিন্তু হিরোশিমার এ্যাটম বোমা বর্ষণের কথা একবার উল্লেখও করিলেন না এবং রুশ সংবাদপত্রেও সেই বোমার কথা প্রাধান্য পাইল না। কিন্তু যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়া এবং অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে প্রচার করা হইতে লাগিল মাকুরিয়ার সোভিয়েত বাহিনীর আক্রমণের সংবাদ।

জেনারেল ইয়ামাদার অধীন মাকুরিয়ার কোয়ান্টাং আর্মি ১০ লক্ষ সৈন্য নিয়া গঠিত ছিল এবং এরা জাপানের উৎকৃষ্টতম স্থলসৈন্যরূপে পরিচিত ছিল। মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩১ ডিভিসন এবং এদের অস্ত্রসজ্জা ছিল ১,১৫৫টি ট্যাঙ্ক, ৫৩৬০ কামান এবং ১৮০০ বিমান। মাকুকোও এবং অন্তর্ভোগিলিয়ার সৈন্যের সংখ্যা ৩ লক্ষ হইলেও এদের অস্ত্রসজ্জা অত্যন্ত ধারাপ ছিল। রুশ জেনারেল শ্বেমেকোর মতে এদের কোন রণক্ষমতাও ছিল না।

অপর পক্ষে দূরপ্রাচ্যে আগে থেকেই যে সোভিয়েত বাহিনী ছিল, তাদের সঙ্গে মে-জুলাই মাসে, ১৯৪৫, আরও নূতন নূতন সৈন্যদল যুক্ত হইল এবং পরিকল্পনা করা হইল পশ্চিমে মঙ্গোলিয়া ও পূর্বে দিকে ম্যান্চুরিয়ায় সশস্ত্র উপকূলের এলাকা থেকে একযোগে সীড়ানির চাপের আকারে প্রচণ্ড দুইটি আঘাত, হানা হইবে মাকুরিয়ার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত কোয়ান্টাং বাহিনীর বিরুদ্ধে।

বলা বাহুল্য যে, সৈন্যসংখ্যা ও অস্ত্রসজ্জার সোভিয়েত বাহিনী জাপানের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল এবং যেভিনটি প্রধান রণক্ষেত্র বা ফ্রন্টের স্থিতি হইল, তাতে

২টি ট্যাক ডিভিসনসহ মোট ৮০ ডিভিসন সোভিয়েত সৈন্যের সমাবেশ ঘটিল। অর্থাৎ সৈন্যসংখ্যা; দাঁড়াইল ১৫ লক্ষেরও বেশী, আর কিয়দগান্ ও মর্টার শ্রেণীর কামান ২৬ হাজারেরও বেশী, ট্যাঙ্কের সংখ্যা ৫ হাজার ৫ শতের বেশী এবং ৩,৮০০ রণবিমান। ফলে, সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনী মাক্‌সিমিয়ান জাপ বাহিনীর তুলনায় সৈন্য অস্ত্র সব দিক দিয়াই অনেক বেশী শক্তিশালী ও শ্রেষ্ঠ ছিল। (৬)

মার্শাল ম্যালিনোভস্কি, মার্শাল মেরেৎসকোভ, মার্শাল ভ্যাসিলাইভস্কি (প্রধান সেনাপতি) এবং জেনারেল পুরকায়েভ—এই কয়েকজন রণদক্ষ সোভিয়েত সেনাপতি মাক্‌সিমিয়ান জাপ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার দায়িত্ব পাইলেন।

তিনটি প্রধান আক্রমণ একসঙ্গে অল্পশ্রুত হইল গোড়াতে সবই মাক্‌সিমিয়ান হারবিন অভিযুগে। এই তিনটি রণক্ষেত্র ছিল :

(ক) মার্শাল মেরেৎসকোভের অধীন প্রথম ফার ইষ্টার্ন আর্মি—ব্লাডিভোস্টক বন্দরের উত্তর দিক দিক দিক।

(খ) দ্বিতীয় ফার ইষ্টার্ন আর্মি জেনারেল পুরকায়েভের অধীন আমুর নদী পার হইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম স্ত্রুর্ উপত্যকা।

(গ) ট্রান্স-বৈকাল আর্মি ম্যালিনোভস্কির অধীন—মঙ্গুলি থেকে পূর্বদিকে চীন। ইষ্টার্ন রেলপথ বরাবর।

এই সমস্ত প্রধান আক্রমণ ছাড়া অন্যান্য উপ-রণক্ষেত্রও ছিল। আর এই সমস্ত রূপ সেনাপতির ছিল সোভিয়েত-জার্মান রণক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রচণ্ড অভিজ্ঞতা ও অপূর্ব দক্ষতা। কিন্তু কোরাস্টাং আর্মিও শক্তিশালী ছিল এবং কয়েক বছর ধরিয়া তারা প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা পাকা করিয়াই গড়িয়া তুলিয়াছিল। এছাড়া প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতাও জাপানী বাহিনীর সহায়ক ছিল।

কিন্তু এই সমস্ত সত্ত্বেও সোভিয়েত বাহিনীর অভিযানের মুখে কোরাস্টাং বাহিনী বেশীদিন টিকিয়া থাকিতে পারিল না। ইংরাজ সামরিক সম্পাদক মেক্স-জেনারেল জার চার্লস গাইন (Charles Gwyn) মন্তব্য করিয়াছেন যে, জাপানী সৈন্যদলকে পরাজিত করা একেবারে জলভাতের মত সহজ ছিল না এবং জাপানীদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা উত্তম ছিল। তথাপি—

‘Nevertheless the conduct of the campaign afforded another striking demonstration of Russian military efficiency. The transfer of troops from west to east and the completion of preparations for an offensive on a great scale in the time available after the collapse of Germany were in themselves remarkable feats. The strategic plan of campaign was admirably suited to the circumstances and its tactical execution showed how thoroughly the lessons of the German war had been absorbed’. (৭)

(৬) গ্রেট প্যাট্রিওটিক ওয়ার অব্ দি সোভিয়েত ইউনিয়ন, মস্কো, পৃষ্ঠা ৪১৮

(৭) The Second Great War—Edited by Sir John Hammerton, Maj-General Sir Charles Gwyn, Vol 9, p 3780, 3785.

অর্থাৎ এই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে এই অভিযান আর একবার রুশ সামরিক ক্ষমতার চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিল। পশ্চিম থেকে পূর্বাধিক এত সৈন্তের স্থানান্তরিতকরণ এবং জার্মানীর পতনের মাঝে এত কম সময়ের মধ্যে এমন প্রচণ্ড আকারে আক্রমণের প্রস্তুতি সম্পূর্ণকরণ, একমাত্র এই ঘটনাক্রমই খুব চমকপ্রদ বলিয়া বিবেচিত হইবে। অবস্থা! অল্পমাত্রায় এই অভিযানের রণনৈতিক পরিকল্পনা খুব চমৎকাররূপে উপযোগী ছিল এবং কার্যক্ষেত্রে এর রণকৌশলগত প্রয়োগ প্রমাণ করিতেছে যে, সোভিয়েত বাহিনী কিরূপ পরিপূর্ণতার সঙ্গে জার্মান যুদ্ধের শিক্ষা কয়দ্বারা করিয়াছেন।'

মাকুরিয়ায় রুশ আক্রমণের দক্ষতা সম্পর্কে ঐতিহাসিকের এই মন্তব্য নিশ্চয়ই অবগোহ্য।

মুত্তরাং অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই জাপানের কোয়ান্টাং বাহিনী চূর্ণ হইয়া গেল। রুশ সৈন্তেরা উত্তর কোরিয়াতেও ঢুকিয়া পড়িল। দক্ষিণ শাখালিন ও কিউরাইল দ্বীপ দখলের জন্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় রুশ নৌবহর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল এবং সংকারীভাবে আত্মসমর্পণের কথা ঘোষিত হওয়ার পরেও জাপানী বাহিনীর মধ্যে এমন কতকগুলি উগ্র দশপ্রেমিক ইউনিট ছিল যারা অনেকদিন পর্যন্ত রুশ-সৈন্তদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছিল।

মাকুরিয়াতে এবং বিশেষভাবে পোর্ট ডাইরেন ও পোর্ট আর্থার—এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর দখলের জন্য সোভিয়েত কমান্ড বিমানবাহিত সৈন্যদল নামাইয়া দিয়াছিল। কারণ, তাঁদের আশঙ্কা ছিল যে, মার্কিন সৈন্তেরা রুশদের আগেই সেখানে অবতরণ এবং বন্দর দুইটি দখল করিয়া নিতে পারে। অবশ্য ইতিমধ্যে মিজপক্ষের নিকট জাপানের আত্মসমর্পণের পাল্লাও শুরু হইয়াছিল এবং যুদ্ধ ক্ষান্ত দেওয়ার জন্য জাপান সরকারের আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে ৫ লক্ষ ২৪ হাজার জাপানী সৈন্ত বন্দী হইল (২০ হাজার আহত সহ)। যুদ্ধ বন্দীদের মধ্যে ছিলেন ১৪৮ জন সেনাপতি। ৮০ হাজার জাপানী নিহত হইয়াছিল। সেই তুলনায় রাশিয়ার ক্ষতি হইয়াছিল নিতান্তই সামান্য—মাত্র ৮ হাজার নিহত ও ২১ হাজার আহত হইয়াছিল।

জাপানের সঙ্গে এই যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে ১৪ই আগস্ট চিয়াং কাই-সেকের চীনের সঙ্গে ৩০ বছরের জন্য সোভিয়েত রাশিয়ার মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, এই চুক্তি স্বাক্ষরে চীনের পক্ষ থেকে (মার্কিন প্ররোচনার) যেচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব করা হইয়াছিল। আর ২২শে আগস্ট স্ট্যালিন কোয়ান্টাং আর্মির আত্মসমর্পণের কথা ঘোষণা করিলেন।

\* \* \*

কিন্তু মাকুরিয়ায় জাপানী বাহিনীর বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার 'শেষ যুদ্ধের' এই আক্রমণ পশ্চিমী সামরিক ইতিহাসে ও মিজপক্ষীয় সোভিয়েত-বিরোধী মহলে গভীর বিভর্ক, বিজ্ঞপ ও সমালোচনার উদ্রেক করিয়াছে। কারণ, এই যুদ্ধের পটভূমিকায় উভয়পক্ষের অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার কূটনৈতিক চাল ও চক্রান্ত ছিল। ১৬ই জুলাই পারমাণবিক বোম্বার সাকল্যান্ডনক পরীক্ষার পর প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ও তাঁর পরামর্শদাতারা এবং ব্রুটেনে চার্চিলের সমর্থকগণ বিশ্বহা (৩)—১০

পটসডাম সম্মেলন থেকেই সোভিয়েত বিরোধিতা শুরু করিয়াছিলেন। পোল্যান্ড, পূর্ব ইউরোপ ও বলকানে তাঁরা সোভিয়েত নীতিকে সম্প্রসারণবাদরূপে চিহ্নিত করিয়া ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছিলেন। সুতরাং জাপানে, হুদুং প্রাচ্যে বা চীনে কিংবা মাঞ্চুরিয়ায় যাতে সোভিয়েত রাশিয়া আর কোন সম্প্রসারণ ঘটতে না পারে, সেজন্য তাঁরা সতর্ক হইলেন এবং রাশিয়াকে আর ‘আস্কারা’ না দিতে সঙ্কল্পবদ্ধ হইলেন। এজন্যই দেখা যায় যে, ২৬শে জুলাই পটসডাম সম্মেলন থেকে যখন ব্রিটিশ-মার্কিন-চীনা চরমপন্থে জাপানকে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণের জন্য আহ্বান জানানো হইল, তখন রুশপক্ষ অতুরোধ জানানাইলেন ওই চরমপন্থের প্রকাশ আরও দুই দিনের জন্য স্থগিত রাখিতে। কিন্তু ইং-মার্কিন পক্ষ জবাব দিলেন যে, সেই পন্থে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে।

আসলে পারমাণবিক শক্তিতে বলীয়ান হওয়ার কলেই ট্রুম্যান ট্যালিনকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই জাপানের বিরুদ্ধে চরমপন্থে ছাড়িয়াছিলেন। অতুরোধভাবে ২০শে জুলাই মলোটোভ যখন ট্রুম্যানকে অতুরোধ করিয়া পাঠাইলেন যে, সোভিয়েত রাশিয়াকে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের জন্য ‘নিয়মমার্কিক অতুরোধ’ জানানো হোক, তখন ট্রুম্যান নানা ছুতায় সেটা এড়াইয়া গেলেন। এই সম্পর্কে মন্তোহুইট মার্কিন মিলিটারি মিশনের বড়কর্তা জেনারেল ডীন্ (Deane) মন্তব্য করিয়াছেন—

“জাপানী যুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার যোগদান আর অত্যাৱশ্যক ছিল না। সুতরাং রাশিয়ার প্রতি কর্কশ ও উদাসীন হওয়ার মত অবস্থায় আমরা পৌঁছিয়াছিলাম।” (৭)

এই সময় মার্কিন রাষ্ট্রনেতা ও সামরিক নেতারা রাশিয়া কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সম্ভাবনার কথা নিয়াই চুঁচিঙাগ্রস্ত ছিলেন না, পাছে জাপানের আত্মসমর্পণের আগেই লালফোঁজ মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিয়া বসে, এই দুর্ভাবনাও ব্যাকুল ছিলেন। ২৮ জুলাই নৌ-সচিব ফরেস্টাল (Forrestal) পররাষ্ট্র-সচিব বার্নসের (Byrnes) সঙ্গে এই সমস্যা নিয়া আলোচনা করিয়াছিলেন এবং বার্নস বলিয়াছিলেন যে, মাঞ্চুরিয়াতে, বিশেষভাবে ডাইরেন ও পোট আর্থার বন্দবে রুশদের ঢুকিয়া পড়ার আগেই জাপানের যুদ্ধটা মিটাইয়া কেলিতে হইবে। কারণ, “একবার রাশিয়ানরা সেখানে ঢুকিলে আর তাদেরকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে না।” বার্নসের পরবর্তী কালের বক্তব্য থেকে আরও জানা যায় যে, ট্রুম্যান এই আশঙ্কাতেই ট্যালিনকে এ্যাটম বোমা বিস্ফোরণের কথা জানান নাই। কারণ, সে কথা জানিলে ট্যালিন হয়তো আগেই মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিয়া বসিতেন। (৮)

এমন কি চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী টি ভি সুং (পরে প্রধানমন্ত্রী) এবং ট্যালিনের মধ্যে যাতে পটসডাম সম্মেলনের আগে ও পরে দ্রুত কোন সাক্ষাৎ এবং বহিঃ-মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়ার রেলপথ ও ডাইরেন বন্দর ইত্যাদি নিয়া কোন চুক্তি দ্রুত

(৭) এ্যাটোমিক ডিপ্লোমাসি : হিরোশিমা এ্যাণ্ড পটসডাম, পৃষ্ঠা ১৮২

(৮) ঐ পুস্তক, পৃষ্ঠা ১৮৩



নিম্নরূপ না হয়, কার্যতঃ ট্রুম্যান কালহরণের ভেতন কোঁশলও অবলম্বন করিয়াছিলেন। (৯)

এই কোঁশলের কথা পররাষ্ট্র সচিব মিঃ বার্নসও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ট্যালিন ও চিয়াং কাইসেকের মধ্যে আলোচনা বড় দীর্ঘ ও বিলম্বিত হয়, ততই মজল। কেননা, সেই অবস্থায় মাঞ্চুরিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার বোগদানে আরও বিলম্ব ঘটবে এবং তার আগেই হয়তো জাপান আমেরিকার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া বসিতে পারে। সুতরাং দেখা গেল রাশিয়া ও চীনের মধ্যে আলোচনা পটসডাম সম্মেলনের আগে ১৪ দিন ( ৩০ জুন থেকে ১৪ জুলাই ) এবং পরে আর এক সপ্তাহ—৭ আগষ্ট থেকে ১৪ আগষ্ট পর্যন্ত অল্পাধিক হইয়াছিল এবং এর পিছনে ওয়াশিংটনের ইচ্ছিত ছিল চিয়াং কাই-সেকের প্রতি। (১০)

একথা সত্য যে, ইয়ান্টা চুক্তি অহুসারে বহিঃমঙ্গোলিয়া এবং মাঞ্চুরিয়ার বন্দর ও রেলপথ ইত্যাদি সম্পর্কে ট্যালিনের দাবিগুলি রুজভেল্ট মানিয়া নিলেও এইগুলি সম্পর্কে চিয়াং কাই-সেকের সম্মতির দরকার হইবে এবং রুজভেল্ট সেই সম্মতি আদায় করিয়া দিবেন এমন কথাও চুক্তিতে ছিল। স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছিল :

'The Heads of three Great Powers have agreed that these claims of the Soviet Union shall be unquestionably fulfilled after Japan has been defeated !'

অর্থাৎ জাপানের পরাজয়ের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের এই সমস্ত দাবি নিঃসন্দেহেই পূর্ণ করা হইবে। এই সম্পর্কে তিনটি বৃহৎ শক্তির রাষ্ট্রপ্রধানগণ একমত হইয়াছিলেন। (১১)

তিন প্রধানের মধ্যে এই স্বাক্ষরিত চুক্তি সত্ত্বেও সোভিয়েত রাশিয়া ও চীনের মধ্যে বন্ধুতা ও মৈত্রীর চুক্তি স্বাক্ষরে বিলম্ব হইতে লাগিল এবং হিরোশিমায় বোমাবর্ষণের পর রাশিয়া কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার আগে সেই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রাশিয়াকে এড়াইবার জন্য মার্কিন কূটনীতি দৃষ্টিমত প্যাচ কবিতেছিল এবং রাশিয়াও ভেতন সন্দেহ করিতেছিল বলিয়াই এ্যাটম বোমা নিক্ষেপ হওয়ার দুই দিন পরেই মাঞ্চুরিয়াতে আক্রমণ করিল। চিয়াং কাই-সেকও কিন্তু মার্কিন কূটনীতির এই প্যাচ ধরিয়া রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি নস্ত্রাৎ করিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিলেন। কিন্তু রুজভেল্ট ও চার্চিলের মত দুই বিশ্বনেতা যখন ইয়ান্টাতে ট্যালিনের সঙ্গে প্রতিক্রিয়াবদ্ধ হইয়াছেন, তখন চিয়াং কাইসেক আর চুক্তি-ভঙ্গ করিতে সাহস পাইলেন না। বিশেষতঃ তৎক্ষণে বিশাল সোভিয়েত বাহিনী মাঞ্চুরিয়া ছাইয়া কোলিয়াছিল।...

(৯) পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ১৮৪

(১০) আলেকজান্ডার ভার্গ, পৃষ্ঠা ২২৩

(১১) পূর্বোল্লিখিত পুস্তক, পৃষ্ঠা ২২৩

ট্রুম্যানের কূটনীতি সম্পর্কে আরও উল্লেখযোগ্য এই যে, পটসডাম সম্মেলনের শেষের দিকে জাপানের সম্রাট যখন প্রিন্স কোনেয়েকে মস্কোতে শান্তি আলোচনার জন্য পার্থাইবার উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করিলেন, তখন ট্রুম্যান ট্যালিনকে সোজানুজি পরামর্শ দিলেন সেই শান্তি প্রস্তাব উপেক্ষা করার জন্য।

কিন্তু পটসডাম থেকে প্রচারিত চরমপত্র জাপান ‘অগ্রাহ্য করিয়াছে’—জাপানী বার্তার এই অসুবাদও স্বেচ্ছাকৃত বিকৃতি বিংবা বিভ্রান্তিকর বলিয়া মনে হইতে পারে। অথচ জাপানী কর্তৃপক্ষ এই অগ্রাহ্য করার কথা স্বীকার করেন না। কেননা, জাপানী শব্দ—‘makusatsu’-এর অর্থ ‘অগ্রাহ্য করা’ নয়, জাপানী ভাষায় এর আসল অর্থ হইল—বর্তমানে এই বিষয়ে ‘কোনো মন্তব্য না করা’। কিন্তু চরমপত্র অগ্রাহ্য করা হইয়াছে—মার্কিন পক্ষ থেকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে কিংবা দৈবাৎ এই ছুতা দেখাইয়া হিরো-শিমার উপর তাড়াতাড়ি বোমাবর্ষণ করার নির্দেশ দেওয়া হইল। (১২)

একদিকে দূরপ্রাচ্যে রাশিয়ার উপর একহাত লওয়ার জন্য ট্রুম্যান ও তাঁর পরামর্শদাতারা যেমন জাপানের শান্তি প্রস্তাব অগ্রাহ্য এবং হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে অ্যাটম বোমা বর্ষণের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, অন্যদিকে সোভিয়েত রাশিয়াও তেমন মাফুরিয়া আক্রমণের খাণ্ডেই জাপান যাতে আমেরিকার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া না বসে তার জন্যও কম ব্যস্ত ছিলেন না। কেবল তাই নয়, এই কূটনীতি এমন বিশ্রী ধরনের ছিল যে, সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ভাষার মধ্যে ‘মিথ্যা’র অবতারণা ছিল। একথা লিখিয়াছেন ‘দ্য কোল্ড ওয়ার’ নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থের প্রণেতা উদারতাবাদী ঐতিহাসিক মিঃ ডি এক ক্লেমিং।

“দুই দিন পর ( বোমাবর্ষণের ) সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অভিযোগ আনিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন যে, যেহেতু জাপান আত্মসমর্পণ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছে এবং মিত্রপক্ষ সোভিয়েত সরকারের নিকট এক প্রস্তাব দাখিল করিয়া জাপানী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের জন্য অস্বীকৃত জানাইয়াছেন এবং যেহেতু এর দ্বারা যুদ্ধের স্থায়ীকাল হ্রাস পাইবে, প্রাণহানির সংখ্যা কমিয়া যাইবে এবং বিশ্বব্যাপী দ্রুত শান্তি প্রতিষ্ঠার সহায়তা করা হইবে, সেজন্য সোভিয়েত রাশিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। মিত্রপক্ষের প্রতি মিত্রজনোচিত দায়িত্ব পালনের জন্যই সোভিয়েত সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন এবং ২৬শে জুলাইয়ের ঘোষণার যোগ দিয়াছেন।” (১৩)

জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণার এই ভাষার মধ্যে কারচুপি ও গোঁজামিল ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু মূলতঃ একথা সত্য যে, ইয়াণ্টা চুক্তি অনুসারে ট্যালিন রুডেন্স্ট-চার্চিলের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, জার্মানীর পরাজয়ের তিন মাসের মধ্যেই রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে। সোভিয়েত

(১২) এ্যাটোমিক ডিপ্লোমাসি, পৃষ্ঠা ১৮৫ এবং আলেকজান্ডার তার্ভের পুস্তকে জার্মান লেখকের উদ্ধৃতি, পৃষ্ঠা ৩২৪

(১৩) দ্য কোল্ড ওয়ার, পৃষ্ঠা ৩০৪-৩০৫

পক্ষের দাবি এই যে, ৮ই আগস্ট যুদ্ধে যোগদান করিয়া সোভিয়েত রাশিয়া মিত্রশক্তির প্রতি তাঁদের সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিয়াছেন।

কিন্তু মহাযুদ্ধের উপসংহারের শেষের দিকের এই সমস্ত ঘটনাবলী অত্যন্ত জটিল। কেননা, ইয়ান্টা চুক্তি, অ্যাটম বোমা ও জাপানের আত্মসমর্পণ—এই সমস্ত ব্যাপারগুলি যেন প্রত্যেকের জাতীয় স্বার্থের ও পরিস্থিতির সঙ্গে জট পাকাইয়া গিয়াছিল। আমেরিকা কর্তৃক অ্যাটম বোমা নির্মাণের আগে পর্যন্ত ইয়ান্টা চুক্তির যে মূল্য বা প্রয়োজন ছিল, সেই মূল্য পরে আর রহিল না। বিশেষতঃ প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এঃ চার্চিলের অন্তরঙ্গমহল অত্যন্ত সোভিয়েত-বিরোধী ছিলেন। সুতরাং পারমাণবিক শক্তি কায়স্থ করার পর তাঁরা ষ্ট্যালিনের রাশিয়াকে এড়াইয়া জাপানকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করিতে চাহিলেন। তাঁরা অস্বস্তি করিলেন যে, পারমাণবিক বোমার ব্রহ্মাস্ত্র করার পর পৃথিবীর সামরিক ভারশক্তির পাল্লা তাঁদের দিকে ঘুরিয়া গিয়াছে। সুতরাং তাঁরা আর সোভিয়েতের কোন দাবি মানিতে প্রস্তুত বা ইচ্ছুক নহেন। জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যোগদানও আর তাঁরা চাহিলেন না। অপর পক্ষে ষ্ট্যালিন ইয়ান্টা চুক্তির সুযোগ নিয়া ১৯৪৫ সালের রুশ জাপান যুদ্ধ জারের বা ইম্পিরীয়েল রাশিয়ার পরাজয়ের ‘প্রতিশোধ’ নিতে সুভরাজ্য ও স্বাধীনতা (কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ ও দক্ষিণ শাখালিন) পুনরুদ্ধার করিতে চাহিলেন। এছাড়া মুকডেন ও ডাইরেন বন্দর, মাঞ্চুরিয়ার রেলপথ ইত্যাদির প্রদানও ছিলই।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, চিয়াং কাইসেক যদিও উত্তর চীন ও মাঞ্চুরিয়া সংক্রান্ত ইয়ান্টা চুক্তিতে আপত্তি জানান নাই, কারণ গত ৪০ বছর ধরিয়া এই অঞ্চলে তাঁর কোন পাস্তাই ছিল না, তথাপি মাও সে-তুংয়ের নেতৃত্বে চীনা কমিউনিষ্ট পার্টি ইয়ান্টা চুক্তির এই অংশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। কেননা, এখানে চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির সৈন্তেরা জাপানের বিরুদ্ধে শক্তির যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। মাও সে-তুংয়ের আরও আপত্তির কারণ এই ছিল যে, মার্কিন জেনারেল প্যাট্রিক হার্লি কর্তৃক চীনা জাতীয়তাবাদীদের (কুওমিনটাং) সঙ্গে চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির মিলনের যে সমস্ত শর্ত স্থির করা হইয়াছিল, ষ্ট্যালিন সেগুলি গ্রহণ করিয়া মাও সে-তুংকে চিয়াং কাইসেকের সঙ্গে কোয়ানচিং গঠনের জন্ত চাপ দিয়াছিলেন। কিন্তু মাও সে-তুং সেই প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। (১৪)

কিন্তু এই সমস্ত সত্ত্বেও ষ্ট্যালিন মাঞ্চুরিয়াতে জাপানের বিরুদ্ধে আক্রমণে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিলেন এবং জাপান যাতে একমাত্র আমেরিকার কাছে আত্মসমর্পণ করিতে না পারে, সেদিক অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে হিরোশিমায় মার্কিন অ্যাটম বোমা বর্ষণের জন্ত রাশিয়া প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং ৮ই আগস্ট তারিখে ভাড়াহুড়া করিয়া রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করিল, অনেকের মতে সামরিকভাবে তার আর প্রয়োজন ছিল না। কেন না, জাপান পতনের মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল এবং আত্মসমর্পণের জন্ত প্রস্তুত হইয়াছিল। কলে, এই অবস্থায় জাপানকে আক্রমণ করার রাশিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিমী মহলে বিজ্ঞপাত্মক মন্তব্য উদ্ভূত

করিল এবং শেষ যুদ্ধে রাশিয়া 'লুণ্ঠের মাল কুড়াইবার জন্ত' যুদ্ধে নামিয়াছে, এমন ভীষণ শ্লেষও স্থানিত হইল। কার্যতঃ হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে ৬ই ও ৯ই আগষ্ট পরপর দুইটি পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরিত হওয়ার পরেই জাপানী যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছিল। মিত্রপক্ষ তখন যুদ্ধজয়ের উৎসব করিতেছিলেন। কিন্তু মাফুরিয়া সম্পূর্ণ দখল না হওয়া পর্যন্ত রাশিয়া সে কথা তাদের স্বদেশবাসীকে জানাইতে প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং ১৪ই আগষ্ট জাপানী সত্ৰাটের আত্মসমর্পণ সংক্রান্ত ঘোষণা সত্ত্বেও জাপানী সৈন্তেরা রুশবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ক্ষান্ত দেয় নাই। এই 'যুক্তি' দেখাইয়া সোভিয়েত সেনানীমণ্ডলীর প্রধান জেনারেল আন্তোনোভ ২০শে আগষ্ট পর্যন্ত যুদ্ধ চালাইয়া গেলেন।

এদিকে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে এ্যাটম্ বোমা বর্ষণের সংবাদ রুশ সংবাদপত্র-গুলিতে চাপিয়া যাওয়া হইল কিংবা দেয়া করিয়া অত্যন্ত লম্বাভাবে 'বিদেশী সংবাদের পৃষ্ঠায়' এক কোণে ছাপা হইল।

মিত্রপক্ষের তুলনার রাশিয়াই যে জাপানকে যুদ্ধে হারাইবার বেশী কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছে, এটা জাহির করিবার জন্ত "রুশরা জাপানের চূড়ান্ত আত্মসমর্পণের জাল চলচ্চিত্র তৈরী করিল এবং এমনভাবে সেই চিত্র দেখাইল যে, একমাত্র রাশিয়াই জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে।" (১৫)

\* \* \*

কিন্তু সোভিয়েত পত্র-পত্রিকায় হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে এ্যাটম্ বোমা বর্ষণ সংবাদ কোন প্রাধান্য না পাইলেও সোভিয়েত জনগণের মধ্যে সেই সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল। কলে, দুই রকমের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইল। প্রথমতঃ আমেরিকা কর্তৃক এই প্রলয়ঙ্কর বোমা নির্মিত হওয়ার কোন কোন রুশমহল বিমর্ষ চিন্তে মনে করিলেন যে, এত রক্তপাত ও ত্যাগ স্বীকারের পর জার্মানীকে যে পরাজিত করা হইল সেই সমস্তই বুঝা গেল।

দ্বিতীয়তঃ এ্যাটম বোমার বর্বরতার দ্বারা জাপান এভাবে ঘায়েল হওয়ার রুশ জনগণের মধ্যে জাপানী জনসাধারণের পতি সহানুভূতি উজ্জেক করিল এবং রাশিয়া যে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিয়াছে, তার জন্ত রুশ জনগণ মোটেই উৎসাহ বোধ করিল না। অর্থাৎ জাপানের বিরুদ্ধে মাফুরিয়াতে রাশিয়ার এই যুদ্ধ আদৌ জনপ্রিয় ছিল না। বরং জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে এত প্রাণহানির পর আবার জাপানের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে তাদের যেন যথেষ্ট অনীহা বা অনাগ্রহ ছিল। অবশ্য রাশিয়ার জনগণ তখনও ইয়ান্টা চুক্তির কথা জানিত না। তবু রুশ জনগণ অহুমান করিল যে, হিরোশিমার বোমা ও রুশ যুদ্ধঘোষণার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন একটা সম্পর্ক আছে।...

সোভিয়েত পত্রিকাগুলি এ্যাটম বোমা সম্পর্কে নীরব রহিল বটে, কিন্তু রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণার পর জারের আমল থেকে আজ পর্যন্ত রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানের সমস্ত দুর্কার ও আক্রমণের দীর্ঘ কিরীতি প্রকাশিত হইল এবং ঘোষণা করা হইল 'পোর্ট আর্থারের' কলঙ্ক মুছিয়া দেয়া হইবে।

সুভরাং প্রশ্ন উঠিতে পারে ইম্পিরীয়েল রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির যে তীব্র সমালোচনা আগে সোভিয়েত সংবাদপত্রগুলিতে করা হইয়াছিল, তার সঙ্গে জাপানের বিরুদ্ধে আলোচ্য প্রতিশোধাত্মক নীতির মিল কোথায়? কিংবা এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি কি মার্কসবাদসম্মত? (১৬)

কিন্তু তৎসঙ্গেও ষ্ট্যালিন জাপানী যুদ্ধজয় সম্পর্কে যে বক্তৃতা দিলেন, তা-ও কম হতবুদ্ধিকর নয়। ষ্ট্যালিন বলিলেন যে, ১৯০৪-৫ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের প্রতিশোধ এতদিনে গ্রহণ করা হইল। জার সরকারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়া জাপান বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক পোর্টআর্থার আক্রমণ এবং কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ ও দক্ষিণ শাখালিন গ্রাস করিয়াছিল। “আমরা বয়স্ক ব্যক্তিরা ৪০ বছর ধরিয়া এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। আজ সেই দিন সমাগত।” (১৭)

ষ্ট্যালিনের মত একজন বিশ্ববিখ্যাত বিপ্লবী মার্কসবাদীর মুখে এমন মন্তব্য অভিনব বটে!

## দশম পর্ব

### সপ্তম অধ্যায়

#### জাপানের আত্মসমর্পণ : বিজ্রোহের ষড়যন্ত্র

জাপানকে পরাজিত করার জন্তু আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে যেন একটা দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু হইয়াছিল এবং এই প্রতিযোগিতায় এ্যাটম্ বোমা নিক্ষেপের দ্বারা যদিও আমেরিকা রাশিয়াকে পিছনে ফেলিয়া দিল এবং প্রতিযোগিতায় জয়ী হইল, তবু কিন্তু পরদিন জাপানের আত্মসমর্পণের আগেই রাশিয়া মাঞ্চুরিয়াতে আক্রমণ করিয়া বসিল এবং কার্গতঃ বাজীয়াং করিল। কেন না, রাশিয়াকে বাধ দিয়া একমাত্র আমেরিকার নিষেধ জাপানের আর আত্মসমর্পণ ঘটাইয়া উঠিল না। যদিও পশ্চিমী মহলে একথা প্রচারিত যে, হিরোশিমাতে পারমাণবিক বোমার আঘাতের জন্তুই জাপান মিত্রপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণে বাধ্য হইয়াছিল, তথাপি সমস্ত সামরিক লেখকই এই বিষয়ে একমত নন। এমন কি, কোন কোন বিশিষ্ট মার্কিন গ্রন্থকার পর্যন্ত একথা অস্বীকার করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন :

• • 'Though the fate of Heroshima has stuck in the world's memory and though it has been regarded as the final cause of Japan's capitulation, it seems, in point of fact, that it was the Russian invasion that tilted the Japanese over to put an end to the war.' (>)

'যদিও হিরোশিমার ভাগ্য পৃথিবীব্যাপী মানুষের স্মৃতিতে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে এবং যদিও জাপানের আত্মসমর্পণের এটাই চূড়ান্ত কারণ বলিয়া ধারণা করা হইয়াছে, তথাপি ঘটনাবলী দৃষ্টে মনে হয় যে, রাশিয়ার আক্রমণের জন্তুই জাপান যুদ্ধ শেষ করার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল।'

কারণ, উপরোক্ত মার্কিন গ্রন্থকারদের মতে হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমা বর্ষণের ভয়াবহতা ও বীভৎসতা তখনও হিরোশিমার বাইরে, এমন কি টোকিওতে পর্যন্ত দায়িত্বশীল ব্যক্তিরাও ভালো করিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ জাপানী জনগণ ওখনকার বি-২০ রাকুসে মার্কিন বোমারুর ক্রমাগত ভয়ঙ্কর বোমাবর্ষণে ও ধ্বংস বিস্তারে যেন অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। 'কিন্তু মাঞ্চুরিয়াতে 'রুশ বর্বরদের' আক্রমণ জাপানের কাছে অনেক বেশী ভীতিপ্রদ ছিল। জাপানের পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গেও রাশিয়ার গ্রন্থ একান্তরূপে জড়িত ছিল। কেন না, সাম্যবাদ প্রসারের আতঙ্ক এর পিছনে ছিল। অধিকন্তু সোভিয়েত রাশিয়ার মত আর একটি বৃহৎ শক্তির আক্রমণের মুখোমুখি হওয়ার কোন সাধ্য তখন জাপানের ছিল না।

মার্কিন ছাড়া একজন বৃটিশ গ্রন্থকারও লিখিয়াছেন যে, টোকিওতে যখন আত্মসমর্পণের গ্রন্থ নিয়া উচ্চতর মহলে প্রচণ্ড বিতণ্ডা চলিতেছিল এবং আত্মসমর্পণের

বিরোধীগণ মার্কিন আক্রমণ প্রতিবোধের পক্ষে ওকালতি করিতেছিলেন, তখন টোকিওর পক্ষ মহলে অনেকেরই বিশ্বাস ছিল যে, মার্কিন ও ব্রিটিশরা প্রস্তুত হওয়ার আগেই রুশ আক্রমণ নিশ্চিতরূপে ঘটবে। এমন কি, যদি যুদ্ধ চলিতে থাকে, তবে, জাপানী জাতি নিশ্চয় হইয়া যাইতে পারে। আবার গ্যাটম্ বোমা পড়িতে পারে (১২ আগষ্ট টোকিওতে গ্যাটম্ বোমা পড়িবে বলিয়া জোর গুজব রটিয়াছিল) এবং যদি আর পারমাণবিক আক্রমণ নাও ঘটে, তবু রুশ আক্রমণ ঘটতে পারে এবং রুশ আক্রমণের অর্থ-ই হইতেছে জাপানী রাজবংশের বিনাশ—‘a Russian invasion would mean an end of the imperial house.’ (২)

রুশ আক্রমণের এই ভীতি জাপান সম্রাটের বিশ্বাসভাজন ও সম্মানভাজন উপদেষ্টাগণের মধ্যেও ছিল।

উইলিয়াম ফ্রেগ নামক আর একজন বিশিষ্ট ইংরাজ গ্রন্থকার জাপানের পতন সম্পর্কে তাঁর রচিত এক চাক্ষু্যকর পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা বর্ষণের দিনসকালে—২ই আগষ্ট, যখন সংবাদ আসিল যে, সোভিয়েত সৈন্যরা মাকুরিমা সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছে, তখন প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ প্রধানমন্ত্রী সূজুকি আর্ট-নাদ করিয়া উঠিলেন—‘খেইলু খতম্’—‘The game is up’ (৩)

সুতরাং তিনি ও তাঁর মতাবলম্বীগণ যুদ্ধ শেষ করার দিকে ঝুঁকিলেন। অতএব জাপানের আত্মসমর্পণে রাণিয়ার ভূমিকাকে লঘু করিয়া দখল যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। বরং ‘আধুনিক জাপানের ইতিহাস’ লেখক রিচার্ড স্টোরী স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে, ৮ই আগষ্ট জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত আক্রমণ গ্যাটোমিক বোমার মতই চূড়ান্ত পর্যায়ের ছিল এবং যুদ্ধ শেষ করিতে জাপানকে বাধ্য করিয়াছিল।

\* \* \*

জাপানের আত্মসমর্পণ বহু নাটকীয় এবং জটিল ঘটনায় পরিপূর্ণ, যেগুলির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে, সংক্ষেপে একথা উল্লেখ করা যায় যে, ঘটনার এই জটিলতার জন্য শেষ পর্যন্ত স্বয়ং জাপানের সম্রাট হিরোহিতোকে আসরে নামিতে হইয়াছিল, যা ছিল জাপানের ও রাজবংশের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। কেন না, ‘দেবতুল্য’ মহামান্য সম্রাট কখনও ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হইয়া জনগণকে নির্দেশ দেন না কিংবা তাঁর মন্ত্রিবর্গও তাঁর ব্যক্তিগত উপদেশ ও নির্দেশ লাভের জন্য কখনও তাঁকে বিব্রত করেন না—এটা ছিল জাপানের প্রচলিত প্রথা বা কনভেনশন। কিন্তু এবার জাপান যে অভ্যন্তরীণ সঙ্কটের সম্মুখীন হইল, তাতে সম্রাটকে ভাবিতে হইল, এমন কি ব্যক্তিগতভাবে শেষ পর্যন্ত অংশ নিতে হইল। সম্রাট হিরোহিতো চীনের কনফুসিয়াসের দার্শনিক মতবাদের দ্বারা কিছুটা প্রভাবাধিত হইয়াছিলেন

(২) A History of Modern Japan—by Richard Storry, Pelican, London, p. 233.

(৩) The Fall of Japan—by William Craig, Pan books, London, 1970, p. 97-98

এবং এই শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে ওক্ গাছের মত সোজানুজি দাঁড়াইতে নাই। কারণ, তাহলে ভাঙিয়া পড়িয়া চূর্ণ হইতে হইবে। বরং উইলো গাছের মত নমনীয় হইতে হইবে, যাতে ঝড়ের তাণ্ডব খামিয়া গেলে আবার সে মাথা, উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারে। (৪)

অর্থাৎ হিরোহিতো যুদ্ধ শেষ ও শান্তির পথ অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু জাপানে জর্জীবাধের প্রাবল্য ছিল, আর্মি ও নেভির এবং বিশেষভাবে আর্মির দাপট বেশী ছিল। কিন্তু ১২৪৪ সালের জুলাই মাসে সাইপান দ্বীপের পরাজয়ের ফলে জেনারেল তোজোর সরকারের পতন হওয়ায় ক্ষমতার বেস্ত্রবিন্দু ক্রমশঃ সিভিলিয়ান বা অ-সামরিক নেতৃত্বের দিকে সরিয়া আসিতেছিল এবং ‘জুসিন’ বা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীদের গঠিত কাউন্সিলের চাপ বৃদ্ধি পাইতেছিল। যদিও ‘জেনরো’ (Genro) বা বয়োজ্যেষ্ঠ রাষ্ট্রনেতাদের সংগঠনের মত এই কাউন্সিলের কোন সংবিধানগত ক্ষমতা ছিল না, তবু যুদ্ধের এই সঙ্কটে এর প্রভাব ক্রমশঃ বাড়িতেছিল। কিন্তু সৈন্ত ও নৌবাহিনী যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে চাহিতেছিল—যদিও সিনিয়র অফিসারেরা উপলব্ধি করিতেছিলেন যে, যুদ্ধ জয়ের আর কোন আশা নাই, তবু যুদ্ধ ফুটিয়া প্রকাশ্যে কেউ সেকথা কবুল করিতে সাহস পাইতেছিলেন না। কেন না, উগ্র-মস্তিষ্ক তরুণ সৈন্যদের পক্ষ থেকে টেরোরিজম ও হত্যাকাণ্ডের ভয় ছিল। কারণ, ‘জাপানের ইতিহাসে কেউ কখনও শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করে নাই এবং এটা একটা ধর্মীয় বিশ্বাস বা ‘cult’-এর মত দাঁড়াইয়া গিয়াছিল।’ (৫)

তথাপি গোপনে এবং পর্দার আড়ালে ‘সম্মানজনক শান্তি’ স্থাপনের জন্য মিজপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা চলিতেছিল এবং তখন বিপর্যয় জাপানের সম্মুখে মিজপক্ষের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ দাবির পটভূমিকায় জাপানের একটি মাত্র প্রস্তাব স্পষ্ট ও জোরদার হইয়া উঠিল—সম্রাটের মর্যাদা ও অধিকারের নিশ্চয়তা বা গ্যারান্টি আদায় করিতে হইবে।

কিন্তু সম্রাট সম্পর্কে জাপানের জনগণের যত ভক্তিই থাকুক না কেন, পশ্চিমী মহলে এটা নিতান্তই একটা ‘সেক্টিমেন্ট’ বলিয়া বিবেচিত ছিল। এমন কি, খোদ আমেরিকাতে পর্বন্ত সম্রাট ও রাজবংশের বিরোধী মনোভাব প্রবল ছিল। বিশেষতঃ পার্ল হারবার আক্রমণের বিশ্বাসঘাতকতা স্মরণ করিয়া বহু আমেরিকান হিরোহিতোকে ‘যুদ্ধাপরাধী’ বলিয়া পর্বন্ত মনে করিতেন। কারণ, এই আক্রমণের সিদ্ধান্ত সেনানায়ীমণ্ডলীর হইয়া থাকিলেও এর পিছনে জাপ সম্রাটের অহুমোদন ছিল। সোভিয়েট উচ্চতম নেতৃত্বও সম্রাট হিরোহিতোকে যুদ্ধাপরাধী বলিয়া মনে করিতেন।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ও মার্কিন সমরসচিব ষ্টিমসন জাপানের সম্রাট সম্পর্কে জাপানীদের মনোভাবের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। কারণ, সম্রাটকে বজায় রাখিলে তাঁর মাধ্যমে জাপানে দখলদারির কার্য পরিচালনা এবং বহুদূর বিস্তৃত জাপ

(৪) টোট্যাল ওয়ার—দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪১

(৫) পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৩৪২



সম্রাজ্যে সৈন্তবাহিনীর আত্মসমর্পণ গ্রহণ করা সহজতর হইবে—এই বাস্তব বুদ্ধির দ্বারা ট্রুম্যান ও ষ্টিমসন পরিচালিত হইলেন। সুতরাং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও তাঁর উপদেষ্টাগণ পটসডাম সম্মেলন থেকে ঘোষিত নিষ্পত্তি আত্মসমর্পণের দাবির জবাবে জাপানীদের বক্তব্য সোজাশুষ্ক গ্রহণ না করিয়া এমনভাবে একটি বার্তা রচনা করিলেন যাতে জাপ সম্রাটের মর্যাদাও রক্ষা পায়, অথচ বাস্তব নিষ্পত্তি আত্মসমর্পণের দাবিও বজায় থাকে। সোজা কথায় ‘সাপও মরে এবং লাঠিও না ভাঙ্গে’—এমন কূটনৈতিক কৌশলই অবলম্বিত হইল।

\*

\*

\*

এদিকে টোকিওতে তখন রাজপ্রাসাদ ও পটসডাম ঘোষণাকে কেন্দ্র করিয়া কি নাটক জমিয়া উঠিতেছিল? ৮ই আগষ্ট মাস্কুরিয়াতে রুশ আক্রমণের সংবাদ যেন পারমাণবিক বোমা বর্ষণের মতই বজ্রাঘাত তুল্য ছিল। ‘এই তারিখটিই সম্ভবত জাপানের ইতিহাসে সবচেয়ে সঙ্কটজনক ছিল।’ (৬)

জাপানে যুদ্ধ পরিচালনার জন্ত অল্প কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের নিষা যে সূত্রীয় কাউন্সিল গঠিত ছিল, ২ই আগষ্ট সকালে সেই কাউন্সিলের বৈঠক বলিল নতুন পরিস্থিতি ও শাস্তির শর্ত আলোচনার জন্ত। এই কাউন্সিলের বৈঠক ৬ জন সদস্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যথা—প্রধানমন্ত্রী সূজুকি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী টোগো, নৌমন্ত্রী ইয়োনাই, সমর মন্ত্রী আনামি এবং নৌ ও স্থল সেনানীমণ্ডলীর দুই প্রধান জেনারেল উমেজু এবং এ্যাডমিরাল তয়োদা। অন্যান্য সহকারীদের এই বৈঠক থেকে বাদ দেওয়া হইল, পাছে তারা প্রভাব বিস্তার করে, এই আশঙ্কায়।

এই সভার আলোচনায় দেখা গেল যে, সূজুকি, টোগো এবং ইয়োনাই একমাত্র সম্রাটের মর্যাদার প্রশ্ন বাদ দিয়া পটসডাম ঘোষণার বাকী শর্তগুলি গ্রহণে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু সমরমন্ত্রী আনামি প্রভৃতি বাকী তিনজন তাতে রাজী ছিলেন না। তাঁদের মতে পটসডাম ঘোষণা গ্রহণের জন্ত জাপানের পক্ষ থেকে মোট ষাটটি শর্ত জুড়িয়া দিতে হইবে, যথা—

- (ক) সম্রাটের অধিকার ও মর্যাদা এবং রাজতন্ত্র রক্ষা করিতে হইবে।
- (খ) শত্রু সৈন্তদল কর্তৃক জাপান দখল করা চলিবে না।
- (গ) জাপানীরা নিজেরাই তাদের সশস্ত্র বাহিনীগুলিকে নিরস্ত্র করিবে এবং
- (ঘ) জাপানী যুদ্ধাপরাধীদেরকে জাপানই বিচার করিবে।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও নৌমন্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে বলিলেন যে, একমাত্র সম্রাটের প্রশ্ন ছাড়া বাকী সমস্ত শর্ত আরোপ করা বৃথা। মিত্রপক্ষ এগুলির কিছুই গ্রহণ করিতে রাজী হইবেন না। সুতরাং সূত্রীয় কাউন্সিলের ৬ জনের বৈঠকে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল না। তখন সমগ্র বিষয়টি বিবেচনার জন্ত ক্যাভিনেট বা মন্ত্রিসভার পেশ করা হইল। সেদিন অপরাহ্নে ও সন্ধ্যার দীর্ঘ ৭ ঘণ্টা ধরিয়া বিশদ আলোচনা ও বিতর্ক হইল। কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে পারিল না।

অথচ সে দিনই (২ই আগষ্ট) সকালে খবর আসিল যে, নাগাসাকিতে দ্বিতীয় অ্যাটোমিক বোমা বর্ষিত হইয়াছে। সুতরাং অনেক বিভক্তের পর রাত দশটার মস্তিস্তার মিটিং খতম হইয়া গেল এবং প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী সোজা সম্মেলনের কাছে গেলেন রিপোর্ট দেওয়ার জন্য। তাঁরা অল্পোখ জানাইলেন সেদিনই অবিলম্বে এই জরুরী অবস্থা বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সম্মেলনের সমক্ষে সুপ্রীম কাউন্সিলের অধিবেশন ডাকার জন্তে। (৭)

বিমান আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সম্মেলনের প্রাসাদ-সংলগ্ন ভূগর্ভে যে আশ্রয় ভৈরী হইয়াছিল, এই অসাধারণ সভা সেখানে অনুষ্ঠিত হইল। কিন্তু ভূগর্ভের এই আশ্রয়টি ছিল নিতান্তই স্বল্পায়তন—লম্বায় ৩০ ফুট, চওড়ায় ১৮ ফুট। ১১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বর্ণাচিত্রিত কিংখাবে (ব্রকেড্) মোড়া (যুদ্ধের এই অবস্থায়ও কিছুটা রাজকীয় আদবকারী ছিল) একটি দীর্ঘ টেবিলের চারদিকে মিলিত হইয়াছিলেন। কক্ষটি সুরক্ষিত ছিল বটে, কিন্তু হাওয়া-বাতাসের কোন ব্যবস্থা ছিল না। সুতরাং আগষ্ট মাসে সেই ভ্যাপসা গরমের দিনে সাজসজ্জা পরিহিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যেন ঘরাক্ত কলেবর হইতেন। ১১ জনের মধ্যে ৬ জন ছিলেন পূর্বোক্ত সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্য—‘বিগ সিক্স’ নামে পরিচিত এবং এঁদের হাতেই ছিল জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে নীতি নির্ধারণের অধিকার। বাকী চারজন ছিলেন সেক্রেটারি এবং একজন ছিলেন নিমন্ত্রিত ‘অতিথি’।

৮১ বছর বয়স্ক বৃদ্ধ কাটারো সুজুকি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ও ‘বিগ সিক্সের’ তথাকথিত নেতা। কিন্তু তিনি জাপানের একজন অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। কারণ ১৯০৪-৫ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধে তিনি একজন হীরা ছিলেন। কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সে শান্তি ও যুদ্ধের মধ্যে তিনি কোন মতি স্থির করিতে পারিতেন নাই এবং ব্যক্তিগতভাবে যদিও তাঁর কোন ক্ষত্র ছিল না, তবু আত্মসমর্পণের প্রস্তাব গ্রহণে টেরোয়িষ্টদের হাতে তাঁর প্রাণনাশের ভয় ছিল।

৬৩ বছর বয়স্ক পররাষ্ট্রমন্ত্রী টোগো শান্তির পক্ষপাতী ছিলেন। আর ৬৫ বছরের নৌমন্ত্রী ইয়োনাই (যিনি হাইস্কির ডক্ট ছিলেন) ছিলেন প্রো-আমেরিকান। সুতরাং জঙ্গীবাদীদের দাপটে তিনি অবসর নিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তিন বছর পর ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে তোকোর পতনের পর আবার নৌমন্ত্রীর ক্ষমতায় ফিরে আসেন। টোগো, ইয়োনাই ও সুজুকির বিরুদ্ধে ছিলেন ৫৭ বছর বয়স্ক যুদ্ধমন্ত্রী জেনারেল আনামি এবং অপর দুইজন হল ও নৌ সেনানীমণ্ডলীর অধ্যক্ষ জেনারেল উমেজু ও গ্র্যাডমিরাল তয়োদা—এঁরাই ছিলেন ১৯৩১-৩০ সাল পর্যন্ত মাকুরিয়া ও চীনে আক্রমণ ও বৃদ্ধ চালাইবার জন্য শায়ী। (আর এই সমগ্র ব্যাপারটার পরিকল্পনাকারী ও উদ্ভাবনকারী ছিলেন জেনারেল তোজো)।

এই ইম্পারিয়াল সম্মেলনে যিনি অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন, তিনি ছিলেন জাপানের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের অন্তর্গত ৮০ বছর বয়স্ক ব্যারন কিচিরো হিরানুমি, প্রীতি কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট এই কাউন্সিল ছিল খোদ সম্মেলনের পরামর্শদাতা।

অভিজ্ঞাত হিচুমা রাজগুরু, দেশভক্ত এবং জাতীয়তাবাদী ছিলেন। গত কয়েক দশক ধরে তিনি জাপানের বহু বক্তারক্তি কাণ্ড এবং সামরিক উঠানামার সাক্ষী ছিলেন। তিনি কৌশলী, তেজস্বী এবং আলোচনা চালাইতে দক্ষ ছিলেন। ১৯৪১ সালে সম্রাসবাদীরা তাঁকে হত্যা করিতে চাহিয়াছিল এবং তিনি আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের বিরোধী ছিলেন। তোকো ক্ষমতায় আসার পর তিনি পদার আড়ালে চলিয়া গেলেন। কিন্তু আজ যুদ্ধের উপসংহারের দিনে তিনি সিংহাসনকে রক্ষা এবং সরকারী গ্রুপবাক্সির তীব্র বিরোধ থেকে দেশকে উদ্ধারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন ... :

ভূগর্ভের সেই আশ্রয়শালায় সমবেত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ২৫ মিনিট ধরিয়া অপেক্ষা করার পর জাপানের 'দ্বিবা শাসক' একজন সহকারীসহ তাঁর আবাস কক্ষের দরজা খুলিয়া প্রবেশ করিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি টেবিলের মাথায় একটি চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন এবং তাঁর প্রজাবৃন্দ অভিবাধনপূর্বক আসনে উপবেশন করিলেন। কিন্তু উপস্থিত ব্যক্তিরা যখন দেখিলেন যে, তাঁদের মহামান্য সম্রাট মাথার চুল আচড়ান নাই এবং দাড়িও কামান নাই, তখন তাঁরা বিমর্ষ হইলেন।

হিরোহিতোর জন্ম ১৯০১ সালে। যুবরাজ হিসাবে জাপানের বাইরে ইউরোপ পরিদর্শন করিয়া তিনি রক্ষণশীলদেরকে হতভম্ব করিয়া দিয়াছিলেন এবং রাজসংশ্লেশে যে মহিলাকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন, তিনি পাঁচ বছর বাগদত্তা ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মাত্র ২৪৪ বার তাঁদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং এই সমস্ত ব্যাপার নিয়া তখন প্রাসাদের রাজকীয় মহলে যথেষ্ট নিশ্চিন্ত ও সমালোচনা হইয়াছিল। কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে হিরোহিতো সৎ ও বিজ্ঞানভূরাগী ছিলেন। ১৯২৪ সালে তাঁর বিবাহ এবং ১৯২৬ সালে তিনি জাপানের ১২৪তম সম্রাটরূপে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর পরলোকগত পিতা বিকৃত মস্তিষ্ক ছিলেন।...

সভার নিয়মমাত্তিক প্রধান মন্ত্রী নুজুকি পটসডাম ঘোষণার বয়ান পড়িয়া শুনাইবার জন্ত ক্যাথিনেট সেক্রেটারিকে নির্দেশ দিলেন এবং ঘোষণাটি যদিও সকলের জানা ছিল, তবু আবার পড়া হইল। তখন নুজুকি সম্রাটকে বুঝাইয়া দিলেন যে, সারাদিন আলোচনার পরেও তাঁরা ৬ জন এই ঘোষণা গ্রহণ সম্পর্কে একমত হইতে পারেন নাই এবং কার্যতঃ অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং পুনরায় সম্রাটের উপস্থিতিতে এই আলোচনার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

প্রধান মন্ত্রী নুজুকি প্রথমেই পররাষ্ট্র মন্ত্রী টোগোকে তাঁর মতামত জানাইতে অনুরোধ করিলেন এবং টোগো বলিলেন—'যদিও পটসডাম ঘোষণা গ্রহণ করা নিতান্তই অসম্মানজনক, তবু এটা গ্রহণ না করেও উপায় নেই। তবে, সম্রাটের মর্বাদা ও অধিকার নিশ্চয়ই রক্ষা করিতে হবে।'

নৌ-মন্ত্রীও অনুরূপ মতামত প্রকাশ করা মাত্র যুদ্ধমন্ত্রী আনামি তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিলেন এবং উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—'কিন্তু ভেই না। আমাদের সৈন্তেরা যথেষ্ট রক্ষার জন্ত এখনও যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত। বতর্কণ পর্বত আমাদের

প্রদত্ত চারটি শর্ত গৃহীত না হয় (এই মতগুলি উপরেই উল্লেখ করা হইয়াছে) ততক্ষণ যুদ্ধ না চালাইয়া উপায় নাই।’...

এভাবে উত্তেজিত আলোচনার সময় কৌশলী ব্যারন হিরাগুমা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—‘রাশিয়া যুদ্ধের ঘোষণা করিল কেন?’

টোগো জবাব দিলেন—‘রাশিয়া মধ্যস্থের ভূমিকা নিতে ইচ্ছুক ছিল না, যুদ্ধ করিতেই ইচ্ছুক ছিল।’

‘কিন্তু রাশিয়া বলিয়াছে যে, জাপানী গবর্নমেন্ট ২৮শে জুলাই তারিখ পটসডাম ঘোষণা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। একথা কি সত্য?’—জিজ্ঞাসা করিলেন হিরাগুমা।

টোগো উত্তর দিলেন—‘না, আমরা অগ্রাহ্য করি নাই।’

টোগোর এই জবাব সত্য ছিল। কিন্তু আসলে গোল বাধিয়াছিল জাপানী জবাবের মধ্যে ‘mokusatsu’ শব্দটির মার্কিন পক্ষীয় অর্থবাদ নিয়া।।...

এভাবে কিছুক্ষণ প্রস্তোত্তরের পর ব্যারন হিরাগুমা জঙ্গীবাদীদের উদ্দেশ্যে খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করিলেন—‘আপনারা এ্যাটম্ বোমার আঘাত ঠেকাইতে পারিবেন এবং যুদ্ধের এই অবস্থায় কিভাবেই বা আত্মরক্ষা করা সম্ভব?’

এই সমস্ত স্পষ্ট প্রশ্নের জবাবে জঙ্গীবাদী আনামি, উমেজু, তায়োদা বোবার মত বসিয়া রহিলেন।।...

তখন প্রধান মন্ত্রী সুজুকি তাঁর ভুরুপের তাস নিক্ষেপের জন্ত প্রস্তুত হইলেন, ২ই তারিখ সকালে মাফুরিয়ার রুশ আক্রমণের সংবাদ পাওয়ার পর তিনি টোগো ও মার্কুৎস কিডোর সঙ্গে সম্রাটের সহিত একটি গোপন বুঝাপড়ার উপনীত হইলেন এবং স্থির করিলেন যে, পটসডাম ঘোষণা গ্রহণ করা হইবে। সুতরাং সেদিনের মিটিংয়ে তারা নিজেরা কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্ত ভোট দিবেন না—চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভার দেওয়া হইবে স্বয়ং সম্রাটের উপর।

পর্দার আড়ালে এই গোপন বুঝাপড়ার পর রাজি ২টার সময় দুই ঘণ্টার অধিক কাল ধরিয়া আলোচনার পর যখন কোন মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে পারিল না, তখন হঠাৎ প্রধান মন্ত্রী সুজুকি দাঁড়াইয়া উঠিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, মহামান্য সম্রাট এই অবস্থায় তাঁর রাজকীয় সিদ্ধান্ত দিয়া জাতিকে সঙ্কট থেকে রক্ষা করুন।

বিরোধী জঙ্গীবাদী নেতারা কখনও এমন একটা অবস্থার জন্ত প্রস্তুত ছিলেন না এবং তাঁরা কখনও প্রত্যাশা করেন নাই যে, সম্রাটকে তাঁর সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিতে অহুরোধ করা হইবে।

তখন সেই নিঃশব্দ সভাকক্ষে হিরোহিটো উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন :

‘I have given serious thought to the situation prevailing at home and abroad and have concluded that continuing the war can only mean destruction for the nation and a prolongation of bloodshed and cruelty in the world....’

অর্থাৎ স্বদেশ ও বিদেশের পরিস্থিতি আমি গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, যুদ্ধ আরও চালাইবার অর্থ হইতেছে জাতির আরও ধ্বংস এবং পৃথিবীতে রক্তপাত ও নিষ্ঠুরতা দীর্ঘায়িত করা।’ (৮)

সম্রাট হিরোহিতো তাঁর এই বক্তৃতায় প্রজাবৃন্দের অশেষ দুঃখের কথা এবং যুদ্ধ চালাইবার অক্ষমতার কথাও বর্ণনা করিলেন এবং সিদ্ধান্ত করিলেন যে, পটগডাম ঘোষণা গ্রহণ ও যুদ্ধ শেষ করিতে হইবে—“এমন একটা সময় আসিয়াছে, যখন অসহনীয়কেও সহ্য করিতে হইবে।”...

সমগ্র সভাকক্ষ নিস্তব্ধ হইল। কাহারও একটি পা’ও নড়িল না এবং কেহ সমর্থন বা বিরোধীতাও করিলেন না।

তখন প্রধান মন্ত্রী দাড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—‘সম্রাটের সিদ্ধান্ত সম্মেলনেরও সিদ্ধান্ত।’ সুজুকির তুফপের তাস নিক্ষেপ সার্থক হইল।...

এরপর রাজি ওটার সময় প্রধান মন্ত্রীর গৃহে মন্ত্রিসভার পূর্ণ অধিবেশন বসিল এবং সম্রাটের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। অর্থাৎ যুদ্ধ শেষ করিতে হইবে। তবে, একমাত্র শর্ত সম্রাটের মর্যাদা রক্ষা করিতে হইবে। ইতিমধ্যে সেনানীমণ্ডলীর প্রধান উমেজুর সহকারী জেনারেল যোশীজুমি ঘটনার এই পরিণতিতে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রধান মন্ত্রী সুজুকির প্রতি আক্রমণোত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁকে নিরস্ত করা হইল।

ভোর রাজি চারটার মন্ত্রিসভার বৈঠক ভাঙিল এবং সারাদিন ও সারারাত্রির ক্লাস্তির পর মন্ত্রিরা স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।...

এদিকে সকাল ৭-৩০ মিনিটের সময় টোকিও শহরের মধ্যস্থলে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দপ্তর থেকে বেতার-বক্তৃতা এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের সাক্ষাতিক বার্তা সুইজারল্যান্ড-সুইডেনের মারফৎ মিত্রপক্ষের বিভিন্ন রাজধানীতে পাঠাইতে লাগিলেন।

### ওয়াশিংটনের প্রতিক্রিয়া

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তাঁর আত্মবৃত্তিতে লিখিয়াছেন যে, মক্কাহিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারিস্যান তাঁকে জানাইয়াছেন যে, হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমা বর্ষণের পর ২৫ আগষ্ট সোভিয়েত সরকার জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং মাফুরিয়া সীমান্ত আক্রমণ করিলেন। ষ্ট্যালিন বলিয়াছেন যে, সোভিয়েতের পূর্ব প্রতিশ্রুতি অঙ্গবাহী জার্মানীর পরাজয়ের ঠিক তিন মাস পরেই রাশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে যোগদান করিল এবং ষ্ট্যালিন স্বয়ং এ্যাটম বোমা সম্পর্কে অভ্যস্ত কৌতূহল দেখাইলেন। তিনি বলিলেন যে, এর কলে জাপানী যুদ্ধ শেষ হইয়া বাইতে পারে। তবে, এ্যাটম বোমার রহস্য গোপন রাখিতে হইবে। অধিকৃত বাগিনের ল্যাবরোটোরিগুলিতে এমন প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যাতে বুঝা যায় যে, জার্মানীও এ্যাটম তত্ত্বের লব্ধ চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু কোন কল লাভ করিতে পারে নাই। ‘ষ্ট্যালিন আরও বলিলেন

(৮) দি কল অব জাপান—উইলিয়াম ক্লেইগ, প্যানথক, লণ্ডন, ১৯৭০, পৃষ্ঠা ১০৩-১০৮

যে, সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকরাও এই সমস্ত সমাধানের জ্ঞান চেটে। করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁরা সকল হন নাই।'—(২)

২ই আগস্ট তারিখে নাগাসাকিতে দ্বিতীয় পারমাণবিক বোমা সম্পর্কে ট্রুম্যান লিখিয়াছেন যে, দ্বিতীয় এ্যাটম বোমা নিক্ষেপের কণা ছিল কোকুয়াতে এবং সেখানে সম্ভব না হইলে নাগাসাকিতে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা কোকুয়াতে পৌঁছিবাব পরেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং বিমানটি তিনবার ঘুরিয়াও লক্ষ্যস্থানের হৃদিশ পাইল না। এদিকে বিমানের গ্যাস ফুরাইয়া আসিতেছিল এবং সেটা বিপদের কথা ছিল। সুতরাং বিকল্প লক্ষ্য হিসাবে নাগাসাকির দিকে ধাওয়া করা হইল। কিন্তু নাগাসাকির আকাশেও মেঘ ঘনাইয়া আসিল। কিন্তু ইতিমধ্যে ষষ্ঠাৎ মেঘের ফাঁক দিয়া নাগাসাকি শহর বোমারু বৈমানিকের দৃষ্টিগোচর হইল। তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় এ্যাটমবোমা নাগাসাকির উপর নিক্ষেপ হইল।

ট্রুম্যানের মতে নাগাসাকির উপর দ্বিতীয় পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের কলে টোকিওতে বাহ্যতঃ ত্রাসের সৃষ্টি হইল। কারণ, পরদিন এমন আভাব পাওয়া গেল যে, জাপান আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছে।

১০ই এপ্রিল সকাল সাড়ে ৭টার টোকিও রেডিও থেকে এবং পবে দুপুরবেলা ওয়াশিংটনে সরকারীভাবে সুইডিস ও সুইস দূতাবাসের মারফৎ জাপানের আত্মসমর্পণের জ্ঞান 'মহিমাম্বিত সম্রাটের অহুজার' ধবর পাওয়া গেল। ২৬শে জুলাই, ১৯৪৫, পটসডাম থেকে ব্রুটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন এবং পরে সোভিয়েত রাষ্ট্রনায়কের অহুমোদিত যে চরমপত্র ঘোষিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, জাপান তা' গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু সর্ব এই যে, সার্বভৌম শাসক হিসাবে সম্রাটের বিশেষ অধিকার ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা চলিবে না। জাপানী গবর্নমেন্ট আশা করেন যে, তাঁদের এই অহুরোধ রক্ষা করা সম্পর্কে মিত্রপক্ষের কাছ থেকে অতি দ্রুত স্পষ্ট আণ্ডাব পাওয়া যাইবে।

এই বার্তা পাওয়ার পর ট্রুম্যান তাঁর সমর, নৌ, পররাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রপতির প্রধান বণ অধিকর্তা—এই চারজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। কিন্তু প্রথম উঠিল জাপানের সম্রাট জাপানী প্রশাসনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং তাঁকে বজায় রাখিয়া জাপানের জঙ্গীবাদ উচ্ছেদ করা কি সম্ভব?

তখন মন্ত্রীরা তাঁকে যে পরামর্শ দিলেন সংক্ষেপে তার মর্ম এই যে, জাপানী সম্রাজ্যের আত্মসমর্পণ কার্যকর করার পক্ষে সম্রাটকে বজায় রাখা সুবিধাজনক হইবে। কেননা, সম্রাটের অহুজা লঙ্ঘন করিতে কেউ সাহস পাইবে না। অপর দিকে পটসডাম ঘোষণার নিশর্ত আত্মসমর্পণ দাবীর মর্যাদাও বজায় রাখিতে হইবে। সুতরাং অনেক চিন্তা ভাবনাব পর এই মর্মে এক জবাবের খসড়া রচিত হইল যে, জাপান কর্তৃক আত্মসমর্পণের পর থেকে সম্রাটের ও জাপান সরকারের কর্তৃত্ব মিত্রপক্ষীয় সুপ্রাথমিক কমান্ডারের আত্মাধীন হইবে। অধিকন্তু সম্রাট ও জাপানী হাইকম্যান্ডকে আত্মসমর্পণের সর্ব স্বাক্ষর করিতে হইবে।

সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ, চীনা ও রুশ সরকারকে এই খসড়া জবাবের প্রতিলিপি পাঠাইয়া দেওয়া হইল। এই খসড়া গৃহীত হইল বটে, কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রধান মন্ত্রী এ্যাটলি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেভিন সন্মত সম্পর্কে এই মর্মে এক সংশোধনী প্রস্তাব জুড়িয়া দিলেন যে, জাপান গবর্নমেন্ট ও জাপানী হাইকমাণ্ডের আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষরদান সন্মত কর্তৃক স্মৃতিস্তম্ভ করিতে এবং তাঁদেরকে উপযুক্ত ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব অর্পণ করিতে হইবে।

চীন ট্রুম্যানের প্রস্তাব গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু সোভিয়েত সরকার জানাইলেন যে, জাপানের প্রস্তাব নিশ্চয় আত্মসমর্পণ নয়। সুতরাং সোভিয়েত সৈন্যেরা মাকুরিয়ার যুদ্ধ বন্ধ না করিয়া আগাইয়া যাইতেছে। তবে, মার্কিন প্রস্তাব সম্পর্কে সোভিয়েত সরকার কিছুটা ইতস্ততঃ ও বিধাগ্রস্ত মনোভাবের পব জানাইলেন যে, প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের খসড়া প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য বটে, কিন্তু জাপানী আত্মসমর্পণ কার্যকর করার জ্ঞান মার্কিন ও সোভিয়েত (মার্শাল ভেসিলেভিচ) দুইজন সুপ্রীম কমান্ডার নিয়োগ করা উচিত। মার্কিন পক্ষ সরাসরি এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিল।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য মনোটাও ও ট্যালিন পরাম্পরের সঙ্গে পরামর্শের পর সেই রাডেই মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে টেলিফোনে জানাইয়া দিলেন যে, তাঁরা ট্রুম্যানের খসড়া প্রস্তাবেই সম্মত।

ট্রুম্যান লিখিয় ছেন যে, মিত্রশক্তি কর্তৃক দখলীকৃত জার্মানীতে যে তিস্ত অভিজ্ঞতা তাঁদের হইয়াছে তাতে জাপান সম্পর্কে তার পুনরাবৃত্তি না করিতে ট্রুম্যান স্বয়ং দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ছিলেন। অধিকৃত জার্মানীতে ও অস্ট্রিয়াতে সোভিয়েতের আচরণ থেকে আমেরিকার যে যে শিখালাভ হইয়াছে, তাতে মিত্রশক্তিবর্গকে কিছুতেই জাপানে দখলকারির অংশ দেওয়া হইবে না। (১০)

\*

\*

\*

মিত্রপক্ষের তিন শক্তির কাছ থেকে অহুমোদন লাভের পর প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান জাপানের উদ্দেশ্যে বিচিত্র তাঁর বার্তায় ব্রিটিশ সংশোধনী প্রস্তাবের সঙ্গে নিজেদের সংযোজন যুক্ত করিয়া সন্মত সম্পর্কে নিম্নলিখিত চূড়ান্ত বাক্যটি রচন করিলেন :

“The Emperor will be required to authorize and ensure the signature the Government of Japan...”

এই বার্তা স্বাক্ষরের তারিখ ছিল ১১ আগষ্ট, ১৯৪৫ এবং কূটনৈতিক নিয়মমাসিক সুইস দূতাবাসের মারকং টোকিওতে এই বার্তা পাঠানো হইল।

জেনারেল ম্যাক-আর্থার মিত্রপক্ষের ভরক থেকে জাপানের সুপ্রীম কমান্ডার নিযুক্ত হইলেন এবং জাপানের আত্মসমর্পণ গ্রহণের অধিকার তাঁকে দেওয়া হইল। অধিকন্তু নির্দেশ দেওয়া হইল যে, জাপানী সৈন্যবাহিনীকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় লর্ড মাউন্ট-ব্যাটেনের কাছে, দুবপ্রাচ্যে সোভিয়েত হাইকমাণ্ডের কাছে এবং চীনে চিয়াং কাই-সেকের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে।

কিন্তু চীনে জেনারেল চিয়াং কাইসেকের সঙ্গে চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির তীব্র

(১০) পূর্বোক্ত পৃষ্ঠক, পৃষ্ঠা ৪৭৬

বিষয়—(৩)—১৪

বিরোধের জন্তু জাপানী সৈন্যদের আত্মসমর্পণের প্রস্তাবও তিক্ত মন্তব্যে দেখা দিল। কারণ, চীনা কমিউনিষ্ট বাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল চুং কমিউনিষ্ট দখলী-কৃত এলাকাগুলিতে জাপানী সৈন্যদেরকে তাঁদের (কমিউনিষ্টদের) নিকট আত্ম-সমর্পণের নির্দেশ দিলেন।

এই সংবাদ পাওয়া পর ট্রুম্যান কড়া হুকুম জারি করিলেন যে, কোন রাজনৈতিক দলের কাছে জাপানী সৈন্যদে: আত্মসমর্পণ করা চলিবে না। কারণ, এটা পটসডাম ঘোষণাও বিবোধী এবং চীনে গৃহযুদ্ধ বাধিতে পারে, এমন কোন কার্যের উদ্ভাবন দেওয়াও চলিবে না। জাপানী বাহিনীকে একমাত্র মিত্রপক্ষীয় গবর্নমেন্ট মুহের প্রতিনিধিদের কাছে আত্মসমর্পণ কবিতে হইবে।

কিছু আত্মসমর্পণের দাবি থেবে সম্রাটকে রেহাই দেওয়া সত্ত্বেও ১৩ই আগষ্ট জাপানের কাছ থেকে যখন কোন সাড়া পাওয়া গেল না, তখন ওয়াশিংটনে উৎপীড়া দেখা দিল। কারণ, উগ্র জঙ্গীবাদীদের শাস্ত করার জন্তুই সম্রাট সম্পর্কে এক বিবেচনা দেখানো হইয়াছিল। এই উৎকণ্ঠার বর্ণনায় পরবাস্তুমন্ত্রী বার্নস (Byrnes) যে তাৎপর্ষ-পূর্ণ মন্তব্য করিয়াছেন, সেটা কম উল্লেখযোগ্য নয় :

‘Never have I known time to pass so slowly...’

‘সময় যে এত মন্দগতিতে চলে, একথা আগে কখনও জানতুম না।’—১১

অবশেষে ১৫ই আগষ্ট অপরাহ্নে ৪টা ৫ মিনিটে সময় সেই বহুপ্রার্থিত খবর পাওয়া গেল :

“জাপান আত্মসমর্পণ করেছে।” (১২)

সন্ধ্যা ৬টার সময় ওয়াশিংটনের সুসুদূতাবাস মারকং সরকারীভাবে জাপানের আত্মসমর্পণের বার্তা মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রীর হাত দিয়া হোয়াইট হাউজে পৌঁছিল, যে বার্তার কলে জাপানের প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধ এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান ঘটিল। চতুঃশক্তির নিকট প্রেরিত ঐতিহাসিক বার্তাটি এখানে উদ্ধৃত করা শাইতেছে :

1 His majesty the Emperor has issued an Imperial rescript regarding Japanese acceptance of the provisions of the Potsdam declaration.

2. His maj sty the Emperor is prepared to authorise and ensure the signature by his Government and the Imperial General Headquarters of the necessary terms for carrying out the provision of the Potsdam declaration His majesty is also prepared to issue his commands to all the military, naval, and air authorities of Japan and all the forces under their control wherever located to cease active operation, to surrender arms and to issue such other rders

স্বাক্ষর করিতে ২ Japan Subdued Herbert Feis, p 127.

(৩) ট্রুম্যান—ট্রুম্যান, প্রথম খণ্ড, পৃ: ৪৮০



as may be required by the Supreme Commander of the Allied Forces for the execution of the above-mentioned terms.—(১৩)

এর সহজ মর্ম এই—‘১। মহামান্ত্র সম্রাট জাপান সরকার কর্তৃক পটসডাম ঘোষণার শর্তাবলী গ্রহণ সম্পর্কে একটি রাজকীয় অমুজ্ঞা জারি করিয়াছেন।

২। পটসডাম ঘোষণার অমুচ্ছেদগুলি কার্যক্ষেত্রে পালনের উদ্দেশ্যে জাপানের সরকার ও সামরিক সদর দপ্তর কর্তৃক যে সমস্ত শর্ত স্বাক্ষরের প্রয়োজন হইবে, মহামান্ত্র সম্রাট সেগুলির সম্পর্ক নিশ্চয়তা বিধান ও কর্তৃত্বদানের জন্য প্রস্তুত আছেন। জাপানের সমস্ত স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর কর্তৃত্বের অধীন যে সমস্ত সৈন্য আছে, তারা যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, তাদের সকলকে রণক্রিয়া বন্ধ করিতে এবং আত্মসমর্পণ করিতে আদেশ দেওয়ায় জন্য মহামান্ত্র সম্রাট প্রস্তুত আছেন। উপরোক্ত শর্তগুলি কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত করার জন্য মিত্রপক্ষীয় বাহিনী-গুলির সর্বোচ্চ অধিনায়ক যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজনীয় মনে করিবেন, মহামান্ত্র সম্রাট সেগুলি পালনের জন্যও হুকুম জারি করিতে ইচ্ছুক আছেন।’

বলা বাহুল্য যে, সরকারীভাবে জাপানের আত্মসমর্পণের এই বার্তা পাওয়ার পর সন্ধ্যা ৭টার সময় প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান হোয়াইট হাউজে সমবেত সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের নিকট এই ঐতিহাসিক খবর ঘোষণা করিলেন এবং সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও পৃথিবীর সর্বত্র মিত্রপক্ষীয় মহলে আনন্দের হিল্লোল বহিয়া গেল।

#### সম্রাটকে গ্রেপ্তারের চক্রান্ত

কিন্তু সরকারীভাবে জাপানের আত্মসমর্পণের আগে খোদ রাজধানী টোকিওতে এমন সব লোমহর্ষক এবং চক্রান্তমূলক ঘটনাবলীর সমাবেশ হইয়াছিল, যে ঘটনাবলী রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধে কিংবা বেপরোয়া হত্যাকাণ্ডে পরিণত হইতে পারিত। কারণ, জাপানে আসল ক্ষমতা পরিচালনা করিত সামরিক নায়কেরা এবং তাদের মধ্যে এমন একটি গোষ্ঠী ছিল, যারা মিত্রপক্ষের নিকট পরাজয় স্বীকার বা আত্মসমর্পণ করিতে আপত্তি রাজী ছিল না। অবশ্য সম্রাটের প্রতি তাদের অহুস্বেদও কম ছিল না। তথাপি পটসডাম ঘোষণার প্রসঙ্গে গভীর বিতণ্ডা দেখা দিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বয়ং সম্রাট এই ব্যাপারে জড়াইয়া পড়িলেন কিংবা হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইলেন। পার্ল হারবারের ব্যাপারে সম্রাটের সম্মতি ছিল বটে, কিন্তু সেই আক্রমণের সিদ্ধান্ত ছিল সামরিক নেতাদের। কিন্তু পটসডাম ঘোষণা গ্রহণের দায়িত্ব স্বয়ং সম্রাট স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। সুতরাং জাপানের প্রভাবশালী মহলে সংশয় দেখা দিল যে, মিলিটারি কি সম্রাটের সিদ্ধান্ত কার্যকর করিতে ইচ্ছুক হইবে? কারণ, শান্তি আলোচনার স্বরূপাত থেকেই মিলিটারির একটা অংশে এর বিরুদ্ধে কানাঘুসা শুনা যাইতেছিল এবং আর্মির নিকট গোপনস্বত্রে বতই পটসডাম ঘোষণাকে কেন্দ্র করিয়া পর্দার অন্তরালবর্তী আলোচনা ও মিত্রপক্ষের নিকট বার্তা আদান-প্রদানের সংবাদ পৌঁছিতেছিল, ততই সামরিক মহলের একটা চক্র উদ্ভূত হইয়া উঠিতেছিল। ১১ই আগষ্ট থেকেই চক্রান্ত শুরু হইয়াছিল। কোন কোন পদস্থ সেনাপতিও এই চক্রান্তের প্রতি সহায়ভূতিদৃশ্য ছিলেন বটে, তবে তাঁরা

হাতে-কব্ধে সম্রাটের বিরুদ্ধে কিছু করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু ১৪ই আগষ্ট রাতে এই চক্রান্ত এক চরম নাটকীয় কাণ্ডের রূপ ধারণ করিল। জাপানের কয়েকটি সম্পন্ন পরিবারের তরুণ অফিসাররা ছিলেন অত্যন্ত উগ্র মস্তিষ্ক। তাঁরা জাপানের আত্মসমর্পণে বাধা দেওয়ার জন্য এক আকস্মিক অভ্যুত্থান ঘটাইবার এবং সম্রাটকে বন্দী করিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করিলেন। (১৪)

এই চক্রান্তকারী দলের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিলেন মেজর হাতানাকা। তাঁকে সমর্থন জানাইলেন মন্ত্রী দপ্তরের সহকর্মী জিরো শিজাকি এবং এঁদের হস্ত শক্তিশালী করিলেন প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী জেনারেল তোজোর জামাতা মেজর কোগা ও যুদ্ধ মন্ত্রী দপ্তরের কর্নেল ইডা। রাজপ্রাসাদের প্রহরী বাহিনীর (ইম্পিরিয়েল গার্ডস ডিভিশন) কিছু কিছু সদস্যের সঙ্গে এই সমস্ত চক্রান্তকারী যোগাযোগ স্থাপন করিলেন এবং তাঁরা নানাভাবে চেষ্টা করিলেন প্রহরী বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল মোরিকে হাত করার জন্য। খোদা যুদ্ধ মন্ত্রী জেনারেল আনামির শ্যালক কর্নেল তাকেসিতাকেও এই চক্রান্তকারীরা দলে টানিতে চাহিলেন বটে, কিন্তু কিছুটা সহায়ত্বিত থাকিলেও কর্নেল তাকেসিতা এমন মারাত্মক ষড়যন্ত্রে মনেপ্রাণে সায় দিতে পারিতেছিলেন না। তথাপি মেজর হাতানাকার উৎসাহে কোন ভাঁটা পড়িল না। তিনি তাঁর বিদ্রোহী দলবল নিয়া মধ্যরাত্রে রাজপ্রাসাদে হানা দিলেন এবং প্রাসাদের চত্বরে প্রাচীরের অভ্যন্তরে যেখানে রাজকীয় প্রহরী বাহিনীর সদর দপ্তর ছিল এবং বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল মোরির কক্ষ ছিল, হাতানাকা তাঁর সঙ্গীদের নিয়া সেট কক্ষ ঢুকিয়া পড়িলেন। ওদিকে প্রহরী বাহিনীর সৈন্যেরা চঞ্চল হইয়া অট্টালিকার ও দরদালানে ছুটাছুটি ও হৈ চৈ শুরু করিয়া দিয়াছিল। হাতানাকা মোরিকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য অমুরোধ করিলেন। কেন না, গোঁরির অধিনায়কত্ব ছাড়া এই প্রাসাদ-বিদ্রোহ সফল করার সম্ভাবনা ছিল না। জেনারেল মোরির তরুণ বিদ্রোহী গোষ্ঠীর দ্বারা বেষ্টিত হইয়া ভয়ানক বিব্রত ও বিপন্ন বোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মোরির হাঁ বা না কিছুই বলিলেন না। হাতানাকা তখন তাড়াতাড়ি যুদ্ধমন্ত্রীর দপ্তরে গিয়া কর্নেল তাকেসিতাকে দিয়া কার্যোদ্ধার করিতে চাহিলেন এবং বলিলেন যে, রাত্রি ২টার সময় দ্বিতীয় রেজিমেন্ট রাজপ্রাসাদে ঢুকিয়া পড়িবে। তাঁদের অফিসারেরা রাজী আছেন। তখন যুদ্ধ মন্ত্রী জেনারেল আনামি যদি নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তা হলে জাপান আত্মসমর্পণ থেকে রক্ষা পাইয়া যাবে। সুতরাং যুদ্ধ মন্ত্রীকে রাজী করাইবার জন্ত কর্নেল তাকেসিতার সাহায্য দরকার।

কিন্তু তাকেসিতা তখন সমস্ত ব্যাপারটা চিন্তা করিয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কারণ, তিনি জানিতেন যে, তাঁর ভগ্নপতি জেনারেল আনামি এমন বিদ্রোহে রাজী হইবেন না। সুতরাং তাকেসিতা মদের ঘাস হাতে নিয়া সুরা পান করিতে করিতে হাতানাকাকে নিরস্ত করিতে চাহিলেন এবং দৃঢ়তার সঙ্গে বলিলেন—‘অত্যন্ত বিলম্ব হচ্ছে

গেছে। এই বিব্রোহ সকল করাঃ জ্ঞাত চারজন উচ্চতম পর্যায়ের সেনাপতি বা জেনারেল আনামি, জেনারেল টানাকা, জেনারেল মোরি এবং জেনারেল উমেজুর একমত হওয়া দরকার। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব - ন।' অর্থাৎ তাকেসিতা হাতানাকাকে কার্ঘ্যতঃ বলিয়াই দিলেন যে, এই প্রকার অভ্যুত্থান ব্যর্থ হইতে বাধ্য। (১৫)

কিন্তু মেজর হাতানাকা তাতেও নিরস্ত হইলেন না। তিনি সেই গভীর রাতে যুদ্ধ মন্ত্রীর দপ্তর থেকে হস্তদস্ত হইল। রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন এবং এই অস্বাভাবিক উত্তেজনার মধ্যে ছুটাছুটি করিয়া ঘরান্তর করিলেন হইতে লাগিলেন। তিনি এবং তাঁর একজন সঙ্গী সোজা প্রহরী বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল মোরির কক্ষে ঢুকিয়া পড়িলেন। মোরির সঙ্গে তখন বিব্রোহীরা প্রায় ঘণ্টা দেড়েক ধরিয়া আলোচনা চালাইতেছিলেন। মোরির ঘরে তখন কর্নেল শিরাইসি (মোরির শ্রালক) ছাড়া আর কেহ ছিলেন না। রাত তখন ২টা, গভীর নিশীথে হাতানাকা যেন তাঁর ধৈর্যের শেষ সীমা পৌছিয়াছিলেন। তিনি মোরিকে শেষবারের জ্ঞাত জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বিব্রোহে তিনি যোগ দিতে রাজী আছেন কিনা। কিন্তু মোরি নিঃশব্দ রহিলেন। তখন হাতানাকা ক্ষিপ্ত হইয়া হঠাৎ তাঁর রিভলভার বাহির করিলেন এবং সোজা মুক্তি গুলী করিয়া জেনারেল মোরিকে হত্যা করিলেন। আর তাঁর সঙ্গী তরোয়াল দিয়া মোরির বাম কণ্ঠে এক কোপ বসাইয়া দিলেন। কর্নেল শিরাইসি এত আকস্মিক ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডে স্তম্ভিত ও আতঙ্কিত হইয়া যখন হত্যাকারীদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে উত্তত হইলেন, তখন হাতানাকার সঙ্গী তাঁর সেই রক্তসিক্ত তরোয়াল দিয়া কর্নেল শিরাইসির ঘাড়ের উপর এমন প্রচণ্ড আঘাত হানিলেন যে, তাঁর মাথা বেহে থেকে প্রায় আলগা হইয়া পড়িল।...

এই খুনখারাপির পর মেজর হাতানাকা জেনারেল মোরির শীলমোহর জাল করিয়া এবং জাল হুকুমনামা জারি করিয়া রাজপ্রাসাদের প্রহরী বাহিনীকে বিব্রোহীদের হাতে তুলিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিলেন।

রাত্রি তখন ২-১৫, ১৪ আগষ্ট (ইংরাজী মতে ১৫ আগষ্ট), হাতানাকা মনে করিলেন রাজপ্রাসাদ তাঁর দখলে আসিয়া গিয়াছে এবং সেই সঙ্গে সম্রাটও। কিন্তু তিনি জানিতেন যে, সম্রাট হিরোহিতো ১৫ই আগষ্ট দুপুরে জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ঘোষণা ভাষণ দিবেন, পটলডাম ঘোষণা অনুযায়ী সমগ্র সৈন্ত বাহিনীকে আত্মসমর্পণের জ্ঞাত হুকুম দিবেন। সুতরাং এই ভাষণ দান বন্ধ করিতে হইবে এবং তার জ্ঞাত প্রয়োজন বেতারের রেকর্ড হস্তগত করা। যদিও সেই বেতার ভাষণ তৈরী হওয়ার পর ১২টা ৫ মিনিটের সময় সম্রাট শয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন এবং যদিও সেই রেকর্ড রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে প্রশাসনিক বিজ্ঞানের দেওয়ালের একটি নিরাপদ সিন্দুক বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, তথাপি হাতানাকা ও তাঁর সঙ্গীরা তর তর করিয়া খুঁজিয়াও কোথাও তার সন্ধান পাইলেন না।

এদিকে যুদ্ধ সন্ধ্যাটিকেও কেউ জাগাতে সাহস পাইতেছিলেন না। লর্ড গ্রীভিশল মাক্‌ইস কিডো: বিজ্রোহের আঁচ পাইয়া প্রাসাদের নীচের কুঠুরিতে আত্মগোপন করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে আরও প্রায় ১৭ জন বেতার বিভাগীয় অফিসারের জীবন বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কার্যত তাঁরাও বিজ্রোহীদের হাতে বন্দী ও জামিনস্বরূপ আটক ছিলেন। (১৬)

অন্তরিক্কে বড়ঘন্টাকারীদের মধ্যে মদের ফোয়ারা বহিতে লাগিল। কিন্তু বিজ্রোহীদের চূড়ান্ত ভাগ্যান্ধামক সেই বেতার রেকর্ডেব কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। ক্রমে রাত্রি শেষ হইয়া আসিল এবং চক্রীদের উৎসাহে তাঁটা পড়িল—শেষ পর্যন্ত তারা ছড়ভঙ্গ হইয়া গেল। (১৭)

কিন্তু ‘আধুনিক জাপানের ইতিহাস’ (ইংরাজী) প্রণেতা এই বিজ্রোহের ব্যর্থ সমাপ্তির একটি ভিন্ন চিত্র দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, কিছু বিজ্রোহী তরুণ সৈন্য কর্তৃক রাজপ্রাসাদ দখল ও অভ্যুত্থান ঘটাইবার চেষ্টার খবর টোকিওর সৈন্যবাহিনীর সদর দপ্তরে পৌঁছিয়াছিল এবং দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক অভ্যন্ত সাহসের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ রাজপ্রাসাদে গিয়া হাজির হইলেন। তিনি তাঁর একমাত্র ব্যক্তিত্বের জোরে ও আবেগপূর্ণ বাগ্মিতার গুণে বিজ্রোহী নায়কদের অভিভূত করিয়া কেলিলেন এবং তাঁদেরকে বুঝাইলেন যে, এভাবে মাথা গরম করিয়া বিজ্রোহ ঘটাইবার চেষ্টা অভ্যন্ত অস্বাভাবিক। তখন বিজ্রোহীরা তাঁদের ভুল বুঝিতে পারিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলেই চারজন বিজ্রোহী আত্মহত্যা করিলেন।...

সকালবেলা সন্ধ্যাটের প্রাসাদের বাইরে পাইন অরণ্য থেকে দুই ব্যক্তি বাহির হইয়া আসিলেন। এঁরা ছিলেন বিজ্রোহীদের নেতা হাতানাকা এবং তাঁর সঙ্গী মিজাকি। বিজ্রোহের ব্যর্থতা এবং তাঁদের কার্যের জগত তাঁরা অনুভব করিয়াছিলেন। মিজাকি সন্ধ্যাটের প্রাসাদের দিকে মুখ করিয়া নতজানু হইলেন এবং তারপর ‘উৎসবের ছুরিকা’ দিয়া নিজ হাতে নিজের পেট কাটিয়া হারাকিরি করিলেন আর মেজর হাতানাকা, যিনি কয়েক ঘণ্টা আগে প্রাসাদের রক্ষীবাহিনীর অধিনায়ককে পিস্তলের গুলি দিয়া হত্যা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি নিজেরই সেই পিস্তল দিয়া নিজের দুই চোখের মধ্যে গুলি করিলেন। তাঁর রক্তলিপ্ত কুশতলু মাটিতে ঢলিয়া পড়িল। সেই রক্তের উপর প্রভাতসূর্যের আলো পড়িয়া জল জল করিতে লাগিল। (‘কল অব জাপান’ পৃষ্ঠা ১৮৮)।

এদিকে তখন সমর স্ত্রী জেনারেল আনাম তাঁর আবাসকক্ষের বাগানদার বসিয়া পৃথিবী থেকে শেষ বিদায় গ্রহণের জন্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন এবং তিনি একটা বিদায় বাস্তব কবিতাও লিখিতেছিলেন। যদিও তিনি যুদ্ধে পরাজয় স্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন না, তথাপি তিনি অস্বস্তি প্রজ্ঞা হিসাবে সন্ধ্যাটের সিদ্ধান্ত মানিয়াছিলেন এবং যশ-সভা থেকে পদত্যাগের দ্বারা কোন জটিলতাও সৃষ্টি করেন নাই। তিনি ঠাক অফিসারদের একাংশের বিজ্রোহের আঁচ পাইয়াছিলেন বলে, কিন্তু তাদেরকে বাধাও দেয় নাই। কিংবা তাঁদের কার্যের অনুমোদনও করেন নাই। কারণ, ‘তার স্বপ্ন

(১৬) পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ১৩

(১৭) টোচ্যাল ওয়াবু—দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৫

ছিল বিজোহের পক্ষে, কিন্তু তাঁর মস্তিষ্ক ছিল বিজোহের বিপক্ষে'। বিদায় গ্রহণের বার্তা রচনা শেষ হওয়ার পর জেনারেল আনামি ভোর রাতি চাংটার সময় সম্রাটের প্রাসাদের দিকে মুখ করিয়া বসিষ্টেন এবং তারপর নিজ হাতে একটি তীক্ষ্ণ ছোবা দিয়া তাঁর নিজের উদর কাটিয়া ফেলিলেন এবং তাতেও ক্ষান্ত না হইয়া সেই ছোরা নিজের ঘাড়ে বিদ্ধ করিলেন। (৮)

সমর মন্ত্রী হিসাবে জেনারেল আনামি যুদ্ধে পরাজয়ের জ্ঞাত নিজেই দায়ী ও অপরাধী মনে করিলেন। সুতরাং জাতির প্রতি তিনি যে অগ্নয় করিয়াছিলেন এবং সৈন্তেরা মহামাত্র সম্রাটের প্রাসাদ অক্রমণ করিয়া যে 'অপবিত্র' কাজ করিয়াছিলেন, এই হাবাকিরির দ্বারা তিনি সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

\*

\*

\*

টোকিওতে গভীর বাত্রে নিদ্রামগ্ন নাগরিকদের অজ্ঞাতসাবে যখন নিঃশাসরোধকারী গোয়েন্দাকাহিনীর মত এই সমস্ত নিদাক্ষণ উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনাবলী ঘটিতেছিল, তখন সম্রাট তাঁর প্রাসাদকক্ষে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছিলেন এবং পরদিন ১৫ আগষ্ট বিপ্রহরে যখন এই নাটকের সম্পূর্ণ বিপবীত দৃশ্য হিসাবে সম্রাটের বেতা: বজ্রজা জাতির উদ্দেশ্যে প্রচারিত হইল। যদিও তাতে মিত্রপক্ষের নিকট জাপানের আত্মসমর্পণের কথা ঘোষিত হইল, তথাপি সম্রাটের 'রাজকীয় ঐতিহ্য' অলুখ্য সালঙ্কার ও স'ভূত্ব ভাবাব ঐতর্ঘ্যে অনেক প্রজ্ঞা সঙ্গসা সেই ভাষণ অনুধাবন করিতে পারিলেন না। বরং অধিকাংশ সাধারণ প্রজাই বিহ্বল ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু এই রাজকীয় ভাষণ সত্ত্বেও জাপানের সর্বত্র কর্নেল ও মেজররা সভা সমিতিতে আত্মসমর্পণের কথা আলোচনা করিতেছিলেন। এমন কি বিমানবাহিনীর 'আত্মবিনাশী' যে সমস্ত পাইলট (সুইসাইড স্কোয়াড) জাতির পক্ষ থেকে চূড়ান্ত চেষ্টা জন্তে প্রস্তুত হইতেছিলেন, তাঁরা প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, টোকিও উপসাগরে আমেরিকার যে যুদ্ধজাহাজ 'মিশোরি'তে জাপানের আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত হইবে, এই আত্মবিনাশী পাইলটের দল সেই জাহাজটির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বিস্ফোরণ ঘটাইবে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই চক্রান্ত একেবারে শেষ মুহূর্তে বানচাল হইয়াছিল।...

কিন্তু সম্রাট হিবোহিতো জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর বেতার বক্তৃতায় বুটেন ও আমেরিকাকে লক্ষ্য করিয়া এমন কয়েকটি কথা বলিলেন, (যন্তবত: এগুলি ছিল তাঁর ব্যক্তিগত মত) যেগুলি মিত্রপক্ষের নিকট আদৌ প্রীতিপদ ছিল না:

'We declared war on America and Britain out of our sincere desire to ensure Japan's self preservation and the stabilization of South East Asia, it being far from our thought either to infringe upon the sovereignty of other nations or to embark upon territorial aggrandizement. (19)

(১৮) রিচার্ড টোরি—পৃ. ৩৬

(১৯) Total War—2nd Vol. p, 346—347

জাপানের আত্মসংরক্ষণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্থায়িত্ব বিধানকে সুনিশ্চিত করার আন্তরিক ইচ্ছা নিয়েই আমরা আমেরিকা ও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলাম। অত্যাচার জাতির সার্বভৌম স্বাধীনতা লঙ্ঘন করা কিংবা পররাজ্য দখলের লিপ্সা পূরণ করার কোন ইচ্ছা আমাদের ছিল না।

কিন্তু দম্ভাটের তরফ থেকে আত্মপক্ষঃসমর্থনের এই নির্লজ্জ চেষ্টা সত্ত্বেও পরাজয়ের মানিতে ও দুঃখে জাপানের বহু লোক কাঁদিয়া ফেলিল। তবে, জনসাধারণের অনেকেই আবার যুদ্ধের ভয়াবহ সর্বনাশ এবং অবর্ণনীয় দুর্গতি ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। তথাপি জাপানী জনতার বিরাট অংশই যেন ছিল এই শাস্তিপর্বের নিষ্ক্রিয় দর্শকের মত ! (২০)

## দশম পর্ব

### অষ্টম অধ্যায়

দলিল স্বাক্ষর : আত্মহত্যা : যুদ্ধশেষ

সম্রাটের বেতার ঘোষণার পর এবার দেশপ্রেমগর্ভী এবং সাম্রাজ্যবিলাসী জাপানের আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষরের পালা। সুতরাং হিটলারী জার্মানীর মত জঙ্গীবাদী জাপানের পক্ষেও ব্যাপাবটা ভয়াবহ রকমের মর্যাস্তক ও নাটকীয় ঘটনায় পূর্ণ ছিল। আগের অধ্যায়ে সেগুলির কিছু কিছু চাক্ষুষকর বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ব্যাপাবগুলি সেখানেই শেষ হইয়া যায় নাই। দলিল স্বাক্ষর থেকে শুরু করিয়া মার্কিন সৈন্তবাহিনী কর্তৃক জাপানী দ্বীপে দখলদারী প্রতিষ্ঠা, এমন কি তার পবেও অনেক রোম-বর্ষক ঘটনাব সমাবেশ হইয়াছিল :—

১৫ আগষ্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের অবসান ঘোষণা করিলেন এবং জেনারেল ম্যাক-আর্থার তাঁর আত্মস্মৃতিতে লিখিয়াছেন যে, যুদ্ধাবসান ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এত অভিনন্দন বার্তা ও এত সম্মানের অধিনারী হইলেন যে, এত সম্মান তিনি জীবনে আগে কখনও পান নাই। সুতরাং ‘আমন্দে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। অথচ এর আগে ছোটবেলা থেকে তিনি কখনও চোখের জল কেলেন নাই।’ (১)

জাপানী যুদ্ধব এই উপসংহার পর্বে জেনারেল ডগলাস ম্যাক-আর্থারের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল—ক) মিত্রপক্ষের সর্বোচ্চ সেনাপতি বা সূপ্রীম কমান্ডার হিসাবে সর্বত্র সমস্ত জাপানী সৈন্তবাহিনীর আত্মসমর্পণ কার্যকর করা এবং (খ) প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের প্রধান সেনাপতিরূপে নির্দিষ্ট এলাকায় জাপানীদের আত্মসমর্পণ গ্রহণ করা। অবশ্য এই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করিবেন এ্যাড-মিরাল নিমিংস এবং জেনারেল ওয়েড মেরার।

যুদ্ধ হইল জাপানের দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলি আমেরিকার খাস নিয়ন্ত্রণে রাখা হইবে কিংবা কয়েকটি দ্বীপ অষ্ট্রেলিয়াকে দেওয়া হইবে। ‘আর ইউরোপীয় মিত্রপুঞ্জ সম্পর্কে ব্যবস্থা হইল ব্রিটন, কমনওয়েলথ, নেদারল্যান্ডস ও ফ্রান্স প্রশান্ত মহাসাগরে এবং এশিয়ার খাস ভূমিতে তাদের কলোনি ও পূর্বোক্ত অধিকৃত দেশগুলি তাদের নিজস্বের চেষ্টায় ও নিজস্বের লোক দিয়া পুনরায় উদ্ধার করিয়া নিতে পারিবে।’ (২)

অর্থাৎ মহাযুদ্ধের শেষেও এশিয়াতে পশ্চিমী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ বজায় রাখার ইচ্ছা ট্রুম্যান ও ম্যাক-আর্থারের ছিল—এই মনোবৃত্তি লক্ষ্য করার মত।

তবে, সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে এই নির্দেশ দেওয়া হইল যে, ইয়ান্টা ও

(১) Reminiscences—Douglas MacArthur, p. 379

(২) Japan Subdued—Feis, p. 139

পটসডাম চুক্তি অনুসারে রাশিয়া দূর প্রাচ্যে তাদের ভূমিগত দাবীর অধিকার পাইবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে স্ট্যালিন ট্রুম্যানের নিকট একটি অতিরিক্ত প্রস্তাব পেশ করিলেন। এই প্রস্তাবে বলা হইল যে, ১৯১২-২১ সালে জাপান সমগ্র সোভিয়েত দূর প্রাচ্য দখল করিয়া নিয়াছিল। সুতরাং ‘জনমতকে শাস্ত করিবার খাতিরে’ রাশিয়াকে হোকাইডো দ্বীপের উত্তর অংশ (মূল জাপানী দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত) দখল করিতে দেওয়া উচিত। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ও মার্কিন সেনানীমণ্ডলীর প্রধানগণ এই প্রস্তাব দৃঢ়তার সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন। কারণ, জাপানে আর কোন শক্তিকে দখলদারির কোন অংশ দেওয়া হইবে না। তবে, কিউরাইল ও দক্ষিণ শাখালিন দ্বীপ সম্পর্কে ইয়ান্টা-পটসডাম চুক্তি মানিয়া লওয়া হইবে এবং সেখানে জাপ সৈন্যদের আত্মসমর্পণ রাশিয়া গ্রহণ রিতে পারিবে।

আর কোরিয়া সম্পর্কে এই ব্যবস্থা হইল যে, ৩৮নং সমান্তরাল রেখার উত্তরে রাশিয়া এবং দক্ষিণে আমেরিকা জাপ সৈন্যদের আত্মসমর্পণ গ্রহণ করিবে।

যদিও ইন্দোচীনে জাপানী বাহিনীর আত্মসমর্পণ গ্রহণের জন্ত ফ্রান্স তার দাবী জানাইয়াছিল, তথাপি দেখা গেল যে, জাপানী সৈন্যদের আত্মসমর্পণ নিষ্পন্ন করার মত শক্তি ও সংগঠন ফ্রান্সের নাই। তখন স্থির হইল যে, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সুপ্রীম কমান্ডার লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে ক্রাসসী সরকারের একজন প্রতিনিধিও থাকিবেন। আর হংকংয়ের ‘ক্রাউন কলোনী’র (বৃটিশ) জাপ সৈন্যেরা চীনের বদলে বৃটিশ পক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিবেন।

জাপানের এই আত্মসমর্পণকে যথাসম্ভব নাটকীয় এবং আকর্ষণীয় করিবার উদ্দেশ্যে এই অল্পাধিক টোকাওর যতটা বাছাকাছি সম্ভব নিষ্পন্ন করার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু জাপানের চরমবাদীদের পক্ষ থেকে হানা দেওয়ার আশঙ্কা থাকায় এই অল্পাধিক উপকূল ভাগ থেকে টোকাও উপসাগরে ১৮ মাইল দূরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে শক্তিশালী ও বৃহত্তম (৪৫ হাজার টনের) যুদ্ধজাহাজ ‘মিশৌরি’র গ্যালারি ডেকে অল্পাধিকের আয়োজন করা হইল। কিন্তু এই যুদ্ধজাহাজ বাছাই করা নিষা আমেরিকার আর্থি ও নেভীর মধ্যে ভিতরে ভিতরে বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। কারণ, নৌ-সচিব করেটাল চাহিয়াছিলেন প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌ-সেনাপতি এ্যাডমিরাল নিমিংসকে দিয়া আত্মসমর্পণের অল্পাধিক সম্পন্ন করিতে। কিন্তু ম্যাক-আর্থার ছিলেন সমগ্র মিত্রপক্ষীয় তরফের সুপ্রীম কমান্ডার। সুতরাং এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব তাঁর উপরেই অর্পণ করা হ’ল। কিন্তু এই বিশাল যুদ্ধজাহাজের নাম ‘মিশৌরি’ (Missouri) রাখা হইল কেন? কারণ, প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান মিশৌরি রাজ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁর কন্যা আত্মাধিক ভাবে নামকরণ কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। (৩)

জাপানে আমেরিকানদের সহর সামরিক কার্যালয় সামরিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ইয়োকোহামায়। ম্যাক-আর্থার কিংকং গর্বের সঙ্গে লিখিয়াছেন যে, জাপানীদের আত্মসমর্পণ গ্রহণের জন্ত তিনি ইয়োকোহামার আটসুগি (Atsugi)



বিমান বন্দরে অবতরণ করার পর যখন শহরের দিকে তাঁর দলবল নিয়া মোটর শোভাযাত্রা যোগে যাইতেছিলেন, তখন সেই ৫ মাইল পথের দুই ধারে দুই ভিভিসন বা ৩০ হাজার জাপানী সৈন্য লাইন বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং তাঁকে জাপান সাম্রাজ্যের অধিকৃত মধ্যপ্রদেশ পাহারা দিয়াছিলেন ! তথাপি মার্কিন মহলে জাপানীদের প্রতি পূর্বাপুরি বিশ্বাস ছিল না। সুতরাং ম্যাক-আর্থারের মনেও কিছুটা সংশয় দেখা দিয়াছিল এবং তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, এত সৈন্য দিয়া পাহারা দেওয়াব পিছনে জাপানীদের কোন গুপ্ত মতলব নাই তো ?

হার্ভার্ট কিম্ব লিখিয়াছেন যে, স্বয়ং স্ট্যানলিনের চিন্তেও এই বিষয়ে গভীর সন্দেহ ছিল ২৭ আগষ্ট তারিখ তিনি মস্কোস্থিত মার্কিন বাহাদুর হ্যাট্টিয়ামানের নিকট মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, জাপানীদের বিশ্বাস নাই তাদের মধ্যে অনেক মাথা পাগলা গুপ্তঘাতক ও বিশ্বাসঘাতক রহিয়াছে। সুতরাং মিত্রপক্ষীয় প্রতিনিধিদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে জাপানের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও গণনেতাদেরকে প্রস্তাব করিয়া জামিনস্বরূপ আটক রাখা উচিত। (৭)

এই সন্দেহের আর একটি দৃষ্টান্ত স্বয়ং ম্যাক-আর্থারের বই থেকেই উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুপ্রীম কমান্ডার সদলে ইয়োকোহামার বিরাট হোটেল—নিউ গ্রাণ্ড হোটলে যখন প্রথম রাজ্যে ডিনার খাইতে বসিলেন, তখন তাঁর টেবিলে পরিবেশিত প্রথম প্লেটটি তাঁহার এক সহকর্মী হঠাৎ কাড়িয়া লইয়া গেলেন এবং পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, তাঁর খাত্তে বিষ মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে কিনা !

অবশ্য ম্যাক-আর্থার তখন সহাস্যে মন্তব্য করিয়াছিলেন—“কেউ কি চিরকাল বেঁচে থাকে ?”...(৫)

২রা সেপ্টেম্বর, সকাল ২ টায় (টোকাই সময়) ‘মিশোরি’ যুদ্ধজাহাজে আনুষ্ঠানিক ভাবে আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরের প্রস্তুতি করা হইল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হাড়া এই দলিল স্বাক্ষরে উপস্থিত ছিলেন ব্রিটিশ, সোভিয়েত, চীনা, অস্ট্রেলিয়ান, কানাডীয়ান, নিউজিল্যান্ড, ডাচ ও ফরাসী—এই মিত্রপুঞ্জের প্রতিনিধিবর্গ। সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষ থেকে যিনি এই ক্ষুণ্ণানে যোগ দিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন প্রায় একজন অজ্ঞাত পরিচয় সেনাপতি জেনারেল ডেরেভিয়াকো। এর দ্বারা অনুমান করা যাইতেছে যে, রাশিয়া নিজের পক্ষ থেকে এই অস্থানের উপর তেমন কোন গুরুত্ব আরোপ করিতে চাহেন নাই। কারণ, জাপানী সৈন্যবাহিনীর আত্মসমর্পণ এবং জাপানে দখলভাগীর অংশ প্রাপ্তির দাবী নিয়া ট্রুম্যানের সঙ্গে স্ট্যানলিনের বিরোধ ও মন কষাকষি চলিতেছিল।

আর এদিকে জাপানের পক্ষ থেকেও সংশয়চ্ছন্ন প্রশ্ন দেখা দিল কোন্ জাপানী নেতা নিশ্চর আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর দিবেন ? যদিও জাপানের সাম্রাজ্যের প্রান্তে পটসডাম ঘোষণা অনুযায়ী এই দলিলকে কার্যভঃ নিশ্চরত বলা চলে না, তথাপি

(৪) জাপান সাবাডউড—পৃষ্ঠা ১৫৫ পাদটীকা

(৫) ম্যাক-আর্থার—পৃষ্ঠা ৩০৬

উগ্রপন্থী ও সন্ত্রাসবাদী সৈন্যদের পক্ষ থেকে এক্ষেত্রেও ভয় ছিল। সুতরাং সন্ত্রাস্ত কৰ্তৃক পটসডাম ঘোষণা অনুযায়ী আত্মসমর্পণের দাবী গৃহীত হওয়ার পর স্বেচ্ছা-মঞ্জিসভা পদত্যাগ করিলেন এবং যেহেতু আত্মসমর্পণের ব্যাপারটা স্বয়ং সন্ত্রাস্তের নির্দেশের অধীন ছিল, সেজন্য স্থির হইল নতুন মন্ত্রিসভাও রাজপরিবারের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা গঠিত হইবে। সন্ত্রাস্তের আত্মীয় (যিনি সৈন্যবাহিনীর একজন জেনারেল) প্রিন্স হিগাশি কুনি প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন এবং জাপানের অত্যন্ত সম্মানভাজন প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স কোনোয়ে ডেপুটি প্রধান মন্ত্রীর পদগ্রহণে সম্মত হইলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বা ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী কেউ আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষর দিতে রাজী হইলেন না, কিংবা সাহস পাইলেন না। প্রিন্স কোনোয়ে জাপানের এক শীর্ষস্থানীয় নেতা হওয়া সত্ত্বেও জাপানের এই পরাজয়ে ও আত্মসমর্পণের ব্যাপারে মর্মান্বিত হইলেন। এমন কি পাছে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে তিনি আদালতে অভিযুক্ত হন, এই চিন্তাস্তায় তিনি শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করিলেন। অশচ ব্যক্তিগত ভাবে প্রিন্স কোনোয়ে কিন্তু জগীবাদী ছিলেন না। তিনি আমেরিকা ও রাশিয়ার সঙ্গে শান্তিরক্ষা ও আপোষ মীমাংসারই পক্ষপাতী ছিলেন। তথাপি সেদিনের জাপানের সামরিক ঘূর্ণাবর্তেও প্রচণ্ড ঝাপ্টা থেকে তিনিও বেহাই পাইলেন না। তাঁর মত আরও অনেককেই মৃত্যুবরণ করিতে হইয়াছিল।...

আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর দানের এই সমস্তার মীমাংসা হইল বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ পরবাস্তব মন্ত্রী সিজিগিমিন্সু দ্বারা। রাজকীয় নির্দেশে তিনিই জাপানের পক্ষ থেকে প্রধান প্রতিনিধির দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন এবং তাঁর উপর সন্ত্রাস্তের এত আস্থা আছে জানিয়া সিজিগিমিন্সু বরং নিজেকে সম্মানিত বোধ করিলেন। ইতিপূর্বে তিনি আরও দুইবার পরবাস্তব মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন এবং তিনি যুদ্ধ শেষ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন।

কিন্তু সৈন্যবাহিনীর প্রতিনিধি জেনারেল উমেজু যদিও দ্বিতীয় ডেলিগেটরূপে মনোনীত হইলেন, তথাপি তিনি দলিল স্বাক্ষরে অত্যন্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। এমন কি, যখন এই প্রস্তাব তাঁর নিকট প্রথম করা হইয়াছিল, তখন তিনি রাগিয়া আগুন হইয়াছিলেন এবং হারাকিরির ভয় দেখাইয়াছিলেন। (৬)

অবশেষে সন্ত্রাস্তের বিশেষ অনুরোধে জেনারেল উমেজুর মত কট্টরপন্থী সেনা-নাযককেও দলিল স্বাক্ষরে রাজী হইতে হইল। এঁদের সঙ্গে জাপানের আরও ২ জন প্রতিনিধি ছিলেন। কিন্তু পূর্বাঙ্কে এঁদের কাকুর নামই প্রকাশ করা হয় নাই। এমন কি, জেনারেল ম্যাক-আর্থারের মিশৌরি জাহাজের দিকে যাত্রার সময় পর্যন্ত গোপন রাখা হইয়াছিল। কারণ, তখন জাপানে আত্মসমর্পণের বিরোধী এবং সন্ত্রাসবাদী যুবকদেরও অভাব ছিল না। এজন্য আত্মসমর্পণ অল্পটান স্থলভাগে না হইয়া জলপথে সমুদ্রের উপর যুদ্ধজাহাজে অল্পটান হইল।

জেনারেল ম্যাক-আর্থার ও অন্যান্য সকলে একটি মোটর লঞ্চে করিয়া মিশৌরি

জাহাজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বয়োবৃদ্ধ সিগেমিংস্ সকলের আগে আগে খোড়াইয়া খোড়াইয়া এবং একটি লাঠির উপর ভর দিয়া চলিতেছিলেন। তাঁর একটি পা ছিল কাঠের তৈরী। প্রায় বছর পনের আগে সাংহাইতে টেরোরিষ্টদের নিক্ষিপ্ত বোমায় সিগেমিংস্‌র একখানি পা উড়িয় গিয়াছিল। তখন থেকে তিনি এই খোড়া পায়ের যত্নগা বহন করিয়া রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছিলেন। ইংরাজ গ্রন্থকার মিঃ উইলিয়াম ক্রেইগ মন্তব্য করিয়াছেন যে, যারা সেই অতুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মনে হইতেছিল সিগেমিংস্ যেন গোটা পঙ্খ ও বিকলাঙ্গ জাপানী জাতিরই প্রতিনিধি ছিলেন—ভালো করিয়া দাঁড়াইতেও অক্ষম ছিলেন। (৭)

টেবিলের উপর সবুজ রঙের কাপড়ের ঢাকনা ছিল, কিন্তু আত্মসমর্পণের দলিলের রঙ ছিল সাদা। আর জ.পানের সেই নির্দিষ্ট স্থানটিতে বহু বিচিত্র বর্ণের পোষাক, ইউনিকর্ষ ও সাজসজ্জা পরিহিত সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তির গুড় ছিল। আর সামরিক সংবাদদাতারা ও ক্যামেরাম্যানরা সেখানে এত প্রচুর সংখ্যায় সমবেত হইয়াছিলেন যে, ভীড়ের চাপে যেন শ্বাসরোধ হওয়ার অবস্থা হইয়াছিল। সেই উৎসুক জনতার ভীড় সুবৃহৎ জাহাজের সর্বত্র পতাকাহণ্ড থেকে শুরু করিয়া কামানের নলের উপর পর্যন্ত এক ভড়ত দৃশ্যের অবতারণা করিল। ম্যাক-আর্থার মন্তব্য করিয়াছেন যে, ‘সহস্র চোখের তীক্ষ্ণ ও তীব্র দৃষ্টি যেন তাঁর মত আমাদের শরীর বিদ্ধ করিতেছিল।’

ম্যাক-আর্থার স্থির পদক্ষেপে মাইকেল সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং ঘোষণা করিলেন যে, পৃথিবীর অধিকাংশ জাতির প্রতিনিধিরূপে তাঁরা এখানে সমবেত এবং তাঁরা বিজিত ও বিজিতার উর্ধ্বে উঠিয়া যেন এই অতুষ্ঠানের পবিত্র উদ্দেশ্য রক্ষা করিতে পারেন এবং অতীতের রক্তপাত ও হত্যাকাণ্ডের ভিতর থেকে যেন একটি শ্রেষ্ঠতর পৃথিবী জন্মলাভ করিতে পারে—যে পৃথিবীতে স্বাধীনতা, সহিষ্ণুতা ও জ্ঞানবিচারের মর্যাদা রক্ষা পাইবে :

‘It is my earnest hope and indeed the hope of all mankind that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past—a world founded upon faith and understanding—a world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish—for freedom, tolerance and justice’ (৮)

সুপ্রীম কমান্ডার অতঃপর জাপানী প্রতিনিধি-দ্বয়কে নিশ্চত আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষরের জন্য আহ্বান জানাইলেন। সমগ্র জাহাজব্যাপী তখন গভীর নিস্তব্ধতা। গুরুভার জনিত পা ধীরে ধীরে টানিয়া আনিয়া সিগেমিংস্ টেবিলের ধারে একটি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। হাওয়ায় তখন তাঁর বপালের চুল উড়তেছিল। তিনি তাঁর সিকের টুপি এবং হাতের হলদে দস্তানা হুলিয়া রাখিলেন।

(৭) দি কল্ অব্ জাপান—পৃষ্ঠা ২৭২

(৮) Reminiscences—MacArthur, p. 392-93

তারপর একটি কলম বাহির করিয়া দাঁললের উপর চোখ ব্লাইলেন, তাঁকে যেন হতবুদ্ধির মত দেখাইল। তখন ম্যাক-আর্থারের নির্দেশে তাঁর চীক অব্‌ ঠোক টেবিলের ধারে গিয়া দেখাইয়া দিলেন দাঁললের ঠিক কোন স্থানে সই করিতে হইবে।

বিক্রত পররাষ্ট্র মন্ত্রী যেন একটু লজ্জিত হইলেন এবং তারপর মাথা নীচু করিয়া দাঁললে স্বাক্ষর দিলেন। বেলা তখন সকাল ৯টা বাজিয়া ৪ মিনিট।

জাপানের দ্বিতীয় প্রতিনিধি জেনারেল উমেজু দাঁললের কিছু না পড়িয়াই সিগেগিমংসুর স্বাক্ষরের নীচে সই করিলেন।

অতঃপর জেনারেল ম্যাক-আর্থার এবং মিত্রপক্ষের অন্যান্য প্রতিনিধিরা একে একে দাঁললে স্বাক্ষর করিলেন।

মাথার উপর তখন বি-২২ মার্কিন বোম্বার্ডার দল বাঁধিয়া উড়িতেছিল এবং আকাশ থেকে স্বরের আলো যেন একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের পতন জনস্ত অক্ষরে ঘোষণা করিতেছিল.....

৪ঠা সেপ্টেম্বর জাপানী ডায়েট বা পার্লামেন্টেব এক জরুরী অধিবেশন আহ্বান করা হইল এবং সেই অধিবেশনে স্বয়ং সম্রাট ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হইয়া আত্ম-সমর্পণের কারণ ব্যাখ্যা করিয়া এক বক্তৃতা দিলেন এবং সমস্ত প্রজাকে আত্মসমর্পণের শর্তগুলি পালন করিয়া শান্তি ও সম্ভব রক্ষার জন্য আহ্বান জানাইলেন।

জাপানের ইতিহাসে এই ঘটনা ছিল অভূতপূর্ব। কেন না, এর আগে কোন সম্রাট কোনদিন তাঁর প্রজাবর্গের সামনে উপস্থিত হইয়া অনুরূপ বক্তৃতা দেন নাই। (২)

\* \* \*

কিন্তু গোড়ার দিকে সুপ্রীম কমান্ডার ম্যাক-আর্থারের কার্য খুব নির্যাক্ষাট ছিল না। কারণ, মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে রাজনৈতিক মত বৈষম্য ছিল। আর তা'ছাড়া জাপানের মোট ৬৯ লক্ষ ৮৩ হাজার সৈন্যের নিরস্ত্রীকরণের সমস্যা ছিল। অধিকন্তু সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষ থেকে স্ট্যালিন ও মলোটোভ দাবি জানাইলেন যে, জাপানে মার্কিন দখলদারির নরম (soft) হইতে পারে, অতএব ম্যাক-আর্থারের বদলে জাপানের জন্য একটি চতুঃশক্তির কমিশন নিয়োগ করা হোক।

অতীতকে আমেরিকাতেও একশ্রেণীর রাজনীতিক, সংবাদপত্র ও রেডিও ভাষ্যকার এবং কমিউনিষ্ট পত্রিকা “ডেইলি ওয়ার্কার” জার্মানীর বিরুদ্ধে যেমন কঠোর পন্থা অবলম্বনের জন্য দাবি জানাইলেন, তেমনি জাপানের বেলায়ও সম্রাট ও রাজপরিবারকে উচ্ছেদের জন্য দাবি জানাইলেন। তারপর শীতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি ও ক্রশ উভয় পক্ষ জাপানে দখলদারির অংশ গ্রহণের জন্য প্রবল চাপ সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। কিন্তু জার্মানীর দখলদারির অভিজ্ঞতা থেকে মার্কিন সরকার এই সমস্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। অবশেষে যুদ্ধে বৈঠকে ১১টি জাতির (যারা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল) প্রতিনিধি নিয়া একটি দুব প্রাচ্য কমিশন এবং একটি Allied Council গঠিত হইল—যে কাউন্সিলের সদস্য হইল আমেরিকা, বৃষ্টি কমন্‌ওয়েলথ,

চীন ও রাশিয়া। কিন্তু এদের প্রত্যেকেরই ভিটে। প্রয়োগের ক্ষমতা ছিল। ফলে, এই কাউন্সিল ও কমিশন শেষ পর্যন্ত কোন কাজে আসিল না। (১০)

\*

\*

\*

কিন্তু জাপানী সাম্রাজ্যের পতন ও ক্যাসিজমের বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষের জয় সত্ত্বেও এশিয়াতে সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটল না। ব্রহ্মদেশে, সিন্ধাপুরে, ইন্দোচীনে, মালয়ে এবং ইন্দোনেশিয়ায় ( বলা বাহুল্য যে, ভারতে তখনও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসন বজায় ছিল ) আগেকার দখলদার শক্তিবর্গ দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার বৃটিশ শক্তির সহায়তায় স্ব স্ব রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন এবং জাপানীদের আত্মসমর্পণ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ফলে, স্থানীয় স্বাধীনতাকামী ও জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে ( যারা প্রতদিন বিদেশীদের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছিলেন ) সংঘর্ষ দেখা দিল—যেমন ইন্দোচীনে হো চি মিনের দলের সঙ্গে এবং ইন্দোনেশিয়ায় সুকর্ণের জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে। জাপান কর্তৃক পটসডাম ঘোষণা গৃহীত হওয়ার পর ১৭ আগষ্ট, ১৯৪৫, ইন্দোনেশিয়ার গ্যামানাল পার্টি সুকর্ণের নেতৃত্বে ইন্দোনেশিয়ায় স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। কিন্তু বৃটিশ সৈন্তেরা তড়িৎ গতিতে আসিয়া হাজির হইল এবং জাপানীদের সহযোগিতায় ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতাকামীদের দমন করিতে লাগিল...

অপরপক্ষে মাঞ্চুরিয়ায় বিপ্লবী কৃষবাহিনী যখন মাঞ্চুকোতে প্রবেশ করিল, তখন জাপানীদের পৃষ্ঠপোষিত এবং আশ্রিত মাঞ্চুকার পুতুল 'সম্রাট' পিউ-ই (Pu-Yi) জাপান অভিমুখে পলায়নের মুখে মুকুর্ভূত হইয়া পড়িলেন এবং কৃষদের হাতে পাঁচ বছর বন্দী ছিলেন। পর তাঁকে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির হাতে সমর্পণ করা হইয়াছিল। ১৯৫০ সাল বেকে ১৯৬৭ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এই প্রাক্তন 'মাঞ্চুকো সম্রাট' পিউ-ইয়ের পুত্রাতন রাজপ্রাসাদের বাগানে মালীর কাজ করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করিতেন।.....(১১)

### আত্মহত্যা

জাপ সাম্রাজ্যবাদের পতন ও সরকারীভাবে জাপানের আত্মসমর্পণের আগে থেকেই জাপানী সেনাবাহিনী এবং জঙ্গীবাদী নেতাদের মধ্যে ঘোরতর মানসিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল। কারণ, পরাজয়ের গানটা বজ্জেব মত তাদের বুক বিদ্ধ করিতেছিল। তবে 'দেবতার বংশোদ্ভূত' সম্রাটের নির্দেশনামা মানিয়া লইয়া অনেকে শাস্ত হইলেও কট্টরপন্থীর সাক্ষ্য পাঠাইতেছিল না। তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র একদল অভ্যুত্থান ঘটাইবার চেষ্টা এবং সম্রাটকে গ্রেপ্তারপূর্বক ক্ষমতা দখলের চক্ৰান্ত পর্যন্ত করিয়াছিল—যে ব্যর্থ চেষ্টার কাহিনী আগের অধ্যায়ে

(১০) পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৪১০

(১১) টোগ্যাল ওয়ার—( দ্বিতীয় খণ্ড ) পৃষ্ঠা ৩৫০

বর্ণনা করা হইয়াছে। গবিত ইম্পিরীয়েল জাপ বাহিনী এখন নিরস্ত্র ও বেকার। সুতরাং নেতাদের মধ্যে কেহ কেহ বেপরোয়া হইয়া উঠিলেন। জেনারেল আনার্মি, এ্যাডমিরাল ওনিসি, জেনারেল টানাফু প্রমুখ প্রসিদ্ধ র-নেতাগণ আগেই আত্মহত্যা বা মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। প্রিন্স কোনোরের মত সম্ভ্রান্ত বাহু-নীতিবিদও একটু পক্ষ অস্বীকার করিলেন।

এবার 'পালের গোদা' জেনারেল হেদিকি তোজোর পালা। দুর্দান্ত তোজো ছিলেন প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের সবচেয়ে উর্বর মস্তিষ্ক চক্রান্তবাজ। কিন্তু ৬৩ বছর বয়স্ক এই জাপানী বীরপুরুষের গৌরবের দিন অন্তিমিত। তাঁর সাবের সৈন্যবাহিনী পরাজিত ও বিপর্যস্ত। সুতরাং জনসাধারণের চক্ষেও তিনি নামিয়া গেলেন এবং অনেকেরই প্রত্যাশা কবিলেন যে, তিনি এবার আত্মহত্যা করিবেন। এমন কি, তাঁকে হারাকিরি করার জন্য জনগণের ২৫ থেকে তাঁর পরিবারের নিকট টেলিফোন-যোগে তাগিদ আনিতে লাগিল।

জেনারেল তোজোর বিশাল বাসগৃহ ছিল টোকিওর বড়লোকদের পাড়ায়, ভূমির আয়তনও ছিল অমিয়ারির মত প্রকাণ্ড এবং সেখান থেকে মাত্র ৫০ মাইল দূরে 'পবিত্র' ফুজিয়াম; পর্বত দেখা যাইত। কিন্তু এই সম্পদ ও ধ্যাতি আজ তোজোর জীবনে যেন বিড়ম্বনা মাত্র। পরাজয়ের গ্লানি থেকে বেহাই পাওয়ার জন্য তোজো তাঁর শেষ পক্ষ হিসাবে মৃত্যুবরণই বাঞ্ছনীয় মনে করিলেন। সুতরাং তিনি সেই চরম মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি ডাক্তারের কাছে গেলেন এবং তাঁর কাছ থেকে জানিয়া নিলেন তাঁর দেহে হার্টের যথেষ্ট অবস্থান কোথায়। সেই জায়গাটা তিনি চিকিৎসকের কাছ থেকে চিহ্নিত করিয়া আনিলেন। আগে তাঁর কর্তব্য আছে সম্রাট ও সম্রাট পরিবারের প্রতি একটি পত্র লিখিয়া তিনি যুদ্ধের সমস্ত দায়িত্ব নিজের স্বন্ধে নিলেন এবং রাজ-পরিবারকে সমস্ত দায়িত্ব থেকে রেহাই দিলেন।

১০ই সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা তোজোকে সাক্ষাৎ করিলেন এবং তোজো তাঁর সুসজ্জিত বাগানে বসিয়া খোস মেজাজে গল্প করিলেন। মিত্রপক্ষীয় বোম্বার্ডগুলি তাঁর সম্পত্তি, বিশেষ ভাবে তাঁর সুদৃশ্য পাইন গাছগুলির যে ক্ষতি সাধন করিয়াছে, রিপোর্টারদের কাছে তা' নিয়া তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, তাঁকে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে গণ্য করা হইবে না। 'কেন না, কোন জাতি যদি কোন যুদ্ধকে যথার্থ ও জ্ঞানসন্মত বলিয়া মনে করে, তবে সেই যুদ্ধ পরিচালনা করার অর্থই যুদ্ধাপরাধ নয়—এই দুয়ের মধ্যে নিশ্চয়ই তফাৎ আছে' (১২)

কিন্তু পরদিনই তোজোর তুল ভাঙ্গিয়া গেল। ইয়োকোহামাতে মার্কিন অষ্টম বাহিনীর সদর দপ্তরে যুদ্ধাপরাধীদের যে তালিকা তৈরী হইতেছিল, তাতে তোজোর নাম ছিল প্রথম সারিতে। অপরাহ্ন চারটার সময় ৬ জন সৈন্যসহ একজন মার্কিন

মেজর তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য তাঁর বাস ভবনে আসিয়া হাজির হইলেন। তাঁর গ্রেপ্তারের এই রোমাঞ্চকর দৃশ্য দেখার জন্য সংবাদপত্রের রিপোর্টার এবং কটোগ্রাফাররাও ভীড় করিলেন। তোজো তাঁর গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং তাঁর আগে তাঁর স্ত্রীকে গৃহত্যাগ করার জন্য নির্দেশ দিলেন, যিসেস্ তোজো তখন পিছনের দরজা দিয়া নিষ্কাশিত হইলেন।

এদিকে তাঁর গ্রেপ্তারকারী মার্কিন সৈন্তেরা যখন তাঁর বন্ধ দরজার উপর আঘাত করিতেছিলেন, তখন তোজো হঠাৎ তাঁর পাঠকক্ষের জানালা খুলিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিলেন—‘আমি জেনারেল তোজো’। কিন্তু তিনি জানিতে চাহিলেন যে, তাঁকে গ্রেপ্তার করার উপযুক্ত কর্তৃত্ব আগন্তুকদের আছে কিনা। তাঁরা দোভাষী মারক্স জানাইলেন যে, হ্যাঁ, আছে। তাঁকে গ্রেপ্তার করিয়া ইয়োকোহামাতে লইয়া যাওয়ার জন্যই তাঁরা আসিয়াছেন।

বাস্ ! আর কিছু বলিতে হইল না। তোজো তাঁর কক্ষের একটি চেয়ারের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন এবং তাঁর বৃকের চিহ্নিত স্থান লক্ষ্য করিয়া রিভলভারের গুলি চালাইলেন (তাঁর জামাতা কোগ এই রিভলভার দিয়াই যুদ্ধাবসানের দিন আত্মহত্যা করিয়াছিলেন)। বেলা তখন অপরাহ্ন ৪-১৭ মিনিট গুলির শেষে বাইরে অপেক্ষমাণ মার্কিন মেজর ও তাঁর সৈন্তেরা দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন তোজোর মাথা চেয়ারে হেলিয়া পড়িয়াছে, আর রিভলভারটা মেঝেতে পড়িয়া আছে।

তোজো কিছু মরিলেন না। সেই ঘরে ভীড়ের মধ্য থেকে কে একজন বলিয়া উঠিল—‘জাখো পীত বেজিয়াটার কাণ্ড। ছুঁ চালাবার সাহস পর্বন্ত হলো না।’ (১৩)

তোজোর কপাল মঞ্চ। মার্কিনীদের হাতে বন্দী হইয়া তিনি ইয়োকোহামার সামরিক হাসপাতালে নীত হইলেন এবং সেখানে আমেরিকান সার্জনের চিকিৎসা সাধিয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁর দেশের লোকের অনেকে এজন্য তাঁকে বিক্রপ করিলেন। (পরে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে তাঁর বিচার ও ফাঁসি হইয়াছিল)

তোজো যখন মার্কিন সামরিক হাসপাতালে যত্নের সঙ্গে পাক্সা লড়িতেছিলেন, তখন টোকিওর অল্প এক শহরতলীতে আর একজন বিখ্যাত সামরিক পুরুষ অল্পকাল সমস্তায় পড়িলেন। তবে, তাঁর সমস্তাটা একটু ভিন্ন ধরনের ছিল। কেন না, তাঁর পত্নী তাঁকে প্রাণ বিসর্জনের জন্য তাগাদা দিতেছিলেন। কিন্তু মার্শাল জেনারেল সুগিয়ামা এবং তাঁর ত্রিশ বছর বয়সী স্ত্রী সুদী দম্পতীরূপেই জীবন যাপন করিতে ছিলেন। পার্ল হারবার আক্রমণের সময় সুগিয়ামা ছিলেন সেনানী মণ্ডলীর কৰ্মাধ্যক্ষ। সুভয়াংশ প্রশান্ত মহাসাগরীর যুদ্ধের সঙ্গে একান্তরূপে জড়িত। কিন্তু আজ পরাজয়ের জাতীয় বিপর্যয়ের পর সুগিয়ামার মত জঁদরেল সামরিক পুরুষের নিশ্চয়ই দায়িত্ব অস্বীকার করা উচিত নয়। তাঁর স্ত্রী এই যুক্তিতে তাঁর নিজের এবং জাতির আত্ম-সম্মান রক্ষার জন্য সুগিয়ামাকে যত্নবরণের জন্য অহরোধ করিলেন এবং সুগিয়ামাও

পরদিন আত্মহত্যা করার জন্ত সজ্জ করিলেন। তাঁর স্ত্রী খুসী হইলেন এবং স্বামী-স্ত্রী সেদিন রাতে ঘনের আনন্দে মত্ত—সাকি (Sake) পান করিলেন এবং দৃষ্টিচক্ষে গল্প করিতে করিতে ‘শেষ ডিনার’ সম্পন্ন করিলেন।

আত্মহত্যার জন্ত স্ত্রী স্বামীকে প্ররোচিত করে, এমন দৃশ্য পৃথিবীতে কদাচিৎ দেখা যায়। কিন্তু সেদিনের জাপানে বোধ হয় সবই সম্ভব ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে আত্মহত্যার দেনী হইল। কারণ, সম্রাট সুগিয়ামাকে ডাকিয়া নির্দেশ দিলেন যে, সেনাপতিদের ব্যক্তিগত স্বত্ব হুঃখ তুলিয়া গিয়া টোকিও এলাকা থেকে সৈন্ত অপসারণ যত দ্রুত সম্ভব নিষ্পন্ন করা উচিত (আত্মসমর্পণের চুক্তি অগ্রহাণী)। সুতরাং সুগিয়ামাকে আগে সম্রাটের আদেশ পালন করিতে হইবে, তারপর নিজেব মৃত্যুর কথা।

কিন্তু এদিকে তাঁর স্ত্রী অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং তাঁকে ক্রমাগত তাগাদা দিতে লাগিলেন তাঁর প্রাণ বিসর্জনের জন্ত, আত্মসম্মান রক্ষার জন্ত। স্ত্রীর তাগাদায় সুগিয়ামার জীবন যেন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল এবং রাতে উভয়ের শয্যা গ্রহণও যেন হুঃসহ বলিয়া মনে হইল। অবশেষে ১১ই সেপ্টেম্বর টোকিও এলাকা থেকে শেষ জাপানী বাহিনী অপসারিত হইল এবং সুগিয়ামা ঘোষণা করিলেন তাঁর কর্তব্য শেষ, এবার তিনি মৃত্যুর জন্ত প্রস্তুত। একথা শুনিয়া তাঁর স্ত্রী মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

কিন্তু সুগিয়ামা বুদ্ধ এবং তাঁর স্ত্রী তরুণী এবং শেষবারের জন্ত তিনি পুনরায় স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘কবে তুমি হারাকিরি করিবে?’...

১২ই সেপ্টেম্বর সকালে কিন্তু মার্শাল সুগিয়ামা বেলা ১০টার সময় তাঁর অফিসে গেলেন এবং তাঁর প্রিয় সেক্রেটারি কোবাইয়্যাসিকে তাঁর শেষ সংস্কার কথা জানাইলেন এবং তাঁকে এই বিশেষ অমুরোধসহ তাঁর স্ত্রীর নিকট পাঠাইলেন যেন তাঁর স্ত্রী তাঁর মৃত্যুর পর আত্মহত্যা না করেন।

এরপর কিন্তু মার্শালের কক্ষ থেকে একটা গুলির আওয়াজ শুনা গেল। সুগিয়ামা তাঁর নিজের বুক লক্ষ্য করিয়া পিস্তলের গুলি করিলেন। অফিসাররা তাঁর কক্ষে ছুটিয়া আসিলেন এবং বিহ্বলচিত্তে লক্ষ্য করিলেন সুগিয়ামা অনিবার্য মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িতেছেন।

ইতিমধ্যে একজন অফিসার টেলিকোনে মিসেস সুগিয়ামাকে তাঁর স্বামীর এই মর্মান্তিক ট্রাজেডির কথা জানাইলেন। তিনি কটিমাত্র প্রশ্ন করিলেন—‘সত্যি কি, আমার স্বামী মারা গিয়াছেন?’

যখন তিনি জবাব পাইলেন—‘হাঁ’, তখন টেলিকোনের রিসিভারটা রাখিয়া দিয়া তিনি তাঁর ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং তারপর একটি ছোট্ট ছুরিকা হাতে নিয়া নিজের বুকে বিদ্ধ করিলেন। সেই ক্ষতস্থান থেকে অল্প একটু তালারক্ত বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যু হইল না। মিসেস সুগিয়ামা তখন একটি ঘরের পাত্র (সারেনাইড) মুখে তুলিয়া নিলেন এবং নিঃশেষে পান করিলেন।

মিসেস সুগিয়ামার বিগত প্রাণ দেহ যেক্ষণে উপর লুটাইয়া পড়িল।...



অবশ্য সম্রাটের জন্ত এবং দেশের জন্ত হারাকিরির দ্বারা আত্মবিসর্জন করা জাপানে বীরের ধর্মরূপে গণ্য এবং এই ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রথা পালন করিতে না পারাই বরং ভীকৃতরূপে পরিচিত।

### সৈন্যদের অভ্যাচার

প্রাচীনকাল থেকেই যুদ্ধের কলেবিজয়ী সৈন্যদের দ্বারা নানাপ্রকার বর্বরতা, অভ্যাচার, অনাচার ঘটনা আসিতেছে এবং সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হইতেছে পুরুষ বন্দীদের উপর নির্ধাতন এবং নারীধর্ষণ। এবারের মহাযুদ্ধেও এই সমস্ত বর্বরতা বহু দেশেই চরমে উঠিয়াছিল। যদিও ক্যাসিটের অত্যাচারের সঙ্গে কোন তুলনা দেওয়াই চলে না, তবু মিত্রপক্ষীয় সৈন্তেরা নান' স্থানে বহু অনাচার করিয়াছে। যেমন জাপানের আত্মসমর্পণের পর গোড়ার দিকে দখলদার মার্কিন সৈন্তেরা ইয়োকোহামা, ইয়োকোসুকা এবং টোকিওতে লুণ্ঠরাজ্য, মাতলামি ও নারীধর্ষণের বহু ঘটনার সংগে জড়িত ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রের ভিতর দিয়া যাদের দিন রাজি কাটে এবং মাসের পর মাস তারা জীপের পরিবারের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অস্বাভাবিক জীবন যাপনে বাধ্য হয়, তাদের ধৌন মনস্তত্ত্ব সাধারণতঃ উগ্ররূপ ধারণ করে। এই সমস্ত 'ক্ষুধার্ত' সৈন্তের জন্ত সময় সময় কিছু 'সুযোগের' ব্যবস্থাও করিয়া রাখিতে হয়। সুতরাং আত্মসমর্পণের দলিলে জাপানের স্বাক্ষর দানের পর যখন মার্কিন সৈন্তদের টোকিওতে প্রবেশ আসন্ন হইয়া উঠিল, তখন একজন সামরিক অফিসার আসিয়া টোকিওর পুলিশ কর্তৃপক্ষের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—'টোকিওর রেড লাইট ডিস্ট্রিক্ট, অর্থাৎ গণিকাপল্লী কোথায়?'

কিন্তু মিত্রপক্ষীয় বিমানবহরের ব্যাপক আক্রমণে টোকিওতে য. ধ্বংসকাণ্ড ও অগ্নিলীলার বিস্তার হইয়াছিল, তার কলে টোকিওর অগণিতব্যাত গণিকাপল্লী—'বাশি-ওয়ারি এলাকা' পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু জাপানী গবর্নমেন্ট আঁত ধরত শহরের অন্তর একটি অংশে একটি নতুন গণিকাপাড়া গড়িয়া তুলিলেন। আমেরিকান অফিসারটি সেই নতুন ঠিকানা এবং 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ' সংবাদটি জানিয়া নিলেন।...

দখলদারি আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন সৈন্তদের উচ্ছৃঙ্খলতা, ডাকাতি ও লুণ্ঠের খবর এবং বিশেষভাবে স্ত্রীলোকদের উপর বলাৎকারের খবর আসিতে লাগিল। ইংরাজ গ্রন্থকার উইলিয়াম ক্রেইগ লিখিয়াছেন যে, বিজয়ী মার্কিন সৈন্তদের লাহনা থেকে নারীর ধর্ম রক্ষার উদ্দেশ্যে জাপানী মহিলারা অনেক ক্ষেত্রে বিবপানে আত্মহত্যা করিতে চাহিয়াছিলেন। তবু প্রথম ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অনেকগুলি বলাৎকার অন্তর্ভুক্ত হইল। ইয়োকোসুকা শহরে তিনজন মার্কিন সৈন্ত একজন জাপানীর গৃহ হানা দিয়া তার স্ত্রী ও কন্যার উপর ধর্ষণ করিল।

অবশ্য এই সমস্ত অভ্যাচারের ঘটনার পর সুপ্রসীদিত কমাওয়ার ম্যাক-আর্থার এই মর্মে কড়া হুকুম জারি করিলেন যে, কাহারও বলাৎকারের অপরাধ প্রমাণিত হইলে তাকে বৃত্তান্ত দেওয়া হইবে।

এই সমস্ত কড়াকড়ি ও কঠোরতা অবলম্বিত হওয়ার পর জাপানে নারীর উপর চরম লাঞ্ছনার যাত্রা অশ্রু কমিয়া গিয়াছিল।...

কিন্তু বিজিত জাপানে যখন এই অবস্থা চলিতেছিল তখন বিজয়ী আমেরিকাতে ‘শান্তির লগিত বানী’ কি মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল? অর্থাৎ জাপানের পরাজয় স্বীকারের বার্তা প্রচারিত হওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রামে, শহরে ও বড় বড় নগরীতে কি অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল?

বিভিন্ন মার্কিন পত্রিকার রিপোর্ট অনুসন্ধান করিয়া মিঃ ক্রেইগ লিখিয়াছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শহরে শহরে, জনপদে জনপদে হল্লা, আমোদ ও উচ্ছ্বলতার যেন প্রবল বান ডাকিল। অনেক বছর পর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসানে ও শান্তি ঘোষিত হওয়ার পর দলে দলে নরনারী যেন বাঁধ ভাঙা জোয়ারে গা ভাসাইয়া দিল। ফুঁ-বাজ ও হল্লামত্ত সৈন্তরা শহরের কেন্দ্রস্থলগুলিতে চলমান মোটরে লাকাইয়া উঠিতে এবং মহিলাদের চুষন করিতে লাগিল। মহিলারা কোন প্রতিবাদ করিলেন না। টাইমস্‌ ফোয়ারে উৎসবমত্ত নরনারীর যেন ভীড় জমিয়া গেল। তীব্র বৈজ্ঞানিক আলোর উজ্জ্বল আভার পুরুষ ও নারী পরস্পরকে চুষন জালিলেন এবং প্রেমের আত্ম-বলিক ক্রিয়াকলাপে ও মদ্যপানে মাতিয়া উঠিল। বিখ্যাত ‘ওয়শিংটন পোস্ট’ সংবাদপত্রেণে অট্টালিকার সমুদ্রে এক বিচিত্র ঘটনা ঘটিল। হঠাৎ দেখ গেল একটি ট্যান্কি থেকে একটি মৈত্র ও একটি যুবতী নামিয়া আসিতেছে এবং নামিয়াই তাহার রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া প্রকাশ্যে তাদের পরিহিত জামা কাপড় সব ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল। রাস্তার উপর দণ্ডায়মান ‘সহায়ত্বভিক্ষার দর্শকেরা’ তাদের উদ্দেশ্যে চোঁচাইয়া বলিতে লাগিল—‘খুল কেনো, খুলে কেনো, সব খুলে কেনো!’

সত্যি সত্যি সেই নর-নারী সমস্ত খুলিয়া ফেলিয়া রাস্তার উপর সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া দাঁড়াইল...

কিন্তু ভয়াবহ উচ্ছ্বলতা এবং হি স্র তাণ্ডব ঘটিল স্তানজালিস্কোভে। অপরায় ৪টার সময় জাপানের আত্মসমর্পণের খবর আসিল এবং সঙ্গে সঙ্গে শুরু হইল নৌসৈন্ত ও নাগরিকদের মস্তপানের বেপরোয়া মাতলামি ও উন্নততা। চীৎকারে, হল্লায় ও মোটরগাড়ী চাপা পড়ায় যেন এক ধরনের সজ্ঞাসের দৃষ্টের অবতারণা হইল। বলাই বাহ্যিক যে, এমন প্রমত্ত প্রমোদের পরিস্থিতি যুবতী নারীদের পক্ষে বিপজ্জনক ছিল এবং বিপদ ঘটিলও বটে, অন্ততঃ ৬টি যুবতী পথচারিণীর :

‘People stood horrified as at least six girls were forcibly thrown on the pavements, held down and repeatedly raped. No one moved to their aid. Policemen watching the assaults looked the other way, afraid to confront the liquor-sodden serviceman.’

প্রকাশ্যে রাস্তার উপর ফেলিয়া অন্ততঃ ৬টি যুবতীর উপর সুরামত্ত সৈন্তদের বারবার বর্বাকার অত্যাচারের কি ভয়াবহ বর্ণনা। দর্শকেরা ত্রাসগ্রস্ত, স্তম্ভিত, আর পুলিশেরা অসহায়ের মত অস্ত্র দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল। (১৪)

এভাবেই যুদ্ধ শেষ হইল এবং সম্ভবতঃ যুগে যুগে এমন বর্ষবৃত্তার কথা দিয়াই যুদ্ধের অবসান ঘটিয়া থাকে, আর অগণিত মানুষের আত্মনাশ ধ্বংস, মৃত্যু ও অভ্যাতারের আড়ালে চাপা পড়িয়া যায়। ইতিহাসের পরিহাস এই যে, শেষ পর্যন্ত দেশের লোকও সেই সমস্ত পাশবিকতার কথা ভুলিয়া যায়। এমন কি, আবার নতুন যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হইতে থাকে।

### যুদ্ধাবসানের ঘোষণা

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান হোয়াইট হাউস থেকে ঘোষণা করিলেন যে, জাপান নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দাবি মানিয়া লইয়াছে। সমস্ত রণাঙ্গনে কামান গর্জন স্তব্ধ হইয়াছে এবং যুদ্ধের অবসান ঘটিয়াছে। জাপানের আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষর—২রা সেপ্টেম্বর তারিখটি জাপানের উপর বিজয় দিবসরূপে (V. J. Day) উদ্‌যাপনের জন্ত ঘোষণা করা হইল। এই বিজয় দিবসের বক্তৃতায় ট্রুম্যান তাঁদের কথা শ্রবণ করিলেন, যারা এই যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন এবং অসহ্য দুঃখভোগ করিয়াছেন। তাঁদের এই আত্মবিসর্জন ও যত্নশ্রী ভোগের জগুই এই যুদ্ধ জয় সম্ভব হইয়াছে। তিনি তাঁর এই বক্তৃতায় মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে কোন মত বিরোধের কথা উল্লেখ করিলেন না কিংবা পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের কলাকল সম্পর্কেও কোন মন্তব্য করিলেন না। বরং আগামী দিনের পৃথিবীর শান্তি, নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক শৃংখলা ও সহযোগিতার এক নতুন যুগ সম্ভাবনার উপরেই জোর দিলেন। তিনি এই বক্তৃতায় ভগবানের কথাও ভুলিলেন না এবং শ্রবণ করিলেন তাঁর সাহায্যেই এই জয় সম্ভব হইয়াছে এবং তাঁর সাহায্যেই আগামী দিনের পৃথিবীর শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জিত হইবে :

'From this day we move forward. We move toward a new era of security at home. With the other United Nations we move toward a new and better world of peace and international good will and co-operation.

'God's help has brought us to this day of victory. With his help we will attain that peace and prosperity for ourselves and all the world in the years ahead' (১৫)

চার্লিস যেমন এ্যাটম বোমার সাকল্যের জন্ত একটি বিবৃতিতে ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং 'ঈশ্বরের দয়াতেই' (by God's mercy) একমাত্র বৃটেন ও আমেরিকা পারমাণবিক রহস্ত আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানও তেমনি এত বড় যুদ্ধ জয়ের জন্ত ভগবানের প্রতি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ১২শে আগস্ট, রবিবার, তারিখটিকে নির্দিষ্ট করিলেন। কারণ, একমাত্র তাঁর দ্বারাতেই সমস্ত দুঃখকষ্ট ও বিপদ পার হইয়া এত বড় গৌরবান্বিত বিজয় অর্জন সম্ভব হইয়াছে। 'সুতরাং আত্মন আমরা তাঁকে ধন্যবাদ দেই।' (১৬)

(১৫) Japan Subdued—Feis, p. 156

(১৬) ট্রুম্যান (ষষ্ঠীয় ৭৩, ) পৃষ্ঠা ৩০৮

অবশ্য ঈশ্বরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের আগে : এই আগষ্ট জাপানের আত্ম-সমর্পণের সংবাদ পাওয়া মাত্র ট্রুম্যান রাজি ৮টার সময় হে রাইট হাউজের সম্মুখে সমবেত জনতার নিকট জয়ে উল্লাস প্রকাশ করিলেন এবং তাঁর আত্মসমর্পণে গর্বের সঙ্গে মন্তব্য করিলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এত বড় যুদ্ধজয়ের পরেও মাহুতের সুখ শান্তি ছাড়া কোন দেশের কোন ভূমিখণ্ড কিংবা কোন ক্ষতিপূরণ দাবি করে নাই। ‘পৃথিবীর ইতিহাসে যে কোন জাতির পক্ষে এমন দৃষ্টান্ত দুর্লভ।’ (১৭)

এখানে স্বরণ করা যাইতে পারে যে, হিটলারও অনেক যুদ্ধজয়ের পর ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের নেতাদের মতই ‘ঈশ্বরের অমুগ্রহে’র দোহাই দিয়াছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই কি শেষ পর্যন্ত তাঁকে আত্মহত্যাও করিতে হইয়াছিল ?

এদিকে মস্কোতেও জাপানের আত্মসমর্পণ উপলক্ষ্যে ৩রা সেপ্টেম্বর বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান হইল এবং ট্যালিন তাঁর বক্তৃতায় ১৯০৪ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধ (যষ্ঠ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে) ও জাপানের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আক্রমণের কথা উল্লেখ করিলেন। তবে, এবার জাপানের পরাজয়ের জন্ত রাশিয়া যে পুনরায় দক্ষিণ শাখালিন ও কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ পুনরায় ফেরত পাইবেন এবং এখন থেকে প্রশান্ত মহাসাগর প্রবেশের পথে আর বাধা রহিল না, সে কথা স্মরণ করিলেন। আর দূততার সঙ্গে বলিলেন যে, এখন থেকে সোভিয়েত রাশিয়া পশ্চিম দিকে জার্মানী এবং পূর্ব দিকে জাপানী আগ্রাসনের আশঙ্কা থেকে মুক্ত হইল।

রেড স্কোয়ারে জয়োৎসব অনুষ্ঠিত হইল এবং বহু আতসবাজী গোড়ানো হইল বটে, কিন্তু কোন কোন প্রত্যক্ষদর্শীর মতে জাপানের বিরুদ্ধে এই জয়লাভে রুশ জনগণের মধ্যে তেমন উৎসাহ ছিল না এবং নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে জয়োৎসবের সময় যে বিশাল জনতার সমাবেশ হইয়াছিল, এবার তার এক-দশমাংশও উপস্থিত ছিল না।

তথাপি রাশিয়ার দাবী এই যে, মাকুরিয়ার তাদের আক্রমণের জন্তই জাপানের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটিয়াছে। অপর পক্ষে আমেরিকার দাবি এই যে, গ্র্যাটম্ বোমার চূড়ান্ত আঘাতেই জাপান এত দ্রুত ধরাশায়ী হইয়াছে। কিন্তু অনেকের ধারণা এই যে, পটসডাম ঘোষণার সময়েই জাপান আত্মসমর্পণের জন্ত ঠেকুক হইয়াছিল। কিন্তু তারা জাপ সম্রাটের মর্যাদা সম্পর্কে আশ্বাসের দাবি করিয়াছিল। হিরোশিমায় বোমা বর্ষণের চারদিন আগে এবং মাকুরিয়ার রুশ আক্রমণের ৬ দিন আগে ২রা আগষ্ট তারিখ মস্কোতে জাপানী রাষ্ট্রদূত মলোটোভের নিকট পটসডাম ঘোষণার এই প্রস্তটি নিয়াই আলোচনা করিতে চাহিয়াছিলেন। (১৮)

কিন্তু তাঁর সেই অনুরোধ ব্যর্থ হইয়াছিল।

\* \* \*

রাশিয়া কর্তৃক মাকুরিয়ার জাপানের বিরুদ্ধে আক্রমণের আগে ট্যালিন একমাত্র চিয়াং কাইসেকের নেতৃত্বে চীনের ঐক্য রক্ষা করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন বলিয়া কোন কোন মার্কিন গ্রন্থে (যেমন, হপকিন্সের রিপোর্ট ‘অল্পদায়ী শেরউডের বিখ্যাত ইতিহাসে’) উল্লেখ করা হইয়াছে, ইদানীংকালের মধ্যে থেকে প্রকাশিত সাময়িক

(১৭) ট্রুম্যান (ষিভীর খণ্ড), পৃষ্ঠা ৪৮৩

(১৮) Russia At War—Alexander Werth, p. 928—929

ইতিহাসগুলিতে সেই সমস্ত কথা অস্বীকার করা হইয়াছে। বরং দাবী করা হইয়াছে যে, জাপানীদের বিরুদ্ধে মাকুরিয়ার সোভিয়েত বাহিনীর যুদ্ধের সময় চীন ও সোভিয়েত জনগণের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে এই বন্ধুত্ব উভয় পক্ষের রক্তের মূল্যে গাঢ়তর হইয়াছিল। সেই সময় মাও সে-তুং লিখিয়াছিলেন :

“The Red Army went to the assistance of the Chinese people. This is unprecedented in the history of China. Its impact is incalculable.”

অর্থাৎ ‘লালকোঁজ চীনা জনগণের সহায়তার জন্য আগাইয়া আসিয়াছিলেন। চীনের ইতিহাসে এই ঘটনা অতীতপূর্ব এবং এর প্রভাব অপরিমেয়।’

এই প্রসঙ্গে আরও দাবী করা হইয়াছে যে, সোভিয়েত বাহিনীর হাতে পরাজিত জাপানী কোয়ান্টাং বাহিনীর সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ চীনের গণকোঁজের (পিপলস লিবারেশন আর্মি) হাতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং এভাবে চীনের বৈপ্লবিক শক্তিকে সহায়তা করা হইয়াছিল। (১০)

যদিও জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ এবং চীনের প্রহ্ন নিরা কিছু কিছু বিতর্কের অবসর আছে, তথাপি ইতিহাসের দিক থেকে একথা অস্বীকার করা যায় না যে, ইউরোপে ও সুদূর প্রাচ্যে সোভিয়েত রাশিয়ার জয়লাভের জন্যই চীনে ও এশিয়া মহাদেশে বৈপ্লবিক শক্তিগুলির জয়যাত্রা ত্বরান্বিত হইয়াছিল।

## দশম পর্ব

### নবম অধ্যায়

#### স্থানান্তরকারীদের বিচার : যুদ্ধাপরাধীদের দণ্ড

২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫, 'মিশোরি' যুদ্ধজাহাজে জাপান কর্তৃক সরকারীভাবে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরের পর বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান হইল। কিন্তু ইতিহাসের অভূতপূর্ব এই মহাযুদ্ধ শেষ হইলেও যারা এই পৃথিবীব্যাপ্ত হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসের জন্ত দায়ী ছিল, তারা তাদের এই রুডকর্মের জন্ত রেহাই পাইল না। পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের দ্বারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যেমন মল্লভাঙির ইতিহাসে এক নতুন যুগের সিংহদ্বার (কিংবা যত্নদ্বার?) খুলিয়া দিল, তেমনি নাৎসী ও ক্যাসিষ্ট শক্তিবর্গের সামরিক ও অসামরিক অফিসার ও নেতাদেরকে যুদ্ধাপরাধের জন্ত দায়ী করিয়া বিচার ও দণ্ডদানপূর্বক মহাযুদ্ধের ইতিহাসে আর একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করা হইল। ১০শে মে, ১৯৪৫, লণ্ডনের 'রাজকীয় স্মার-আদালতে' ইউনাইটেড নেশন্সের ওয়ার ক্রাইমস্ কমিশনের চেয়ারম্যান লর্ড রাইট-এর (Lord Wright) অধিনায়কত্বে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইল, তারই কালে যুদ্ধাপরাধের বিচার সম্পর্কে চতুঃশক্তির মধ্যে এক নতুন চুক্তি ও চাটার বা সনদ স্বাক্ষরিত হইল। ৮ই আগস্ট, ১৯৪৫, লণ্ডনে এই সনদের স্বাক্ষরকারীরা ছিল ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও সোভিয়েত রাশিয়া। এই সনদের দ্বারা ইতিহাসে সর্বপ্রথম দাবাণা করা হইল যে, আক্রমণাত্মক যুদ্ধের অনুষ্ঠান, যুদ্ধের আইনভঙ্গ এবং অসামরিক জনগণের—এমন কি নিজ দেশের নাগরিকদের প্রতিও বর্বরতার অনুষ্ঠান আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে। জার্মানীর সামরিক, রাজনৈতিক ও শ্রমশিল্পের নেতাদেরকে একটি আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতে (ট্রাইব্যুনাল) বিচারের ব্যবস্থা করা হইবে।

কিন্তু যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কিংবা বিচারের প্রস্তাব এই প্রথম নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পরও এই ধর নর প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল বটে, তবে সেগুলি ছিল ভিন্ন প্রকৃতির এবং তখনও অপ্রাচ্যার ও দ্রাসের কাহিনী শুনা গিয়েছিল। যখন—বেলজিয়মের অসামরিক জনগণের বিরুদ্ধে, নার্স এডিথ ক্যাভেল'-এর ও ক্যাপ্টেন ফ্রাইটের (Fryatt) হত্যাকাণ্ডে এবং হাসপাতাল জাহাজ ও বাণিজ্য তথা যাজীবাহী জাহাজগুলির (যেমন, 'লুসিটানিয়া') ধ্বংসাত্মক নিমজ্ঞনে। প্রথম মহাযুদ্ধের এটি একটি অন্ততম ভয়াবহ ঘটনা। ৩১,৫০০ টনের এই ব্রিটন জাহাজটি ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম যাজীবাহী জাহাজের অন্ততম। ১৯১৫ সালের ৭ই মে এই জাহাজটি জার্মান সাবমেরিন কর্তৃক নিকপ্ত দুইটি টর্পেডোর আঘাতে ২০ মিনিটের মধ্যে সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছিল। এই জাহাজে ১২৫৫ জন যাজীবাহী এবং ৩৫১ জন লস্কর ছিল। এদের মধ্যে ১২৪ জন আমেরিকান সহ মোট ১১৩৮ জন নিমজ্ঞিত কিংবা নিহত হইয়াছিল। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর বিরুদ্ধে আমেরিকার বোগদানের অন্ততম কারণ ছিল এই

বাজী জাহাজের ধ্বংস সাধন। 'লুসিটানিয়া' জাহাজে কোন অস্ত্রশস্ত্র বা গোলাবারুদ ছিল না।

কিন্তু যারা এই সমস্ত অপরাধের দায়ী ছিল, তাদের বিচারের জন্য কোন কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে নাই। কয়েকটি তদন্ত কমিশনও নিযুক্ত হইয়াছিল বটে, সাক্ষ্য প্রমাণও কিছু কিছু গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু আসামীদেরকে গ্রেপ্তার করিয়া আদালতে অভিযুক্ত করা সম্ভব ছিল না। এর প্রধান কারণ এই যে, সেবার মিত্রশক্তিবর্গের দ্বারা জার্মানী দখলীকৃত ছিল না। কিন্তু সেবারেও তদন্তে দেখা গিয়াছিল যে, অপরাধগুলি পূর্ব-পরিকল্পিত ও পূর্ব-সঙ্ঘটিত ছিল--বিত্তীয় মহাযুদ্ধে ক্যাসিট শক্তিবর্গের অপরাধের এটাই ছিল নিয়মিত বৈশিষ্ট্য।

অবশ্য ভার্সাই সন্ধির ২১৮ ২৩০ অর্জুন্ডে অমুসারে জার্মানী যুদ্ধসংক্রান্ত অপরাধের জন্য দায়ী ব্যক্তিদেরকে মিত্রশক্তিবর্গের হাতে অর্পণ করিতে বাধ্য ছিল এবং মিত্রশক্তিবর্গের সামরিক আদালতে তাদের বিচারেরও কথা ছিল, তথাপি কার্যক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯২০ সালের প্রথম ভাগে জার্মানীর সবচেয়ে খ্যাতিমান, সম্মান'র্হ ব্যক্তিদের নামের তালিকাসহ ষোট ২০০ ব্যক্তির বিচারের দাবী করিয়া মিত্রপক্ষ যে দলিল পেশ করিলেন, তাতে স্বয়ং জার্মানীর সম্রাট বা কাইজার বিত্তীয় উইলহেলম, ফিল্ড মার্শাল হিওেনবুর্গ, ফিল্ড মার্শাল লুডেনডর্ক, এ্যাডমিরাল ফন্ তিরপিৎস্ (Tirpitz) প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় নৌ-সেনাপতি, সেনানায়ক এবং অধিকাংশ প্রিন্স বা রাজপুত্রদের নাম ছিল। কাইজারের বিরুদ্ধে 'আন্তর্জাতিক নৈতিকতা ও সঙ্কীর্ণতার পবিত্রতা ভঙ্গের চরম অপরাধের' অভিযোগ আনা হইয়াছিল। কাইজার অবশ্য হল্যাণ্ড বা নেদারল্যান্ডসে পলাইয়া গেলেন এবং সেখানে আশ্রয় নিলেন। ডাচ গবর্নমেন্ট এই সূক্তিতে কাইজারকে মিত্রশক্তির হাতে অর্পণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন যে, ওলন্দাজদের (ডাচ) আইনে এই ধরনের কোন অপরাধের উল্লেখ নাই এবং এই অপরাধ একমাত্র ভার্সাই সন্ধির বলে সৃষ্টি করা হইয়াছে। সুতরাং যে অপরাধের আগে কোন আইনগত অস্তিত্ব ছিল না, তার বিচারের দাবী স্থায়ী বিচারের পরিপন্থী।

অস্তিত্ব আসামীদের সম্পর্কে জার্মানীর সরকারের পক্ষ থেকে বলা হইল যে, রাইখস্ট্যাগে (পার্লিমেণ্টে) বিশেষ আইন প্রণয়ন ছাড়া এঁদেরকে মিত্রশক্তিবর্গের হাতে অর্পণ করা যাইবে না। কারণ, এঁদের অধিকাংশই জার্মানীতে জাতীয় বীরপুরুষরূপে সম্মান'র্হ। সুতরাং কোন গবর্নমেন্ট এঁদের বিরুদ্ধে আইন পাশ করিতে গেলে সেই সরকারের তৎক্ষণাত্ পতন অনিবার্য! তবে, বিরুদ্ধ প্রস্তাব অমুসারে কয়েকজন নিয়মদ্বয় অকিয়ারকে লাইপজিগের সুরীমকোর্টে অভিযুক্ত করা হইল। কিন্তু সেখানে বিচারের নামে বিচারের প্রহসন হইল। (১)

প্রথম মহাযুদ্ধের এই অভিজ্ঞতা থেকে বিত্তীয় মহাযুদ্ধের মিত্রপক্ষীয় নেতারা আগে থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং ১৯৪১ সালের ২৫শে অক্টোবর চার্লিস এবং ফ্রাঙ্কফোর্ট, ১৯৪১ সালের জ'নুয়ারী ও ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে

সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষ থেকে মলোটোভ কার্ভান অধিকৃত দেশগুলিতে নৃশংসতা অল্পাধিক সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারণ করিলেন এবং হিটলারী গবর্নমেন্ট, কার্ভান হাইকমাণ্ড ও তাদের কুকার্ভের অংশীদারগণকে এই সমস্ত অপরাধের জন্য দায়িত্ব বহন করিতে ও শাস্তি পাইতে হইবে বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে লণ্ডনে লর্ড রাইটকে চেয়ারম্যান করিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত একটি ঘৃণাপরাধ কমিশনের তরফ হইতে সাক্ষ্য গ্রহণের ব্যবস্থা হইল।...

১৯৪৩, নভেম্বর মাসে মস্কোতে বুটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের এক সম্মেলন থেকে ঘোষণা করা হইল যে, যে যে দেশের নাগরিকদের বিরুদ্ধে কার্ভান অফিসার ও নাৎসী পার্টির সদস্য ও লোকেরা নৃশংসতা, নিবিচার হত্যা ও প্রাণ হননের জন্য দায়ী তাদেরকে সেই সেই দেশে কেন্দ্র পাঠানো হইবে এবং সেই সমস্ত দেশের আইন অনুযায়ী তাদের বিচার ও দণ্ড হইবে। কিন্তু প্রধান প্রধান ঘৃণাপরাধীদের এবং যাদের অপরাধ কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়, তাদেরকে মিত্রপক্ষের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের দ্বারা শাস্তি দেওয়া হইবে। ১৯৪৫ সালের বিখ্যাত পটসডাম সম্মেলনে সোভিয়েত রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটিশ গবর্নমেন্টের প্রধানগণ কর্তৃক এই ঘোষণা অনুমোদিত হইল।

কার্ভানীর ঘৃণাপরাধীদের বিচার ও দণ্ডদান সম্পর্কে এই পটভূমিকা স্মরণীয় এবং বিশেষভাবে স্মরণীয় একজন যে, একমাত্র ছারেমবার্গের আন্তর্জাতিক আদালতে প্রধান প্রধান কার্ভান নেতাদের বিচার হইয়া থাকিলেও মিত্রপক্ষীয় বিভিন্ন দেশে ও অধিকৃত কার্ভান এলাকার বহু নাৎসী ও ক্যাসিট সামরিক বা প্রশাসনিক ব্যক্তিদের বিচার ও ফাঁসি হইয়াছিল। যেমন, মস্কো ঘোষণার অব্যবহিত পরেই ১৯৪৩, ডিসেম্বর মাসে চার্লজেন কার্ভানের বিরুদ্ধে গ্যাস সহযোগে অ-সামরিক সোভিয়েত নাগরিকদেরকে দলবদ্ধভাবে হত্যার অভিযোগ আনা হইল এবং বিচারের পর প্রকাশ্যভাবে তাদেরকে ফাঁসিকাঠে ঝুলাইয়া দেওয়া হইল।

যুদ্ধ বতাই শেষ হইয়া আসিতেছিল, ততই ঘৃণাপরাধীদের বিচারের জন্য নানা স্থানে সামরিক আদালত প্রতিষ্ঠিত ও অভিযুক্তদের বিচার ও দণ্ড হইতেছিল। ১৯৪৬, ৩১শে আগস্ট পর্যন্ত কার্ভানীর বৃটিশ অধিকৃত এলাকার ৪৪২ জন অভিযুক্তের মধ্যে ৩২০ জন আসামী দণ্ডিত হইয়াছিল। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিতদের মধ্যে একটি কার্ভান সাবমেরিনের (১৯৪৪ সালে অতলান্টিস মহাসমুদ্রে) একজন ক্যাপ্টেন ও দুইজন অফিসারও ছিলেন।

১৯৪৫ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর কার্ভানীর লুনবার্গে হুখাত বেলসেন বন্দীনিবাসের টাক্ বা কর্মচারীদের মধ্যে থেকে ৩৫ জনের বিরুদ্ধে ঘৃণাপরাধের অভিযোগ আনা হইল। ১৮ই নভেম্বর তারিখ এদের মধ্যে ৮ জন পুরুষ ও তিনজন স্ত্রীলোক সহ মোট ১১ জন আসামীকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইল। এই সমস্ত অপরাধীর মধ্যে ক্যাম্প কমণ্ড্যান্ট ক্রামার (Kramer), ক্যাম্প ডাক্তার ফ্রিৎস ক্লিন (Fritz Klein) এবং প্রধান নারী ওয়ার্ডার ইরমা গ্রেসি (Irma Grese) অত্যন্ত অসহন ও বর্বর অত্যাচারের দ্বারা অভিযুক্ত হইয়াছিল এবং তাদের সকলেরই ফাঁসি হইয়াছিল।



এই দলের মন্ত্রীরা ইরমা গ্রেসি এবং ক্রামার 'বিট অব্ বেলসেন' কিংবা বেলসেনের পণ্ডরূপে কুখ্যাত হইয়াছিল। এটাই ছিল জার্মানীতে বন্দীশিবিরের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের প্রথম বিচার।

ইতালীতে ডুস্তার (Dostler) নামে একজন জার্মান জেনারেলকে একটি মার্কিন সামরিক আদালত-প্রাণদণ্ড দেয়া হইয়াছিল ১৫ জন মার্কিন কমান্ডো সৈন্যকে হত্যা করার জন্য। এই সৈন্যেরা তখন যুদ্ধবন্দী ছিলেন। জার্মান সেনাপতি এই বলিয়া আত্মপক্ষ সমর্থ করিয়াছিলেন যে, কমান্ডো অভিযানে ধৃত সমস্ত শত্রুসৈন্যকে সংহার করার জন্য হিটলারের কড়া হুকুম ছিল। সুতরাং তিনি উপরওয়ালার হুকুম কার্যকর করিয়াছেন মা। কিন্তু আদালতে তাঁব এই যুক্তি গ্রাহ্য হয় নাই। কেন না, জেনেভা কনভেনশন অনুসারে যুদ্ধবন্দীদেরকে হত্যা করা যুদ্ধাপরাধ হিসাবে গণ্য।

\* \* \*

যুদ্ধের শেষে বিজয়ী পক্ষের মধ্যে বহু মতভেদ ছিল, একথা সত্য। কিন্তু একটি বিষয়ে তাদের সকলে একমত ছিলেন এবং তাঁদের দৃঢ় সংকল্প ছিল যারা যুদ্ধাপরাধের জন্য দায়ী, যারা হিংস্রতা ও নির্ধর্মতার দ্বারা অগণিত মানুষের সর্বনাশ করিয়াছে, তাদের দণ্ড দিতেই হইবে এবং কোন মতেই তাদের রেহাই দেওয়া হইবে না। মিত্রপক্ষীয় প্রধান চতুঃশক্তির স্বাক্ষরিত (৮ আগষ্ট, ১৯৪৫) এই চার্টারে রাষ্ট্রপুঞ্জ আদালত ১০টি সদস্যরাষ্ট্রে যে স্বাক্ষর দিল, তার ফলেই আন্তর্জাতিক সামরিক আদালত গঠিত এবং প্রধান প্রধান নাৎসী নেতাদের বিচার অল্পমিত হইল। ইতিহাসের নিষ্ঠুর পরিহাস এই যে, যে পুরাতন হ্যারেমবার্গ শহর ছিল হিটলারের প্রতিষ্ঠিত জ্ঞাননাল সোসিয়েলিস্ট পার্টির বিরাট বিরাট সভা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠানের লীলাভূমি এবং যেখানে লক্ষ লক্ষ জার্মান নর-নারী-যুবক হিটলারী মেঠো বক্তৃতার উদ্‌ঘাটনী মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পররাজ্য দখলে লোভাভুর হইয়াছিল, সেই হ্যারেমবার্গের বিচার কক্ষেই বড় বড় নাৎসী নেতাদের স্বীবনের উপর যবনিকা নাষিয়া আসিল।

২০শে নভেম্বর, ১৯৪৫, বেলা ১০টার সময় ৮ই আগষ্টের স্বাক্ষরিত চার্টার অনুযায়ী হ্যারেমবার্গে আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতের অধবেশন শুরু হইল। বিচারকমণ্ডলী গঠিত হইল চার জন জজ ও চার জন বিকল্প জজ নিয়া। যেমন—

- ১। সভাপতি লর্ড জাস্টিস জিওফ্রে লরেন্স (ব্রিটিশ)
- ২। বিকল্প—স্মার উইলিয়াম নরম্যান বারকেট্
- ৩। মিঃ ফ্রান্সিস বিডল (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন এটর্নি-জেনারেল)
- ৪। বিকল্প—জজ জন জে পার্কার
- ৫। ফ্রান্সের পক্ষ থেকে—

Henri Donnedieu de Vabres.

- ৬। বিকল্প—Le Conseiller Falco
- ৭। সোভিয়েত ইউনিয়ন—

বেকর-জেনারেল আই টি নিকিৎচেভো

৮। বিকল্প—লেঃ কর্নেল এ এক ডলচকোভ

বুটিন, মার্কিন, কন্সালী ও সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষ থেকে প্রধান অভিযোক্তা কোম্পানি ছিলেন যথাক্রমে—শ্রার হার্টলি শ'ক্স (Shawcross) কে-সি, এম-পি, ফ্রান্সিস ববার্ট এইচ জ্যাকসন, Francois De Menthon এবং জেনারেল আর এ ক্রমেরো।

এঁরা ছাড়া এঁদের সঙ্গে আরও ছিলেন শ্রার ডেভিড ম্যাকসওয়েল-ফাইফ (Maxwell Fyfe), চার্লস দুবোষ্ট (ক্রাস) এবং কর্নেল ইউরী পোকোভস্কি (রাশিয়া)।

১৮ অক্টোবর, ১৯৪৫, চারটি অভিযোগকারী সদস্যরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ২৪ হাজার শব্দ সম্বলিত অভিযোগপত্র পেশ করা হইল ৬টি জার্মান সংগঠন এবং হিটলারী জার্মানীর ২৪জন সামরিক ও নাৎসী নেতার বিরুদ্ধে।

নিম্নলিখিত সংগঠনগুলিকে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল :

১। জার্মান সেনানীমণ্ডলী এবং জার্মান সশস্ত্র বাহিনীর হাইকমান্ড।

২। জার্মানীর গুপ্ত মন্ত্রিসভাসহ রাইখ ক্যাবিনেট, ডিক্লেস কাউন্সিলের সদস্যবর্গ, অন্তান্ত্র মন্ত্রিবর্গ এবং সরকারী দপ্তরের প্রধানগণ।

৩। মূল বড়বস্ত্রের কেন্দ্রীয় খ ডড-নাৎসী পার্টির নেতৃত্ব—সমস্ত পার্টি-অফিসার এবং প্রশাসকবর্গ (Gauleiter) প্রভৃতি।

৪। এস এস বাহিনী—গোড়াতে এই বাহিনী গঠিত হইয়াছিল হিটলারের ও অন্তান্ত্র নাৎসী নেতাদের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী হিসাবে। কিন্তু পরে এরা একটা উৎপীড়ক পুলিশ বাহিনীতে ও ভাড়াটে সৈন্যবাহিনীতে পরিণত হইল।

৫। এস-এ, হিটলারের গোড়াকার দিকের অহুচরদের নিয়া গঠিত ঝটিকাবাহিনী বা টর্চ-ট্রুপার।

৬। গেটাপো বা গুপ্ত পুলিশ—সর্বপ্রকার নৃশংস অত্যাচারের জন্য অতি কুখ্যাত সংগঠন।

যে ২৪ জন প্রধান আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হইয়াছিল, তাদের নাম :

১। হেরম্যান উইলহেলম গোয়েরিং—দুই নম্বর নাৎসী নেতা, জার্মান বিমানবহরের অধিনায়ক, কনসেনট্রেশন ক্যাম্প বা বন্দীশিবির প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্ভাবক এবং একজন সেরা নাৎসী নেতা।

২। জোয়াচিম ফন রিবেন্ট্রপ—নাৎসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী, ১৯৩৯ সালের রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির প্রধান উদ্যোক্তা এবং ইহুদী-বিরোধে অভিযানের মূখ্য পাণ্ডা।

৩। আলফ্রেড রোজেনবার্গ—হিটলারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, গ্রাশ-হাল সোসিয়েলিষ্ট "স্বপ্নের প্রধান দার্শনিক উদগাতা এবং 'নাৎসী পার্টির আত্মিক ট্রেনিংয়ের' পরিচালক।

৪। উইলহেলম ফ্রিক—রাইখস্ট্যাগের গোড়াকার দিকের নাৎসী নেতা এবং বোহেমিয়া ও মোরাভিয়ার সংরক্ষক বা প্রোটেক্টর।

৫। জুলিয়াস ট্রেইচার—ঘোনিবিরক অতি অগ্নীপ্ৰিয় সামরিকীর সম্পাদক ও

ভয়াবহ রক্তের গোড়া ইহুদী-বিষেবী—‘মাতৃঘের বেহে ইহুদীরা হইতেছে মৃতিমান শয়তান’—এই ভাষ্য প্রচারক।

৬। ভার্গার কাক—প্রাক্তন অর্থনৈতিক মন্ত্রী। রাইখ ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট এবং বৃহৎ ব্যবসায় ও নাৎসীদের মধ্যে সক্রিয় সংযোগ রক্ষাকারী।

৭। কুডলক্ হেস—ফুরারের ডেপুটি, ৩নং নাৎসীনেতা, পাটির অন্তর্ভুক্ত ও বিরোধ মীমাংসার ভারপ্রাপ্ত নারক। একজন শীর্ষনেতা।

৮। হান্স ফ্রাঙ্ক—ব্যাভেরিয়া আইনজীবী, জাশনাল সোসিয়েলিজম ও আইনকে একীকরণের জন্য দায়ী। তাঁর ঘোষণা—‘ইতিহাসে হিটলারই সবচেয়ে বড় আইন প্রণেতা’ এবং ‘ফুরারের ইচ্ছাই আইন’। পোলাণ্ডের নাৎসী গবর্নর-জেনারেল।

৯। কনষ্টানটিন ফন্ নিউরাথ—প্রাক্তন নাৎসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং পরে বোহেমিয়া ও মোরাভিয়ার সংরক্ষক বা প্রোটেক্টর।

১০। ফ্রানজ ফন্ প্যাপেন—দুইটি বিশ্বযুদ্ধেই রাজনৈতিক ভাগ্যক্ষেপী। পরদায় আড়ালে রাজনৈতিক ঘোঁট পাকানোতে সিদ্ধহস্ত, নাৎসী কূটনৈতিক এবং যুদ্ধের সময় তুরস্কের রাষ্ট্রদূত।

১১। আর্নেস্ট ক্যালটেনব্রুনার—নাৎসী সিকিউরিটি পুলিশের বড়কর্তা, ইহুদী-ঘেরকে সংহার করার জন্য হিটলার ও হিমলারের আজ্ঞাবাহী। এস এস জেনারেল, অস্ট্রিয়ার নিরাপত্তা রক্ষার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং ভিয়েনার পুলিশের অধিকর্তা।

১২। এইচ এইচ গ্রীলে শ্যাক্তি—নাৎসীদের অর্থনীতির যাত্ৰকর বলে পরিচিত ও প্রাক্তন নাৎসী অর্থমন্ত্রী, রাইখ ব্যাঙ্ক প্রেসিডেন্ট, বিপুল নাৎসী পুনরুদ্ধারজ্ঞান কর্মসূচী সংক্রান্ত টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞ।

১৩। ফ্রিৎস সাউকেল—( Fritz Sauckel ) এস-এস এবং এস-এ জেনারেল।

১৪। ব্যালডুর ফন শাইরাচ ( Schirach )—নাৎসী যুব আন্দোলনের নেতা ও ইহুদী-বিষেবী।

১৫। আতু’র ফন্ সেইস্ ইনকোয়ার্ট ( Seyss Inquart )—অস্ট্রিয়ার নাৎসী চ্যান্সেলার এবং পরে নেদারল্যান্ডসের কমিশার।

১৬। আলবার্ট স্পীর ( Speer )—অসাধারণ টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞ, নাৎসী যুদ্ধাভিযানের আসল মস্তিষ্ক এবং স্থপতি শিল্পী ও রাইখের দায়িত্বশীল মন্ত্রী।

১৭। ফ্রিৎস্‌শে ( Fritzsche )—নাৎসী প্রচারকার্যের ও সংবাদপত্রের একজন প্রধান সম্পাদক।

১৮। ফিল্ড মার্শাল উইলহেলম কাইটেল—সমগ্র সশস্ত্রবাহিনী বা জার্মান হাইকমান্ডের ( ও. কে. ডব্লিউ ) প্রধান।

১৯। জেনারেল আলফ্রেড জডল—জার্মান সৈন্তবাহিনীর সেনানায়ীকর্তার ( ও. কে. ডব্লিউ ) প্রধান।

২০। এ্যাডমিরাল এরিখ রেইডার—গ্রাও এ্যাডমিরাল এবং জার্মান নৌবহরের প্রাক্তন প্রধান।

২১। এ্যাডমিরাল কার্ল ডোয়েনিংস—গ্রাও এ্যাডমিরাল এবং জার্মান নেভির প্রধান সেনাপতি।

২২। রবার্ট লে—নাৎসী শ্রমিক বা লেবর ক্রণ্টের বড় কর্তা।

২৩। গুস্তভ ক্রপ্ কন্ বোলেন আও হলব্য্যাচ—জার্মানীর শ্রমিকলগ্ন ‘সম্রাট’ এবং সুবিখ্যাত ইম্পাত ও অস্ত্রকারখানার প্রধান কর্তা।

২৪। মার্টিন বোরম্যান—হিটলারের সেক্রেটারি। এস-এর প্রধান এবং পিপলস্ আর্মির বড় কর্তা (অনুপস্থিতিতে বিচার)।

এই ২৪ জন আসামীর মধ্যে ২১ জনকে আত্মপক্ষ সমর্থনে প্রত্যুত্তর জন্ত ৩০ দিন সময় দেওয়া হইয়াছিল। নাৎসী পার্টির প্রতিপত্তিশালী অগ্রতম নেতা মার্টিন বোরম্যান বার্লিন যুদ্ধের পর থেকেই নিখোজ হইয়াছিলেন। অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, তিনি জার্মানী থেকে কোনক্রমে দক্ষিণ আমেরিকায় পলাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু পরে জানা গিয়াছে বার্লিনের ধ্বংসস্থাপে তিনি নিহত হইয়াছেন। কিন্তু হ্যারেম-বার্গের মামলার সময় সেটা নিশ্চিতরূপে জানা ছিল না। একজ্ঞ তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর বিচার ও দণ্ড হইয়াছিল। নাৎসী শ্রমিক ক্রণ্টের কর্তা কুখ্যাত রবার্ট লে নিজের পাপের বোঝায় অভিভূত হইয়া বিচার আরম্ভের আগেই আত্মহত্যা করেন। জার্মান শ্রমিকলগ্নের বিশ্ববিখ্যাত অধিনায়ক গুস্তভ ক্রপ্ নাৎসী পার্টির দলভুক্ত ছিলেন না। কিন্তু দৈহিক ও মানসিক ভাবে তিনি ওতই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁর বিচার স্থগিত ছিল। কাইটেল, জড্‌ল, ডোয়েনিংস এবং রেইডার—এই চারজন রণনায়কও নাৎসী পার্টির সদস্য ছিলেন না বটে, কিন্তু যুদ্ধাপরাধের দিক থেকে তাদের দায়িত্ব আরো কম ছিল না। বরং সেরা অপরাধী হিসাবে তাঁদের বিচার হইয়াছিল।

আসামীদের বিরুদ্ধে চার দফা অভিযোগ পেশ করা হইয়াছিল :

১। শাস্তির বিরুদ্ধে অপরাধ অনুষ্ঠানের জন্ত বড়যন্ত্র

২। শাস্তির বিরুদ্ধে অপরাধ

৩। যুদ্ধাপরাধ এবং

৪। মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ

এই সমস্ত অপরাধ অনুষ্ঠানের সপক্ষে অসংখ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ, হলিল, কাগজপত্র এবং বহু বন্দীশিবিরের নৃশংসতা ‘ও হত্যাকাণ্ডের কটো ও চলচ্চিত্র এবং খাতা ও হিসাবপত্র ইত্যাদি সংগৃহীত ও আদালতে পেশ করা হইয়াছিল। জার্মানীর খাস সরকারী দপ্তর থেকে এবং অধিকাংশ দক্ষিণ জার্মানীর ব্যাভেরিয়া অঞ্চলের সুরক্ষিত স্থান থেকে আমেরিকানদের দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু মিজপক্ষের কেউ কেউ বিশ্বাসের সঙ্গে এই প্রমাণ করিয়াছেন যে, অপরাধের প্রমাণস্বরূপ এই সমস্ত হলিল জার্মানী আত্মসমর্পণের আগে নষ্ট করে নাই কেন? ২০ গাড়ী বোঝাই এই হলিলপত্রের সঙ্গে বৃটিশ, ফরাসী ও রুশদের দ্বিত কাগজপত্রও সরবরাহ করা হইয়াছিল। এই পর্বতপ্রমাণ কাগজপত্র থেকে বিশেষজ্ঞরা ৩০০০ হলিল বাছাই করিয়াছিলেন—বেঙলির সমস্তই প্রামাণিক ছিল। এগুলির মধ্যে আসামীদের অনেকের

স্বীকারোক্তিও ছিল। ২০শে নভেম্বর, ১৯৪৫ থেকে শুরু করিয়া ১লা অক্টোবর, ১৯৪৬ পর্যন্ত একাধিক্রমে ৯ মাস ধরিয়া এই বিচার অহুষ্ঠিত হইয়াছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে এত ব্যাপক পটভূমিকার (ক্যানভাসে)—২৫ বছর ব্যাপ্ত ঘটনাবলীর এবং যে ঘটনাবলীর সঙ্গে সারা পৃথিবীর দুর্ভোগ জড়িয়ে ছিল—এমন বিরাট মামলার আর কখনও বিচার হয় নাই—এই কথাগুলি বলিয়াছেন হুদাপরাধ-বিশেষজ্ঞ প্রখ্যাত ব্রিটিশ আইনজীবী স্যার ডেভিড ম্যাকডোয়েল কাইক্‌। তিনি নাস্ত্রীত্বের অপরাধের ব্যাপকতা ও গভীরতা সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, প্রত্যেক যুদ্ধেই সংঘর্ষের সময় কিংবা নিরাক্রম কোন লড়াইয়ের পর পান্থিক প্রবৃত্তি জাগে ও ভয়ঙ্কর অপরাধ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু নাস্ত্রীরা ঠাণ্ডা মাথায় এবং হিসাবনিকাশ করিয়া যেভাবে নৃশংসতাকে রাজ্যভ্রমের একটা বাস্তবিক উপায়ে পরিণত করিয়াছিল, তেমন পরিকল্পনা আগে কখনও পৃথিবীতে দেখা যায় নাই। স্যার ডেভিড তাঁর করাচী সহযোগীর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন :

“The National Socialist dictate which raises inhumanity to the level of a principle constitutes in fact the doctrine of disintegration of modern society . All the former conceptions which attempted to humanise war are outdated.”

সোজা কথায়—“ন্যাশনাল সোসিয়ালিস্ট পার্টি তাদের হুকুমনামার অমাহুতিকভাবে এমন একটা নীতিগত পর্যায়ে তুলিয়াছিল যে, কার্যতঃ এই মতবোধ আধুনিক সমাজের ছিন্নভিন্ন করণের মত ছিল। আগেকার দিনে যুদ্ধকে মানবিকতার মধ্যে রাখার জন্য যে সমস্ত চিন্তাভাবনা করা হইয়াছিল, সেগুলি সমস্তই সম্পূর্ণরূপে সেকলে হইয়া গেল।”

আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের তালিকার ‘গণহত্যা’ শব্দটির উল্লেখ এবং বিচারের সময় সেই অপরাধের সবিস্তার বর্ণনার দ্বারাই ‘ই নতুন নাস্ত্রী মতবাদের ভয়াবহতার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। (২)

স্যার ডেভিড আরও বলিয়াছেন যে, স্মূহৎ জার্মান সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলার জন্য এই ধরনের ‘গণহত্যা’ কিংবা এক একটা জাতিকে—যেমন ইহুদী, পোল, চেক, রাশিয়ানদের সমূলে সংহার করার পরিকল্পনা অসংখ্য করার প্রয়োজন তারা বোধ করিয়াছিল। কিন্তু জার্মানীর ঘরে ও বাইরে এভাবে অসংখ্য ইহুদী ও রাজনৈতিক বিরোধীদেরকে খুন করা যে, একটা অপরাধ এটা যে কোন সভ্য রাষ্ট্রে স্বীকৃত। সুতরাং একমাত্র হ্যারেমবার্গের আদালতের বিচারের জন্যই এমন বিধান তৈরী হয় নাই।

যে ‘চার্টার বা সনদ’ অনুসারে এই ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইয়াছিল, হ্যারেমবার্গের বিচারকমণ্ডলী তার উপর চরম গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। কারণ, এই সনদের দ্বারা অহুদারী আসামীদেরকে যে ৮৩ দেওয়া হইবে, একমাত্র সেজন্যই এই

আদালতের গুরুত্ব ছিল না, বিশেষভাবে গুরুত্ব ছিল এই কারণে যে, এই আদালতের বিচার থেকে ভবিষ্যৎ আগ্রাসকগণ এই শিক্ষা পাইবে যে, এরপর থেকে পরের দেশ আক্রমণ করিতে গেলে সেটা এমন একটা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে যে, 'গলায় ফাঁসির দড়ি পরিয়া আগ্রাসকের ভূমিকা নিতে হইবে'—বুটিশ এটর্নী-জেনারেল স্যার হার্টলি শ' ক্রসের মন্তব্য অমুযায়ী।

হ্যারেমবার্গের বিচারকমণ্ডলী আর একটি বিষয়েও সতর্ক ছিলেন। আসামীদের যথোপযুক্ত শাস্তি বিধান করা হইবে, একমাত্র সেটাই যথেষ্ট ছিল না, কিংবা এরা যে শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত ছিল, কেবল সে কথাটা পৃথিবীর সর্বজন সমক্ষে প্রমাণিত হওয়াই যথেষ্ট ছিল না। কিন্তু সবচেয়ে শূড় কথ্য ছিল এই যে, সমসাময়িক কালের এবং ভবিষ্যতের বিশ্বব্যাপী জনমত যেন স্বীকার করিয়া নেয় যে, আসামীদের বিচার ও দণ্ড যথাযথভাবে আইন অনুসারেই হইয়াছিল। অন্যথা হ্যারেমবার্গকে ন্যায়-বিচার বলিয়া গণ্য করা হইবে না, চইনে বিজয়ীদের প্রতিহিংসারূপে।

যে আইন অনুসারে আসামীদের কার্যাবলী অপরাধজনক বলিয়া বিবেচিত ছিল, সেই সমস্ত আইন বিজয়ী দেশের বলিয়া গণ্য করা যায় না। কারণ, আসামীদের কেউ সেই সমস্ত আইনের আওতাভুক্ত ছিল না। অর্থাৎ হ্যারেমবার্গের আদালত আন্তর্জাতিক আইন অনুসারেই কাজ করিতোঁছিল এবং আদালত এই সমস্ত আইন গঠন করে নাই, কেননা আদালতের সেই ক্ষমতাও ছিল না। অভিযোগ পত্রের দাবী অনুসারে আসামীরা অপরাধজনক কার্যগুলি সম্পাদন করিয়াছিল কিন, কেবল মাত্র সেইটুকু নির্ধারণ করাই আদালতের ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর আদালত চার্টারের শর্ত অনুযায়ী চার্টারকে আইনের দিক থেকে সঠিক বা সিন্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে এবং আসামীদের কার্যাবলীকে অপরাধজনক বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য ছিল।

কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে—তা হলে চার্টারই কি এই নতুন অপরাধের আইন প্রণয়ন করিয়াছে?—না, এর জবাবেও বলা যাইতে পারে—না। চার্টার সম্পাদনকারীদের তেমন কোন আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ছিল না। কারণ, তারা কোন বিশ্ব সংসদের বা 'World Parliament'-এর মর্যাদাসম্পন্ন ছিল না এবং তেমন কোন ক্ষমতারও দাবীদার তাঁরা ছিলেন না। যদি তেমন কোন ক্ষমতাও তাঁদের থাকিত, তবে, তাঁদের সেই কার্যের দ্বারা 'Natural Justice' বা 'স্বাভাবিক ন্যায়পরায়ণতার' উপর হিংস্র আঘাত আনা হইত। কেন না, একমাত্র ১২৪৫ সালেই যদি তাঁরা সর্বপ্রথম সেই আইন প্রণয়ন করিতেন, তবে, সেই বছরের আগে অগুষ্ঠিত জার্মানদের কার্যাবলী নিশ্চয়ই আইন অনুসারে অপরাধজনক বলিয়া গণ্য করা যাইত না। কারণ, 'স্বাভাবিক ন্যায় বিচারের মূল নীতির উহা বিরোধী হইত।'

সুতরাং চার্টার সম্পাদনকারীদের একমাত্র ক্ষমতা ছিল আগে যে কই যে আইনের অস্তিত্ব ছিল, একমাত্র সেই আইনকে ঘোষণা করা। সুতরাং মৌখিক প্রশ্ন দাঁড়াইল—

"Were the acts declared in the Charter to be crimes by

international law truly crimes by that law before the Charter was drawn up?" (৩)

অর্থাৎ চার্টারে যে সমস্ত কার্য অপরাধ বলিয়া ঘোষিত হইল আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে সেগুলি কি চার্টার রচিত হওয়ার আগেই আইনগতভাবে সত্যকার অপরাধ বলিয়া গণ্য ছিল ?

গ্রেট ব্রিটেনে আন্তর্জাতিক আইন বিচারদণ্ডের মধ্যে এই বিষয়ে মতভেদ ছিল এবং বিচারের আইনগত বৈধতা সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে সর্বসম্মত কোন মতৈক্য ছিল না।\*

তবে, একথা সত্য যে, অনেক বিশ্ববিখ্যাত আইনবিশেষজ্ঞ হ্যারেমবার্গের এই বিচারকে যেমন বিধিসম্মত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন তেমনই কোন কোন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ এই সমস্ত বিচারকে “রাজনৈতিক দেশজোহিতার বিচারের” সঙ্গে তুলনা দিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন, “এরদ্বারা বিশ্বের জাতিবিচার সংক্রান্ত ধারণার অপক্লব ঘটানো হইয়াছে।”

আসামীদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ করা হইয়াছিল, সেগুলির মধ্যে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ বা যুদ্ধের পটভূমিতে শাস্তির বিরুদ্ধে অপরাধ বলিয়া গণ্য ছিল। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সন্ধি ও চুক্তি এবং জাতিসমূহের আচরণ থেকে বিভিন্ন জাতি সমবায়ের মধ্যে এই ‘সাধারণ আইন’ (‘কমন ল’ ) উদ্ভূত হইয়াছিল যে, আগ্রাসন অপরাধের তুল্য। সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে চার্টারের অন্যতম স্বাক্ষরকারী অধ্যাপক এ এন ট্রেইনিন ‘কৌজদারি আইন’ অনুসারে হিটলারী দায়িত্ব শীর্ষক তত্ত্বে মন্তব্য করিলেন যে, ‘পৃথিবীতে সেই যুগ অভিজ্ঞান্ত হইয়াছে যখন বিভিন্ন জাতি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাস করিত। বর্তমানে দ্বারী আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আদান প্রদান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মানবসমাজের এই মহা গুরুত্বপূর্ণ অবদান এবং রাষ্ট্র ও জাতিসমূহের মধ্যে সম্পর্কের উপর হননকারী আঘাত নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক অপরাধ। কারণ, আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের ভিত্তির উপর আঘাত হানা আন্তর্জাতিক অপরাধরূপে গণ্য হওয়ার যোগ্য।’

আর একজন খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ লর্ড রাইট যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, সংক্ষেপে তা উল্লেখ করিয়া বলা যায় যে, যুদ্ধকে বে-আইনী ঘোষণা করিয়া যখন রাষ্ট্রসমূহ চুক্তিপত্র স্বাক্ষর দান করে, তখন ব্রিটিতে হইবে যে, সভ্য জাতিসমূহ এই মূলনীতি গ্রহণ করিতেছে যে, যুদ্ধ অস্ত্রার এবং অপরাধজনক। সুতরাং এই নীতি আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী। (৪)

অবশ্য পৃথিবীতে এমন একদিন ছিল যখন কোন রাষ্ট্র তার নিজের সুবিধা বা স্বার্থ-

(৩) The Second Great War—Vol-9, p 3974.

\* এই বিষয়ে টোকিও আন্তর্জাতিক আদালতের সুবিখ্যাত ভারতীয় বিচারপতি ডঃ রাধাবিনোদ পালের ভিন্ন মত পরবর্তী অধ্যায়ে উল্লেখ্য।

(৪) পূর্বোক্ত পৃষ্ঠ ৩, পৃষ্ঠা ৩৩০.

বি মহা (৩)—১৩

সিদ্ধির জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া বিধিসম্মত বলিয়া মনে করিত। জার্মান রণপণ্ডিতদের গুরু ক্লাউসেভিৎস (Clausewitz) যুদ্ধের অমূৰূপ সংজ্ঞা দিয়াছিলেন :

‘War is the continuation of politics by other means’.

অর্থাৎ যুদ্ধের পন্থায় রাজনীতি পরিচালনার নামই যুদ্ধ !

কিন্তু উনবিংশ ও বিংশ শতকে পৃথিবীর মানুষ ক্রমেই সচেতন হইয়া উঠিতে লাগিল এবং তারা যুদ্ধকে যন্তায় ও অপরাধজনক বলিয়া মনে করিতে লাগিল। এই মনোভাব থেকেই যুদ্ধ নিবারণের জন্য এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সম্ভাব রক্ষা করার জন্য অনেকগুলি আন্তর্জাতিক সন্ধিচুক্তির উদ্ভব হইল। ১৮৯৯ এবং ১৯০৭ সালের হেগ চুক্তি (কনভেনশন) থেকে শুরু করিয়া প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে প্রতিষ্ঠিত লীগ অব নেশন্সেব যে সমস্ত চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে, সেগুলির উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ নিবারণ কিংবা শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধ ধর মীমাংসা। রাষ্ট্র-সংঘের বিধিবিধানের মধ্যেও যুদ্ধ নিষিদ্ধ ঘোষিত হইল এবং অস্ত্র সীমাবদ্ধ করণের প্রস্তাব গৃহীত হইল।

১৯২৫ সালের লোকার্নো প্যাক্ট যুদ্ধ নিষিদ্ধ করার পক্ষে ইউরোপীয় ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ও ঘোষণা ছিল মার্কিন ও ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রীদ্বয়ের পক্ষ থেকে ১৯২৮ সালের কেলগ-ব্রিড্জ প্যাক্ট কিংবা ‘যুদ্ধ বর্জনের সাধারণ সন্ধিপত্র’। এই সন্ধিপত্রের স্বাক্ষরকারীগণ পবিত্র গান্ধীধর্মের সঙ্গে ঘোষণা করিলেন যে, জাতীয় নীতি হিসাবে তাঁরা যুদ্ধের পন্থা গ্রহণকে পরিত্যাগ করিলেন। পরবর্তী কালে এই সন্ধি পৃথিবীর সমস্ত বৃহৎ শক্তি কর্তৃক গৃহীত হইল এবং ১৯৩৯ সালের মধ্যে (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সন্ধিক্ষণ) জার্মানীসহ পৃথিবীর ৬০টিরও অধিক জাতি এই সন্ধির বাধ্যবাধকতা স্বীকার করিয়া নিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ১১বার এই সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করা হইয়াছিল। তার মধ্যে একমাত্র জার্মানী কর্তৃকই তিনবার—১৯৩৭ সালে অস্ট্রিয়া, ১৯৩৯ সালে চেকোস্লোভাকিয়া এবং ১৯৪১ সালে পোল্যান্ড।

তার হার্টলি শ’ক্স হ্যারেমবার্গের আদালতে যুদ্ধবিরোধী আন্তর্জাতিক বিধিবিধানগুলির ব্যাখ্যা ও বিবরণ দিয়া বলিয়াছেন যে, ১৯২৮ সালের কেলগ-ব্রিড্জ প্যাক্টের মত ব্যাপক সন্ধিচুক্তি ছাড়াও আরও এমন অল্পসংখ্যক চুক্তি, শর্ত ও বিধিবিধান ছিল এবং সেগুলির দ্বারা যুদ্ধ নিষিদ্ধ ও আন্তর্জাতিক বিরোধ সালিলী বা শান্তিপূর্ণ আলোচনার দ্বারা মীমাংসার জন্য বাধ্যতামূলক ছিল, সেগুলির সংখ্যা প্রায় হাজার ধানেক হইবে। সংখ্যাটি অবিস্মৃত বটে, কিন্তু সত্য এবং এই সত্য কার্যতঃ পৃথিবীর সকল জাতির পক্ষেই প্রযোজ্য ছিল।

সুতরাং দেখা বাইতেছে যে, ১৯৩৯ সালের মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত সত্য জাতিই এই নীতি মানিয়া লইয়াছিলেন যে, যুদ্ধ বে-আইনী। অতএব এই নীতি—  
‘this principle became part of the common law of the community of nations.’



সোজা কথায়, এই নীতি পৃথিবীর জাতি গোষ্ঠীর ‘সাধারণ আইনে’ পরিণত হইয়াছিল।

লর্ড রাইট তাঁর ব্যাখ্যায় যুদ্ধকে কেবল অস্ত্রায় বলেন নাই কিংবা ১৯৩৯ সালের যুদ্ধকে মনুষ্যজাতির পক্ষে সর্বাপেক্ষা সর্বনাশকর ঘটনাগুলির অন্ততম বলিয়াই বর্ণনা করেন নাই, আক্রমণাত্মক যুদ্ধকে যুদ্ধাপরাধগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সেরা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। (৫)

চার্টারে বর্ণিত অপরাধগুলির মধ্যে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগের সম্পর্কে তেমন কোন অভিনবত্ব ছিল না। কেননা, এই অভিযোগে— অর্থাৎ যুদ্ধের নিয়মকানুন ও বিধি-বিধান ভঙ্গের অভিযোগে অতীতেও সামরিক আধালতে শত্রুপক্ষের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও দণ্ড হইয়াছে। প্রধানতঃ নৃশংসতা ও যুদ্ধের আইন ভঙ্গ করা জন্মই এই সমস্ত শাস্তি দেওয়া হইয়াছে।

যুদ্ধের এই সমস্ত নিয়মকানুন সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৮৬৮ সালে সেন্ট পিটোস্‌বুর্গের ঘোষণার দ্বারা যখন যুদ্ধে বিক্ষোভক বুলেট নিষিদ্ধ করা হইল, তারপর থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আবস্ত পর্বন্ত ৮টি নতুন কনভেনশন বা চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল যুদ্ধযুদ্ধের আইন ও আচরণ সম্পর্কে। এই সমস্ত চুক্তিও মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ১৯০৬ এবং ১৯২২ সালের জেনেভা কনভেনশন যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈন্য ও যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে—১৯০৭ সালের হেগ কনভেনশনও অমূল্য গুরুত্ব-সম্পন্ন ছিল।

এগুলি ছাড়া হেগ সম্মেলনে নীতি সম্পর্কেও অনেক নিয়মকানুন গৃহীত হইয়াছিল।

যুদ্ধ সংক্রান্ত এই সমস্ত চুক্তিভঙ্গের জন্মই যে, যুদ্ধাপরাধগুলি দণ্ডনীয় ছিল তা নয়, সমস্ত সভ্যদেশের গৃহীত সাধারণ কৌজদারী আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ-গুলির মূলনীতিও এই সমস্ত অপরাধের দ্বারা ভঙ্গ করা হইয়াছিল বলিয়াই এগুলি দণ্ডনীয় ছিল।

চার্টারে গৃহীত ও বর্ণিত মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের মধ্যে অবজ্ঞাই নূতনত্ব ছিল। কারণ, এই অল্পক্ষেত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, “যুদ্ধের আগে বা পরে যে কোন অসামরিক নাগরিকের বিরুদ্ধে অমাত্মিক কার্যের অচ্যুতানই মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।” জাতি, বর্ণ, ধর্ম ও রাজনৈতিক মতবাদের জন্য নৃশংসতার অচ্যুতান এই সমস্ত অপরাধের অন্তর্গত ছিল। তবে, মানবিকতার বিরুদ্ধে অপরাধের এই আইনগত সংজ্ঞা নিয়া কোন কোন আইনবিশেষজ্ঞ কিছুটা আপত্তি তুলিয়াছিলেন। কেননা, সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রের অন্তর্গত কোন নাগরিক বা প্রজার প্রতি সেই রাষ্ট্রের আচরণ আন্তর্জাতিক আইনের আওতার পড়ে না।

কিন্তু এর বিরুদ্ধেও এই মর্মে যুক্তি দেখানো হইয়াছে যে, অতীতে অন্ত কোন স্বাধীন দেশের নাগরিকের বিরুদ্ধে নৃশংস অত্যাচারের শাস্তি বিধানের জন্য বাইরের

শক্তির হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছিল—যেমন, তুরস্কে নির্ধাতিত খ্রীষ্টানদের পক্ষে। এটাও মানবিকতার বিরুদ্ধে অপরাধের অন্তর্গত।

১৯১৫ সালের ২৮শে মে ক্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন ও রাশিয়া প্রথম মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে তুরস্কে আর্মেনিয়ান জনসাধারণের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ঘটয়াছিল, তার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দাবাদ করিয়া এক ঘোষণাবাদী প্রচার করিয়াছিলেন এবং অপরাধীদের শাস্তি বিধানের জন্ত দাবি করিয়াছিলেন। তুরস্ক সরকার এই ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের জন্ত দায়ী ব্যক্তিদিগকে মিজশক্তিবর্গের হাতে সমর্পণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। হ্যারেমবার্গ ও টোকিওর আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগে যে সমস্ত বিচার হইয়াছিল, সেগুলির পক্ষে তুরস্কের এই ঘটনা একটা নজীরের মত উদ্ধৃত হইয়াছিল। (৬)

চার্টার অল্পদায়ী মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের এই সংজ্ঞার মধ্যে আর একটি নতুনত্ব এই ছিল যে, কোন আসামী যদি কোন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তি বা কোন দায়িত্বশীল সরকারী অফিসারও হইয় থাকেন, তথাপি তাঁকে অপরাধ অল্পষ্ঠানের দায়িত্ব থেকে রেহাই দেওয়া যাইবে না। এমন কি সরকারী হুকুম পালন করিতে গিয়াই অপরাধগুলি সম্পাদন করা হইয়াছে, এই যুক্তিতেও আসামীকে রেহাই দেওয়া যাইতে পারে না। তবে, তার অপরাধের মাত্রা লঘু করিয়া দেখা যাইতে পারে।

১৯১৪-১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধে উপরওয়ালার বা সরকারী হুকুমে অপরাধ অল্পষ্ঠিত হইয়াছিল, এমন যুক্তি দেখাইয়া অভিযুক্ত সৈন্তেরা রেহাই পাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এবারের সনদ অল্পদায়ী সেই পথ বন্ধ হইয়া গেল।

তথাপি এই সনদের বিরুদ্ধে এই মর্মে সমালোচনা উত্থিত হইল যে, আন্তর্জাতিক আইন অল্পসারে যদিও কার্যগুলি অপরাধজনক বলিয়া বিবেচিত, তথাপি কোন রাষ্ট্রের কোন নাগরিক বিশেষকে এই আইন অল্পদায়ী অভিযুক্ত করা যাইতে পারে না। কেন না, রাষ্ট্র হিসাবে রাষ্ট্রের সঙ্গেই সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়া থাকে, ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে নয় এবং সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ এই রাষ্ট্রগুলিই আন্তর্জাতিক জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্গত এবং আন্তর্জাতিক আইনের অল্পবর্তী।

কিন্তু এই যুক্তিও ঘোপে ঢিকে নাই। কেন না, বহু অতীতকাল থেকেই স্বীকার করা হইয়া আসিতেছে যে, যুদ্ধের নিয়মকানুন ও আইন ভঙ্গের জন্ত ব্যক্তিবিশেষকে দায়ী ও শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে এবং এটাই আন্তর্জাতিক আইনের বিধান (৭)

হ্যারেমবার্গ আদালতের এই বিচার সম্পর্কে সাধারণ জার্মানরা ধরিয়াই লইয়াছিলেন যে, এটা বিজয়ী পক্ষের প্রতিহিংসা গ্রহণ করা ছাড়া আর কিছু নয়। তবে, তাঁরা যে সরাসরি বন্দীদের গুলি করিয়া মারেন নাই, এইটুকুই তাঁদের কুপা। তবে, লণ্ডন টাইমসের বিশেষ সংবাদদাতা আর ডব্লিউ কুপার মন্তব্য করিয়াছেন যে, অধিকাংশ

(৬) Human Rights and the United Nations—Raghubir Chakraborti, 1958, Calcutta, p. 22

(৭) The Second Great War —Vol. 9, p 3981

জার্মানদের সম্ভবতঃ এই ধারণা ছিল যে, 'যুদ্ধ আরম্ভ করার দ্বারা নাৎসীরা সবচেয়ে বড় অপরাধ করে নাই। কিন্তু তাদের সবচেয়ে বড় অপরাধ ছিল যুদ্ধে পরাজয়।'

কিন্তু জার্মানদের যে ধারণাই থাকুক, অভিব্যক্ত আসামীদের প্রতি সুবিচার করার জন্য ন্যূরেমবার্গের আদালতের সভাপতি ও প্রধান বিচারপতি লর্ড জাষ্টিস লরেন্স তাঁর যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। আসামীদের আত্মপক্ষ সমর্থনের যথোচিত সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল এবং কোর্ট কর্তৃক মনোনীত কৌশলীদের তালিকা থেকে আসামীরা তাঁদের কৌশলি বাছাই করার অধিকারী ছিলেন। জার্মান আইনবিদরাও মামলা পরিচালনায় যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন এবং তাঁদের বৃন্তির মর্দাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। যদিও তাঁদের অনেকে আদালতের এক্টিয়ার চ্যালেঞ্জ করিয়াছিলেন, তথাপি চার্টার অনুসারে তা চ্যালেঞ্জের বহির্ভূত ছিল।

কোন কোন আইন বিশারদে অবশ্য পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, একমাত্র বিজয়ীপক্ষের প্রতিনিধিদের নিয়ম আদালত গঠন না করিয়া নিরপেক্ষ দেশের কিংবা জার্মানীর বিচারকদের নিয়ম আদালত গঠন করা হোক। কিন্তু এই প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই এই কারণে যে, সোভিয়েত রক্তস্রাব ও যুদ্ধকৃত পৃথিবীর অবস্থা এমন ছিল যে, কোন দেশ থেকেই "নিরপেক্ষ জজ" পাওয়া সম্ভব ছিল না। (স্মার ডেভিড ম্যাকগুয়েল কাইক-এর মন্তব্য)। (৮)

অভিব্যক্ত নাৎসী ও জার্মান নেতাদের বিরুদ্ধে অল্প প্রকার বর্বরতা ও অত্যাচারের অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছিল। যুদ্ধের আগে এবং পরে জার্মানীতে ও অধিকৃত দেশগুলিতে হত্যা, সমূলে সংহার, নির্বাসন, দাসত্ব গ্রহণে বাধ্যকরণ এবং অস্বাভাবিক অমার্যবিক কার্যাবলী কেবল যুদ্ধবন্দী, বিরোধী রাজনৈতিক হল প্রভৃতির বিরুদ্ধেই নয়, সাধারণ নাগরিকদের বিরুদ্ধেও ব্যাপক হারে অহুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সমস্ত ছিল মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের পর্যায়ভুক্ত।

মিত্রশক্তিবর্গ কর্তৃক জার্মানীর পরাজয় ও ইউরোপের উদ্ধারের পর বিভিন্ন বন্দী-শিবিরের অমার্যবিক কার্যাবলীর বিবরণ, যেগুলি আগে নাৎসীরা খুব সতর্কতার সঙ্গে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল, সেগুলি সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। মিত্র সৈন্তদের দ্বারা বন্দীশালার দ্বার উন্মুক্ত করার কিংবা নাৎসী-কবলিত গ্রাম, জনপদ ও শহরগুলির মুক্তির পর প্রত্যক্ষদর্শীদের এবং ভুক্তভোগীদের (যারা কোনক্রমে রক্ষা পাইয়া গিয়াছিল) অবিস্মৃত অভিজ্ঞতার কাহিনী প্রকাশিত হইতে থাকে। জাতি-বিষেব বর্বরতার এমন চরমে পৌঁছিয়াছিল যে, নাৎসী কবলিত ইউরোপে ২৬ লক্ষ ইহুদীর মধ্যে অন্ততঃ ৫১ লক্ষ (মতান্তরে ৬০ লক্ষ) একেবারে 'অদৃষ্ট' হইয়া গিয়াছিল। অধিকাংশকেই বেচ্ছার খুন করা হইয়াছিল। জার্মানীর উচ্চতম সামরিক কর্তৃপক্ষও এই বেচ্ছাকৃত বর্বরতার দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না। কারণ কিন্ড মার্শাল কাইটেল (জার্মান সশস্ত্রবাহিনীর সর্বোচ্চ কর্তা) রাজনৈতিক বিরোধীদের সম্পর্কে পর্বত 'Night & Fog' (রাত্রি ও কুয়াশা) নামে এক কুখ্যাত সার্কেটিক হুকুমনামা প্রচার করিয়াছিলেন, যার কলে দৃত রাজনৈতিক বন্দীরা কর্তৃপক্ষের হত উর্বরা গিয়াছিল।

আউসেভিৎস, বুকাভিভ্‌, ডাচাউ, বেলসেন, মাজডেনেক, র্যাডেনসত্রক ইত্যাদি বহু বন্দীনিবাস ইতিহাসে চিরদিন কুখ্যাত হইয়া থাকিবে জীলোক ও শিশু নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে হত্যার জন্ত। একমাত্র আউসেভিৎস বন্দী শিবিরেই ৪০ লক্ষের অধিক এবং মাজডেনেক শিবিরে ১৫ লক্ষের বেশী লোককে সংহার করা হইয়াছিল।

হ্যারেমবার্গের আন্তর্জাতিক আদালতে একজ্ঞ ‘genocide’ বা গণহত্যা শব্দটি আইনেন নূতন মর্বাদা পাইয়াছিল। (৯)

পশ্চিম, পূর্ব, উত্তর, দক্ষিণ অর্থাৎ ইউরোপের নাৎসী-অধিকৃত ও কবলিত সমস্ত স্থানেই অসংখ্য এবং অবর্ণনীয় নৃশংসতার কাণ্ড ঘটিয়াছিল, যগুলি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা সম্ভব নয়। “১৯৪৩ সালের জুন মাস থেকে জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়নের অধিকৃত স্থানগুলিতে এই সমস্ত পৈশাচিক অপরাধের প্রমাণ পাপন করার জন্ত তারা গোরস্থান খুঁড়িয়া ফেলিয়া মৃতদেহগুলি বাহির করিয়া আনিয়া ও পুড়াইয়া ফেলিয়া এবং হাড়গুলি গুঁড়া করিয়া সার হিসাবে ব্যবহার করিল। বার্লিন রাজ্যসমূহ, শ্বোলেনস্ক, লেনিনগ্রাদ, স্ট্যালিনগ্রাদ, ওরেল, নভোগোরোদ ইত্যাদি শহরগুলিতে অসংখ্য অসামরিক নর-নারীকে সোজা গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিয়া এবং সোজা গুলি করিয়া মারাই ছিল তাদের পক্ষে সব চেয়ে দ্রব্য কার্য! এমন কি শিশুরা পর্যন্ত রেহাই পাইল না। তাদেরকে হাসপাতাল থেকে বা শিশুনিবাস থেকে ধরিয়া আনিয়া জীবন্ত অবস্থায় কবর চাপা দেওয়া হইল, জলন্ত অগ্নিকূণে নিক্ষেপ করা হইল, বেরনেট দিয়া তাদেরকে বিদ্ধ করা হইল, বিষ দিয়া মারিয়া ফেলা হইল, না খাইতে দিয়া মারা হইল কিংবা তাদের রক্ত নিষ্কাশন করিয়া সেই রক্ত জার্মান আর্মির ব্যবহারের জন্ত রাখিয়া দেওয়া হইল”—লণ্ডন টাইমসের সংবাদদাতার রিপোর্ট। (১০)

মার্কিন ঐতিহাসিক ব্লাইডার মন্তব্য করিয়াছেন যে, বড়বন্দ, আগ্রাসন ও পাশবিক অত্যাচারের এই সমস্ত কাহিনী এমন আজগুবি যে, ইতিহাসে তার তুলনা নাই। ১,০০০০০০ বা এক কোটিরও অধিক ইউরোপীয় নাগরিক ও যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করা হইয়াছিল এবং অসংখ্য প্রকার নৃশংসতা হইয়াছিল। আর বিজিত রাজ্যগুলি থেকে কোটি কোটি টন কাঁচামাল, কৃষিপণ্য ও ভ্রমশিল্পের যন্ত্রসজ্জা লুণ্ঠন করা হইয়াছিল। (১১)

বন্দীনিবাসগুলির নৃশংসতার নিদর্শনস্বরূপ যখন মাধার খুলি, মাল্‌বের চামড়ার তৈরী ল্যাম্পশেড্‌ (আলোর আচ্ছাদন) ইত্যাদি আদালতে দেখানো হইল, তখন কার্টিগডার উপর অনেক নাৎসী আসামীরই মাথা হেলিয়া পড়িল এবং যখন প্রমাণ-স্বরূপ অত্যাচারের চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হইল, তখন অন্ততম আসামী নাৎসী ‘অর্ধনীতিজ্ঞ

(৯) পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৪২

(১০) হ্যারেমবার্গ ইয়াল, পৃষ্ঠা ১২

(১১) স্ত ওয়ার—১৯৩৯-১৯৪৫, পৃষ্ঠা ৩২৭

যাচুকর' শ্রান্তিকে যেন 'ঠাণ্ডার জমিয়া যাওয়া মতবৎ মনে হইল' এবং তিনি যেচ্ছার ছবির পিঠের দিকে পিঠ দিয়া বসিয়া রহিলেন। অর্থাৎ এই সমস্ত চিত্র তাঁর কাছে অসহ্য মনে হইতেছিল।

আদালতে এভাবে 'মৃত্যুপূরীর' ত্রাসের এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ উত্থাপন করা হইল খামাখীরা নিজেরাই যেগুলিকে অকাটা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিলেন। 'বীবপুরুষ' গোয়েরিং এই সমস্ত চলচ্চিত্র দেখিয়া স্বীকার করিলেন—

'হাঁ, একথা সত্য যে, আমিই বন্দীনিবাসীদের প্রবর্তন করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি এইটুকু মাত্র চাইয়াছিলাম যে, 'রাজনৈতিক' বন্দীদেরকে পুনরায় শিক্ষা দেওয়া হোক। কিন্তু ১৯৩৪ সালের পর থেকে এই ক্যাম্পগুলি চালাইতেছিলেন মিশলাব। আমাব কোন ধারণা ছিল না যে, এমন সমস্ত বীভৎস কাণ্ড সেখানে ঘটিয়াছে— 'I had no idea that such terrible things took place.' (১২)

হ্যারেমবার্গের আদালতে অভিযুক্ত নাৎসী নায়কদের মধ্যে মার্শাল গোয়েরিংই সবচেয়ে কুটূর্ব্বিক, সাহসী এবং কথাবার্তায় ও প্রভাবে অগ্রগণ্য বলিয়া প্রমাণ দিয়াছিলেন। কার্যতঃ গোয়েরিংকে কেন্দ্র করিয়াই কোন কোন বিষয়ে আদালতের প্রায় সমস্ত শুনানী আবর্তিত হইয়াছিল। এমন কি, তিনি নির্বিকার চিত্তে আত্মপক্ষ সমর্থনে এমন একটা উদ্ধৃতি দিলেন, যার দ্বারা তিনি মনে করিলেন যে, তিনি বাজীমাৎ করিয়াছেন। উক্তিটি এই :

"In the struggle of life and death there is no legality."

"জীবন ও মৃত্যুর দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে বৈধতার কোন প্রশ্ন নাই।"

গোয়েরিংয়ের মতে তাঁদের "সর্বাপেক্ষা বড় ও জবরদস্ত শত্রু" স্বয়ং উইনস্টোন চার্চিল এই মন্তব্য করিয়াছিলেন। কিন্তু অভিযুক্ত গোয়েরিং তুলিয়া গিয়াছিলেন যে, আইনকে অস্বীকার করিয়া নিজের কার্যের বৈধতা প্রমাণ করা যায় না!

আর কিন্তু মার্শাল কাইটেল আত্মপক্ষ সমর্থনে এই যুক্তি দেখাইয়াছিলেন যে, তিনি নামে মাত্র জার্মান সশস্ত্রবাহিনীর প্রধান ছিলাম। আসলে একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রের সর্বপ্রকার ক্ষমতার প্রকৃত মালিক ছিলেন হিটলার, তিনি তাঁর আজ্ঞাবহ কর্মচারী মাত্র ছিলেন। (১৩)

কিন্তু হ্যারেমবার্গের আদালতে যে সমস্ত সোভিয়েত আইনজ্ঞ ও পরিদর্শক উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ, যেমন মিঃ এ পোলটোরাক মন্তব্য করিয়াছেন যে, কাইটেল নিজেকে যথেষ্ট গুরুত্বহীন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, আসলে তিনি ততটা 'বাজে লোক' ছিলেন না। "বরং জার্মান সেনাপতিগণ, দ্বারা মনে করিতেন যে, তাঁরা প্রত্যেকেই রণক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সকলে মিলিয়া যুদ্ধে হারিয়া গিয়াছিলেন।" তাঁরা কিন্তু আসলে হিটলার ও কাইটেলকেই জার্মান সমর-বস্ত্রের আসল নিয়ামক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং জার্মানীর পতনের জন্ত সমস্ত দোষ হিটলার ও কাইটেলের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু কাইটেল তা

অস্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি নামে যাত্র সশস্ত্রবাহিনীর প্রধান ছিলেন। আসলে হিটলার ছিলেন এক অসাধারণ সামরিক প্রতিভা ( হিটলার সম্পর্কে এই উচ্চ ধারণা কিন্তু আরও অনেক জার্মান নায়কের ছিল ) এবং তাঁকে কোন উপদেশ দিতে যাওয়া নিতান্তই অনাবশ্যক ছিল। কাইটেল বলিলেন :

“Hitler had studied general staff publications, military literature and that he had a knowledge in the military fields which can only be called amazing.”

সহজ কথায়, হিটলার সমস্ত প্রকার সামরিক সাহিত্য এমন গভীরভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন যে, এই বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল বিশ্বব্যাপক।

কাইটেল আরও বলিয়াছেন যে, সামরিক অস্ত্রশস্ত্র, সংগঠন, সামরিক নেতৃত্ব, সৈন্যবাহিনীর সাজসজ্জা ও যন্ত্রাদি এবং সবচেয়ে অশুভ কথা সারা পৃথিবীর নেতি সম্পর্কে হিটলার অত্যন্ত গুরাকবহাল ছিলেন।

“যুদ্ধের সময় আমি যখন তাঁর সদর দপ্তরে ছিলাম, তখন দেখিয়াছি হিটলার সারা যাত্র জার্মান মণ্ট্কে, স্লিয়েকেন এবং ক্লাউসেভিৎস প্রমুখ রণপণ্ডিতদের সামরিক গ্রন্থগুলি ( জেনারেল ষ্টাক হুকস্ ) পড়িতেছেন এবং এভাবে তিনি নিজেই সামরিক বিষয়ে অগাধ বিজ্ঞা অর্জন করিয়াছিলেন। সুতরাং আমাদের ধারণা জার্মান ছিল যে, একমাত্র কোন অসাধারণ প্রতিভার পক্ষেই এটা সম্ভব—

‘Therefore, we had the impression only a genius can do that’.

কিন্তু আদালতে হাজির অস্ত্রান্ত আসামীর কিত্ত বারবার ‘কাইটেলের আবেশের’ কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। (১৪)

অর্থাৎ কাইটেলের নির্দোষতার ভণ্ডামি তাঁর সহ-আসামীরও বিশ্বাস করেন নাই।

বলা বাহুল্য যে, হিটলারই যে নাটের গুরু ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহের কারণ নাই এবং এই যুদ্ধের মূল হারিত্বও তাঁর—যদিও অস্ত্রান্তরাও তাঁর সমান অংশীদার ছিলেন। হিটলারী জার্মানীর অস্ত্রতম সেরা মন্ত্রী এ্যাড্‌মিরাল স্পীরাং হ্যারেমবার্গের আদালতের শুনানীর পর মন্তব্য করিয়াছেন যে, জার্মানীর যুতেরা এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরগুলিই হিটলারের ও তাঁর সহযোগীদের অপরাধরূপে চিরকাল সাক্ষ্য দিবে!

\*

\* . \*

\*

হ্যারেমবার্গ অনেক দিক দিয়াই নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে। আদালতে এই মামলার শুনানীতে ৬০ লক্ষ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছিল। প্রায় অবিচ্ছিন্ন ঘটনার মত। আর সারা পৃথিবী থেকে ৩০০ সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন এই মামলা রিপোর্ট করার জন্য এবং আদালতে ভাষান্তরিতকরণের জন্য যেমন দক্ষ ভাষাবিশেষজ্ঞ ছিলেন,

ভেদনি বৈজ্ঞানিক, যান্ত্রিক ব্যবস্থাও নিখুঁত ছিল। প্রধান তিনটি ভাষার অনুবাদের কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল এবং প্রত্যেক টিমে তিনজন করিয়া বিশেষজ্ঞ ছিলেন। (১৫)

কারাগারে আসামীদের প্রতি যথাসম্ভব ভালো ব্যবহারই করা হইয়াছিল এবং হ্যারেমবার্গ আন্তর্জাতিক আদালতের চতুঃশক্তির বিজ্ঞ বিচারপতিগণ সনদ অনুসারে ঘোষিত : আইন অনুযায়ী স্থায়ীবিচারের কোন ক্রটি করেন নাই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৯৪৪ সালের ২০শে জুলাই হিটলারকে হত্যা চেষ্টার বড়যন্ত্রের অভিযোগে নাৎসী গণ-আদালতে দ্বুত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি বিচারের নামে যে বীভৎসতার তাণ্ডব করা হইয়াছিল, আদালতে সেই চলচ্চিত্রও দেখানো হইয়াছিল এবং সেই সময় অধিবেশন কক্ষে এক অদ্ভুত নাটকীয়তার সৃষ্টি হইয়াছিল। অবশ্য “ফ্রাংসিস দিউওয়াল” সেই হিটলাংপন্থী জঙ্গ ফ্রিজলিং (Freisling) শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।

এক মাস স্বগিত থাকার পর হ্যারেমবার্গের আন্তর্জাতিক আদালত ৩০শে সেপ্টেম্বর ও ১লা অক্টোবর, ১৯৪৬, তাঁদের ঐতিহাসিক রায় ঘোষণা করেন। এই রায়ে বুদ্ধকে ‘চরম আন্তর্জাতিক অপরাধ’ বা ‘১২শীম ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম’ বলিয়া অভিহিত করা হয় এবং মন্তব্য করা হয় যে, আসামীদের কয়েকজন ১২টি জাতির বিরুদ্ধে কেবল বুদ্ধের বড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা করে নাই, কার্যতঃ আক্রমণাত্মক বুদ্ধও চালাইয়াছিল। ৫০ হাজার শব্দের এই রায়ে অষ্ট্রিয়া থেকে পার্লামেন্টারি পর্বত আক্রমণাত্মক বুদ্ধের একটি রেখাচিত্র তুলিয়া ধরা হইয়াছে—জার্মান সরকারী ও সামরিক হলিলপজ থেকেই এই রেখাচিত্র আঁকিত হইয়াছে। দ্বুত হলিলপজের প্রামাণিক সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করিয়া আদালত বিশেষ ভাবে হিটলারের চারটি গুপ্তসভার উল্লেখ করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে, এই সভাগুলিতেই আক্রমণাত্মক বুদ্ধের পরিকল্পনা ও চক্রান্ত হইয়াছিল। এই সমস্ত গুপ্তসভা অগুপ্ত হইয়াছিল ৫ নভেম্বর ১৯৩৭, ২৩ মে ১৯৩৯, ২২ আগষ্ট ১৯৩৯ এবং ২৩ নভেম্বর ১৯৩৯। এই সমস্ত গুপ্তসভাতেই হিটলারের মতলব একেবারে সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হইয়াছিল।...

রায় অনুসারে জার্মানীর বিরুদ্ধে চার দফা অভিযোগ—যেমন, শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধের বড়যন্ত্র, দ্বিতীয়তঃ শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধের অগ্ৰহণ, তৃতীয়তঃ বুদ্ধাপরাধ এবং চতুর্থতঃ মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ—এগুলি সবই প্রমাণিত হইয়াছিল।

হ্যারেমবার্গের আন্তর্জাতিক আদালত জার্মানীর বুদ্ধাপরাধ সম্পর্কে যে বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তার ভূমিকা থেকে সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করিলে অগুপ্ত অপরাধের মাত্রা উপলব্ধি করা যাইবে। আদালত এই সম্পর্কে তাঁদের রায় মন্তব্য করিয়াছেন যে, যে বিপুল পরিমাণ হলিল ও সাক্ষ্যপ্রমাণাদি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির সম্পূর্ণ পর্যালোচনা করা অসম্ভব। তথাপি এই সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের

নির্গলিত সত্য এই যে, মাহুঘের যুদ্ধের ইতিহাসে এমন বিশাল পটভূমিকায় এত বড় যুদ্ধের অপরাধ আর কখনও অহুষ্ঠিত হয় নাই :

'The truth remains that war crimes were committed on a vast scale, never before seen in the history of war. They were perpetrated in all the countries occupied by Germany, and on the high Seas, and were attended by every conceivable circumstance of cruelty and horror. There can be no doubt that the majority of them arose from the Nazi conception of 'total war', with which the aggressive wars were waged. For in this conception of 'total war' the moral ideas underlying the conventions which seek to make war more human are no longer regarded as having force or validity. Every thing is made subordinate to the overmastering dictates of war. Rules, regulations, assurances and treaties all alike are of no moment, and, so, freed from the restraining influence of international law, the aggressive war is conducted by the Nazi leaders in the most barbaric way. Accordingly, war crimes were committed when and wherever the Fuhrer and his close associates thought them to be advantageous. They were for the most part the result of cold and criminal calculation' (১৬)

মূল ইংরাজী থেকে উদ্ধৃত এই বাক্যাংশের মধ্যেই স্মারকসমূহ সামরিক আদালতের রায়ে আসল মর্ম এবং ক্যান্সিটে যুদ্ধে ভয়াবহতা বুঝা যাবে।...

১লা অক্টোবর, ১৯৪৬, ট্রাইব্যুনালের শেষ অধিবেশন বসিল এবং বিচারক-সমূহের রায়ে আসামীদের বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা ঘোষিত হইল, অবশ্য দণ্ড ঘোষণার আগে ক্যামেরাম্যানদের আদালত কক্ষ ত্যাগ করিতে হইল। কোন কটো তুলিতে দেওয়া হইল না এবং কটো তোলার ফ্লাড-লাইট বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। একমাত্র নীলাভ নিওন লাইট জ্বলিতেছিল, আসামীদের কাঠগড়াও (ডক) খুল ছিল। সমগ্র আদালত কক্ষ তখন অস্ত্রোপচার কক্ষের মত গভীর ও নিস্তব্ধ ছিল।

ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট লর্ড জাস্টিস লরেন্স স্বয়ং আদালতের রায়ে দণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা করিলেন। দুইজন সশস্ত্র প্রহরীর পাহারায় পার্শ্ববর্তী কক্ষের দরজা দিয়া একেবারে এক একজন করিয়া আসামী প্রবেশ করিলেন, কাঠগড়ায় আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং প্রধান বিচারপতি লরেন্স আবির্ভাবিত কর্তে তাঁদের প্রত্যেকের উদ্দেশে পর পর দণ্ডাজ্ঞা উচ্চারণ করিলেন। নিম্নলিখিত ১২ জনের প্রতি ফাঁসির দণ্ডাদেশ দেওয়া হইল। কারণ, তাঁরা সকলেই চার রকম অপরাধের মধ্যে হস্ত সমস্ত কিংবা অধিকাংশ অপরাধের দ্বারা দোষী সাব্যস্ত হইলেন :



(১) হেরমন্ট উইলহেলম গোরেরিং (২) জেরোচিম রিবেট্‌প (৩) উইলহেলম কাইটেল (৪) আর্নেস্ট কান্টেনেক্রানার (৫) আলফ্রেড রোজেনবর্গ (৬) হ্যান্স ফ্রাঙ্ক (৭) উইলহেলম ফ্রিঙ্ক (৮) জুলিয়াস ট্রেইচার (৯) ফ্রিৎস সাওকেল (Fritz Sauckel) (১০) আনফ্রেড জডল (১১) আর্থার সেইস ইনকোয়ার্ট এবং (১২) মার্টিন বোরম্যান—এই শেখোক্ত ব্যক্তি অল্পপস্থিত ছিলেন।

উপরের এই ১২ জন প্রধান আসামীরক মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইল এবং বাকী সকলকে যাবজ্জীবন দণ্ড থেকে বিভিন্ন প্রকারের কারাদণ্ড দেওয়া হইল। তিনজনকে মুক্তি দেওয়া হইল :

কডল্‌ফ হেস যাবজ্জীবনদণ্ড, ভার্ণার ফ্রাঙ্ক যাবজ্জীবন, গ্রিক রেইডার যাবজ্জীবন, ব্যালডুব শাইরাচ ২০ বছর, আলবার্ট স্পীয়াব ২০ বছর, কনস্টানটিন নিউর্যাথ ১৫ বছর, কার্ল ডোয়েনিৎস ১০ বছর, হ্যালম্যার শাক্ট নির্দোষ—মুক্ত, ফ্রাঙ্ক কন প্যাপেন নির্দোষ—মুক্ত এবং হ্যান্স ফ্রিৎশ (Hans Fritzsche) নির্দোষ—অতএব মুক্ত।

রবার্ট লে অভিযুক্ত। কিন্তু ২৫ অক্টোবর, ১৯৪৫, জেলখানার আত্মসম্মতি করিয়াছিলেন এবং জার্মানীর বিশ্ববিখ্যাত শিল্পপতি ও স্তম্ভিত জুপ দৈহিক ও মানসিকভাবে এমন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁর বিচার স্বগিরা রাখা হইয়াছিল। (১৭)

মার্কিন মনস্তত্ত্ববিদ ডঃ জি. এম. গিলবার্ট হুবেমবার্গের আদালতে অভিযুক্ত আসামীদের সঙ্গে সাক্ষাৎপূর্বক তাঁদের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং চরিত্র ও আচরণ সম্পর্কে যে সমস্ত রিপোর্ট রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলি যথেষ্ট মূল্যবান বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু এখানে সেগুলির বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। এখানে সেই ডায়েরির উপসংহারের সামান্য কয়েকটি লাইন উল্লেখ করা যাইতেছে :

আন্তর্জাতিক আদালত থেকে যে তিনজনকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল, তাঁরাও স্বপ্তি পাইলেন না এবং তাঁদের স্বাধীনতা উপভোগ করিতে পারিলেন না। যে মুহূর্তে তাঁদের মুক্তির কথা ঘোষিত হইল, তার পরমুহূর্তেই ‘জার্মান জনগণের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতার’ অভিযোগে জার্মানীর অসামরিক প্রশাসন তাঁদেরকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ বাহিনী নিয়া হানা দিল এবং ‘প্যালেস্ অব জাস্টিস’-এর দরজা বরিয়া ফেলিল।

বিশ্ববাসীদের হাতে লালিত হওয়ার ভয়ে তাঁরা তিনদিন তিনরাত্রি নৈজের ইচ্ছাতেই জেলের মধ্যে রহিলেন। কন প্যাপেন ভিক্টর বলিলেন—‘আমাকে যেন জানোয়ারের মত তাড়না করা হইবে’ এবং আমাকে কখনো শাস্তিতে থাকিতে দেওয়া হইবে না।’

ষষ্ঠীয় মুক্ত আসামী ফ্রিৎশ (Fritzsche) ডঃ গিলবার্টের কাছে একটি পিণ্ডল চাহিলেন এবং বলিলেন তিনি আর এই নরকযন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিতেছেন না। অবশেষে ফ্রিৎশ ও শাক্ট জেলখানা থেকে গভীর রাত্রে বাহির হইয়া আসিলেন বটে, কিন্তু তাঁদেরকে একবার করিয়া গ্রেপ্তার এবং একবার করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইতে লাগিল। কন প্যাপেনও অল্পকালব্যতীতে জেল থেকে বহির্গমনের আশায় রহিলেন।

হাস্য ক্রাক তাঁর মৃত্যুদণ্ডের সেল থেকে এইসব দেখিয়া চৈতাইয়া উঠিলেন—“হাঃ হাঃ এরা যুক্তি চায়। হিটলারজন্ম থেকে কোন যুক্তি নাই। একমাত্র আমাদের মত মৃত্যু-দণ্ডিতরাই যুক্তি! হাঃ হাঃ!”

কিন্তু বীরপুরুষ গোয়েরিংয়ের মুখে আর হাসি ছিল না। মৃত্যুদণ্ড শোনার পর তিনি সোজা জেলখানায় তাঁর সেলে ঢুকিয়া পড়িয়া খাটির উপর শুইয়া পড়িলেন। তাঁর আগেকার সমস্ত বীরত্ব উবিয়া গেল এবং চোখ মুখ সম্পূর্ণরূপে চূপসাইয়া গেল।...

কিন্তু গোয়েরিং ফাঁসিতে গেলেন না। ১৪-১৫ অক্টোবর রাতে বিষপান (পটেসিয়াম সায়েনাইড) করিয়া ভবলীলা সাধ করিলেন এবং হিটলার, হিমলার ও গোয়েবলসের দলে গিয়া মিশিলেন!...(১৮)

ডঃ গিলবার্ট লিখিয়াছেন যে, আসামীদের বিরুদ্ধে যখন প্রথম অভিযোগপত্র রচিত এবং আদালতে সেগুলি পঠিত হইয়াছিল, তখন বিভিন্ন আসামীর বিভিন্ন রকমের প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল। গোয়েরিং বলিয়াছিলেন “বিজয়ীরা সব সময়েই বিদারক হইবে এবং পরাজিতরা হইবে আসামী।”

রিবেট্রপ বলিয়াছেন—“ভুল লোকদের অভিযুক্ত করা হইয়াছে। আমরা সকলেই হিটলারের আজ্ঞাবাহী ছিলাম।”

কিন্তু নাৎসী জার্মানীর অস্ত্র ও গোলা-বারুদ উৎপাদনের মন্ত্রী (যাঁর অধীনে ১৯৪২ থেকে ১৯৪৪ সালের মধ্যে জার্মানীতে ও অধিকৃত ইউরোপে মোট ১ কোটি ৪০ লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত হইয়াছিল) এ্যাডমিরাল স্পীরার স্বীকার করিয়াছিলেন—“বিচারের দরকার আছে। প্রভুত্ববাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনেও এই ধরনের ভয়ঙ্কর অপরাধ (horrible crimes) অল্পষ্ঠানের জন্ত সকলেরই দায়িত্ব আছে।”

অর্থাৎ একা হিটলারের নয়। অবশ্য নাৎসী আসামীদের অধিকাংশই সমস্ত অপরাধের দায়িত্ব হিটলারের ঘাড়ে চাপাইতে চাহিয়াছিলেন...

৯ এবং ১০ অক্টোবর, ১৯৪৬, দখলীকৃত জার্মানীর চতুঃশক্তির কন্ট্রোল কাউন্সিলের (নিয়ন্ত্রণ পরিষদ) নিকট মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্তদের কাছ থেকে ক্ষমাপ্রদর্শনের যে আবেদনপত্র পাওয়া গিয়াছিল, সেগুলি অগ্রাহ্য হইল। তখন একমাত্র কাজ বাকী রহিল ফাঁসির দণ্ডাদেশ কার্যে পরিণত করা। মার্কিন সার্জেন্ট উডের উপর এই দায়িত্ব অর্পিত হইল। এই দায়িত্ব পাইয়া সার্জেন্ট উড তাঁর প্রাণের আনন্দ চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁর একমাত্র দুঃখ ছিল গোয়েরিংয়ের জন্ত। কারণ, ডেপুটি ফুয়েরার আগেই ফাঁসির মঞ্চকে ফাঁকি দিয়া ইংলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাকী সকলকে ১৬ই অক্টোবর মধ্যরাত্তির পর দ্বারেমবার্গের জেলখানায় একে একে ফাঁসিকাঠে ঝুলাইয়া দিলেন। চতুঃশক্তির প্রতিনিধিগণ এই প্রাণদণ্ডাদেশ কার্যকর করার সময় ফাঁসির স্থানে উপস্থিত ছিলেন। আর ছিলেন সোভিয়েত রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটন ও ফ্রান্সের ২ জন করিয়া সংবাদপত্র প্রতিনিধি—মোট ৮ জন। তিনটি ফাঁস কাঠ সাজানো হইয়াছিল। এই তিনটির মধ্যে একটি ছিল রিকার্ড।

(১৮) Nuremberg Diary.- Dr. G. M. Gilbert, Signet, Newyork, 1961, p. 396-97.

১২টি সিঁড়ি বাহিরা ফাঁসিঘরে আরোহণ করিতে হইত এবং ফাঁসিকাঠ থেকে মোটা দড়ি বুলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

প্রথম যে ব্যক্তিকে ফাঁসিঘরে আনা হইল, তিনি হইলেন হিটলারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী রিবেট্রুপ। কিন্তু ফাঁসিকাঠের দিকে আগাইতে গিয়া সম্পূর্ণরূপে ভাঙিয়া পড়িতেছিলেন এবং নিজের নাম পর্বন্ত উচ্চারণ করিতে পারিতেছিলেন না।

কিন্তু সার্জেট জন উড অভ্যস্ত দক্ষতার সঙ্গে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করিলেন। মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যে তিনি পৃথিবীর কুখ্যাত নাৎসী অপরাধীদেরকে একে একে ফাঁসিকাঠে বুলাইয়া দিলেন। তাঁদের মৃতদেহ মিউনিকের অন্তর্গত একটি বৈজ্ঞানিক চুল্লিতে (ক্রিমোটোরিয়াম) পোড়াইয়া ফেলা হইল।...

কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদেরকে পশ্চিম বার্লিনের স্পানডাউ কারাগারে বন্দী করিয়া রাখা হইল। চতুঃশক্তির গ্রহণপালা করিয়া সর্বক্ষণ এঁদেরকে পাহারার মধ্যে রাখিয়াছিলেন। ১৯৬৬ সালে দীর্ঘযোশী বন্দিরা মুক্তি পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মহাযুদ্ধের অবসানের ৩২ বছর পর এঁদের সকলেই বর্তমানে (১৯৭৭ সালে) মৃত। একমাত্র এখনও বাঁচিয়া আছেন স্পানডাউয়ের নির্জন কারাকক্ষে নিঃসঙ্গ বন্দীরূপে রুডলফ হেস—হিটলারী শীর্ষ নেতাদের অন্যতম। ১৯৪১ সালে হিটলার কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণের মাত্র ১০ দিন আগে বিমানযোগে বুটেনে উড়িয়া গিয়া (বুটেন ও জার্মানীর মধ্যে শান্তির আপোস চুক্তি সম্পাদনের আশায় হেস ছুনিয়াব্যাগী নিদাক্ষ চাকলা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন থেকেই হেস বন্দী—ইংলেণ্ডের পর পশ্চিম বার্লিনের স্পানডাউ কারাগারে। ১৯৭৭ সালে হেসের বন্দীজীবনের ৩৬ বছর এবং বয়স ৮২ বছর অতিক্রান্ত হইতে চলিল। সোভিয়েত রাশিয়ার বিরোধিতার জন্যই হেসের পক্ষে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয় নাই।...

যাদের ক্ষমতার দৃষ্টে, অবর্ণনীয় অত্যাচারে ও নৃশংসতার পৃথিবীর অগণিত মানুষ দলিত, মথিত ও রক্তসিক্ত হইয়াছিল, ইতিহাসের অমোঘদণ্ডে শেষ পর্বন্ত তারা সাধারণ খুনী আসামীর মত ফাঁসিকাঠে প্রাণ হারাইল।

## দশম পর্ব দশম অধ্যায়

টোকিওর সামরিক আদালতে বিচার : জাষ্টিস্ পালের ভিন্ন রায়

১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে পটসডামের ঘোষণা অনুযায়ী জাপান যখন ১৫ই আগস্ট আত্মসমর্পণে রাজী হইল এবং ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫ নিশর্ত আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করিল, তখন মিত্রপক্ষের সুপ্রীম কমান্ডার জেনারেল ডগলাস ম্যাক-আর্থার সেই আত্মসমর্পণের শর্তানুযায়ী জাপানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের উদ্দেশ্যে ১৬ জানুয়ারী, ১৯৪৬ এক ঘোষণা প্রণীত করেন এবং সেই ঘোষণা অনুযায়ী দৃত জাপানী নেতাদের বিচারের জন্য টোকিওতে একটি আন্তর্জাতিক মিলিটারি ট্রাইব্যুনাল (দূরপ্রাচ্যের জন্য) গঠিত হইল।

যে চার্টার বা সনদ অনুযায়ী হ্যারেমবার্গের আন্তর্জাতিক আদালত গঠিত এবং জার্মান নেতাদের বিচার ও দণ্ড দেওয়া হইয়াছিল, অল্পরূপ চার্টার (২৬ এপ্রিল ঘোষিত) অনুসারেই জাপানী সামরিক এবং অ-সামরিক নেতাদেরও বিচার ও দণ্ড দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ইউরোপীয় চার্টার এবং জাপান বা দূরপ্রাচ্যের চার্টারের মধ্যে মাত্র একটি প্রভেদ বৈধতা ছিল—ইউরোপীয় সনদে রাষ্ট্রপ্রধানকে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ থেকে রেহাই দেওয়ার কোন বিধান ছিল না। কিন্তু জাপান সংক্রান্ত সনদে রাষ্ট্রপ্রধান বা সম্রাটকে সেই বিধান থেকে রেহাই দেওয়া হইয়াছিল। (এ জন্যই সমালোচকদের মতে আইন অনুসারে জাপানের আত্মসমর্পণ সম্পূর্ণরূপে নিশর্ত ছিল না—যদিও কাগজে কলমে বাস্তবঃ নিশর্ত আত্মসমর্পণের রূপ বজায় রাখা হইয়াছিল।)

টোকিওর এই আন্তর্জাতিক সামরিক আদালত নিম্নলিখিত দেশের বিচারকমণ্ডলী নিয়া গঠিত হইয়াছিল :

ফ্রান্সের উইলিয়াম এক ওয়েব—সভাপতি, (অস্ট্রেলিয়া), জাষ্টিস্ ম্যাকডুগাল (কানাডা) বিচারপতি জু-আও মেই Ju-Ao Mei—চীন), হেনরি রেইমবার্গ (Henri Reimburger—ফ্রান্স) অধ্যাপক বার্নার্ড ডি এ রোলিং (নেদারল্যান্ডস), এরিমা হার্ভে নরকট (নিউজিল্যান্ড), বিচারপতি আই এম জেরিয়ানোভ (সোভিয়েত ইউনিয়ন), লর্ড প্যাট্রিক (বুটেন), মেজর-জেনারেল এম সি ক্রেয়ার (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), জজ জারানিলা (কিলিপিন) এবং ভারতের পক্ষ থেকে বিচারপতি ডঃ রাধাবিনোদ পাল।

জাপান যে সমস্ত দেশ আক্রমণ করিয়াছিল এবং পরে জাপান যাদের হাতে বা মিত্রপক্ষের হাতে পরাজিত হইয়াছিল, তাদের দেশেরই আইনজ্ঞ প্রতিনিধি নিয়া বিচারকমণ্ডলী, তাদের সহকারীবর্গ এবং অভিযোক্তামণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল।

হ্যারেমবার্গের অভিযুক্ত জার্মানদের মতই জাপানীদের বিরুদ্ধেও শাস্তিভঙ্গ ও যুদ্ধের চক্রান্ত, যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ অনুষ্ঠানের গুরুতর অভিযোগ আনা হইয়াছিল। প্রধানতঃ এই তিনজনের অভিযোগের মধ্যে বহুপ্রকার অপরাধজনক কার্যের উল্লেখ করা হইয়াছিল।

৪ঠা জুন, ১৯৪৬, টোকিওতে আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতের বিচার শুরু হইল। অভিযুক্ত হইলেন জাপানের প্রধান প্রধান সামরিক ও রাষ্ট্রনৈতিক নেতৃগণ।

যেমন—মাকুহিরায়ার জেনারেল কেনজি দৈহারা ( Doihara ), সর্বোচ্চ সময় পরিবহের জেনারেল হাতা, ১৯৩৬ সালের প্রধানমন্ত্রী কোকী হিরোতা, জীভি কার্ডিনালের প্রাক্তন সদস্য জিরো মিনামি, প্রধা-মন্ত্রী ও যুদ্ধমন্ত্রী জেনারেল হিরেদিকি তোজো, নৌদপ্তরের ( ১৯৪০-৪৪ ) প্রধান তাকানুমি ওকা, উপযুদ্ধমন্ত্রী উমেজু, সময়-পরিবহের সদস্য জেনারেল আরাকি, সামরিক বিষয়ক প্রধান ( ১৯৩২-৪২ ) আকিরা মুতো, চীফ সেক্রেটারি হোসিনো, অর্থমন্ত্রী কোকোনোরি কায়া, সত্ৰাটের প্রধান বিশ্বস্ত উপদেষ্টা মাকুইসু কেচি কিদো, উপযুদ্ধমন্ত্রী কিমুরা, 'Rape of Nanking'-এর ( নানকিংয়ের বলাৎকার ) কুখ্যাত গোলন্দাজি রেজিমেন্টের কর্নেল হাসিমোতো, ( ছুট ব্রিটিশ গানবোট 'লেডিবার্ড' এবং 'বী'-এর উপর গোলাবর্ষণের জন্ত দাঃী ), প্রধানমন্ত্রী কুনিম্বাকি কয়সো, এ্যাডমিরাল ওহুশি নাগানো, বালিনের রাষ্ট্রদূত ( ১৯৩৮-৪৫ ) হিরোসি ওসিমা, প্রধানমন্ত্রী ( ১৯২২ ) ব্যারন কাইচিরো হিরানুম্বা, পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিগেনরি টোগো, পররাষ্ট্র মন্ত্রী সিগেমিৎসু, নৌমন্ত্রী ভাইস-এ্যাডমিরাল শিগেতারো শিমাডা, ইতালীর বাষ্ট্রদূত ( ১৯৩৯ ) তোশিও শিরাতোরি, দপ্তরহীন মন্ত্রী লে: জেনারেল সুজুকি, কোয়াংটাং বাহিনীর সেনানায়ীমণ্ডলের প্রধান জেনারেল শেইসিরো ইংগাকি প্রভৃতি।

উপরোক্ত প্রধান যুদ্ধাপরাধীগণ ছাড়া ব্রিটিশ সামরিক আদালতগুলি ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী থেকে জুলাই মাসের মধ্যে অপেক্ষাকৃত নিম্নপদস্থ ২২৯ জন জাপানীকে অভিযুক্ত করিয়াছিল। এদের মধ্যে ৯৮ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইয়াছিল। ১০৫ জনকে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড এবং ৩৬ জনকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। মার্কিন এবং অষ্ট্রেলিয়ান আদালতগুলিতেও যুদ্ধাপরাধে দৃষ্ট জাপানীদের দণ্ড হইয়াছিল। (১)

কেবল পার্ল হারবার আক্রমণের ( ১৯৪১ ডিসেম্বর ) তারিখ থেকে প্রশান্ত মহা-সাগরীয় অঞ্চলের যুদ্ধকালীন অপরাধগুলির জন্তই নহে, তারও বহু পূর্ব থেকে চীনে 'মুকদেনের ঘটনাবলী' ও 'নানকিংয়ের বলাৎকার' এবং মার্কিন গানবোট 'প্যানের' উপর গোলাবর্ষণের জন্তও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিচার ও দণ্ড হইয়াছিল।

কিন্তু কেন দণ্ড হইয়াছিল? সেই ভয়াবহ অভ্যাসের কাহিনী অতীতের ইতিহাস থেকে কিছুটা উল্লেখ কর। দরকার—চীনে অল্পজিষ্ট জাপানীদের অনাচারের গুরুত্ব বুঝিবার জন্ত।

১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর ও ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসে জাপানী বাহিনী চীনের অভ্যন্তরে আক্রমণ চালাইয়া নানকিং শহরে প্রবেশ করার পর হত্যা, লুণ্ঠ, অগ্নিকাণ্ড এবং আরণ্যক হিংস্রতার যে তাণ্ডব অনুষ্ঠিত হইল এবং যেভাবে অসংখ্য চীনা জাতীলোক ও শিশুদের উপর পাশবিক অভ্যাসের সংঘটিত হইল, তখনকার চীনের ইতিহাসে তার কোন তুলনা ছিল না। নানকিংয়ের প্রত্যক্ষদর্শী ২০ জনেরও বেশী বিদেশীদের সাক্ষ্য থেকে একথা লিখিয়াছেন ফ্রাঙ্ক ওল্ডভার ( যে বইয়ের ভূমিকা লিখিয়াছেন বিখ্যাত পিটার ফ্রেমিং ) তাঁর গ্রন্থে। নানকিংয়ের দিকে জাপানী সৈন্তদের অগ্রগতি ঠেকাইবার জন্ত পঞ্চাদশসরস্বকারী দুর্বল চীনাবাহিনী যথাসম্ভব পোড়ামাটির নীতি

অবলম্বন করিল এবং উত্তর ও দক্ষিণদিকের গ্রামে, শহরে, জনপদে আন্তঃনদীয়াইয়া দিল। সেই আন্তঃনদীয়া লেগিহান শিখার নানকিংয়ের রাজ্যের আকাশ রক্তবর্ণ ধারণ করিল। কিন্তু জাপানীদের অগ্রগতি ঠেঁকানো গেল না। কোথায় গেল তাদের বহুবোম্বিত ঐতিহ্যবাহিত 'বুশিদো'র সামরিক সদাচার?—তার বদলে দেখা দিল নির্ভেজাল বর্বরতা :

"Instead they treated China and the world to an exhibition of ruthless barbarity. Bushido, the conduct supposed to be set up by the Japanese army, was thrown completely overboard. In a month 24,000 defenceless civilians has been brutally murdered ; 10,000 women, ages ranging from children of ten to grandmothers of seventy-two, had been raped ; vast sections of the city deliberately burned to the ground ; shops and houses, consulates and foreign embassies, looted ; and thousands of terror stricken people brought to the verge of starvation by refusal to allow food supplies to enter the city. (২)

সংক্ষেপে—জাপানী সৈন্যবাহিনী তাদের বুশিদোর বদলে নানকিংয়ে হিংস্র ও বর্বর আচরণের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইল। এক মাসের মধ্যে অসংখ্য চীনা নাগরিকদের মধ্যে অন্ততঃ ২৪ হাজারকে নৃশংসভাবে হত্যা করিল এবং ১০ হাজার স্ত্রীলোকের উপর বলাৎকার চালাইল—এই সমস্ত স্ত্রীলোকদের মধ্যে ১০ বছরের শিশু থেকে শুরু করিয়া ৭২ বছরের ঠাকুরমা পর্যন্ত ছিল। দোকান-পাট, ঘরবাড়ী এবং বিদেশী দূতাবাসে পর্যন্ত লুণ্ঠরাজ চলিল। খেচ্ছায় আশ্রয় দিয়া শহরের বিস্তীর্ণ এলাকা পোড়াইয়া দেওয়া হইল এবং জাগ্রন্ত শহরবাসীদেরকে উপবাসে রাখার উদ্দেশ্যে শহরে খাদ্য শস্তের আমদানি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

১৯৩৭-৩৮ সাল থেকে চীনে জাপানীদের এই অত্যাচার—যে চীনকে তারা 'বিদেশীদের হাত থেকে রক্ষা' এবং যেখানে তারা 'মুশুম্বল গবর্নমেন্ট' স্থাপন করিতে চাহিয়াছিল।...

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে স্বাধাতিযানের সময় কিলিপিঙ্গেও অসংখ্য অত্যাচার হইয়াছিল। কলে, স্বাধাতির অতিযোগে ২২শে অক্টোবর, ১৯৪৫, কিলিপিঙ্গে বিজয়ী জাপানের 'টাইগার'—সেনাপতি জেনারেল ইয়ামাসিতার বিচার আরম্ভ হইল নির্বিচারে কিলিপিনোদেরকে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা, স্বাধাতিদের উপর অত্যাচার ও প্রাণনাশ, লুণ্ঠন ও অগ্নিপ্রদান এবং দলে দলে মেয়েদের উপর বলাৎকার অত্যাচারের জন্য। ইয়ামাসিতা অবশ্য এই সমস্ত অপরাধের কথা অত্যন্ত তীব্রতার সঙ্গে অস্বীকার করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, তিনি ও তাঁর উপরওয়ালারা দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের সুপ্রীম জাপানী কমান্ডার কিন্তু মশাল কাউন্ট জুইচি তেরাউচির

(২) Special Undeclared War—by Frank Oliver, Jonathan Cape, London, 1939, p. 168.

(Juichi Terauchi) আত্মাধীন ছিলেন। তিনি কোন নৃশংসতার কথা জানেন না এবং তেমন কোন আদেশও দেন নাই। যদি নিরপদস্থ কর্মচারীরা এই ধরনের কার্য করিয়া থাকে, তবে, তাঁর অজ্ঞাতসারে। কিন্তু আদালতে ইয়ামাগিসভার যুক্তি গ্রাহ্য হইল না। ৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৫, পার্ল হারবার আক্রমণের বার্ষিকী দিবসে জেনারেল ইয়ামাগিসভার প্রতি প্রাণদণ্ডাদেশ (ফাঁসি) দেওয়া হইল। অপর দিকে টোকিওর আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতে যুত জাপানী নেতাদের যে বিচার অস্থিতি হইল, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগস্ত ছিলেন জেনারেল তোজো—যিনি জাপানী সামরিক অভিযানের পিছনে আসল মস্তিষ্ক ছিলেন। তাঁর আত্মহত্যার চেষ্টার কথা আগের অধ্যায়েই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। যুত ও অভিযুক্তদের বিচার সারা প্রাচ্যখণ্ডে প্রভূত কৌতূহল ও উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল। কয়েক মাস খরিয়া মামলার সুনানীর পর জেনারেল তোজো এবং তাঁর সঙ্গী ৬ জন আসামীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইল। ২২ ডিসেম্বর, ১৯৪৮ টোকিওর নির্জন সুগাষো কারাগারে জাপানের যুদ্ধকালীন ডিক্টেটর তোজো এবং অন্যান্য দণ্ডিতদেরকে ফাঁসি দেওয়া হইল। ফাঁসি কাঠে আরোহণের আগে তোজো কিছু একটি বিদায়কালীন ছোট্ট কবিতা লিখিয়াছিলেন, ইংরাজীতে তার মর্ম এই :

'It is good-by  
Over the mountains I go to-day  
To the bosom of Buddha  
So happy am I.' (৩)

বুদ্ধের শরণ নিয়া ভোক্তার এই ফাঁসি-মঞ্চে আরোহণকে অন্ততঃ ভীকৃত্যার অপবাদ দেওয়া চলে না।...

#### ডঃ পালের ভিন্নমত

টোকিও আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতের বিচারকমণ্ডলীর অগ্রতম সদস্য এবং ভারত-বিখ্যাত আইনজ্ঞ ও বিচারপতি ডঃ রাখাবিনোদ পাল টোকিওর এই চাকল্যকর মামলার যে ভিন্ন মত পোষণ করিয়াছিলেন এবং বিচারকমণ্ডলীর অধিকাংশের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যে ভিন্ন রায় দিয়াছিলেন, আইনের ইতিহাসে তা' স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, আইন শাস্ত্রে ডঃ পাল তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। এবং আসামীদিগকে দোষী সাব্যস্ত করার ব্যাপারে তিনি বিচারকমণ্ডলীর মেজরিটি রায়ের সঙ্গে একমত হইতে পারেন নাই। এই বিষয়ে তিনি আন্তর্জাতিক আইন ও সংশ্লিষ্ট আইনসমূহের বিধিবিধান ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণপূর্বক এবং আসামীদের বিরুদ্ধে বিজয়ী পক্ষের উত্থাপিত অভিযোগসমূহের ঐতিহাসিক পটভূমিকা বিচার ও সম্মানপূর্বক যে সুদীর্ঘ রায় দিয়াছিলেন, তা একটি সুবৃহৎ গ্রন্থের স্ফূর্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে তার সবিস্তার বর্ণনা দেওয়া সম্ভবও নয় এবং প্রয়োজনও নাই।

(৩) লুই ব্রাইডার—পৃষ্ঠা ৬৩৭-৩৮

ডঃ পাল তাঁর রায়ে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি তাঁর বিজ্ঞ সহযোগী বিচারক-যুগলীর রায় ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হইতে না পারিয়া দুঃখিত।

তাঁর রায়েতে প্রকাশ যে, ২০ এপ্রিল, ১৯৪৬, ১১টি অভিযোগকারী দেশের পক্ষ থেকে ৭৭ জনের ২৮ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মোট ৫৫ দফার অভিযোগ আনা হইয়াছিল এবং অভিযুক্তদের মধ্যে ২ জন মামলার সুনানীর আগেই মারা যান এবং তৃতীয় ব্যক্তি তার মানসিক ব্যবহার জ্ঞাত বিচারের অসুপস্থিত ছিলেন। বাকী ২৫ জন আসামীর বিরুদ্ধে গুরুতর যুদ্ধাপরাধের বিভিন্ন অভিযোগে মামলার সুনানী চলিয়াছিল। স্মারকমার্গে নাৎসী জার্মানীর নেতাদের মধ্যে জাপানের নেতাদের বিরুদ্ধে তিন বা চার জনের যুদ্ধাপরাধে অভিযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু 'বিচারপতি মিঃ পাল এই সমস্ত অভিযোগের দুইতৃত্ত্ব বিশ্লেষণপূর্বক যে সন্দেহীয় রায় দিয়াছিলেন, তার মূল ভিত্তি ছিল এই যে, আসামীদের অস্তিত্ব ও কাজগুলি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয় কার্য এবং সরকারী যন্ত্রের কার্য হিসাবেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল :

"The acts alleged are in my opinion all acts of state and whatever these accused are alleged to have done, they did that in working the machinery of the Government, the duty and responsibility of working the same having fallen on them in due course of events" (৪)

বিচারপতি মিঃ পাল বিশুদ্ধ আইনের দিক থেকে প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন যে, এক জাতি কর্তৃক অন্য জাতির উপর সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভুত্ব আন্তর্জাতিক জগতে অপরাধ বলিয়া বিবেচিত ছিল কিনা ?

ষিটীয়তঃ অতি সাগে বর্ণিত যে সময়ে এই সমস্ত যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই সময়ে আন্তর্জাতিক আইনে এগুলি অপরাধজনক ছিল কিনা ?—বাধি না হইয়া থাকে, তবে, পরবর্তীকালে আইন প্রণয়ন করিয়া ওই সমস্ত যুদ্ধকে অপরাধজনক বলিয়া অভিযুক্ত করা যায় কিনা ?

কিংবা আগ্রাসী বলিয়া বর্ণিত কোন রাষ্ট্রের কোন ব্যক্তিকে সরকারী ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালনের জন্য অপরাধী করা যায় কিনা ?

ডঃ পাল তাঁর রায়ে ভাবাবেগ বা রাজনীতির দ্বারা পরিচালিত হন নাই। বিশুদ্ধ আইনের এবং ঐতিহাসিক দিক থেকে নানা বিধি ও আইনের নজীর ও ঘটনার দৃষ্টান্ত তিনি বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে, অতীতে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি যে দমস্ত কার্য করিয়াছে, জাপান তার অতিরিক্ত কিছু করে নাই। চুক্তি ও সন্ধিসম্মত ভাৱে অভিযোগ, অন্য দেশকে রক্ষণাবেক্ষণের নামে নিজেরের তাঁবে আনা, অন্য দেশের উপর অর্থনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপন, যুদ্ধবন্দীদের কিংবা নারী ও শিশুর উপর যুদ্ধের সময় অত্যাচার এবং আত্মবলিক বর্বরতা ইত্যাদি সমস্তই অতীতে বিভিন্ন শক্তি কর্তৃক অনুষ্ঠিত



হইয়াছে। এমন কি জাপান সঙ্ঘচুক্তি পৰ্যন্ত কূটনীতি ও 'পাওয়ার পলিটিক্স'-এর অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত। যেমন, জাপানের বিরুদ্ধে যিহুশক্তির যুদ্ধে রাশিয়া কর্তৃক যোগদান সম্পর্কে ঠ্যালিনের সঙ্গে যিহুশক্তিবর্গের আগেই গোপন চুক্তি হইয়াছিল এবং সেই চুক্তি এমন এক সময় সম্পাদিত হইয়াছিল যখন সোভিয়েত রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে বাহ্যতঃ বন্ধুতার সম্পর্কই ছিল। (৫)

পার্ল হারবার আক্রমণের আগে জাপান এবং আমেরিকা উভয়েই চীনে জাপানী আক্রমণকে আইনতঃ যুদ্ধ বলিয়া মনে করে নাই। জাপান তেমন কোন ঘোষণা দেয় নাই এবং আমেরিকাও চীন সম্পর্কে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার প্রয়োজন মনে করে নাই। এমন কি আক্রান্ত চীনও এটাকে যুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করে নাই। ডঃ পাল উল্লেখ করিয়াছেন যে, এর আসল কারণ সম্ভবতঃ এই যে, সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি এর স্বারা কেলগ-ব্রিয়ার চুক্তির দুইনিবারণী ধারা এবং আন্তর্জাতিক আইনের দায়িত্ব এড়াইতে চাহিয়াছিলেন! সুতরাং আমেরিকা যুদ্ধরত চীনকে (নিরপেক্ষতা আইন সত্ত্বেও) যথারীতি গোলাবর্ষণ ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করিয়া চলিতেছিল। (৬)

ডঃ পাল প্রথম মহাযুদ্ধের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, সেই সময়েও জাৰ্মানদের বিরুদ্ধে নৃশংসতা, বর্বরতা ইত্যাদি যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ উঠিয়াছিল। কিন্তু ভার্সাই শান্তি সম্মেলন কর্তৃক নিযুক্ত কমিশন সেই সমস্ত অপরাধের জন্য ব্যক্তিবিশেষকে দায়ী ও অভিযুক্ত করিয়া আদালতে বিচার করার জন্য সুপারিশ করিতে পারেন নাই :...

ডঃ পাল তাঁর রায়ে আরও মন্তব্য করিয়াছেন যে, পার্ল হারবার আক্রমণের পিছনে জাপানের কোন বড়মন্ত্র ও চক্রান্তমূলক মতলব ছিল না। বরং জাপানী রাষ্ট্রদূত নমুয়া চীন ও অন্যান্য প্রদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় আসিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়, যার জন্য একা জাপান দোষী নয় এবং পার্ল হারবারও সেই ব্যর্থ আলোচনার পরিণতিতে আক্রান্ত হইয়াছিল। আলোচনার সময় একমাত্র জাপানের পক্ষ থেকেই নয় আমেরিকার পক্ষ থেকেও যুদ্ধায়োজন চলিয়াছিল। (৭)

বিচারপতি ডঃ পাল তাঁর সুদীর্ঘ রায়ের শেষে টোকিওর আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতে অভিযুক্ত সমস্ত জাপানী নেতাকে নির্দোষ বলিয়া সাব্যস্ত করেন এবং মুক্তি দানের জন্য সুপারিশ করেন।

বলা বাহুল্য যে, এটা ছিল ডঃ রাধাবিনোদ পালের একক বা মাইনোরিটি রায়। কিন্তু বিচারকমণ্ডলীর মজরিটি আসামীদিগকে অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন এবং বিভিন্ন প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন।

\* \* \*

ডঃ পাল তাঁর ঐতিহাসিক রায়ের উপসংহারে এ্যাটম্ বা পারমাণবিক বোমা

(৫) পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৪২৮

(৬) পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৫৮১

(৭) পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৫১২-১৩

বর্ণকেই বরং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও বর্বরতা বলিয়া তীব্র নিন্দাত্মক মন্তব্য প্রদান করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রথম মহাযুদ্ধের জার্মান সন্ত্রাস্ত বা কাইজার দ্বিতীয় উইলহেলমের একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠির উল্লেখ করিয়াছেন। এই চিঠিতে কাইজার মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে অস্ত্রিয়ার সন্ত্রাস্ত ক্রাজ জোসেফকে লিখিয়াছিলেন :

"My soul is torn, but everything must be put to fire and sword ; men, women and children and oldmen must be slaughtered and not a tree or house be left standing. With these methods of terrorism ...the war will be over in two months, whereas if I admit considerations of humanity it will be prolonged for years .."

সোজা কথায়, কাইজারের বক্তব্য ছিল যে, যদিও তাঁর বুক ব্যথায় বিদীর্ণ হইতেছে, তথাপি সমস্তই আগুন ও তরবারির মুখে দিতে হইবে। নর-নারী-শিশু এবং বৃদ্ধ নির্বিশেষে অবশ্যই সকলকে সংহার করিতে হইবে—একটি গাছ কিংবা একটি বাড়ীও যেন দণ্ডায়মান না থাকে। একমাত্র এইপ্রকার টেরোরিজম বা সন্ত্রাসবাদেই ঘারাই যুদ্ধ ছুই মাসের মধ্যে শেষ হইতে পারে। অপর পক্ষে যদি মানবতার কথা বিবেচনা করা হয়, তবে এই যুদ্ধ বছরের পর বছর ধরিয়া চলিতে থাকিবে। "সুতরাং আমি আগের ( টেরোরিজমের ) পন্থাই অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছি।"

ডঃ পাল মন্তব্য করিয়াছেন যে, প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর কাইজারের মত প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে মিত্রপক্ষও যুদ্ধ ক্রম হ্রাস করার নাম করিয়া জাপানের বিরুদ্ধে এ্যাটম্ বোমা নিক্ষেপ এবং নর-নারী-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে নির্দোষ নাগরিকদিগকে পাইকারি হারে হত্যা করিয়া মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্য অপরাধ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নাৎসী নেতারাও অবশ্য ইম্পীরিয়েল জার্মানীর কাইজারের নীতিই অনুসরণ করিয়াছিল। কিন্তু ডঃ পালের মতে জাপানের অভিজ্ঞ আসামী-গণকে এই ধরনের অপরাধের জন্য দায়ী করা যায় না। (৮)

অবশেষে ডঃ পাল মন্তব্য করিয়াছেন যে, বিজয়ী পক্ষ কার্ভাস : নিজেদের রাজ-নৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই সমস্ত আন্তর্জাতিক আদালত গঠন করিয়াছেন এবং সেই সমস্ত আদালতকে আইন ও বিচারের ছদ্মবেশ পরাইয়াছেন। কিন্তু বিজয়ী পক্ষ কখনও বিজিতকে জার্মানিয়ার দিতে পারেন না। কারণ, আদালত যদি রাষ্ট্রনীতির মধ্যে শিকড় গাড়িয়া বসে, তবে, জার্মানিয়ার যতই যুগ্মে পরানো হোক না কেন, "তখন জার্মানিয়ার শুধু বলশালী পক্ষের স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারে পরিণত হয় মাত্র।" (৯)

ডঃ রাধাবিনোদ পালের এই রায়ের মধ্যে অনেক তীব্র, তিক্ত ও অশ্রিয় মন্তব্য রহিয়াছে বটে, কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন এবং সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান সম্পর্কে যে গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের প্রকাশ পাইয়াছে, কয়েকজন স্বনামধন্য আইনজ্ঞ, যেমন—ইংলণ্ডের প্রাণ্ডি কার্ডিনালের সদস্য লর্ড হার্ডি, আন্তর্জাতিক আইন-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডব্লিউ. ক্রিডম্যান এবং টোকিওর সাধারণ আদালতের মার্কিন কৌশলী তাঁর উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন।

এই রায়ের কলে ভারতের প্রতি জাপানের মনোভাবও খুব অস্বস্তিকর হইয়াছিল।

(৮) পূর্বোল্লিখিত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৬২০

(৯) পূর্বোল্লিখিত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৭০০

পৰলোকগত ডঃ পাল তাঁৰ জীবিজকালে বৰ্তমান গ্ৰন্থকাৰেৰ সন্মুখত আলোচনা প্ৰসঙ্গে অল্পৰূপ মন্তব্য কৰিছিল। তেওঁ, ডঃ পালেৰ এই বাৰ সম্পৰ্কে বিশেষভাবে স্মৰণীয় এই যে, এই বাৰ ৰাজনীতি-বিবৰ্জিত এবং একান্তৰূপেই আইনবৰ্জিত। বিচাৰক হিসাবে তিনি শুধু আইন ও বিধিবিধান এবং বিধিবিধানৰ পটভূমিকাত ইতিহাসিক ঘটনাবলীৰ বিচাৰ কৰিছিল। অবশ্য সেই সমস্ত ঘটনাবলীৰ প্ৰসঙ্গে বিভিন্ন শক্তিবৰ্গৰ মध्ये সম্পৰ্কেৰ কথাও বিশ্লেষণ কৰিছিল এবং অভিযোগগুলিৰ প্ৰামাণিকতা যেমন—‘নানকিংয়েৰ বলাৎকাৰ’ গভীৰভাবে তলাইয়া দেখাৰ চেষ্টা কৰিছিল। ইতিহাসেৰ উপাদান হিসাবে এই বাৰেৰ মূল্য কম নহ। (১০)

(১০) পূৰ্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৬০৬-৬০৭

## দশম পর্ব

### একাদশ অধ্যায়

মহাযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা

সরকারী বিবৃতি : ১৯৩৯-১৯৪৫

১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসে লন্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস বা ভারত সচিবের দপ্তরের বার্তা বিভাগ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা সম্পর্কে যে ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল তাতে ১৯৩৯-১৯৪৫ সালের তথ্য ও ঘটনাবলীর যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, এখানে সেগুলির উল্লেখ কর' গেল। কেননা, মহাযুদ্ধের ইতিহাসের পক্ষে এই সরকারী তথ্যগুলি মূল্যবান ও প্রামাণিক।...

"...১৯৩৯ সালের তুলনায় আজ ভারতের নাম বিধে অনেক উপরে স্থান পাইয়াছে। অন্ততঃ আমার তাই মনে হয়। তবে একজ্ঞ সমস্ত কৃতিত্বই সরল সাধারণ মানুষ, সৈনিক, নাবিক, বৈমানিক, ভূমি ও কলকারখানার শ্রমিকদেরই প্রাপ্য। এইসব মানুষগুলি যেভাবে বিপজ্জক বছরগুলিতে সর্বশক্তি নিয়োজিত করিয়া কাজ করিয়াছে, তার তুলনা হয় না। সর্বোপরি রণাঙ্গনের যুদ্ধরত সৈনিকরা, যারা সবকটি যুদ্ধ অভিযানে সাহস ও শৌর্কের পরিচয় দিয়াছেন এবং মিত্রশক্তির অন্তর্গত অন্তান্ত যেসব জাতির সঙ্গে একত্রে যুদ্ধ করিয়াছেন তাঁদের সকলেরই প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন।..."

—লর্ড ওয়েভেল, তাইসরয় অব ইণ্ডিয় ১৫ অক্টোবর, ১৯৪৫।

### সরকারী বিবৃতি

১৯৩৯-১৯৪৫

ভারতের ৪০ কোটি অধিবাসী ছড়াইয়া রহিয়াছে ১৫ লক্ষ ৮১ হাজার ৪০০ বর্গ-মাইল এলাকা ছুড়িয়া। আন্বিকগত দিক দিয়া ভারতের আয়তন বুটেনের ১৭ গুণ, একত্রিতভাবে ক্রান্ত ও স্পেনের ৪গুণ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট এলাকার দুই পঞ্চমাংশ।

ভারত একটি কৃষিপ্রধান দেশ, যদিও তার পক্ষে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে অল্প যোগানো খুবই কষ্টকর ব্যাপার। তবে যুদ্ধ বখন শুরু হয় তখন ভারতের বিভিন্ন এলাকা ও শহরগুলি শান্তিপূর্ণ অবস্থার উৎপাদনের জন্য ধীরে ধীরে উন্নত হইতেছিল। আধুনিক কোন যুদ্ধের জন্য ভারত সম্পূর্ণভাবে অপ্রস্তুত ছিল। দৃষ্টান্তরূপে বলা যায়, ভারতে সেই সময় একটি নতুন বিমানক্ষেত্রে শৈল্পী করিতে পশ্চিমী ছিন্দিয়ার মত চলতি অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিলেই চলে নাই; বরং এ জন্য সবকিছুর গোড়াপত্তন করিতে হইয়াছিল।

যুদ্ধ শুরুর সাথে সাথেই আগে যেখানে ছিল গ্রাম, খানেক্ত ও রৌদ্রবহু মরুভূমি সেখানেই গড়িয়া তোলা হয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা, রাস্তা, রেলওয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাড়ীঘর, বিদ্যুৎ ও শক্তি কেন্দ্র, পরঃপ্রণালী এবং অন্তান্ত প্রয়োজনীয় সবকিছু।

যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারত কিভাবে তার কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছিল তা নীচেও তথ্যাদি হইতেই স্পষ্ট হইয়া উঠে।

#### পশ্চিমের শত্রু

১৯৩৯-৪০ সালে ভারতের শত্রুরা ছিল পশ্চিমে। ১৯৩১ সালের ৭ ডিসেম্বর পার্স হারবারে জাপানী হানার দিন ভারত প্রায় আড়াই লক্ষ সৈন্যকে আহ্বানযোগে পশ্চিমাঞ্চলে পাঠাইয়াছিল। সৈন্য সংখ্যার দিক দিয়া ঐ অবস্থায় গ্রেট ব্রিটেন বা অন্য কোন কমনওয়েলথ দেশ এত বেশী সৈন্য পাঠায় নাই।

আর উত্তর আফ্রিকায় যুদ্ধ-অভিযান শুরুর প্রথম দিকে পাইপ লাইন, রোলিংস্টক ও লোকোমোটিভ সরবরাহের পুরাপুরি দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল ভারত। সেই সময় ভারত তার নিরস্ত্র ১২০০ মাইল রেল লাইনকে তুলিয়া কেলিয়া সেই সমস্ত সরঞ্জাম বাইরে পাঠাইয়াছিল।

এমনকি ভারতের গ্রামীণ শিল্পকেও সেই সময় পুরাপুরিভাবে কখন, ক্যামোফ্লাজ জাল ও পীট হেলমেট তৈরীর কাজে নিয়োজিত করা হইয়াছিল।

#### প্রাচ্যের শত্রু

পার্স হারবারে জাপানী হানার ফলে ভারত দুই দিক দিয়া আক্রমণের মুখোমুখি হইয়া পড়ে। এক কথায় নতুন আর এক শত্রুর মুখোমুখি হয় ভারত এবং পূর্বাঞ্চলে যুদ্ধ করিবার জন্য আরও অধিক সংখ্যায় সৈন্য যোগানোর নতুন কর্তব্যের মুখোমুখি হয়।

ভারত সেই কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছিল এবং প্রয়োজনীয় সৈন্য যোগান দিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্য নিয়োগ না করিয়াই ভারত প্রশিক্ষণ দিয়া এবং প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সজ্জিত করিয়া ২৫ লক্ষ সেনার এক বিরাট বাহিনী তৈরী করিয়াছিল।

আর এই সেনাবাহিনীর সহায়ক কাজের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল ৮০ লক্ষ ভারতীয়কে।

তাছাড়া যুদ্ধ-শিল্পে নেওয়া হইয়াছিল ৫০ লক্ষ ভারতীয়কে। আর রেল যোগাযোগ স্থাপনের জন্য সেই সময় ক্রমাগত যে চাপ আসিয়াছিল তাহা ১ লক্ষ অতিরিক্ত কর্মী মিলিয়া সম্পন্ন করিয়াছিল।

#### আক্রমণ ঘাঁটি

আক্রমণ ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহারের জন্য ভারতকে সেই সময় প্রস্তুত হইতে হইয়াছিল। আর একজনই কমনওয়েলথ ছাড়াও চীন এবং আমেরিকার বিরাট গৈষ্ঠ বাহিনীকে ভারতে রাখার প্রয়োজন হইয়াছিল।

এই জন্য :

১০ লক্ষ ২০ হাজার মানুষের খাওয়ার জায়গা তৈরী করা হইয়াছিল।

৪ কোটি ২০ লক্ষ বর্গফুট আবরণ দেওয়া মজুতগার তৈরী করা হইয়াছিল।

৪ লক্ষ ৭০ হাজার ব্যক্তিকে একসঙ্গে প্রশিক্ষণ দিবার জন্য ৭০টি নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গঠন করা হইয়াছিল।

#### বিমানক্ষেত্র

ছুইশটিরও বেশী সম্পূর্ণ সজ্জিত হানাদারী বিমানক্ষেত্র তৈরী করা হইয়াছিল। এছাড়া, তৈরী করা হইয়াছিল ৭টি বিরাট বিরাট বিমানঘাঁটি। এই বিমানঘাঁটিগুলির প্রত্যেকটি রানওয়ে ছিল এক মাইলেরও বেশী লম্বা। চীনে সরবরাহ কাজ চালাইবার জন্য মূলতঃ এইগুলি তৈরী হইয়াছিল।

#### রেলওয়ে

বাংলা আসাম রেলওয়ের ৮০০ মাইলের ক্ষমতাকে চতুর্ভুগ্ন করা হইয়াছিল।

ভারতীয় রেলওয়ে সেই সময় এক মাসে ১১ লক্ষ ৬২ হাজার টন সামরিক সামগ্রী, ৫ লক্ষ ৫০ হাজার সামরিক যাত্রী বহন করিয়াছিল। বন্দরগুলি হইতে মাল খালাস করিবার জন্য একদিনে ৩০টি বিশেষ ট্রেনের প্রয়োজন হইয়াছিল। আর এইসব বিশেষ ট্রেনের একটি নিয়মিত দাঁক্ষে করাচী হইতে ভারত অভ্যন্তর করিয়া আসামের লেহো পর্যন্ত ২ হাজার ৭৩০ মাইল পথ পাড়ি দিত।

১৯৪১ সালে ভারতীয় রেলওয়েতে মোট ২৬ কোটি যাত্রী ৩৬০০ কোটি মাইল ভ্রমণ করিয়াছিল।

#### বন্দর ও জাহাজচলাচল

ভারতের বন্দরগুলির কর্মক্ষমতা অনেক গুণ বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। ১৯৩৯ সালে ছোট ছোট বৃষ্টি আভিযানকারী বাহিনীর অবতরণের উপযোগী উপকূলবর্তী বড় ঘাঁটি ছিল ভারতে সাতটি। আর সেখানে ক্রালের ছিল ১৩টি বন্দর।

যুদ্ধের পূর্বে ভারতের অল্প কয়েকটি জাহাজ কারখানার ছোট ছোট জাহাজ তৈরী হইত এবং ছোটখাটো সারাইয়ের কাজ হইত। কিন্তু যুদ্ধের সময় বেশ কয়েক শত জাহাজ তৈরী হইয়াছিল এইসব কারখানার; এইসব জাহাজের মধ্যে মাইন ক্ষেপণাস্রী জাহাজ যেমন ছিল, তেমনই ছিল যুদ্ধজাহাজও। সেই সময়ে দেশের ৫৬টি কারখানায় মোট ৩ কোটি ৮৮ লক্ষ ৪০ হাজার টনের ৬৫০০টি জাহাজ মেরামত করা হইয়াছিল।

তাছাড়া বার্ষিক নদীসংকুল এলাকায় যুদ্ধরত বাহিনীর সরবরাহ ও পরিবহণ ব্যবস্থার প্রয়োজনে সমস্ত ধরনের নৌ-যান সহ একটি সম্পূর্ণ বাহিনী তৈরী করা হইয়াছিল। এই সব নৌযানের অধিকাংশই ছিল আবাস বিশেষ উন্নত ধরনের। যুদ্ধের সময়ে সারা দেশে প্রধানতঃ সামরিক কর্মীদের দ্বারা সব সময়ের জন্য বেশ কয়েক শত মাইল সড়ক নির্মাণ করা হইয়াছিল।

#### সড়ক

ছুইটি সড়ক তৈরী হইয়াছিল জরীপহীন জঙ্গল ও পাহাড়ী এলাকার মধ্য দিয়া। এই সড়ক দুটির প্রতিটি লম্বায় ছিল ৩০০ মাইলের বেশী। এই সড়ক দুটি রেল ও ৩ অগ্রবর্তী ঘাঁটি, যেমন, লেহোর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিল। তাছাড়া এই

সড়ক দুইটি বার্ষিক সড়কব্যবহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিল এবং চীনের সঙ্গে স্থলপথে সড়ক যোগাযোগের পথ খুলিয়া দিয়াছিল।

### তেলের লাইন

বাংলা ও আরাকান হইতে আসাম ও উত্তর বার্ষিক মধ্যে হাজার মাইল লম্বা দুইটি প্রধান তেলের লাইন সহ বহু শত মাইল তেলের পাইপ লাইন বসানো হইয়াছিল।

### চিকিৎসা-ব্যবস্থা

সারা দেশে ১৩০টি নতুন হাসপাতাল তৈরী করা হইয়াছিল। ডাছাড়া ভারত চিকিৎসা-সামগ্রী তৈরীর পরিমাণ নিজের প্রয়োজনের ২৫ শতাংশ ১৯৪০ সাল হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৬০ শতাংশ করিয়াছিল। এমন কি ভারত হাসপাতাল ও অপারেশনের কাজের সামগ্রী এবং অনেক স্ট্যাণ্ডার্ড মানের যন্ত্রপাতিও সেই সময় তৈরী করিয়াছিল।

### ভারতে মিজশক্তির জন্ম

ভারতকে ষাঁটি হিসাবে ব্যবহারকারী মার্কিন সেনাবাহিনীকে ভারত ১৯৪৪ সালে ৪৪ হাজার মাইল স্থতীকাপড় এবং আবার ১৯৪৫ সালে ২৮ হাজার মাইল স্থতী কাপড় সরবরাহ করিয়াছিল। ডাছাড়া চীনা বাহিনীকেও ভারত ১১ হাজার মাইল স্থতী কাপড় সরবরাহ করিয়াছিল।

স্থতী ছাড়া অন্যান্য ধরনের কাপড়ও (মোট প্রায় ২০ হাজার মাইল লম্বা) সরবরাহ করা হইয়াছিল।

এই সময়ে ভারতস্থিত মার্কিন সেনাবাহিনীকে ভারত মোট ১২ কোটি ৯১ লক্ষ ৮০ হাজার পাউণ্ড (৫১ কোটি ৬১ লক্ষ ২০ হাজার ডলার) মূল্যের বিভিন্ন অব্যাহি সরবরাহ করিয়াছিল।

### শিল্প

দেশের শিল্পসম্পদের উন্নতি সাধন সেই সময় ভারত ও তার মিত্রদেশগুলির কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে উপস্থিত হইয়াছিল। আর এই উন্নতির জন্য প্রয়োজন হইয়াছিল নতুন কারখানা স্থাপন, নতুন প্রায়্ট বসানো, নতুন উৎপাদনযন্ত্র চালু করা ও পুরাতনগুলিকে কাজে লাগানো এবং হাজার হাজার নতুন শ্রমিক নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার।

### ইম্পাত

দেশের সম্পদ হইতেই ভারতের ইম্পাত কারখানাগুলিতে সেই সময় নিয়ে উন্নতিপন্থী জিনিসের জন্য অব্যাহি উৎপাদিত (বছরে প্রায় ১৫ লক্ষ টন হারে) হইয়াছিল : রেললাইন, সার্কিক্যাল যন্ত্রপাতি, ব্রীজ, ভাসমান ডক, আরবার পিরেরিং স্টীল, জাহাজ, ব্লেট অক স্টীল, ফ্রেন, বেসিন টুল।

### অস্ত্র-কারখানা

সরকারী অস্ত্রকারখানাগুলি সেই সময় নতুন নির্মিত কারখানাগুলিতে ৮৫ হাজার নতুন কর্মীকে চাকুরি দিয়াছিল।

এইসব কারখানার তৈরী হইয়াছিল :

মেশিনগান, ডেপ্‌থ চার্জ (জল বিস্ফোরক), কিন্ড গান, কামানের গোলা, বোমা, পাইরোটেকনিকস্, গ্লেনেড, প্রোপেল্যান্ট, মাইন, ছোট অস্ত্রাদির গোলাবারুদ।

তাছাড়া বন্দুক ও অস্ত্রশস্ত্রের আবরণ নির্মাণে, গোলাবারুদ ভর্তি করিবার কাজে, এইসব অস্ত্রশস্ত্র রঙ করার কাজে এবং এইগুলি পাঠাইবার জন্য পাত্র নির্মাণের কাজেও অত্যন্ত শিল্পকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এক কথায় সেই সময় অস্ত্রকারখানাগুলির সঙ্গে বোগাযোগ রাখিয়া কাজ করিবার ক্ষেত্রে মোট দেড়হাজার ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপকে কাজে লাগানো হইয়াছিল।

### বিমানের রক্ষণাবেক্ষণ ও সমাবেশ

ভারতের ১৮টি কেন্দ্রে যুদ্ধের সময় বিমান জড়ো হইত এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা হইত। শুধু তাই নয় এইসব কেন্দ্রে বিমানের যন্ত্রাংশ ও আত্মবলিক অংশ তৈরী হইত।

### জাহাজপথে সরবরাহ

ভারতের কারখানাগুলিতে মিত্রপক্ষের জন্য সমস্ত ধরনের মোট ৪৫ লক্ষ প্যারাসুট তৈরী হইয়াছিল।

আর ভারতে তৈরী প্যারাসুটের মাধ্যমে এক বছরে বার্ষিক মোট প্রায় ৬ লক্ষ ৯ হাজার ৭১৭ টন বিভিন্ন দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হইয়াছিল।

### পোশাক-পরিচ্ছদ

ভারতের পোশাক নির্মাণকারী কারখানাগুলিতে যুদ্ধের সময় ৪০ কোটি তৈরী-পোশাক নির্মিত হইয়াছিল। তাছাড়া ভারতীয় চামড়া দিয়া ভারতীয় কর্মীবা মোট ৫ কোটি জোড়া জুতা তৈরী করিয়াছিল।

১৯৩৯ সালে এবং ১৯৪৩ সালে সম্পূর্ণভাবে দেশীয় দ্রব্যাদি দিয়া ভারতে মোট ২০ লক্ষ এবং ১১ কোটি ৩০ লক্ষ পোশাক তৈরী হইয়াছিল।

বার্ষিক যুদ্ধে ব্যবহৃত প্রতিটি জংলী সবুজ রংয়ের পোশাকও নির্মিত হইয়াছিল ভারতেই।

### সেনাবাহিনীর সম্প্রসারণ

১৯৩৯ সালে যেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৮৩ হাজার, ১৯৪৫ সালে সেই সংখ্যা দিয়া দাঁড়াইয়াছিল ২৫ লক্ষে।



এছাড়া সেনাবাহিনীর অন্ত্যস্ত শাখার যে সস্ত্রসারণ ঘটনাছিল তাহা নিম্নরূপ :

	১৯৩৯	১৯৪৫
রাজকীয় ভারতীয় নৌবাহিনী	২,৩০০	৩০,০০০
রাজকীয় ভারতীয় বিমানবাহিনী	১,৬০০	৩০,০০০

আর ১৯৪৫ সালে মহিলা অস্ত্রিলিয়ারি কোর ( ভারত )-এর সদস্য-সংখ্যা গিয়া দাঁড়াইয়াছিল দশ হাজারে ।

### রাজকীয় ভারতীয় নৌবহর

পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রে জয়লাভ নিশ্চিত করিতেই যুদ্ধকালে রাজকীয় ভারতীয় নৌবহর সবসময় রাজকীয় নৌবহরকে সাহায্য করিয়াছে । তাছাড়া ১৯৪২ সালে বার্মা থেকে সৈন্ত অপসারণ ও আরাকানেন্দ্র মধ্য দিয়া সৈন্তদের কিরিয়া আসিবার প্রথম দিকেও ভারতীয় নৌবাহিনী একাই সহায়তা করিয়াছে । আরম্ভিকবাহিনীর ক্ষুদ্র অগ্রগতির কালে আরাকানের সমুদ্র এলাকা ও বার্মা রণাঙ্গনে আক্রমণ চালাইবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল ভারতীয় নৌবহরের উপর ।

এইসব সহযোগিতা ছাড়া, যুদ্ধ চলাকালীন পুরা সময়েই ভারতীয় বন্দরের স্থানীয় নৌ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং পারস্ব উপসাগরে টহলদারি কাজেরও দায়িত্ব ছিল ভারতীয় নৌবহরের উপর ।

### রাজকীয় ভারতীয় বিমানবহর

১৯৪২ সালের শুরুতে রাজকীয় ভারতীয় বিমানবহরে কেবলমাত্র দুইটি স্কোয়াড্রন ছিল । আর এই দুইটি স্কোয়াড্রনে আর এ এক অংশ ছিল শক্তিশালী । কিন্তু যুদ্ধের শেষে ভারতীয় বিমানবহরে স্কোয়াড্রনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া দশ হইয়াছিল, অন্ত্যস্তকে আর এ এক অংশ মারাত্মকভাবে কমিয়া গিয়াছিল ।

যুদ্ধকালে এই সব স্কোয়াড্রনের অনেক কটি স্কোয়াড্রন বার্মা রণাঙ্গনে আক্রমণ কাজে নিযুক্ত ছিল । আর বাকী স্কোয়াড্রনগুলির উপর ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আকাশসীমা রক্ষা করিবার দায়িত্ব ছিল ।

যুদ্ধকালে ভারতীয় বিমানবহরের যে সস্ত্রসারণ সম্ভব হইয়াছিল, তা মূলতঃ ভারতীয়দের ব্যাপক অংশগ্রহণের ফলে । এই সময় বিমানবহরের বিভিন্ন কাজে তো বটেই, এমনকি সাহায্যকারী আর এ এক কর্মী হিসেবেও ভারতীয়রা কাজ করিয়াছিলেন ।

### ভারতীয় সেনাবাহিনী

ভারতীয় সেনাবাহিনী সম্পূর্ণভাবেই একটি স্বৈচ্ছামূলক সেনাবাহিনী । কারণ, ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয়ান ( ব্রিটিশ )-দের ছাড়া আর কাহাকেও বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হয় নাই ।

১৯৪৫ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনী ছিল নিম্নরূপ :	সংখ্যা
ভারতীয় আরমার্ড কোর্স	৩১,০০০

রাজকীয় ভারতীয় গোলন্দাজবাহিনী	৮৩,০০০
ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার	২৬৩,০০০
ভারতীয় সিগনাল কোর্	৬৮,০০০
ভারতীয় আর্মি মেডিক্যাল কোর্	১৬৭,০০০
রাজকীয় ভারতীয় আর্মি সার্ভিস কোর্	৩৬০,০০০
ভারতীয় আর্মি অর্ড্যান্স কোর্	৬৪,০০০
ভারতীয় আর্মি ইলেকট্রিক্যাল ও মেডিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার	২২,০০০

#### অফিসারদের সংখ্যা

১৯৩৯ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কমিশনপ্রাপ্ত ভারতীয় অফিসারের সংখ্যা ছিল ১,১১৫ জন। আর ১৯৪৫ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া হইয়াছিল ১৫,৭৪০ জনে।

#### হতাহত

যুদ্ধকালে (১৯৪৫ সালের আগষ্ট পর্যন্ত) ভারতীয় সেনাবাহিনীর বহু সেনা হতাহত হইয়াছিল—

নিহত	২৪,৩৩৮ জন
আহত	৬৪,৩৫৪ জন
নিখোঁজ	১১,৭৫৪ জন
যুদ্ধবন্দী	৭২,৪৮২ জন
মোট	১৭২,৯৩৫ জন

#### যুদ্ধ অভিযান

ভারতীয় সেনাবাহিনী নিয়ে উল্লিখিত যুদ্ধ অভিযানে অংশ নিয়াছিল—মালয়, ভিউটনিসিয়া, বার্মা, মধ্যপ্রাচ্য, পূর্ব আফ্রিকা, সিসিলি, উত্তর আফ্রিকা, ইতালী, গ্রীস।

#### পাইকোর্স

মধ্যপ্রাচ্যে (ইরান ও ইরাক) ভারতীয় ডিভিসনকে পাঠানো হইয়াছিল ককেসাস হইয়া ভারত অভিমুখে জার্মানদের সম্ভাব্য অগ্রগতি রুখিবার জন্য। সেইসময় মধ্যপ্রাচ্যে ভারতীয় ডিভিসন পরিচিত হইয়াছিল ‘পাইকোর্স’ নামে। এককথায়, রাশিয়ার সৈন্তদের পশ্চাদ্দপসারণ এবং ইরান ও ইরাক হইয়া জার্মান বাহিনীর অগ্রগতির আসন্ন মুহূর্তে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বাধা দান ছিল সেই সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

#### রাশিয়া অভিমুখে

জার্মান বাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে রাশিয়াকেও ভারত সাহায্য করিয়াছিল। ভারতীয় সৈন্তরা সেই সময় উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে রাশিয়া পর্যন্ত ইরান-আফগান থেকে মেশেদা হইয়া দীর্ঘ ৩০০০ মাইল সরবরাহ পথ তৈরী করিয়া দিয়াছিল।

আর এই সড়কপথে ১৫ লক্ষ টন দ্রব্যাদি রাশিয়ার সরবরাহ করা হইয়াছিল। অথচ সেই সময় জাহাজযোগে এত বৃহৎ পরিমাণ দ্রব্যাদি সরবরাহ করা একপ্রকার অসম্ভব ছিল।

সরবরাহ ছাড়াও, তপ্ত মরুভূমি ও বরফে ঢাকা পাহাড়ী অঞ্চলের মধ্য দিয়া অভিক্রম করা এই সড়ক পথে ২৪ ঘণ্টা সামরিক টেলিগ্রাফবাহী ও বজায় রাখিয়াছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী।

একটি বৃহৎ অগ্রগতি

পূর্ব আফ্রিকার যুদ্ধে নিযুক্ত ভারতীয় সৈন্যরা শুধুমাত্র ঐ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। বরং তাঁরা যুদ্ধ করিতে করিতে উত্তর আফ্রিকা, তিউনিসিয়া ও ইতালী পর্যন্ত দীর্ঘ ৪৫০০ মাইল অগ্রসর হইয়াছিল।

পুরস্কার

যুদ্ধকালে ভারতীয় সেনাবাহিনী ৩১টি ভিক্টোরিয়া ক্রস জয় করিয়াছিল। এগুলির ২৭টি দেওয়া হইয়াছিল বার্মার যুদ্ধে অসম সাহসিকতার জন্য। এছাড়াও ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্যরা আরও ২০টি পুরস্কার জয় করিয়াছিল।

এক কথায় যুদ্ধে অসম সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী মোট ৪০২৮টি পুরস্কার জয় করিয়াছিল।

ভারতীয় কম্যাণ্ড

জাপানের পরাজয়কালে জঙ্গলে যুদ্ধ করিবার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৫০০০০ জনকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হইয়াছিল। এছাড়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কম্যাণ্ডে ৭০০০০ জন, বিদেশে (পাইকোর্স হিসেবে মধ্যপ্রাচ্য ও ইতালীতে) ২২০০০ জন এবং ভারতীয় কম্যাণ্ডে ৩০০০০ জন ভারতীয় সৈন্য নানাভাবে যুদ্ধে নিযুক্ত ছিল।

এক কথায় ভারতীয় কম্যাণ্ড ছিল সমস্ত রণাঙ্গনে নানাভাবে সহায়তা করার ক্ষেত্রে অত্যন্তম একটি অবলম্বন।

বার্মা

বার্মার নিযুক্ত চতুর্দশ বাহিনী ছিল বিশ্বের মধ্যে বৃহত্তম একক বাহিনী। এর যুদ্ধক্ষেত্রে ছিল ৭০০ মাইল বিস্তৃত, যা জার্মানীর বিকল্পে রাশিয়ার ফ্রন্টের সমান।

বার্মার যুদ্ধরত সেই ১০ লক্ষ সৈন্তের মধ্যে ৭ লক্ষই ছিলেন ভারতীয়।

আর বিভিন্ন রণাঙ্গনে জাপানীরা বহু হতাহত হইয়াছিল, তার অর্ধেকই হইয়াছিল বার্মার, ব্রিটিশ ও ভারতীয় বাহিনীর হাতে।

হুইভাবে সাহায্য

মিত্রশক্তির যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ভারত হুইভাবে সাহায্য করিয়াছিল। একদিকে যেমন ভারত নিজস্ব সম্পদ থেকে নির্মিত যুদ্ধ সামগ্রীর একটা বিরাট অংশ সরবরাহ করিয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি মিত্র শক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ-সামগ্রীর সরবরাহও ভারত যুদ্ধ চলাকালে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল।

এই সময় বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পৰ্ব্ব উৎপাদনের নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছিল এবং শাস্তির সময়ে যে সব দ্রব্য রপ্তানি করা হইত তার দেশীয় বিকল্পের সন্ধান করিয়াছিল। এছাড়া পৰ্ব্ব নিয়োজিত দ্রব্যের উন্নত ব্যবহার পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন :

কেমিকাল	ওষুধ
প্লাস্টিক	ডাই
ভেজটেবল অয়েল	লুব্রিক্যান্ট
	শোলাক

### কাঠ

অসংখ্য অনেক কিছুর উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালে ভারতে কাঠের উৎপাদনও আশ্চর্যরূপ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে যেখানে ভারতে কাঠ উৎপাদিত হইয়াছিল ২ লক্ষ ৪২ হাজার টন, সেখানে ১৯৪৩-৪৪ সালে তা বৃদ্ধি পাইয়াছিল ১২ লক্ষ ৭৪ হাজার টনে।

তাছাড়া এই সময়ে ভারতের কারখানাগুলিতে ৬ কোটি বর্গফুটেরও বেশী পরিমাণ প্রাইউড উৎপাদিত হইয়াছিল।

### মিশ্রশক্তিকে সরবরাহ

নিজস্ব প্রয়োজন মিটানো ছাড়াও ভারতের নতুন কারখানাগুলি মিশ্রশক্তির জন্ত প্রয়োজনীয় উল্লেখযোগ্য যুদ্ধসামগ্রীও নিয়মিত সরবরাহ করিয়াছিল।

ভারতে তৈরী হওয়া ১৫টি দেশে পাঠানো হইয়াছিল। তাছারা মিশ্রশক্তির প্রয়োজনীয় ৫০ হাজার বিভিন্ন ধরনের বস্ত্রাদির মধ্যে ৩৭ হাজারই ভারত সরবরাহ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

প্রশান্তমহাসাগরীয় যুদ্ধে অষ্ট্রেলিয়াকে বিভিন্ন দ্রব্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে ভারত ছিল তৃতীয় স্থানে। সেই সময় অষ্ট্রেলিয়া ছাড়া, চীন ও রাশিয়াতেও প্রচুর পরিমাণ যুদ্ধ-সামগ্রী পাঠানো হইয়াছিল। এই সব ছাড়া ভারত নিয়োজিত দেশগুলিতে সরবরাহ করিয়াছিল :

### মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকায়—

ইলেকট্রিক তার	ভার
পাখা	স্পাত
বস্ত্র	কাঠ

### ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য

### বুটেনে—

তুলা	জুতা
পাট	খাদ্যসামগ্রী

ক্যানভাস

সমস্ত মিত্রে দেশগুলিতে—

অম্র	চামড়া (কাঁচা)
পাট	পশু চৰ্ম
ম্যাঙ্গানীজ আকরিক	রবার

“ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করিতে আপনারা জাপান যাইতেছেন তিনিয়া আমি খুবই খুশী হইয়াছি। জাপানীদের পরাজয়ে বাধ্য করিবার ব্যাপারে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কৃতিত্ব অনেকখানি। আর সারা বিশ্বই জানে যে, ভারতীয় সেনাবাহিনী আসাম ও বার্মায় কি সুন্দরভাবে যুদ্ধ করিয়াছে। তাছাড়া ভারতীয় সেনাবাহিনী সাহসিকতা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে আফ্রিকা, জার্মানী, ইতালী ও গিরিয়ায় জার্মানীর পরাজয় ঘটাইবার কঠিন যুদ্ধে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে। আপনাদের মধ্যে এমন অনেক :উনিট এবং অফিসার ও সৈনিক আছেন যারা এই সব কয়টি দেশেই যুদ্ধ করিয়াছেন এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীকে খ্যাতি আনিয়া দিয়াছেন। \*

—জেনারেল স্ত্রার ক্লড অকিনলেক, কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ, ভারতবর্ষ ( জাপানে দখলদারি কোজে যে ভারতীয় সৈন্যদল প্রেরিত হয় তাঁদের উদ্দেশ্যে ভাষণ ) ১৫ জানুয়ারী, ১৯৪৬।

\* সাংবাদিক শ্রীপরিভোষ পাল কর্তৃক মূল ইংরাজী থেকে অনূদিত।

## দশম পর্ব দ্বাদশ অধ্যায় উপসংহার

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করিয়া মানুষবেব ইতিহাসের যে বর্বরতম যুদ্ধ দীর্ঘ ৬ বছর ধরিয়া চলিয়াছিল, তার সমাপ্তি ঘটিয়াছিল ১৯৪৫ সালের ১৪ই আগষ্ট। হিটলার কর্তৃক পোলাণ্ড আক্রমণের দ্বারা যে রক্তশ্রাবী মহাযুদ্ধের সূচনা, জাপান কর্তৃক নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মধ্যে সেই নরমেধযজ্ঞের অবসান। অবশ্য তার আগেই ৮-৯মে নাৎসী জার্মানীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরের দ্বারা ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের অবসান হইয়াছিল এবং তার পরেই আগষ্ট মাসে জাপানেরও পতন ঘটিল।

এ পর্বস্ত মানুষের ইতিহাসে এমন ভয়ঙ্কর, এমন বীভৎস এবং এমন নিবিচার ধ্বংস ও হত্যাকাণ্ডপূর্ণ মহাযুদ্ধ আর অচলিত হয় নাই। সুতরাং প্রথমেই এই মহাযুদ্ধের নরঘাতন লীলার একটা রেখাচিত্র দেওয়া যাক। ১৯১০ সালে বর্তমান গ্রন্থকার যখন দ্বিতীয়বার পূর্ব-জার্মানী পরিদর্শনে গিয়াছিলেন, তখন সাময়িক ইতিহাসের ছাত্ররূপে স্বভাবতঃই তিনি পটসডামের সেই বিখ্যাত সম্মেলন-কক্ষ পরিদর্শন করিয়াছিলেন, যে প্রাসাদকক্ষে ১৯৪৫ সালের ১৭ জুলাই থেকে ২ আগষ্ট পর্বস্ত মিলিত হইয়াছিলেন ষ্ট্যালিন, চার্চিল (পরে এ্যাটলি) ও ট্রুম্যান এবং স্বাক্ষর করিয়াছিলেন পটসডাম চুক্তি। কিন্তু সেই সম্মেলন কক্ষের দেওয়ালে মহাযুদ্ধের যে ভয়াবহ তথ্যগুলি একটি চার্টের আকারে টাঙ্গাইয়া রাখা হইয়াছিল, সেগুলি এই উপসংহার পর্বে নিশ্চয়ই পাঠকদের পক্ষে উল্লেখযোগ্য। যেমন—

প্রথম মহাযুদ্ধে নিহত হইয়াছিল ১ কোটি লোক।

আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছিল ৫ কোটি ৫০ লক্ষ লোক।

প্রথম মহাযুদ্ধে ৭ কোটি ৪০ লক্ষ লোক সশস্ত্র বাহিনীতে যোগ দিয়াছিল।

আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যোগ দিয়াছিল ১১ কোটি লোক।

প্রথম মহাযুদ্ধে ৩০টি দেশ সরকারীভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল।

আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ৭২টি দেশ।

“মানুষের ইতিহাসের বীভৎসতম অপরাধের অঙ্কণান করিয়াছিল ক্যাসিষ্ট বর্বরের।

১০ মিলিয়ান বা ১ কোটি লোককে বন্দীনিবাসগুলিতে হত্যা করা হইয়াছে নানা হিংস্র ও কল্পনাভীত নিষ্ঠুর উপায়ে—বিষাক্ত গ্যাসের সাহায্যে, পিটিয়ে ও শারীরিক যন্ত্রণা দিবে, সোজা গুলী করে, ফাঁসিতে লটকিয়ে, শ্রেক উপবাসে রেখে এবং অন্যান্য নানা উপায়ে—যেমন পরীক্ষামূলক ঔষধ প্রয়োগে।

এই নিহত নর-নারী-শিশু-বালক-বালিকা ও বৃদ্ধ প্রভৃতির মধ্যে ছিল ৬০ লক্ষ ইহুদী।

পটসডাম কনফারেন্স হলে জার্মান ক্যাসিষ্ট কর্তৃক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বর্ণনা সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি ছিল :

সোভিয়েত ইউনিয়ন—	২,০০০,০০০
পোল্যান্ড—	৬০,০০০
জার্মানী—	৮০,০০০
যুগোস্লাভিয়া—	১৭,০০০
রুম্যানিয়া—	৭,৭০,০০০
গ্রেট ব্রিটেন ও কমনওয়েলথ—	৬,৬৫,০০০
ফ্রান্স—	৬,২০,০০০
ইতালী—	৬,৭০,০০০
গ্রীস—	৫,৭০,০০
চেকোস্লোভাকিয়া—	৮,৫০,০০০
অস্ট্রিয়া—	৩,৪৬,০০০
হাঙ্গেরী—	৭,২০,০০০
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩,৬৭,০০০
হল্যান্ড—	২,৫৫,০০০
বেলজিয়াম—	১,৬০,০০০
কিনল্যান্ড—	২৭,০০০
সুইডেন—	৩২,০০০
আলবেনিয়া—	২৬,০০০
নরওয়ে—	২,০০০
ডেনমার্ক—	৩,০০০
আহত ও পত্ন—	৮,০০০,০০০

উপরে উদ্ধৃত এই সংখ্যার সঙ্গে এশিয়া মহাদেশের চীন ও জাপানের কথাও মনে রাখিতে হইবে। একটি মার্কিন পুস্তকে প্রকাশ যে, চীনে কত লোক হতাহত হইয়াছিল, তা সঠিক ভাবে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে, ক্রেনারেলিজিমো চিয়াং কাইসেক তাঁর আত্মকথায় লিখিয়াছেন যে, চীনা সৈন্তের হতাহতের সংখ্যা ৩০ লক্ষেরও বেশী। এই সংখ্যার মধ্যে অবশ্যই চীনের অসামরিক নর-নারীঃ বৃদ্ধা ও সম্পত্তি-হানির কথা ধরা হয় নাই।

আর বিমান আক্রমণে ও যুদ্ধে জাপানের প্রাণহানির সংখ্যা ২০ লক্ষ। (১)

এই প্রসঙ্গে বাংলার ও ভারতে ৪০ থেকে ৫০ লক্ষ লোকের হুজিঁকে মৃত্যুর কথাও নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য।...

১৯৭৫ সালের মে মাসে দ্বিতীয় মণ্ডল অবসানের ৩০তম বার্ষিকী উপলক্ষে মণ্ডো থেকে যে সমস্ত তথ্য প্রকাশিত হইয়াছিল, সেগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি স্মরণযোগ্য :

(১) Total War—Vol II—by Peter Calvocoress : Guy Wint  
New York, 1973, p. 374

বিম্বা (৩)—১৮

১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯—নাৎসীদের পোল্যান্ড আক্রমণে যুদ্ধের সূচনা। ৮ মে, ১৯৪৫—নাৎসী জার্মানীর আত্মসমর্পণ।

“যুদ্ধের স্থিতিকাল ছিল ৬ বছর এবং হডরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা—এই তিনটি মহাদেশের ৪-টি দেশ রণক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। ইউরোপীয় মহাদেশে ছিল মহাযুদ্ধের মূল নাটক এবং তাঁর চূড়ান্ত অঙ্ক ছিল সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে।” (২)

যুদ্ধে জড়িত মাল্লবের সংখ্যা ছিল ১৭০ কোটি। অর্থাৎ সমগ্র মনুষ্যজাতির তিন-চতুর্থাংশ (প্রথম মহাযুদ্ধে ১০০ কোটি)।

যুদ্ধে লিপ্ত দেশগুলির মোট ব্যয় আনুমানিক ১,৫০,০০০ কোটি ডলার।

আমেরিকার সামরিক ব্যয় ৩১,৮০০ কোটি ডলার।

ব্রিটেনের সামরিক ব্যয় ৩১,০০০ কোটি ডলার।

অক্ষশক্তির মোট সামরিক ব্যয় ৪২,০০০ কোটি ডলার।

যুদ্ধে লিপ্ত মোট সৈন্যসংখ্যা ১১ কোটি। প্রধানতঃ সমরাস্ত্র নির্মাণেই অর্থশক্তি নিযুক্ত হইয়াছিল এবং যাত্রা চারিটি দেশ—আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মানী ও সোভিয়েত ইউনিয়নে নির্মিত হইয়াছিল :

বিমান—৬,৫০,০০০

ট্যাঙ্ক—২,৮৭,০০০

কাষান—১০,৪২,০০০

যুদ্ধে নিহত সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষ। এর মধ্যে সৈন্য ২ কোটি ৭০ লক্ষ এবং অ-সামরিক নর-নারী ২ কোটি ৮০ লক্ষ।

অ-সামরিক জনগণের উপর নৃশংস আক্রমণ এবং শহর-গ্রাম জনপদ ধ্বংস মিথস্বায়ে দেওয়াই ছিল তাদের বর্বর রণনীতির প্রধান লক্ষ্য। আর বন্দীশিবির-গুলিতে গণহত্যা। এ জন্তাই সৈন্য সংখ্যার চেয়ে অ-সামরিক নর-নারী-শিশু হত্যার সংখ্যা এত বেশী।

সোভিয়েত দেশে নাৎসীরা নিশ্চিহ্ন করিয়াছিল :

১,৭০১ টি ছোট-বড় শহর

৭০,০০০ টি গ্রাম

৩১,০০০ শিল্পসংস্থা

৩৮,০০০ ঘোষ খামার

১,৮৭৬ রাষ্ট্রীয় খামার

৬৫,০০০ কিলোমিটার রেল লাইন

ধ্বংস করে বা জার্মানীতে লইয়া যাওয়া হয় :

১৬,০০০ রেল ইঞ্জিন

এই নি ৪,২৮,০০০ রেলওয়ে ওয়াগন

ইহদী। যত ইউনিয়নের মোট বৈবরিক ক্ষতি :

পটসডাম ব ২,৬০,০০০ কোটি রুবল

নিম্নলিখিত তথ্য : Great Patriotic War of the Soviet Union, p. 433.



নাৎসীদের বিমান আক্রমণে ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হং—

বুটেনে ২০ লক্ষ ঘরবাড়ী।

ক্রাক্স, হল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, যুগোস্লাভিয়া, গ্রীস ও অন্যান্য দেশেও নিশ্চিহ্ন হয় অসংখ্য ঘরবাড়ী ও অ-সামরিক সংস্থা।

অপরদিকে মিত্রশক্তির পাল্টা আক্রমণে জার্মানীর ধ্বংস হয় :

১৫ লক্ষ ঘরবাড়ী।

নিরাশ্রয় হয় ৭৫ লক্ষ জার্মান।

\*

\*

\*

দানবিক ক্যাসিজমকে পরাজিত করার জন্য কি পরিমাণ মূল্য দিতে হইয়াছে, তা উপরে উদ্ধৃত তথ্যগুলি থেকে কিছুটা অনুমান করা যাতে পারে। কিন্তু মনে রাখা দরকার এই অঙ্কও সম্পূর্ণ বা চূড়ান্ত নয়। যাহাযে জীবনের ও বিবয়-সম্পত্তির ক্ষয়-ক্ষতি ইউরোপে, আফ্রিকায় ও এশিয়ায় স্থানিদিষ্টরূপে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। অধিকন্তু মিত্রপক্ষের মধ্যেও ইঙ্গ-মার্কিন এবং সোভিয়েত রাশিয়ার প্রদত্ত হিসাবগুলির মধ্যে সর্বত্র মিল নাই। কারণ, প্রত্যেকেই যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেদের বীরত্ব ও কৃতিত্বকে প্রাধান্য দিতে চাহিয়াছেন, তেমনই অপরের ফুলনাশ নিজেদের ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ স্বীকারকেও বড় করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। সম্ভবতঃ জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় গৌরবের দিক থেকে এই দুর্বলতা স্বাভাবিক। কিন্তু তৎসঙ্গেও স্বীকার করিতে হইবে নাৎসী ও ক্যাসিষ্ট শক্তিবর্গকে প্রতিরোধ ও পরাজিত করিতে গিয়া ৬ বছরের মহাযুদ্ধে যে অভাবনীয় ক্ষতি ও ধ্বংস হইয়াছে, তা পরিমাপ করা সম্ভব নয়। বিশেষতঃ জীবনের চূড়োগ ও যন্ত্রণা পরিমাপ করার যন্ত্র কোথায় ? এই দুর্ভোগ ও যন্ত্রণার খেসারৎ দিতে হইয়াছে বিভিন্ন দেশকে মহাযুদ্ধ অবসানের ৩০ বছর পরেও—দারিদ্র্য, বেকারি, মুক্তা-ক্ষতি, বাস্ত্যহারা এবং অন্ত্যঃ বহুভাবে।

উপরে প্রধানত সোভিয়েত পক্ষের প্রদত্ত হিসাব দেওয়া হইয়াছে। এক্ষেপে মার্কিন পক্ষের প্রকাশিত হিসাবও উল্লেখ করা যাইতেছে ‘দুই শিবিরের’ (রাজনৈতিক মত-বিরোধের দিক থেকে) বক্তব্য অনুধাবনের জন্য।

মার্কিন ঐতিহাসিক লুই ব্রাইডার লিখিয়াছেন যে, জার্মানী সমগ্র ইউরোপকে নিজেদের তাঁবেদারিতে আনিতে গিয়া প্রভূত মূল্য দিয়াছিল :

হিটলারী যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল ২ কোটি জার্মান।

এর মধ্যে ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত।

অন্ত্যন্ত ভাবে মৃত ৫৩ লক্ষ ৫০ হাজার।

৭২ লক্ষ ৫০ হাজার আহত এবং ১৩ লক্ষ নির্যোজ।

অর্থাৎ জার্মানীর হতাহত ও নির্যোজের (বন্দীসহ) মোট সংখ্যা ১ কোটি ২১ লক্ষ ৫০ হাজার।

জনসংখ্যার এই ক্ষতি ছাড়া মিত্রবাহিনীর হাতে হিটলারের তৃতীয় রাইখ এমনভাবে ধ্বংস হইয়াছিল যে, আগেও জার্মানীকে আর যেন চেনাই যাইত না। জার্মানীর ২ কোটি অষ্টালিকার মধ্যে ৭০ লক্ষ হয় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত

হইয়াছিল। ২০০০ সেতু ধ্বংস হইয়াছিল, আর ৩০০০ মাইল রেলপথ ও সড়ক চূর্ণ হইয়াছিল। কার্ভত প্রায় সমস্ত বড় বড় শহরের রাস্তাই ধ্বংসস্থাপে পরিণত হইয়াছিল এবং জাৰ্মানীর বিখ্যাত রাজধানী বার্লিনের সরকারী ও বেসরকারী অট্টালিকা, পরিবহণ, জল, বিদ্যুৎ ও গ্যাস ইত্যাদি সমস্ত পারিক সাড়িস ও সরবরাহ-ব্যবস্থা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং সর্বত্র মৃত্যুর বিজয়িকায় বালিন যেন প্রেতনগরীর রূপ ধারণ করিয়াছিল। আর এই প্রেতপুরীতে কত হতভাগ্যকে দেখা গিয়াছে স্ত্রীপুত্র পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের খোঁজ করিতে! হিটলারী নাৎসী ডিক্টেটরির চরম মূল্য দিতে হইয়াছে জাৰ্মানীকে। একমাত্র প্রাচীন কার্বেজ নগরীর (রোমানদের হাতে) ধ্বংসের সঙ্গে এর তুলনা করা যাইতে পারে। আর্থিক হিসাবে জাৰ্মানীর ক্ষতির পরিমাণ কমপক্ষে ছিল ২৭ হাজার ২০০ কোটি ডলার!

অক্ষশক্তিবর্গের অন্ততম প্রধান অংশীদার জাপানকেও অল্পরূপ খেসারৎ দিতে হইয়াছিল।

২৭ লক্ষ জাপানী অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। এর মধ্যে রণক্ষেত্রে নিহত হইয়াছিল ১২ লক্ষ ৭০ হাজার। অগ্ন্যস্ত্রভাবে মারা পড়িয়াছিল ৬ লক্ষ ২০ হাজার। আহত হইয়াছিল ১ লক্ষ ৪০ হাজার, নিখোঁজ হইয়াছিল ৮৫ হাজার। অর্থাৎ জাপানের মোট ২১ লক্ষ ১৫ হাজার হতাহত ও বন্দী।

জাপানের সমগ্র নৌবহর ধ্বংস হইয়াছিল এবং বাণিজ্যবহরও ধ্বংস হইয়াছিল শতকরা ২৫ ভাগ।

জাপানী দ্বীপের এক অংশ থেকে অল্প অংশ পর্যন্ত শহরগুলি চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পার্লামেন্টার আক্রমণের চূড়ান্ত পরিণতি এই!

অক্ষশক্তিবর্গের তৃতীয় বড় অংশীদার ইতালীর অবস্থাও মর্মান্তিক হইয়াছিল।

৩১ লক্ষ ইতালীয়ান অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। এর মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইয়াছিল ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৪২৬ জন।

আহত হইয়াছিল ৬৬,৭১৬ জন এবং নিখোঁজ হইয়াছিল ১ লক্ষ ৩৫ হাজার ৭০ জন।

ইতালীর ২০৮ টি যুদ্ধজাহাজ ধ্বংস হইয়াছিল এবং ৪২টি আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। আর বাণিজ্য নৌ-বহরের ২০ ভাগ নষ্ট হইয়াছিল।

আর্থিক দিক দিয়া ইতালী প্রায় দেউলিয়া হইয়া গিয়াছিল।

২০ বছরের ক্যাসিট মহিয়ার এবং মুসোলিনী'র রোমক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের এই পরিণতি!

উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত সারা ইতালী বোমার ও গোলায় বিধ্বস্ত হইয়াছিল এবং সর্বত্র খাড়াভাবে ও ক্ষুধার্ত মানুষের করুণ দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছিল।

মিত্রপুঞ্জের মধ্যে বিজয়ী বুটেন পর্যন্ত মারাত্মকরূপে ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্বল হইয়াছিল।

বুটেন যুদ্ধের জন্য সমাবেশ করিয়াছিল ৫৮ লক্ষ ২৬ হাজার জন। এর মধ্যে মারা পড়িয়াছিল ৩ লক্ষ ৫৭ হাজার ১২৬ জন।

আহত হইয়াছিল ৩ লক্ষ ১২ হাজার ২৬৭ জন এবং নিখোঁজ হইয়াছিল ৪৬

হাজার ৭০ জন। বুটেনের বিশাল বাণিজ্য নৌবহর যুদ্ধের সময় প্রভূত পরিমাণে পরিস্ফীত হইলেও ২ কোটি ৩০ লক্ষ টন থেকে হ্রাস পাইয়া ১ কোটি ৬০ টনে দাঁড়াইয়াছিল।

আর খাস বৃটশ বীপপুঞ্জের ৫ লক্ষ বাড়ী ধ্বংস হইয়াছিল, আর ৪০ লক্ষ বাড়ী ক্ষয় হইয়াছিল।

বুটেনের আর্থিক ক্ষতি হইয়াছিল ভয়াবহ। জাতীয় ঋণের পরিমাণ ৭ হাজার কোটি ডলার থেকে বৃদ্ধি পাইয়া ১০ হাজার কোটি ডলার ছাড়াইয়া গিয়াছিল। আর বিদেশী ঋণের পরিমাণ ৬ গুণ বৃদ্ধি পাইয়া ১ হাজার ৩০০ কোটি ডলারে দাঁড়াইয়াছিল। আর সমুদ্র পারবর্তী বৃটিশ সম্রাজ্যের বিশাল মূলধনী কারবার নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

বুটেনের মিত্র ও ঘোসর আমেরিকার শক্তি বৃদ্ধির তুলনায় ইংলণ্ড যেন রাহগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

এখানে সোভিয়েত রাশিয়ার ক্ষতির পুনরুল্লেখ করা নিম্নয়োজন। মার্কিন গ্রন্থকার তার বিশদ বিবরণ দিয়া বলিয়াছেন যে, একমাত্র ষ্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধে রাশিয়ার বত লোক হারাইয়াছিল আমেরিকা সমগ্র ষিভীর মহাযুদ্ধের সমস্ত যুদ্ধেও তত লোক হারায় নাই! মার্সাল ষ্ট্যালিন নাকি একবার মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, মিত্রশক্তির জয়লাভে রাশিয়া দিয়াছে রক্ত, বুটেন দিয়াছে সময় এবং আমেরিকা দিয়াছে মাল। (৩)

ষিভীর মহাযুদ্ধে অবশ্য ক্রান্তের ক্ষতি প্রথম মহাযুদ্ধের মত বিপর্যয়কর ছিল না— বনিও প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছিল।

ক্রান্তের সশস্ত্র বাহিনীর ২ লক্ষ ১৫ হাজার ৬৮ জন নিহত এবং অন্তান্ত মৃত ২ লক্ষ ৩১ হাজার ৫৭৭ জন।

আহ ৩ ৪ লক্ষ এবং ১ লক্ষ ৪০ হাজার নিখোঁজ।

৩০ হাজার করাসী কাদারিং স্কোয়াডের মধ্যে প্রাণ দিয়াছিলেন।

১ লক্ষ ৮৮ হাজার অন্তান্ত অ-সামরিক ব্যক্তি মারা পড়িয়াছিল।

১ লক্ষ ৫০ হাজার নির্বাসিত হইয়াছিল এবং যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে ৮৮ হাজার বন্দীশালায় মারা গিয়াছিল।

কলকারখানা, সেতু, রেলওয়ে ইঞ্জিন ও নৌবহর এবং বন্দর ইত্যাদির ক্ষতি হইয়াছিল অপরিমেয়।

পাঁচ বছর নাৎসী জার্মানীর বুটের ডলার খাকার কলে ক্রান্তের নৈতিক শক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। চোর, জুগাচোর, কালোবাজারের কারবারী ও বিশ্বাসঘাতকে বেশ ছাইয়া গিয়াছিল।

বহু শ্রীলোকের চরিত্র নষ্ট হইয়াছিল এবং যারা জার্মানদের শয্যাসিঁকনি হইয়াছিল, তাদেরকে শাস্তিভরূপে মাথা নেড়া করিয়া প্রকান্ত রাস্তার প্লাকার্ডসহ (আত্মদোষ স্বীকৃতির প্রমাণ হিসাবে) মার্চ করানো হইয়াছিল এবং জনসাধারণ তাদের মধ্যে গুঁড়ু দিয়াছিল। শত্রুর সহযোগী প্রায় ১ লক্ষ লোককে আদালত থেকে দণ্ড

দেওয়া হইয়াছিল এবং ১৯৪১ সালের জুলাই-আগষ্ট মাসে ৫০০ বিশ্বাসঘাতককে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইয়াছিল।

ক্রান্তের প্রথম মহাযুদ্ধের (ভার্দুন) হীরো মার্শাল পেন্ডা, বিনি ভিসি সরকারের নায়ক এবং জার্মানীর সহযোগী ও আত্মসমর্পণকারী ছিলেন, তাঁরও মৃত্যুদণ্ড হইয়াছিল বিশ্বাসঘাতকতার জন্য। কিন্তু ৯০ বছরের বৃদ্ধকে প্রাণে বধ না করিয়া বাবস্কীবন দণ্ড দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু কুখ্যাত পিয়ের লাভালকে রেহাই দেওয়া হইল না, বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে তাকে গুলি করিয়া মারা হইল।

এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষয়ক্ষতির কথা। আমেরিকার নৌ, বিমান ও স্থল সর্বপ্রকার সশস্ত্রবাহিনীতে মোট ১ কোটি ৩১ লক্ষ ১২ হাজার ৫৬৬ জন যোগ দিয়াছিল।

এর মধ্যে হতাহত হইয়াছিল ১০ লক্ষ ৭৮ হাজার ৬৭৪ জন।

যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত ২ লক্ষ ৯৩ হাজার ২৮৬ জন। অন্ত্যান্তভাবে মৃত ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৮৪২ জন। এবং আহত ৬ লক্ষ ৭০ হাজার ৮৪৬ জন।

ইউরোপ থেকে স্মরণ প্রশান্ত মহাসমুদ্রের ঘাঁপপুঞ্জ পর্বন্ত সর্বত্র আমেরিকানরা মৃত্যুবরণ করিয়াছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ও বে-সামরিক সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ ছিল ন্যূনপক্ষে ৩৫ হাজার কোটি ডলার।

কিন্তু পূর্জ মার্শাল মন্তব্য করিয়াছেন যে, একজন সৈন্ত রণক্ষেত্রে যে সাড়িস দ্রুত গোটা জাতির পক্ষেও তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব নয়! (৪)

\*

\*

\*

উপরে উদ্ধৃত সংখ্যাগুলি থেকে অন্ততঃ এইটুকু বুঝা যাইতেছে যে, মানুষের ইতিহাসে এমন ভয়ঙ্কর নরধাতন এবং অভাবনীয় পার্শ্ববিকতার উল্লসিততা আর কখনও দেখা যায় নাই এবং এত বড় বিরামহীন যুদ্ধও আর কখনও ঘটে নাই। এই মহাযুদ্ধ চলিয়াছিল ২১২১ দিন ধরিয়া। সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল জুকোভ তাঁর স্মৃতি কথায় মন্তব্য করিয়াছেন—‘যুদ্ধের গোটা কালপর্ব জুড়ে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সকল ঋতুতেই বিরামহীন লড়াই চলেছিল।’ এমন কি রাজ্জবেলা পর্বন্ত লালকোজ লড়াই চলাইয়াছিল। কিন্তু আগে ‘বিশেষ অবস্থায় ছাড়া’ রাজ্জবেলা সাধারণতঃ রণক্রিয়া চালানো হইত না। ১৯৪৩-৪৫ কালপর্বে লালকোজ যে বিরাট আক্রমণ অভিযান চলাইয়াছিল, তাতেই নৈশ রণক্রিয়ার পরিধি এত ব্যাপক হইয়াছিল। কিন্তু জার্মান-বাহিনী নৈশ লড়াই এড়াইয়া যাইতে চাহিত। (৫)

কিন্তু জার্মানীর মত জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমুন্নত একটা সভ্যজাতির পক্ষে এমন বর্বর যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া এবং হিটলারের পক্ষে সেই যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া কিভাবে সম্ভব হইল? আর হিটলারের মত এমন নিরঙ্কুশ এবং অপরিণীত ক্ষমতার ডিক্টেটরি (বা পৃথিবীর

(৪) পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৬১৬

(৫) মার্শাল জুকোভ প্রণীত ‘স্মৃতিচারণ ও গভীর চিন্তন’ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত—সোভিয়েত সমীক্ষা, ১৯৭৫, সংখ্যা ২২।

ইতিহাসে আগে কখনও দেখা যায় নাই) অর্জন এবং তার সর্বাঙ্গিক প্রয়োগ কিভাবে সম্ভব হইয়াছিল?—যে কোন চিন্তামূল পাঠকের মনে এমন প্রশ্ন নিশ্চয়ই দেখা দিতে পারে। কারণ, যুদ্ধ মাত্রই বর্বর। কিন্তু সেই বর্বরত' এত চরম মাত্রায় উঠিয়াছিল কিভাবে?

এই জটিল প্রশ্নটির উত্তর দিয়াছেন হিটলারেরই একজন দক্ষ এবং বিখ্যাত পার্শ্বচর ও সমরাস্ত্রবে মন্ত্রী আলবার্ট স্পায়ার (Albert Speer)—যুগেরমবার্গের বিচারালয়ে একমাত্র যিনি জার্মানীয় এই যুদ্ধ ও যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কে হিটলারসহ তাঁর সমস্ত সহকর্মীদেরকেই দায়ী বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। পশ্চিম বার্লিনের স্পাডাউ কারাগারে বসিয়া তিনি যে স্মৃতিকথা লিখিয়াছেন, তাতে নাৎসী জার্মানীর বহু চাক্ষু্যকর চিত্র তিনি উদ্ঘাটন করিয়াছেন। আধুনিক যুদ্ধ ও হিটলারের ডিক্টেটরি সম্পর্কে তিনি একজন অভিজ্ঞ বুদ্ধিজীবী ও যন্ত্রবিদ্যারদ্রুপে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, এরজন্ত মূলতঃ দায়ী যন্ত্রবিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার অবিস্মৃত অগ্রগতি ও উন্নতি। তিনি লিখিয়াছেন যে, একমাত্র তিনি নন, এমন ধারণা ও বিশ্বাস ব্যক্ত করিয়াছেন স্বয়ং মার্কিন সমরসচিব মিঃ হ্যারি এল ট্রিমসন। ১৯৪৭ সালে ট্রিমসন আমেরিকার বিখ্যাত সাময়িকপত্র “করেন এ্যাক্যুয়ার্স” পত্রে লিখিয়াছিলেন :

“We must never forget, that under modern conditions of life, science and technology, all war has become greatly brutalized and that no one who joins in it, even in self-defence, can escape becoming also in a measure brutalized. Modern war can not be limited in its destructive method and the inevitable debasement of all participants ..”

অর্থাৎ সহজ কথায় ‘আধুনিক জীবনযাত্রার অবস্থার বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার জন্ত সমস্ত যুদ্ধই বর্বরতার পরিণত হইতে বাধ্য। এমন কি, আত্মরক্ষার জন্ত যারা যোগ দিয়া থাকেন, তাঁদের পক্ষেও বর্বর না হইয়া উপায় নাই। আধুনিক যুদ্ধে ধ্বংসের উপায়গুলিকে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব নয় এবং এমন যুদ্ধে সমস্ত সংশ্লিষ্টকারীদের চারিত্রিক পতন অনিবার্য।’

মার্কিন সমরসচিবের এই মন্তব্য য সত্য, তার প্রমাণ কেবল হিটলারী যুদ্ধ ও বন্দীশালার নৃশংসতা নয়, হিরোশিমা ও নাগাসাকির উপর স্বয়ং আমেরিকানদের পারমাণবিক বোমাবর্ষণ।...

হিটলারী ডিক্টেটরির সর্বগ্রাসিতা সম্পর্কে আলবার্ট স্পায়ার যে সমস্ত মন্তব্য করিয়াছেন, সেগুলি অত্যন্ত প্রাধান্যবোধ্য। তিনি বলিয়াছেন :

Hitler's dictatorship was the first dictatorship of an industrial state in this age of modern technology, a dictatorship which employed to perfection the instruments of technology to dominate its own people.....By means of such instruments of technology as the radio and public address systems, eighty million persons could be made subject to the will of one individual.

সহজ কথায়—‘আধুনিক প্রযুক্তিবিজ্ঞান যুগে হিটলার এমন একটি প্রশিক্ষিত উন্নত রাষ্ট্রের ডিক্টেটরি পাইয়াছিলেন, যে রাষ্ট্রের কারিগরি বিদ্যার সমস্ত যন্ত্রগুলি এই ডিক্টেটরিকে নিখুঁত নৈপুণ্যের মধ্যে প্রয়োগের সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং তাঁর নিজের জনগণের উপর এই যন্ত্রবিদ্যা নিরবচ্ছিন্ন প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিল। ৮০ মিলিয়ন লোককে একটি মাত্র ব্যক্তির ইচ্ছাধীন রাখার জন্য আধুনিক কারিগরি বিদ্যার যন্ত্রগুলি, যেমন রেডিও এবং জনগণের নিকট ভাষণ দেওয়ার পদ্ধতি সাকল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা হইয়াছিল।’

মিঃ স্পীয়ার আরও লিখিয়াছেন—‘টেলিকোন, টেলিটাইপ ও রেডিও ব্যবস্থার মাধ্যমে একেবারে সর্বত্রের—উচ্চতম থেকে নিম্নতম পর্যন্ত কর্মচারীদের নিকট সমস্ত হুকুম সোজানুজি পৌঁছাইয়া দেওয়া যাইত এবং তারা বশব্দের মত সেগুলি কার্যক্ষেত্রে পালন করিয়া যাইত। অন্ত্য হুকুমগুলিও এমন প্রত্যক্ষভাবেই অধিকার ও সৈন্যপত্নের নিকট পৌঁছিত।’

‘The instrument of technology made it possible to maintain a close watch over all citizens and to keep criminal operations shrouded in a high degree of secrecy..... Dictatorships of the post needed assistants of high quality in the lower ranks of the leadership also—men who could think and act independently. The authoritarian system in the age of technology can do without such men. ...

The criminal events of those years were not only an outgrowth of Hitler's personality. The extent of the crimes was also due to the fact that Hitler was the first to be able to employ the implements of technology to multiply crime.’ (৬)

অর্থাৎ প্রযুক্তিবিজ্ঞান যন্ত্রগুলির মাধ্যমে সমস্ত নাগরিকদের উপর তীব্র নজর রাখা এবং সমস্ত অপরাধজনক কার্যাবলী অত্যন্ত উচ্চ স্তরের গোপনীয়তার মধ্যে ক্রাশাচ্ছন্ন করিয়া রাখা সম্ভব হইত। অতীতকালের একনাথকত্ব সাকল্যের সঙ্গে পরিচালনার জন্য নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণেও উচ্চগুণসম্পন্ন সহকারীর দরকার হইত—যে সহকারীরা স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কাজ করিতে সক্ষম। কিন্তু যন্ত্রবিজ্ঞান যুগে প্রভুত্বপারায়ণ রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পক্ষে এই ধরনের লোক ছাড়াও চলিতে পারে। ...

‘ওই বছরগুলির অপরাধজনক কার্যাবলী একমাত্র হিটলারের ব্যক্তিত্বের অতি-ক্ষীণের জন্য ঘটে নাই। এই সমস্ত অপরাধের এই ব্যাপকতা ঘটয়াছিল এই জন্য যে, হিটলারই প্রথম কারিগরি বিজ্ঞান যন্ত্রপাতিগুলিকে অজস্র অপরাধের মাত্রা বাড়াইবার জন্য সাকল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।’

এইভাবে হিটলার আধুনিক যন্ত্রবিদ্যাকে বর্ধিত ও হত্যাকাণ্ডের বাহন করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং সেই সমস্ত পৈশাচিকতা অধিকাংশ জাতিগত নর-নারীর কাছে

গোপন রাখিতেও পারিয়াছিলেন। কিন্তু জার্মান সমরনায়কদের অধিকাংশই এই বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন, একথা সত্য নয়। বরং তাদের অনেকেরই জ্ঞাতসারে এবং ইচ্ছানুসারে এই সমস্ত পার্শ্ববিকতা অহুষ্ঠিত হইয়াছিল। যদিও অনেক জার্মান সেনাপতি যুদ্ধের পর তাঁদের আত্মজ্ঞতিতে হিটলারের অপরাধকে লম্বু করিয়া দেখাইতে কিংবা তাঁর দোষ স্থানল করিয়া চাহিয়াছেন, অথবা হিটলারের হাতে অপমানিত বা অপহৃত সেনাপতিরা তাঁর প্রচুব মিন্দাও করিয়াছেন, তবু শীর্ষ সেনানায়কদের অনেকেই, যেমন মার্শাল গোয়েরিং, কিন্ড মার্শাল কাইটেল, কিন্ড মার্শাল ম্যানষ্টাইন, জেনারেল গুডেরিয়ান প্রভৃতি হিটলারকে অনন্তসাধারণ প্রতিভাশালী এবং অধিতীয় জার্মান নেতা বলিয়া মনে করিতেন এবং জার্মানীর পতন আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর প্রতি অস্বভাবিক ও বিশ্বাস পোষণ করিতেন। হিটলারের আশ্চর্য স্বরূপশক্তি, তাঁর অভূতপূর্ব বক্তৃতার মোহনীয় মায়া, অল্পশব্দ সম্পর্কে তাঁর নিখুঁত জ্ঞান, সাংঘাতিক শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ইত্যাদি বহু বিষয়ে তাঁরা ফুরারকে অনন্তসাধারণ মনে করিতেন। আর মনে করিতেন তাঁর চোখের ও ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ অনতিক্রম্য। (৭)

এছাড়া হিটলার কর্তৃক জার্মানীর রাষ্ট্রকর্মতা দখলের পর সমস্ত প্রকার প্রচারবস্ত্র—সংবাদপত্র, রেডিও ইত্যাদি থেকে শুরু করিয়া স্থলের পাঠ্যপুস্তক পর্যন্ত সর্বত্র একদিকে কঠোর নিয়ন্ত্রণ (হিটলার-বিরোধী সমস্ত দল ও সংবাদ নিষিদ্ধকরণ) ও অন্যদিকে হিটলারের অজস্র জ্ঞতির বক্তা প্রবাহিত হইয়াছিল। গোয়েবলসের দপ্তর এ বিষয়ে ছিল অসাধারণ দক্ষ। কলে, জার্মান জাতির কাছে হিটলার ইতিহাসের একজন সর্বোত্তম পুরুষ, জার্মান জাতির ভাগ্যান্বিতায়ক ও অস্বাভাবিক প্রাণকর্তা বলিয়া প্রতিভাত হইলেন এবং হিটলার নিজের বিশ্বাস করিতেন যে, তিনিই বিধাতৃ নির্দিষ্ট জার্মানীর সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্ধারকর্তা। এমন কি, তিনি কোমলজন্মের নিরামিষাশী (কারণ জীবহত্যা সহ করিতে পারিতেন না!) ও ব্রহ্মচারী বলিয়া প্রচারিত হইলেন।

এভাবে একটা গোটা জাতিতে একটি মাত্র ব্যক্তির কুক্ষিগত ও বদ্বন্দ্য করিয়া ইতিহাসের এক অভাবনীয় বিপর্যয় ডাকিয়া আনা হইল। (৮)

সুতরাং নাসী জার্মানীর এই সর্বগ্রাসী ডিক্টেটরির ইতিহাস থেকে সমস্ত বেশেরই শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত। কারণ, একা হিটলার নয়, ফুরারের অধিকাংশ তত্ত্ব ও সহকর্মীই ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত, ক্ষমভালোভী, নিষ্ঠুর ও পরস্পরের প্রতি ঈর্ষান্বিত। আলবার্ট স্পায়ার তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, যখন জার্মান জাতিতে এক জীবন-মুহুর ঘণ্টে সর্বস্ব পণ ও ত্যাগ স্বীকার করিতে গোয়েবলসের দপ্তর নিপুণ প্রচারকার্য চালাইতেছিল, তখন হিটলার, হিমলার, গোয়েরিং প্রভৃতি জার্মানীর ভাগ্য বিধাতাগণ অসম্ভব আড়ম্বর ও বিলাসিতাপূর্ণ প্রাসাদোপম অট্টালিকা তৈয়ার করাইতে ছিলেন—

(৭) এই প্রসঙ্গে কিন্ড মার্শাল ম্যানষ্টাইন প্রণীত *Lost Victories* (পৃষ্ঠা ২৭৪-৭৫), জেনারেল গুডেরিয়ান প্রণীত 'Panzer Leader' (জ্যোৎস্না পরিচ্ছেদ) এবং স্যুয়েডবার্গের আদালতের মামলার গোয়েরিং ও কাইটেলের সাক্ষ্য স্বরূপ বা তদ্ব্য।

(৮) ডাক্টর সি ল্যাঙ্কার প্রণীত 'The Mind of Adolf Hitler' (The Secret Wartime Report) পুস্তক—Pan Books, 1974, London তদ্ব্য।

যদিও যুদ্ধ চালাইবার উপযুক্ত মালমশলার অভাব ঘটতে ছিল। কেউ কেউ বারুকিতার জন্তও প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন।

স্পীয়ার এই সমস্ত ঘটনার উপর মন্তব্য করিয়াছেন :

‘After only nine years of rule the leadership was so corrupt that even in the critical phase of the war it could not cut back on its luxurious style of living. For ‘representational reasons’ the leaders all needed big houses, hunting lodges, estates and palaces, many servants, a rich table, and a select wine cellar,’ (২)

যুদ্ধের দুর্দিনে এই সমস্ত অস্বস্তি বিলাসিতা ও আশ্চর্যপূর্ণ রাজসিক ব্যবস্থা ছাড়াও স্পীয়ার লিখিয়াছেন যে, দুর্নীতিপূরণ নাৎসী নেতারা যখন যেখানে ভ্রমণে যাইতেন সেখানেই নিজেদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার নাম করিয়া সাড়ে ষোলফুট পুরু কংক্রিটের ছাদ ও দেওয়ালের অসংখ্য শেলটার বা ভূগর্ভের আশ্রয় নির্মাণ করাইয়াছিলেন। একজ্ঞ অল্প অর্থব্যয় ও অল্প শ্রমিক নিয়োগ করিতে হইয়াছিল।..

\* \* \*

বাহ্যত ক্যাসিট শক্তিবর্গ যতই শক্তিশালী বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকুক না কেন, ভিতরে ভিতরে তাদের নৈতিক শক্তি (সাময়িক ও বৈষয়িক শক্তি ছাড়াও) পড়িয়া গিয়াছিল এবং তাদের নেতৃবর্গ দুর্নীতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অপরাধকে যিহ্নপূঞ্জের মধ্যে রাজনৈতিক মতভেদ থাকিলেও তাদের মধ্যে এই ধরনের দুর্নীতি ও চারিত্রিক পতন ছিল না। বিশেষতঃ সোভিয়েত রাষ্ট্র তো মহান দেশপ্রেমের যুদ্ধে যেন অগ্নিশিখা হইয়া উঠিতেছিল এবং সেটা আরও সম্ভব হইয়াছিল সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার জন্ত। যে ব্যবস্থার জন্ত একটা গোটা জাতির ‘নিহিত আত্মিক শক্তির’ জাগরণ ঘটাইয়াছিল—এই মন্তব্য করিয়াছেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি মার্শাল জুকোভ, তাঁর “স্মৃতিচারণ” গ্রন্থে। তিনি লিখিয়াছেন :

‘আমরা ক্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমাদের জয়কে সোভিয়েত জনগণের জীবনে নক্ষত্রোজ্জ্বল যুদ্ধের বলে বর্ণনা করিতে পারি। ঐ বছরগুলিতে আমরা ইস্পাতদৃঢ় হয়ে উঠেছিলাম এবং বিরাট নৈতিক পুঞ্জীকরণ করেছিলাম।’

অবশ্য একজ্ঞ সোভিয়েত ইউনিয়ন-ক অপরিমিত ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। আমেরিকার ভূখণ্ডে যখন একটিও বোমা পড়ে নাই কিংবা কোন কামানের গোলায় যখন একটি মাত্র শহরেরও ক্ষতি হয় নাই, তখন রাশিয়াকে ২ কোটি জীবন আহুতি দিতে এবং অসংখ্য শহর, জনপদ ও গ্রাম হারাইতে হইয়াছিল। আর জার্মানী ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমেরিকার মাত্র ১ লক্ষ ৫০ হাজার এবং গ্রেট ব্রিটেনের ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার মানুষের মৃত্যু হইয়াছিল।

কিন্তু তৎসঙ্গেও মার্শাল জুকোভ হিটলার-বিরোধী কোয়ালিশনের উচ্চ প্রশংসা



করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, সোভিয়েত জনগণ এই কোয়ালিশনের অজ্ঞাত সদস্যদের অবদানের কথা কখনও বিস্মৃত হন নাই (১০)

ইতিহাসের দিক থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এবং যুগান্তকারী ঘটনা সম্ভবতঃ দুইটি। প্রথমতঃ পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ও পারমাণবিক যুগের উদ্বোধন এবং দ্বিতীয়তঃ হিটলার ও ক্যাসিজম বিরোধী মহাজোট বা কোয়ালিশন, যার ফলে ক্যাসিষ্ট শক্তিশালী চূড়ান্ত পরাজয় কিংবা নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ।

যদিও পশ্চিমের মিত্রশক্তি মহলে সোভিয়েত বিরোধী এবং ক্যাসিষ্ট পক্ষপাতী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর অভাব ছিল না, তথাপি জনসাধারণের ও বুদ্ধিজীবী মহলের অধিকাংশই ছিল ক্যাসিজমের বিরুদ্ধবাদী ও সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষপাতী। তাঁরা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ক্যাসিষ্ট আগ্রসন জয়লাভ করিলে কেবল সার্বভৌম স্বাধীনতাই বিপর্যস্ত হইবে না, জাতীয় অস্তিত্বও বিপর্যস্ত হইবে এবং জনগণ চির-দাসত্ব গ্রহণে বাধ্য হইবে। সুতরাং ক্যাসিজমে বিরুদ্ধে বৃটেন, আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ার কিংবা চার্লিস-ক্লডেট-ষ্ট্যালিনের যে মহাজোট গড়িয়া উঠিল, তার মূলে ছিল জনসাধারণ, শ্রমিকশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবী আন্দায়ের প্রবল নৈতিক ও রাজনৈতিক চাপ। তা ছাড়া ক্যাসিষ্ট শক্তিপুঞ্জের পৃথিবীব্যাপী প্রভুত্ব স্থাপনের সামরিক দৃষ্টান্ত ছিলই। অদূরের আরও পরিহাস এই যে, পশ্চিমের যে সমস্ত ধনিক ও রাজনৈতিক মহল সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে হিটলার ও ক্যাসিজমকে ভোষণ ও পেংক করিতেছিলেন, তাঁদেরই দেশ হিটলার কর্তৃক সর্বাগ্রে আক্রান্ত হইল। জার্মান চাচিয়াছিল আগে পশ্চিমী শক্তিবর্গকে খতম করিতে এবং তারপর সোভিয়েত রাশিয়াকে সংহারপূর্বক জাপানের সঙ্গে একত্রে সারা পৃথিবী করায়ত্ত করিতে। যখন জার্মানী সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করিল, তার আগেই প্রায় সারা ইউরোপ হিটলারের কবলে আসিয়া গেল এবং তারপর জাপান প্রশান্ত মহাসাগরে ও এশিয়া খণ্ডে মার্কিন, বৃটিশ, ফরাসী ও ওলন্দাজ প্রভৃতি সাম্রাজ্য ও জাতীয় স্বার্থকে গ্রাস করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে আফ্রিকায় সুরেজখাল পর্যন্ত ইতালীয়-জার্মান বাহিনীর অগ্রগতিতে মিশর ও মধ্যপ্রাচ্য হাতছাড়া হইবার উপক্রম হইল। অপরপক্ষে লাতিন আমেরিকায় জার্মান ক্যাসিজমের অনুপ্রবেশ ও প্রভাব মার্কিন একচেটিয়া ধনিক-গোষ্ঠীকে উদ্বেগ করিয়া তুলিল। সোজা কথায় একদিকে পশ্চিমী শক্তিবর্গের জাতীয় স্বাধীনতা এবং অস্তিত্বকে তাদের খননাত্মক ও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ বিষম অগ্নিপরিষ্কার পড়িল। সুতরাং এই অবস্থায় সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত হাত মিলাইয়া সাধারণ শত্রু বা 'common enemy'কে প্রতিরোধ ও পরাজিত না করিয়া উপায় ছিল না। অতএব হিটলার বিরোধী কোয়ালিশনের অন্তর্গত দেশগুলিতে জনসাধারণ থেকে উপরের মহল পর্যন্ত প্রায় সর্বত্র ক্যাসিষ্ট শত্রুকে পরাজিত করার অধ্যম সফল দেখা দিল এবং বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে যেমন সামরিক ও রাজনৈতিক মৈত্রী ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হইল, তেমনি বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক

(১০) ক্লকোভের রচনা থেকে উদ্ধৃতি—সোভিয়েত সমীক্ষা, ১৯৭৫, ২২ সংখ্যা ব্রতব্য।

চুক্তিও সম্পাদিত হইল। ক্যাসীবিরোধী মহাজোটের অংশীদাররূপে ষ্ট্যালিন-চার্লিল-কক্সডেট কার্যঃ বিশ্বনেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন এবং পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার দ্বারা ক্যাসিষ্ট শক্তিপুঞ্জের পতন ঘটাইলেন। নাৎসী শক্তিবর্গের এই পরাজয়ের কেবল মিত্রপক্ষের সৈন্য বাহিনীরই নয়, পার্টিজান বা গেরিলা বোম্বারদের অকুতোভয় সংগ্রাম, অপূর্ব ত্যাগবীকার এবং জনগণের নির্ভাতন বরণও ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে। অবশ্য সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার করা উচিত যে, জার্মান সৈন্য বাহিনীও যুদ্ধের দিক থেকে অপূর্ব দক্ষতা, বীরত্ব, ত্যাগবীকার এবং কষ্টসহিষ্ণুতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে। বিশেষতঃ যুদ্ধের গোড়ার দিকে এই সমস্ত গুণ এবং জার্মান সামরিক সংগঠনের উৎকর্ষ ও যুদ্ধক্ষেত্রের বেটেননার্টি দুনিয়াব্যাপী যেমন নাটকীয় চমক সৃষ্টি করিয়াছিল—যদিও শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত বাহিনী যুদ্ধ-বিদ্যার দক্ষতার, রণকৌশলের বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগে এবং রণনীতির বিন্দুমাত্র নৈপুণ্যে আর সামরিক অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদনে নাৎসী জার্মানীকে বহুদূরপিছনে ফেলিয়া গিয়াছিল। ষ্ট্যালিনগ্রাদ থেকে বার্লিন পর্যন্ত বহু ঐতিহাসিক যুদ্ধক্ষেত্রে সোভিয়েত বাহিনী ও সেনানীমণ্ডলী মার্শাল ষ্ট্যালিন ও মার্শাল জুকোভ ও অন্যান্য মার্শালদের নেতৃত্বে অবর্ণনীয় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। অপরপক্ষে রুশ সামরিক শক্তি উত্তর আফ্রিকায় এল. হালামিয়েনের যুদ্ধে এবং তার আগে বুটেনের বশেশরকার সংগ্রামে, আর মার্কিন বাহিনীর প্রশান্ত মহাসাগরে ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রশংসনীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। বিশেষতঃ ইক-মার্কিন মহল সমুদ্র পারবর্তী অভিযানগুলিতে অসাধারণ সংগঠনশক্তির ঐতিহাসিক স্বাক্ষর রাখিয়াছেন। আর মার্কিন সরবরাহ-ব্যবস্থা সমুদ্র পারের সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া মিত্রপক্ষকে প্রভূত সহায়তা দিয়াছিল—যদিও বুটিশ নৌশক্তি ক্যাসিষ্ট আক্রমণে প্রচণ্ডভাবে ব্যথিত হইয়াছিল।

যদিও ক্যাসিবিরোধী মহাজোটের সমবেত চেষ্টার কলেই ক্যাসিষ্ট শক্তিপুঞ্জের চরম পরাজয় ঘটিয়াছে, তবু নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক মাজই স্বীকার করিবেন যে, এই মহাযুদ্ধে হিটলারী জার্মানী যেমন ছিল প্রধান শত্রু, তেমনি ষ্ট্যালিনের রাশিয়াই সেই শত্রুকে হনন করার মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। এই মহাযুদ্ধে রাশিয়ার দেশ-ক্ষেত্রের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রশক্তির প্রাধান্যও প্রমাণিত হইয়াছে এবং যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সোভিয়েত রাশিয়া আমেরিকার সঙ্গে শীর্ষস্থানীয় শক্তির আসন দখল করিয়াছে।

আন্তর্জাতিক জগতে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। মিত্রশক্তির অন্ততম মুখ্য অংশীদাররূপে চীনও বৃহৎ শক্তির মর্যাদা লাভ করিয়াছে এবং মহাযুদ্ধের কল্যাণে কিংবা জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য মাও সে-তুংয়ের নেতৃত্বে মহাচীনেও কমিউনিষ্ট বিপ্লব সহজতর হইয়াছে। প্রভূত মার্কিন সাহায্য সত্ত্বেও চীনের গৃহযুদ্ধে জেনারেল চিয়াং কাইসেকের ছুনীতি-দৃষ্ট গবর্নমেন্টের পরাজয় ও পতন স্বরাস্ত হইয়াছিল।

কেবল চীনেই বিপ্লব ঘটে নাই, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ক্যাসিষ্ট শক্তিপুঞ্জের পরাজয়ের কলে পুরাতন সাম্রাজ্যবাদ এবং ঔপনিবেশিকবাদেরও যেকদও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি সহ এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের পরাধীন দেশগুলির শৃঙ্খল ভাঙিয়া পড়িয়াছে এবং ভিতরৎনাম তথা ইন্দোচীনে বিপ্লব ঘটয়া গিয়াছে। কিন্তু রক্তপাত ও সংঘর্ষও প্রচুর হইয়াছে। যেমন, ১৯৪৭ সালে বৃটেনের সহিত আপোবে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের কলে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও হত্যাকাণ্ড ঘটয়া গিয়াছে এবং ভারত বিখণ্ডিত হওয়ার কলে স্বাধীন পাকিস্তানের উদ্ভব হইয়াছে।

\*

\*

\*

একথা নিঃসন্দেহ যে, হিটলার-মুসোলিনী-তোজোর বিরুদ্ধে ষ্ট্যালিন চার্চিল-রুজভেল্টের মহামৈত্রী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। তথাপি একথা ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয় যে, এই মহামৈত্রী সত্ত্বেও কোন পক্ষই তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ বিসর্জন দেন নাই এবং পশ্চিমী শক্তিবর্গ কমিউনিজমকেও খ্রীতির চক্ষে দেখেন নাই। এই সমস্ত রাজনৈতিক মতবিরোধের জন্তই ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলিতে অনেক বিলম্ব (১৯৪৪ সালের মধ্যভাগ) হইয়াছিল এবং তার জন্ত মহাযুদ্ধও অনেক বেশী দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল। (অবশ্য কোন কোন সমালোচকের মতে রুজভেল্ট কর্তৃক ক্যাসাব্রান্সা সম্মেলন থেকে অক্ষশক্তিবর্গের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ দাবী করার জন্তই জার্মানী ও জাপান শেষ পর্যন্ত লড়িয়াছিল। অত্বে আরাও আগে আত্মসমর্পণ ঘটিত। কিন্তু বিবয়টি বিতর্কমূলক এবং চার্চিলও এর সারবত্তা স্বীকার করিতেন না।)

মহাযুদ্ধ যতই উপসংহারের দিকে অগ্রসর হইতেছিল মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে রাজনৈতিক মতবিরোধও ততই তীব্র হইতেছিল এবং এপ্রিল মাসে রুজভেল্টের আকস্মিক মৃত্যুর পর এই বিরোধ কোয়ালিশনকে প্রায় ভাঙনের সীমানায় আনিয়া ফেলিয়াছিল। বিশেষভাবে পোল্যাণ্ড, বলকান রাজ্যগুলি, অস্ট্রিয়া এবং জার্মানী নিয়া বিরোধের অন্ত ছিল না। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে পূর্বদিকে জাপানকে নিয়াও রাশিয়ার সঙ্গে যথেষ্ট মন কষাকষি ও কূটনৈতিক চালবাজি দেখা দিয়াছিল। তথাপি জার্মানী ও জাপানের সরকারীভাবে আত্মসমর্পণের আগে মিত্রপক্ষের এই মহামৈত্রী অন্ততঃ বাহ্যতঃ কাগজ পত্রে অব্যাহত ছিল—যদিও মনে মনে তিন পক্ষের মধ্যে, এমন কি বৃটেন ও আমেরিকার মধ্যেও কোন কোন সাময়িক বিষয়ে (যেমন, ভূমধ্য-সাগর, পশ্চিম ইউরোপ ও জাপানের বিরুদ্ধে অভিযানে) অত্যন্ত মতান্তর ছিল।

বলা বাহুল্য যে, তিন বিশ্বনেতার মধ্যে কিংবা কোয়ালিশনের তিন প্রধান অংশী-দারদের মধ্যে উইনস্টোন চার্চিল ছিলেন সাম্রাজ্যাগ্রেমিক, তাঁর সমস্ত চেষ্টা ও লক্ষ্য ছিল ভারতসহ সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যকে বৃটিশ প্রভুত্বের অধীনে রাখা। এইজন্য সমস্ত রণনীতি-ও রণকৌশল তিনি সেদিকে পরিচালনা করার জন্ত তাঁর সর্বপ্রকার কূটনৈতিক বৃত্তি, অপূর্ব ব্যাপ্ততা এবং সাময়িক বিচার জ্ঞান সেদিকে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁর পান্টা দুর্ধর্ষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং বজ্রকঠোর স্বভাবের অধিকারী ছিলেন ষ্ট্যালিন—সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তা এতটুকু ছাড় হইতে দিতে কিংবা ক্যাসিজমকে কোন কল্পনা দেখাইতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। একজই

বলকান অঞ্চল ও পূর্ব ইউরোপ নিয়ন্ত্রা রাশিয়ার সঙ্গে এত বিরোধ গিয়াছে। কিন্তু যদি কোন প্রস্তাব ষ্ট্যালিনের বিবেচনার দ্বারসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত মনে হইত, তবে মার্কসবাদে তাঁর অটল বিশ্বাস সত্ত্বেও তিনি চার্লিস-কুজভেট বা পশ্চিমী মিত্রদের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসা করিতে বিন্দুমাত্র ষিধা করিতেন না এবং মিত্রপক্ষের বিপদের দিনে (১৯৪৪ ৪৫ সালের শীতকালে) নিজের অস্থিবিধা সত্ত্বেও আগাইয়া যাইতে পিছু-পা হইতেন না।

এই তিন বিশ্বনেতার মধ্যে প্রসিডেন্ট কুজভেট ছিলেন সর্বাপেক্ষা মাজিত, শিষ্টাচারসম্পন্ন এবং সুবিবেচক। সম্ভবতঃ সেদিনের বৃজ্জেরা আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ ‘জাতক’ ছিলেন কুজভেট। মহাযুদ্ধের ব্যাপকতা ও দশটের জন্ত বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনষ্টোন চার্চিলের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা ও অন্তরঙ্গতা গড়িয়া উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু মার্সাল ষ্ট্যালিনের প্রতি তাঁর মনে মনে গভীর অস্বরাগ ছিল। এমন কি, তিনি মনে করিতেন যে, চার্চিলের চেয়ে তিনি যদি একা ষ্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করেন (যেমন, তেহরান সম্মেলনে) তবে সমস্তার মীমাংসাপ্রাপ্তি অনেক বেশী সহজ ও ফলপ্রসূ হইতে পারে। একজন ষ্ট্যালিনের সঙ্গে একা সাক্ষাৎ করিতে তিনি খুব উদ্যমী ছিলেন এবং ষ্ট্যালিন ও চার্চিলের চেয়ে কুজভেটকে বেশী পছন্দ করিতেন। এর মূল কারণ ছিল এই যে, কুজভেট উপনিবেশবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন না, অধিকন্তু যুদ্ধের বিরোধী এবং বিশ্বশান্তির পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, ষ্ট্যালিন তথা সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে যদি সম্ভাব্য ও সখ্যতা বজায় রাখা যায়, তবে মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বিশ্বশান্তি রক্ষা করা সহজতর ও অধিকতর বাস্তবতাসম্মত হইবে। একজন মিত্রশক্তিবর্গকে নিয়ন্ত্রা যেমন তিনি ইউনাইটেড নেশন্স গঠনে উদ্যোগী ছিলেন, তেমনি ষ্ট্যালিনের সঙ্গে বন্ধুতা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে পূর্ব ইউরোপ বা বলকান সম্পর্কে রাশিয়াকে কিছু ‘কনশেনস’ দিতেও তাঁর আপত্তি ছিল না। ইরানটা সম্মেলনে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধবাহী সম্পর্কে ষ্ট্যালিনের সঙ্গে তাঁর ‘গোপন চুক্তি’ পরবর্তীকালে আমেরিকার তীব্র সমালোচনার কারণ হইয়াছিল—যেমন সমালোচনা হইয়াছিল পূর্ব ইউরোপীয় ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ন্ত্রা। কিন্তু এই সমস্ত সত্ত্বেও বলা যাইতে পারে যে, কুজভেট ও ষ্ট্যালিনের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর শান্তি রক্ষা বিষয়ে কল্যাণের ভিত্তিক ছিল। কিন্তু কুজভেটের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর পর আমেরিকার ট্রুম্যান এবং বৃটেনে চার্চিলের সোভিয়েত বিবেচনা ও বিরোধীতাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে ক্রমাগত ইরানটা ও পুটলডামের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ করিতে লাগিলেন। সুতরাং মহাযুদ্ধের পরবর্তী কাল থেকেই ঠাণ্ডা লড়াই বা ‘Cold War’-এর ব্যাপ্তি শুরু হইয়াছিল।

তথাপি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসে চার্চিল-কুজভেট-ষ্ট্যালিনের মহামিলন ও মহাজোট যে অবিস্মরণীয় অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে, আগামী শতাব্দী কাল পর্যন্ত তা পাঠকদের চিত্তে গভীর রেখাপাত করিবে।

কিন্তু তবু প্রশ্ন উঠিতে পারে—এই কোয়ালিশন টিকিল না কেন? এর জবাবও একজন মার্কিন প্রবন্ধকারের রচনা থেকে দেওয়া যাইতে পারে। অবশ্য এই লেখক

সোভিয়েত পক্ষপাতী নন। তিনি (ডব্লিউ এল নিউম্যান) লিখিয়াছিলেন যে, ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত আরো নতুন নয়, যখন বিপদের দিনে বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে কোয়ালিশন গঠিত হইয়াছিল, কিন্তু বিপদ কাটয়া যাওয়ার পর সেই কোয়ালিশনের অংশীদাররাই পরস্পরের মাথা কাটিতে প্রায় উদ্ভূত হইয়াছিল :

"The problems of coalitions are not new. Produced by fear of a common enemy, wartime unity has frequently turned to hostility and even warfare when that enemy is no longer dangerous "A drowning man traps at a serpent" said a nineteenth century Ottoman Sultan defending his alliance with his ancient Russian enemy in the face of an Egyptian invader. But when the drowning man succeeds in being rescued, he chooses his associates with care and may even join a crusade against serpents." (১১)

অতএব মিত্রশক্তির বা সোভিয়েত-বুটিন-মার্কিন মহামৈত্রী ভাঙ্গিয়া যাওয়া ইতিহাসে কোন অঘটন ব্যাপার নয়। কিন্তু ভবিষ্যতের পক্ষে অত্যন্ত বিপদজনক ব্যাপার। কারণ, মহাযুদ্ধ অবসানের গত ৩০।৩২ বছরের মধ্যে বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে পারমাণবিক ও অস্ত্রাস্ত্র প্রলয়ঙ্কর অস্ত্র নির্মান ও গুদামজাত করার যে ভয়ঙ্কর প্রতিযোগিতা দেখা দিয়াছে, পৃথিবীর সমস্ত চিন্তাশীল ও শান্তিকামী ব্যক্তি সে জগু নিদারুণ উৎকণ্ঠিত। সমরাস্ত্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিজ্ঞা এমন স্তরে পৌঁছিয়াছে এবং কল্পনাভীত বিক্ষোভে শক্তিসম্পন্ন এত বিভিন্ন মারণাস্ত্র তৈয়ার হইতেছে যে, ভূতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হইলে সমগ্র মনুষ্যজাতি, এমন কি সমগ্র জীবজগৎ ধ্বংস হইয়া যাইবে। তবে, সম্ভবতঃ একমাত্র সত্য—এই যে, সেই মহাশয়শানে কাঁদিবার কিংবা 'বংশে প্রদীপ জালিবার' মত কেউ আর বাঁচিয়া থাকিবে না! সুতরাং সেই ভয়ঙ্কর পরিণাম থেকে সমগ্র সভ্যতা ও সমগ্র মনুষ্যজাতিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর সর্বত্র সমস্ত দেশেব জনগণের উচিত যুদ্ধ ও আগ্রাসন নিবারণ এবং বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ব রক্ষা করার জগু নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা করা।

(১১) After Victory—Willian L. Neumann, Harpor-Row, New York, 1969. p. 188

সমাপ্ত

## মহাযুদ্ধের দিনগণী

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী কয়েকটি ঐতিহাসিক তারিখ

১৯১৪

৩ আগস্ট প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ ।

—জার্মানী ওর্তক বেলজিয়ম আক্রমণ ।

১৯১৮

১১ নভেম্বর জার্মানীর পরাজয় ও যুদ্ধ বিরতির চুক্তি স্বাক্ষর ।

১৯১৯

২৮ জুন জার্মানীর সহিত ভাস'ই সন্ধি স্বাক্ষর ।

১৯২১

• ২৮ জুলাই হিটলার ক্রাশনাল সোসিয়েলিষ্ট জার্মান ওয়ার্কাস' পার্টির প্রথম চেয়ারম্যান নিযুক্ত ।

১৯২২

২৬ অক্টোবর ক্যাসিষ্ট মুসোলিনীর রোম 'অভিযান' ।

১৯২৩

১১ জানুয়ারী ক্রাশ ও বেলজিয়ম কর্তৃক জার্মানীর রুড অঞ্চল দখল ।

১৯২৪

১ ফেব্রুয়ারী বুটেন কর্তৃক সোভিয়েত গবর্নমেন্টকে স্বীকৃতি দান ।

১৯২৭

২৩ অক্টোবর ট্যালিন কর্তৃক টুইঙ্কি ও জিনোভিয়েফের বহিষ্কার ।

১৯২৯

২৩ অক্টোবর ওয়াল ট্রাট ষ্টক মার্কেটের পতন । পৃথিবী ব্যাপী বাজার মন্দার শুরু ।

১৯৩০

২২ এপ্রিল জাপান, বুটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নৌ-চুক্তি ।

৩০ জুন রাইনল্যান্ড পরিত্যাগ ।

১৯৩১

১৯ সেপ্টেম্বর জাপান কর্তৃক মাকুরিয়া আক্রমণ ।

২১ সেপ্টেম্বর বুটেনের স্বর্ণমান পরিত্যাগ ।

১৯৩২

২৫ ফেব্রুয়ারী হিটলার কর্তৃক জার্মানীর নাগরিকত্ব লাভ ।

৮ নভেম্বর কক্সডেন্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত ।

১৯৩৩

৩০ জানুয়ারী হিটলার জার্মানীর চ্যান্সেলার পদে নিযুক্ত ।

২৭ ফেব্রুয়ারী—রাইখট্যাগে অগ্নিকাণ্ড । কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে জাস হুট ।

বিরোধীদের দমন আরম্ভ ।

২৮ ফেব্রুয়ারী—ভেইমার সংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলি জরুরী অবস্থায় অজুহাতে স্থগিত।

১৬ মার্চ—গারেবেলস্ প্রোপাগাণ্ডা মন্ত্রী নিযুক্ত।

২৭ মার্চ—জাপান কর্তৃক লীগ অব নেশন্স পরিত্যাগ ঘোষণা।

১লা এপ্রিল—ইহুদীদের বিরুদ্ধে জাতিগত ভাবে বর্জন আন্দোলন আরম্ভ।

১৪ অক্টোবর—হিটলার কর্তৃক জার্মানীর বিশ্বরাষ্ট্র সংঘ পরিত্যাগ ঘোষণা।

২৪ নভেম্বর—সমস্ত বিরোধীদলকে টেরোরিজমের দ্বারা হুমকির অবাধ অধিকার অর্পণ পুলিশের বড় কর্তা হিমলারের উপর।

১৯৩৪

২৬ জানুয়ারী—জার্মানী ও পোল্যান্ডের মধ্যে ১০ বছরের জন্য অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত।

৩০ জুন—হিটলারের ‘রক্তস্নান’—ক্যাপ্টেন রোয়েম প্রমুখ আটকাবাহিনীর প্রধান-গণকে ও অন্যান্য পদস্থ জার্মানদেরকে হত্যা।

১৯৩৪

২৫ জুলাই—অস্ট্রিয়ার চ্যাকেলর ডলফাসকে হত্যা।

২ আগস্ট—প্রেসিডেন্ট কন্‌ মার্শাল হিগেনবুর্গের মৃত্যু।

হিটলার কর্তৃক নিজেকে জার্মানীর রাষ্ট্রপতিরূপে ঘোষণা।

১৮ সেপ্টেম্বর—সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক বিশ্বরাষ্ট্র সংঘে যোগদান।

১৯৩৫

১৬ মার্চ—জার্মানী কর্তৃক ভার্সাই-সন্ধিজনপূর্বক বাধ্যতামূলক সামরিক বৃদ্ধি প্রবর্তন।

১৮ জুন—বুটেনের সহিত জার্মানীর নৌ-চুক্তি।

৩ অক্টোবর—মুসোলিনী কর্তৃক আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া) আক্রমণ।

১৯৩৬

৭ মার্চ—হিটলার কর্তৃক লোকার্নো চুক্তি বাতিল এবং জার্মান সৈন্তের রাইন-ল্যান্ড দখল।

১১ জুলাই—জার্মানী কর্তৃক অস্ট্রিয়ার সার্বভৌমত্ব স্বীকার এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি।

১৭ জুলাই—স্পেনে জেনারেল ফ্রান্সো কর্তৃক গৃহযুদ্ধ আরম্ভ।

২৫-২৭ অক্টোবর—ইতালীর জার্মান অক্ষমতা চুক্তি ঘোষণা।

১৮ নভেম্বর—জার্মানী ও ইটালী কর্তৃক ফ্রান্সের সামরিক ক্ষমতাকে স্পেনের গবর্নমেন্ট হিসাবে স্বীকৃতি।

২৫ নভেম্বর—জাপানের সঙ্গে জার্মানীর অ্যান্টি-কোমিটার্ন চুক্তি স্বাক্ষর।

বিমহা (৩)—১৯

[১৯১৬-১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার টেরর সৃষ্টি এবং অসংখ্য কমিউনিষ্ট কর্মী, নেতা ও সমর নেতাদের 'বিচার' ও প্রাণদণ্ড।]

১৯৩৭

২৭ ফেব্রুয়ারী—ব্রিটিশ অস্ত্রসজ্জার পরিকল্পনা।

৭ জুলাই—পিপিংয়ের মার্কো পলো ব্রীজে চীন-জাপানের সংঘর্ষের ছুতায় ২৭ জুলাই থেকে বন্ধাবদ্ধ।

৭ সেপ্টেম্বর—ভার্সাই সন্ধি মৃত্ত বলিয়া হিটলারের ঘোষণা।

১৩ অক্টোবর—বেলজিয়মের ভৌমিক অক্ষুণ্ণতা বজায় রাখার জন্য জার্মানীর প্রতিশ্রুতি।

৫ নভেম্বর—হিটলার কর্তৃক উচ্চতম নেতাদের গোপন বৈঠকে ইউরোপে জোর-পূর্বক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা।

৬ নভেম্বর—কমিউটার বিরোধী চুক্তিতে ইতালীর যোগদান।

১১ ডিসেম্বর—ইতালী কর্তৃক বিশ্বরাষ্ট্র সংঘ পরিত্যাগ।

১৯৩৮

৪ ফেব্রুয়ারী—হিটলার কর্তৃক জার্মান হাই কমান্ডের রদবদল।

১২ ফেব্রুয়ারী—অস্ট্রিয়ার চ্যাকেলর অশ্বনিগকে বার্সেটসগ্যাডেনে আনয়ন ও চরমপত্র দান।

১৫ ফেব্রুয়ারী—অস্ট্রিয়ার বশুতা স্বীকার।

১২ মার্চ—অস্ট্রিয়াকে জার্মান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং হিটলারী বাহিনী কর্তৃক অস্ট্রিয়া দখল।

১৭ মার্চ—নাৎসী আগ্রাসনে বাধা দেওয়ার জন্য সোভিয়েত কর্তৃক সম্মেলনের প্রস্তাব।

২৪ এপ্রিল—চেকোস্লভাকিয়ার সুদেভেন জার্মানদের নেতা হেনলেইন কর্তৃক সুদেভেন জার্মানদের স্বায়ত্ত্ব শাসন দাবী।

১৫ সেপ্টেম্বর—চেকারলেনের বিমানযোগে বার্সেটসগ্যাডেনে গমন, হেনলেইন কর্তৃক সুদেভেন ল্যাণ্ড জার্মানীর সঙ্গে মিলনের দাবী।

২২ সেপ্টেম্বর—চেকারলেন দ্বিতীয় বার হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য গডেসবার্গে উড়িয়া গেলেন।

২৫শে সেপ্টেম্বর—সমগ্র যন্ত্রপাতি ও কারখানাসহ সুদেভেন প্রদেশ জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করার দাবী চেকোস্লভাকিয়া কর্তৃক অগ্রাহ্য।

২৬শে সেপ্টেম্বর—প্রেসিডেন্ট কলডউইল কর্তৃক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য হিটলার ও প্রেসিডেন্ট বেনেসের নিকট আবেদন।

২৯-৩০ সেপ্টেম্বর—মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষর। হিটলার, মুসোলিনি, চেকারলেন, দালাদিয়ের একত্রে মিলে চেকোস্লভাকিয়াকে চাপ দিলেন জার্মানীকে সুদেভেনল্যাণ্ড অর্পণের জন্য। মিউনিক চুক্তির নিকট চেকোস্লভাকিয়ার নতি স্বীকার।



১ অক্টোবর—জার্মান সৈন্যদের সুইডেনল্যান্ড প্রবেশ ও চেকোস্লভাকিয়া দখলীকরণ।

১২ নভেম্বর—জার্মানীতে ইহুদীবিরোধী ভয়ানক কড়া আইন ও নিষেধাবিধি প্রবর্তন এবং ইহুদীদের উপর নির্যাতন।

১৯৩২

১০ মার্চ—মিউনিখের পর ষ্ট্যালিন কর্তৃক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা পর্যালোচনা।

১৫ মার্চ—চেকোস্লভাকিয়া আক্রান্ত ও জার্মান সৈন্যদের প্রাণে প্রবেশ।

১৬ মার্চ—বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া হিটলার কর্তৃক জার্মানীতে আশ্রিত রাজ্যে পরিণত।

স্লোভাকিয়াও জার্মানীর অধীন গেল।

২০ মার্চ—ন্যাংসী আগ্রাসন প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক ইক-করাসী শক্তিবর্গের নিকট সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব।

২৭ মার্চ—ফ্রান্সের স্পেন কমিউটার বিরোধী প্যাক্টে যোগ দিল।

২৮ মার্চ—স্পেনের গৃহযুদ্ধে জেনারেল ফ্রান্সো কর্তৃক রাজধানী মাদ্রিদ দখল।

৩১শে মার্চ বৃটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক পোল্যান্ডের পূর্ণ স্বাধীনতার গ্যারান্টি দান।

৭ এপ্রিল—ইতালী কর্তৃক আলবানিয়া দখল।

১৪ এপ্রিল—প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কর্তৃক হিটলার ও মুসোলিনীর নিকট একটি ব্যক্তিগত আবেদন প্রেরণ অপরের দেশ আক্রমণ না করার জন্য।

১৭ এপ্রিল—লিটভিনোফের শাস্তি পরিকল্পনা চেম্বারলেন কর্তৃক অগ্রাহ্য।

২৮ এপ্রিল হিটলাব কর্তৃক পোলিশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি বাতিল।

৪ মে—লিটভিনোফের স্থলে মলোটোভ সোভিয়েত পররাষ্ট্র মন্ত্রী নিযুক্ত।

২২ মে—জার্মানী ও ইতালীর মধ্যে সামরিক মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষর।

১২ জুন—রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনার জন্য লণ্ডন থেকে মিঃ স্ট্যান্‌য়ের মস্কো যাত্রা।

২ জুলাই—রাশিয়ার সঙ্গে বৃটেনের সামরিক মৈত্রী স্থাপনের জন্য চার্লস পুনরায় জোর দিলেন।

৫ আগস্ট—সোভিয়েতের অল্পরোধে ইউরোপে শাস্তিরক্ষা ও আগ্রাসনে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আলোচনার জন্য একটি ইক-করাসী মিলিটারি মিশনের মস্কো যাত্রা।

ইক-করাসী-রুশ আলোচনার অতি মন্থ গতি।

১০ আগস্ট—হিটলার কর্তৃক জার্মানীকে ডানিগগ ফেরৎ দেওয়ার জন্য পোল্যান্ডের নিকট দাবী।

২০ আগস্ট—ষ্ট্যালিনের নিকট হিটলারের টেলিগ্রাম।

২২ আগস্ট—ইক-করাসী কর্তৃক পোল্যান্ডকে প্রতিশ্রুতি দানের পুনরাবৃত্তি।

—চেম্বারলেন কর্তৃক পোলিশ বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসার জন্য হিটলারের নিকট আবেদন।

- ২৩ আগষ্ট—সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণচুক্তি স্বাক্ষরিত।  
( জার্মানী কর্তৃক পোল্যান্ড আক্রান্ত হইলে রাশিয়াও একটা অংশ দখল করিবে, এই মর্মে এক গোপন চুক্তি। )
- ২৪ আগষ্ট—প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কর্তৃক হিটলারের নিকট পুনরায় শান্তিপূর্ণ মীমাংসার আবেদন।
- ৩০ আগষ্ট—রিবেণ্ট্রপ কর্তৃক পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে জার্মানীর দাবীর পুনরাবৃত্তিকরণ—বৃটিশ রাষ্ট্রদূতের নিকট।
- ৩১ আগষ্ট—পোলিশ সমস্তার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য হিটলারের নিকট পোলিশ রাষ্ট্রদূতের সম্মতি জ্ঞাপন।

### দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ

১৯৩৯

- ১ সেপ্টেম্বর—জার্মানী কর্তৃক পোল্যান্ড আক্রমণ।
- ৩ সেপ্টেম্বর—বুটেন ও ক্রাঙ্গ কর্তৃক জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।
- ১-২ সেপ্টেম্বর—জার্মান সৈন্যদের কবলে পশ্চিম পোল্যান্ড।
- ১৭ সেপ্টেম্বর—জার্মানদের ব্রেট-লিটোভস্ক প্রবেশ এবং রাশিয়ান সৈন্যদের পূর্ব পোল্যান্ড আক্রমণ।
- ২৮ সেপ্টেম্বর—ওয়ারশ'র আত্মসমর্পণ।  
রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে পোল্যান্ডের পার্টিশ'ন।
- ১৪ অক্টোবর—স্বাপাক্সোতে বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ রয়েল ওক্ নিমজ্জিত।
- ৩০ নভেম্বর—রাশিয়া কর্তৃক কিনল্যান্ড আক্রমণ।
- ১৩ ডিসেম্বর—জার্মান পকেট ব্যাটলিশিপ্ গ্রাক স্পীর রোমাঞ্চকর নৌযুদ্ধ ( দক্ষিণ আমেরিকা )। এবং
- ১৭ ডিসেম্বর মণ্টেভিডো বন্দরে আত্মনিমজ্জন ও ক্যাপ্টেন ল্যান্সডকের আত্মহত্যা।

১৯৪০

- ১২ মার্চ—রাশিয়া ও কিনল্যান্ডের মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর।
- ৯ এপ্রিল—ন্যাৎসী জার্মানীর ডেনমার্ক ও নরওয়ে আক্রমণ।
- ২ মে—মিডলপকের স্ত্রামস্ পরিভ্রাণ।
- ১০ মে—জার্মানী কর্তৃক হল্যান্ড, বেলজিয়ম ও লাক্সেমবুর্গ আক্রমণ।  
—বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনের পরভ্রাণ।  
—বুটেনের প্রধানমন্ত্রী পদে উইনষ্টোন চার্চিল।
- ১২ মে—জার্মান বাহিনীর ক্রাঙ্গের সীমা অভিক্রম।
- ১৫ মে—ওলন্দাজ ( ডাচ ) বাহিনীর আত্মসমর্পণ।
- ১৬ মে—সেডানে ফরাসী বাহিন্য এবং জার্মানদের দ্রুত অগ্রগতি।
- ২৮ মে—বেলজিয়মের রাজা বিওপোলের আত্মসমর্পণ।

- ২৬ মে-৯ জুন—ডানকার্ক থেকে বৃটিশ বাহিনীর পরিভ্রমণ ও পলায়ন।
- ১০ জুন—মুসোলিনী কর্তৃক বৃটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।
- ১৪ জুন—জার্মান বাহিনীর অরক্ষিত প্যারিসে প্রবেশ।
- ১৭ জুন পেতা কর্তৃক ফ্রান্সে-জার্মান যুদ্ধবিরতি প্রার্থনা এবং ২২ জুন স্বাক্ষর।
- ২২ জুন—কম্পেইন অরণ্যে ফ্রান্স ও জার্মানী কর্তৃক যুদ্ধবিরতির চুক্তি স্বাক্ষর।
- ১৭-২৩ জুন—রাশিয়া কর্তৃক বার্লিনে রাজ্যগুলি দখল।
- ২৭-৩০ জুন রাশিয়া কর্তৃক বেসারাবিয়া এবং উত্তর বাকুভিনা দখল।
- ৩ জুলাই—ওরান বন্দরে বৃটিশ কর্তৃক করাচী বৃহৎ যুদ্ধ জাহাজসমূহ আক্রমণ।
- ১০ জুলাই—বৃটেনের বিরুদ্ধে জার্মান বিমান অভিযান বা 'ব্যাটল অব বৃটেন' আরম্ভ।
- ৩ সেপ্টেম্বর—রাজ্য ক্যাবল কর্তৃক কমান্ডার সিংহাসন ত্যাগ।
- ৭ সেপ্টেম্বর—লণ্ডনের বিরুদ্ধে জার্মানীর প্রথম ব্যাপক বিমান অভিযান। জার্মানী কর্তৃক কমান্ডার তৈলখনি দখল।
- ১৩-১৬ সেপ্টেম্বর—ইতালীয় বাহিনীর মিশর সীমান্ত অতিক্রম এবং গিদিবারানী দখল।
- ২৭ সেপ্টেম্বর—জার্মানী-ইতালী-জাপানের মধ্যে দশ বছরের জন্য জিপাঙ্কিক চুক্তি স্বাক্ষর।
- ২৮ অক্টোবর—ইতালীর গ্রীস আক্রমণ।
- ১১ নভেম্বর—টরেন্টো বন্দরে বৃটিশ আক্রমণে ইতালীয় নৌ বহর প্রচণ্ড রকমে পত্ন।
- ১২-১৪ নভেম্বর—মলোটোভ কর্তৃক বার্লিন পরিদর্শন।
- ১৪-১৬ নভেম্বর—কেভেলিতে জার্মান বিমান আক্রমণ।
- ৯ ডিসেম্বর—উত্তর আফ্রিকার অষ্টম বাহিনীর আক্রমণ শুরু।
- ১৮ ডিসেম্বর—হটেলার কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণের জন্য বার্বারোসা পরিকল্পনা চূড়ান্ত অঙ্গমোহন।

১৯৪১

- ৩ জানুয়ারী—উত্তর আফ্রিকার ইতালীয়দের ব দ্বিধা পরিভ্রমণ।
- ৬ জানুয়ারী—ক্রিসেন্টে ককডেন্ট কর্তৃক 'চতুর্বিধ স্বাধীনতা' ঘোষণা।
- ১৮ জানুয়ারী—পতীর রাজ্যে ছদ্মবেশে সূতাবচক্র বস্তুর কলিকাতা ত্যাগ এবং কাবুল ও মক্কা হইয়া মার্চ মাসে বার্লিনে উপস্থিত।
- ৩০ জানুয়ারী—অষ্টম আর্মির বেলাজী অভিযান ও তৎকাল বন্দর দখল।
- ৫ ফেব্রুয়ারী—বেলাজী বন্দর দখল।
- ১১ মার্চ—ককডেন্ট কর্তৃক লেও লীজ (কর্জ-ইকারা) বিল স্বাক্ষর।
- ২৭ মার্চ—মুগোয়াভিয়ার বিপ্লব।
- ২৮ মার্চ—মাতাপান অন্তরীপের যুদ্ধ।
- ৩১ মার্চ—উত্তর আফ্রিকার জার্মানীর পান্টা-আক্রমণ আরম্ভ।

- ৫ এপ্রিল—সোভিয়েত-যুগোস্লাভ অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর।
- ৬ এপ্রিল—জার্মানী কর্তৃক গ্রীস ও যুগোস্লাভিয়া আক্রমণ।  
—গ্রীসে ব্রিটিশ কর্তৃক ৬০ হাজার সৈন্য প্রেরণ।
- ৭ এপ্রিল—বৃটিশ পক্ষের বেজাকী পরিভ্যাগ।
- ১৩ এপ্রিল—সোভিয়েত-জাপান আক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত।  
—জার্মানদের হাতে তোক্কো, বট্টিভ এবং বাদিয়া পুনর্দখল।
- ২২ এপ্রিল—বৃটিশ কর্তৃক গ্রীস পরিভ্যাগ আরম্ভ।
- ৬ মে—সোভিয়েত সরকারের প্রধানের পদে ষ্ট্যালিন, মলোভোভ পররাষ্ট্র মন্ত্রী।
- ১০ মে—রুডলফ হেস কর্তৃক স্টল্যাণ্ডে অবতরণ।
- ২০ মে—জার্মানী কর্তৃক ক্রীট দ্বীপ আক্রমণ।
- ২৮ মে—২ জুন—বুটেনের ক্রীট দ্বীপ পরিভ্যাগ।
- ৩১ মে—বৃটিশ কর্তৃক ইরাকে বিদ্রোহ দমন (২রা থেকে আরম্ভ)।
- ৮ জুন—মিত্র বাহিনীর গিরিয়া প্রবেশ।
- ১৪ জুন—জার্মানী কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণ আসন্ন—তাস কর্তৃক বিশেষ ইস্তাহারে অস্বীকার।
- ২২ জুন—জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ।
- ২৮ জুন—মিনস্ক, লিথুয়ানিয়া, ল্যাটভিয়া ও পশ্চিম উক্রাইন জার্মানীর দখলে।
- ৩ জুলাই—ষ্ট্যালিন কর্তৃক সোভিয়েত জনগণের নিকট বেতার বক্তৃতা।
- ১২ জুলাই—বৃটিশ-সোভিয়েত পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি স্বাক্ষর।
- ১৬ জুলাই—মস্কোর অভিমুখে জার্মানদের শলেনস্ক শহর দখল।
- ৩০ জুলাই—রুজভেল্টের প্রতিনিধি হারি হপকিন্সের মস্কো উপস্থিতি।
- ১৪ আগস্ট—অভ্যুত্থান সনদে স্বাক্ষর।  
—রুজভেল্ট-চার্লিস সয়ুজবসকে মিলন ও যুদ্ধের উদ্দেশ্যে ঘোষণা।
- ১৭ আগস্ট—জার্মানদের উক্রাইনে অগ্রগতি ও নিম্নোপদ্রোহ দখল।
- ২৫ আগস্ট—বৃটিশ ও রুশ বাহিনীর ইরান দখল।
- ৩০ আগস্ট—লেনিনগ্রাদের শেষ রেলপথের সংযোগ জার্মানীর দখলে।
- ৮ সেপ্টেম্বর—ভূমিপথে লেনিনগ্রাদ সম্পূর্ণ বেষ্টিত।
- ১৭ সেপ্টেম্বর—কিরেভ জার্মানীর দখলে।  
—বিশাল রুশবাহিনী বেষ্টিত।
- ২২ সেপ্টেম্বর—মস্কোতে বীভারত্বক ও হ্যাংগ্যান-এর উপস্থিতি।
- ৩০ সেপ্টেম্বর—জার্মানীর মস্কো আক্রমণ আরম্ভ।
- ৬-১২ অক্টোবর—মস্কোর পশ্চিমে লালকোজের বৃহৎ অংশ বেষ্টিত।
- ১১ অক্টোবর—জেনারেল হিডেলি ভোলো জাপানের প্রধানমন্ত্রী পদে।
- ১৪-১৬ অক্টোবর—মস্কোর দিকে জার্মানদের আরও অগ্রগতি।
- ১৬ অক্টোবর—মস্কোতে নাগরিকদের মধ্যে জ্বাল।
- জার্মান-রুশবাহিনী কর্তৃক ওডেসা দখল দখল।

- ২০ অক্টোবর—মস্কোতে অবরোধ ঘোষণা।
  - ২৭ অক্টোবর—জার্মানদের দখলে খারকোভ
  - ২৫ অক্টোবর—মস্কোতে জার্মানীর প্রথম অভিযান ব্যর্থ।
  - ৩০ অক্টোবর—সেবাস্তোপোল দুর্গের ২ মাস ব্যাপী অবরোধ আরম্ভ।
  - ৬-৭ নভেম্বর—জাতীয়তাবাদের উদ্দীপনামূলক ট্যাগিনের ‘পবিত্র রাশিয়া’ সংক্রান্ত ২টি বক্তৃতা।
  - ৯ নভেম্বর—লেনিনগ্রাদ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন
  - ১২ নভেম্বর—বুটেনের স্তব্ধ যুদ্ধজাহাজ আর্ক বয়েল নিমজ্জিত।
  - ১৬ নভেম্বর—মস্কোর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় জার্মান অভিযান আরম্ভ।
  - ১৮ নভেম্বর—লিবিয়াতে (পশ্চিম মরুভূমি) অষ্টম বাহিনীর অভিযান আরম্ভ।
  - ১৯ নভেম্বর—জার্মানীর দখলে রটোভ বন্দর।
  - ২০ নভেম্বর—রুশ কর্তৃক রটোভ পুনর্দখল।
  - ৬ ডিসেম্বর—মস্কোতে রুশ বাহিনীর পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ।
  - ৭ ডিসেম্বর—জাপান কর্তৃক পার্লামেন্টের আক্রমণ  
—প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধেব আরম্ভ।
  - ৮ ডিসেম্বর—জাপানের বিরুদ্ধে বুটেন ও আমেরিকার যুদ্ধ ঘোষণা।  
—গুয়াম, মিডওয়ে, ফিলিপিন্স, হংকং ও মালয়ে জাপানী বোম্বার্ড আক্রমণ।
  - ২ ডিসেম্বর—লুকনে জাপানীদের অবতরণ  
—রুশদের টিকভিন দখল এবং লেনিনগ্রাদের আত্মরক্ষা।
  - ১০ ডিসেম্বর—বুটেনের বিখ্যাত যুদ্ধজাহাজ প্রিন্স অব ওয়েলস্ জাপানীদের আক্রমণে নিমজ্জিত।
  - ১০-১১ ডিসেম্বর—জার্মানী ও ইটালী কর্তৃক আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং মার্কিন কর্তৃক পাল্টা ঘোষণা।
  - ২৪ ডিসেম্বর—বুটেন কর্তৃক বেঙ্গালী পুনর্দখল।
  - ২৫ ডিসেম্বর—হংকংয়ের আত্মসমর্পণ।
- ১৯৪২—
- ১লা জানুয়ারী—২১টি জাতি কর্তৃক ইউনাইটেড নেশন্স এর ঘোষণা স্বাক্ষর।
  - ১০ জানুয়ারী—জাপান কর্তৃক ওন্দোজ দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ।
  - ২১ জানুয়ারী—উত্তর আফ্রিকার পশ্চিম মরুভূমিতে জার্মানীর পাল্টা অভিযান।
  - ২৮ জানুয়ারী—জার্মানী কর্তৃক বেঙ্গালী পুনর্দখল।
  - ১৫ ফেব্রুয়ারী—জাপানীদের নিকট সিঙ্গাপুরের আত্মসমর্পণ।
  - ১০ মার্চ—রেডুনের পতন।
  - ২ এপ্রিল—বাভানের আত্মসমর্পণ।
  - ১ মে—মাস্কাগনের পতন।
  - ৬ মে—কোরিকিউরের আত্মসমর্পণ।

২৭ মে—বারকোভ অঞ্চলে রুশ পান্টা আক্রমণের জবাবে জার্মানীর পান্টা-আক্রমণ ও রুশদের পরাজয়।

২৬ মে—মলোটোভ কর্তৃক লণ্ডনে ইঙ্গ-সোভিয়েত মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষর এবং ওয়াশিংটনে গমন।

—পশ্চিম ফ্রন্টমিতে রোমেলের পুনরায় অভিযান শুরু।

৩০ মে—কলোনে হাজার ব্রিটিশ বোম্বার্ডার হানা।

৩ জুন—মিডওয়ে দ্বীপের বুদ্ধিরাজ্য।

১১ জুন—দ্বিতীয় রণাঙ্গন সংক্রান্ত ইস্তাহার প্রকাশ।

১২ জুন—ব্রিটিশের মিশর সীমানা পর্যন্ত পশ্চাদপসরণ।

২১ জুন—রোমেল কর্তৃক তোক্কর দখল।

২৫-২৭ জুন—চার্চিল-রুজভেল্টের মধ্যে দ্বিতীয় ওয়াশিংটন সম্মেলন।

২৮ জুন—অষ্টম বাহিনীর এল আলামিনে পশ্চাদপসরণ।

—দক্ষিণ রাশিয়ার জার্মানীর প্রচণ্ড অভিযান আরম্ভ।

৩ জুলাই—সেবাস্তোপোলের পতন।

২৮ জুলাই—জার্মানদের রট্টোভ পুনর্দখল।

৩০ জুলাই—‘আর এক পা পিছু হটা চলবে না’—লালকোর্ভের প্রতি ট্যালিনের কড়া নির্দেশ।

৭ আগষ্ট—গুয়াডাল ক্যানালে মার্কিনীদের অবতরণ।

১২-১৫ আগষ্ট—মস্কোতে চার্চিল-হ্যাট্টিংসন ও ট্যালিনের বৈঠক।

১৩ আগষ্ট—ডিরেপ’রে হানা।

২৩ আগষ্ট—বুখ ডেডপূর্বক জার্মানদের ট্যালিনগ্রাদের উত্তরে প্রবেশ।

—ট্যালিনগ্রাদে জার্মান বিমান আক্রমণে ৩০ হাজার নিহত।

২৫ আগষ্ট—গ্রোজনি ও বাকু তৈলখনির পথে জার্মান অগ্রগতি রুদ্ধ।

৩ সেপ্টেম্বর—ভলগার তীরে দক্ষিণ ট্যালিনগ্রাদে জার্মানদের প্রবেশ।

২৪ সেপ্টেম্বর—মধ্য ট্যালিনগ্রাদের অধিকাংশ জার্মানদের দখলে।

২৩ অক্টোবর—এল আলামিনের যুদ্ধ আরম্ভ—মন্টগোমারীর আক্রমণ রোমেলের বিরুদ্ধে।

৪ নভেম্বর—রোমেল কর্তৃক পূর্ণ পশ্চাদপসরণ।

৮ নভেম্বর—ইঙ্গ-মার্কিন মিত্র বাহিনীর করাসী উত্তর আফ্রিকার অবতরণ।

১৩ নভেম্বর—ট্যালিনগ্রাদে লালকোর্ভের পান্টা আক্রমণ আরম্ভ।

২২ নভেম্বর—ডিন লক্ষাধিক জার্মান সৈন্য ট্যালিনগ্রাদে বোম্বিট।

১২-২৩ ডিসেম্বর—ট্যালিনগ্রাদের অবরুদ্ধ জার্মানবাহিনীর জাপের লন্ডন জেনারেল ম্যানটাইনের বর্ণনা আক্রমণ।

২১ ডিসেম্বর—অষ্টম বাহিনীর বেকাজী দখল।

২৪ ডিসেম্বর—উত্তর আফ্রিকার করাসী প্রধান রাষ্ট্রনায়ক গ্যাডফিরাল দারদ’। আততায়ীর হস্তে নিহত।

১৩৫৩

- ২ জাহুয়ারী—জার্মান বাহিনীর ককেশাস পরিভ্রমণ শুরু।
- ১৪ জাহুয়ারী—ক্যাসাব্লাঙ্কা সম্মেলন (চার্চিল-রুজভেল্ট) আরম্ভ—২৩ শেষ।  
—জেনারেল স্তগলের শক্তি সঞ্চয়।
- ২৩ জাহুয়ারী—অষ্টম বাহিনীর জিপোলি প্রবেশ।
- ৩১ জাহুয়ারী—ষ্ট্যালিনগ্রাদে কন্‌পাউলসের আত্মসমর্পণ।
- ২ ফেব্রুয়ারী—ষ্ট্যালিনগ্রাদে জার্মানবাহিনীর চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ—যুদ্ধের মোড় পরিবর্তন।
- ৮-১৩ ফেব্রুয়ারী—কুরস্ক, রটোভ ও খারকোভ পুনরায় রুশ দখলে
- ২ ফেব্রুয়ারী—জার্মানীর কিরেল বন্দর থেকে সুভাষচন্দ্র বসুর সাবমেরিন যোগে জাপান যাত্রা এবং তিন মাস পরে সুদূর প্রাচ্যে উপস্থিতি।
- ২ মার্চ—বিসমার্ক সাগরের যুদ্ধ।
- ১৫ মার্চ—জার্মানদের খারকোভ পুনর্দখল।
- ২০ এপ্রিল—ওয়ারশ যেটোর হত্যাকাণ্ড।
- ২৬ এপ্রিল—কাটরান অরণ্যের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে রুশদের বিরুদ্ধে অভিযোগের জন্ত লওন পোলদের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক ছিন্ন।
- ৭ মে—মিত্র বাহিনী কর্তৃক ভিউনিগ ও বিজার্টা দখল।
- ১১ মে—চার্চিল-রুজভেল্টের তৃতীয় ওয়াশিংটন সম্মেলন।
- ১২ মে—ভিউনিগস্‌র জার্মানবাহিনীর আত্মসমর্পণ।
- ২২ মে—ষ্ট্যালিন কর্তৃক কমিটার্ন (তৃতীয় আন্তর্জাতিক) ভেঙ্গে দেওয়ার ঘোষণা।
- ৪ জুলাই—বিপ্লবী রাসবিহারী বসু কর্তৃক সিদ্ধাপুরে সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে আই-এন-এর ভার অর্পণ।
- ৫ জুলাই—কুরস্কের যুদ্ধারম্ভ।
- ১০ জুলাই—মিত্রবাহিনীর সিসিলি দ্বীপ আক্রমণ।
- ১২-১৫ জুলাই—ওরেল দ্বীপ্তিযুগে রুশদের পান্টা আক্রমণ।
- ২৫ জুলাই—মুসোলিনীর পরচূড়িত ও গ্রেপ্তার।
- ৫ আগষ্ট—রাশিয়ানদের ওরেল এবং বেলগোরোদ দখল।
- ১৭-২৪ আগষ্ট—প্রথম কোরেবেক সম্মেলন।
- ২৩ আগষ্ট—রুশদের খারকোভ পুনর্দখল।
- ৩ সেপ্টেম্বর—মিত্রবাহিনীর দক্ষিণ ইতালী আক্রমণ।
- ৮ সেপ্টেম্বর—ইতালীর আত্মসমর্পণ।
- ৯ সেপ্টেম্বর—ভ্যালারনোতে মিত্রবাহিনীর অবতরণ।
- ১০ সেপ্টেম্বর—জার্মানীর রোম দখল।
- ২৫ সেপ্টেম্বর—রুশদের মলেনস্ক দখল।
- ৩০ সেপ্টেম্বর—মিত্রবাহিনীর নেপলস দখল।
- ১৩ অক্টোবর—ইতালী কর্তৃক জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।

- ১৮ অক্টোবর—মস্কোতে ইক্স-মার্কিন-রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন আরম্ভ।
- ১৯ অক্টোবর—ইতালীর ডলটোর্নে নদী থেকে জার্মানদের পশ্চাদপসরণ।
- ২১ অক্টোবর—সিঙ্গাপুরে নেতাজী সুভাষ কৰ্তৃক অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠা।
- ১ নভেম্বর—সলোমোন দ্বীপের বুগেনভিলে মার্কিনদের অবতরণ।
- ৬ নভেম্বর—রাশিয়ানদের কিয়েভ পুনর্দখল।
- ২২-২৬ নভেম্বর—প্রথম কায়রো সম্মেলন—চার্লিল-রুজভেল্ট-চিচিয়াংকাইসেকের মিলন।
- ২৮ নভেম্বর-১০ ডিসেম্বর—তেহরান সম্মেলন—রুজভেল্ট-ষ্ট্যালিন-চার্লিল শীর্ষ বৈঠক।
- ৪ ডিসেম্বর—দ্বিতীয় কায়রো সম্মেলন—রুজভেল্ট-চার্লিল-ইনোহু
- ২৬ ডিসেম্বর—নাংসী যুদ্ধজাহাজ শার্নহোষ্ট নরওয়ের সমুদ্রে নিমজ্জিত।

১৯৪৪

- ৭ জানুয়ারী—ইতালীতে ক্যাসিনোর পূর্বে পঞ্চম জার্মির আক্রমণ।
- ২২ জানুয়ারী—আঞ্জিওতে জার্মান সৈন্যদের পিছনে মিত্রসৈন্যদের অবতরণ।
- ২৭ জানুয়ারী—লেনিনগ্রাদের অবরোধ সম্পূর্ণ মুক্ত।
- ৪ ফেব্রুয়ারী—আজাদ হিন্দ কোজের আরাকান দখল।
- ৪ মার্চ—উজাইনে রুশ অভিযান আরম্ভ।
- ২ এপ্রিল—রুশদের কমানিঙ প্রবেশ।
- ৮-১৪ এপ্রিল—কোহিমা ও ময়রাং আজাদ হিন্দ কোজ কর্তৃক দখল।
- ২০ এপ্রিল—আজাদ হিন্দ কোজের হাতে ইন্দলের পতন শেষ মুহূর্তে বার্থ।
- ২ মে—সেবাস্তোপোল পূর্নদখল।
- ১৮ মে—ক্যাসিনো দখল।
- ২৩ মে—আঞ্জিও থেকে মিত্রবাহিনীর আক্রমণ আরম্ভ।
- ৪ জুন—ইক্স-মার্কিন বাহিনীর দখলে রোম।
- ৬ জুন—নরম্যাণ্ডিতে মিত্রবাহিনীর অবতরণ—পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গণ।
- ১০ জুন—কিনল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে রুশদের অভিযান
- ১৩ জুন—লণ্ডনে প্রথম উড়ন্ত বোমার (ডি-১) আক্রমণ।
- ১৫ জুন—জাপানের উপর প্রথম মার্কিন অতিকায় বোমারুর আক্রমণ
- ১৯ জুন—মার্কিন দখলে সাইপান দ্বীপ।
- ২০ জুন—ভীষোর্গ রুশদের দখলে।
- ২৩ জুন—বেলোরাশিয়ার রুশদের অভিযান আরম্ভ।
- ২৭ জুন—শেরবুর্গ বন্দর মিত্রপক্ষের দখলে।
- ৩ জুলাই—মিনস্ক পুনর্দখল—১ লক্ষ জার্মান সৈন্য বন্দী।
- ১৮ জুলাই—রোকোসোভস্কির বাহিনী কর্তৃক পোল্যান্ডে প্রবেশ—পিসকোভ দখল।
- ২০ জুলাই—হিটলারকে হত্যার চূড়ান্ত চেষ্টা—বোমা বিস্ফোরণের দ্বারা হিটলার আহত। অস্ত্রের জন্ত প্রাণরক্ষা।



- ২৩ জুলাই—লুবলিন দখল।
- ২৮ জুলাই—ব্রেট-লিটোভস্ক পুনর্দখল।
- ৩১ জুলাই—ওয়ারশ'র প্রবেশযুদ্ধে রুশসৈন্য।
- ১ আগষ্ট—ওয়ারশ' অত্যাধানের আরম্ভ।
- ১৫ আগষ্ট—ব্রিস্ক ফ্রান্সে মিত্রবাহিনীর অবতরণ।
- ২৩ আগষ্ট—রুম্যানিয়া কর্তৃক রুশ যুদ্ধবিরতির চুক্তি গ্রহণ।
- ২৫ আগষ্ট—প্যারিসের যুক্তি।
- ৩ সেপ্টেম্বর—বৃটিশ কর্তৃক ক্রপেলস দখল।
- ৪ সেপ্টেম্বর—রুশ-কিনিশ যুদ্ধবিরতি—এণ্টোয়ার্পের যুক্তি।
- ৫ সেপ্টেম্বর—বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণা।
- ৬ সেপ্টেম্বর—প্রথম 'ডি-২' ( উড়ন্ত বোমা ) লগুনে বর্ষণ।
- ২ সেপ্টেম্বর—বুলগেরিয়ার যুদ্ধবিরতি।
- ১০ সেপ্টেম্বর—রুশ-কিনিশ যুদ্ধবিরতি—দ্বিতীয় কোয়েবেক সম্মেলন—চার্চিল-রুজভেল্ট।
- ১২ সেপ্টেম্বর—রুম্যানিয়ার যুদ্ধবিরতি।
- ১৭ সেপ্টেম্বর—আর্নহেমের যুদ্ধ—মিত্র বিমানসৈন্যের হল্যান্ডে অবতরণ।
- ২২ সেপ্টেম্বর—রুশদের যুগোশ্লাভিয়া প্রবেশ।
- ২ অক্টোবর—ওয়ারশ' এর আত্মরক্ষাও সৈন্যদের আত্মসমর্পণ।
- ২ অক্টোবর—মস্কোতে ইডেন-চার্চিল-ষ্ট্যালিন বৈঠক।
- ১৪ অক্টোবর—মিত্রবাহিনীর এবেল দখল।
- ১২ অক্টোবর—আমেরিকানদের ফিলিপিনে অবতরণ।
- ২০ অক্টোবর—রুশ ও যুগোশ্লাভদের বেলগ্রেডে প্রবেশ।
- ২১ অক্টোবর—লেডি উপসাগরের যুদ্ধ।
- ১২ নভেম্বর—জার্মান যুদ্ধজাহাজ তিরপিৎস নিমজ্জিত।
- ২৪ নভেম্বর—ট্রাসবুর্গ দখল।
- ২ ডিসেম্বর—মস্কোতে শান্তি গল।
- ১৬ ডিসেম্বর—আর্দেনেস পার্বত্য অঞ্চলে হিটলারী পান্টা আক্রমণ—ফ্রীডি-যুদ্ধের যুদ্ধ।
- ১৮ ডিসেম্বর—উত্তর বার্মা জাপানীদের কবলযুক্ত।
- ২৭ ডিসেম্বর—সালকোজের বৃদ্ধাপেট বেটন।

১৩৪৫

- ৩ জানুয়ারী—আর্দেনেস অঞ্চলে আমেরিকানদের পান্টা আক্রমণ।
- ১৭ জানুয়ারী—রুশদের ওয়ারশ' দখল।
- ২০ জানুয়ারী—হাঙ্গেরীর অস্থায়ী সরকার কর্তৃক যুদ্ধবিরতি।
- ২৩ জানুয়ারী—সালকোজের ওডের নদীতীরে উপস্থিতি।
- ৩১ জানুয়ারী—মস্কোতে চার্চিল-রুজভেল্ট।
- ৪ ফেব্রুয়ারী—ইয়ু টাতে স্ট্যালিন-চার্চিল-রুজভেল্ট শীর্ষ বৈঠক শুরু।

৫ কেক্সারী—আমেরিকানদের ম্যানিলা দখল—রাইন নদীর দিকে মিজবাহিনীর অগ্রগতি ।

১৩ কেক্সারী—বুধাপেটের পতন

১৩ কেক্সারী—আমেরিকানদের আইওজিমার অবতরণ ।

২৩ কেক্সারী—পোজানান দখল ।

৪ মার্চ—কিনল্যান্ড কর্তৃক পান্টা জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ।

৭ মার্চ—প্রথম মার্কিন বাহিনীর রেমানন ব্রীজ দিয়া রাইন নদী অতিক্রম ।

২৩ মার্চ—মিজপক্ষের রাইন নদী অতিক্রম ।

২৩ মার্চ—রুশদের অস্ট্রিয়ান সীমান্ত প্রবেশ ।

১ এপ্রিল—আমেরিকানদের ওকিনাওয়া আক্রমণ ।

১২ এপ্রিল—গ্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মৃত্যু ।

১৬ এপ্রিল—লালকোজ কর্তৃক বালিনের দিকে চূড়ান্ত অভিযান

১৩ এপ্রিল—আমেরিকানদের হাতে লাইপ্সগ ।

২৩ এপ্রিল—লালকোজের বালিনে প্রবেশ ।

২৭ এপ্রিল—জেনোয়া ও ভেরোনার পতন—টরগাউতে মার্কিন-রুশবাহিনীর মিলন ।

২৮ এপ্রিল—পার্টিকানদের হাতে মুসোলিনী ও তাঁর প্রণয়িনী ধৃত এবং গুলিতে নিহত ।

৩০ এপ্রিল—বালিনের ভূগর্ভের আশ্রয়ে হিটলার ও ইভা ব্রাউনের আত্মহত্যা—  
—রাইখস্ট্যাগের ( বালিন ) উপর লালকোজের জয় পতাকা উত্তোলন ।

১ মে—গ্রাণ্ড এ্যাডমিরাল ডোরেনিংস কর্তৃক জার্মানীর দায়িত্ব গ্রহণ ।

২ মে—রুশদের হাতে বালিনের পতন—মিজপক্ষের নিকট ইতালীর সমগ্র জার্মান বাহিনীর আত্মসমর্পণ ।

৩ মে—মিজবাহিনীর রেলুন দখল ।

৭ মে—রেইমসে আইজেনহাওয়ারের সদর দপ্তরে জার্মান বাহিনীর আত্মসমর্পণ ।

৮ মে—বালিনে মার্শাল জুকোভের সদর দপ্তরে মার্শাল কাইটেল কর্তৃক জার্মানীর আত্মসমর্পণ হলিল স্বাক্ষর ।

৯ মে—সোভিয়েত বিজয় দিবস উদ্‌যাপন ।

১১ মে—ওকিনাওয়ার পতন ।

২৬ জুন—স্রাল ফ্রান্সের দ্বারা বিখ্য নিরাপত্তা সনদে স্বাক্ষর ।

২৭ জুলাই-২ আগস্ট—পটসডাম সম্মেলন ( ট্রিয়ান, ট্যালিন, চার্লিল এবং এ্যাটলি )

৬ আগস্ট—হিরোশিমাতে প্রথম অ্যাটোমিক বা পারমাণবিক বোমা বর্ষণ ।

৮ আগস্ট—সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ।

৯ আগস্ট—নাগাসাকিতে ষষ্ঠীয় অ্যাটমবোমাবিক্ষোরণ—মাকুরিমাতে রুশআক্রমণ ।

১৪ আগস্ট—জাপান কর্তৃক বিনাশর্তে আত্মসমর্পণে সম্মতি ।

১৮ আগস্ট—ভাইহাকুতে ( করমোকা ) বিমান দুর্ঘটনার নেতাজী হত্যাবচন বন্ধ  
যুদ্ধাসংবাদ প্রচার ।

২ সেপ্টেম্বর—টোকিও উপসাগরে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ মিনোরিতে জাপান কর্তৃক আত্মসমর্পণের হলিল স্বাক্ষর এবং ষষ্ঠীয় মহাবুদ্ধের অবসান ।



# বাল্টিক সাগর





নবম পর্ব/তৃতীয় অধ্যায়

কুমার সৈন্যের

বার্মিন অভিযান

১৭ ই এপ্রিল - ১৯৪৫

১৯৪৫

আক্রমণের ধারা ←

বার্মিন শ্রিদিয়া  
আংটি আকারে  
সড়ক

পটসডাম

বার্মিন

বুকাও

কুমোচিন

ক্রাকভুর্ট

ওসর

প্রবেন

লুকাও

কুটবাস

বটেনবার্গ

টরগাও

কুমার সৈন্যের  
সাহিত্যিক  
মিনত

ড্রেসডেন







# পশ্চিম প্রান্ত মহাসাগর

পশ্চিম প্রান্ত মহাসাগর

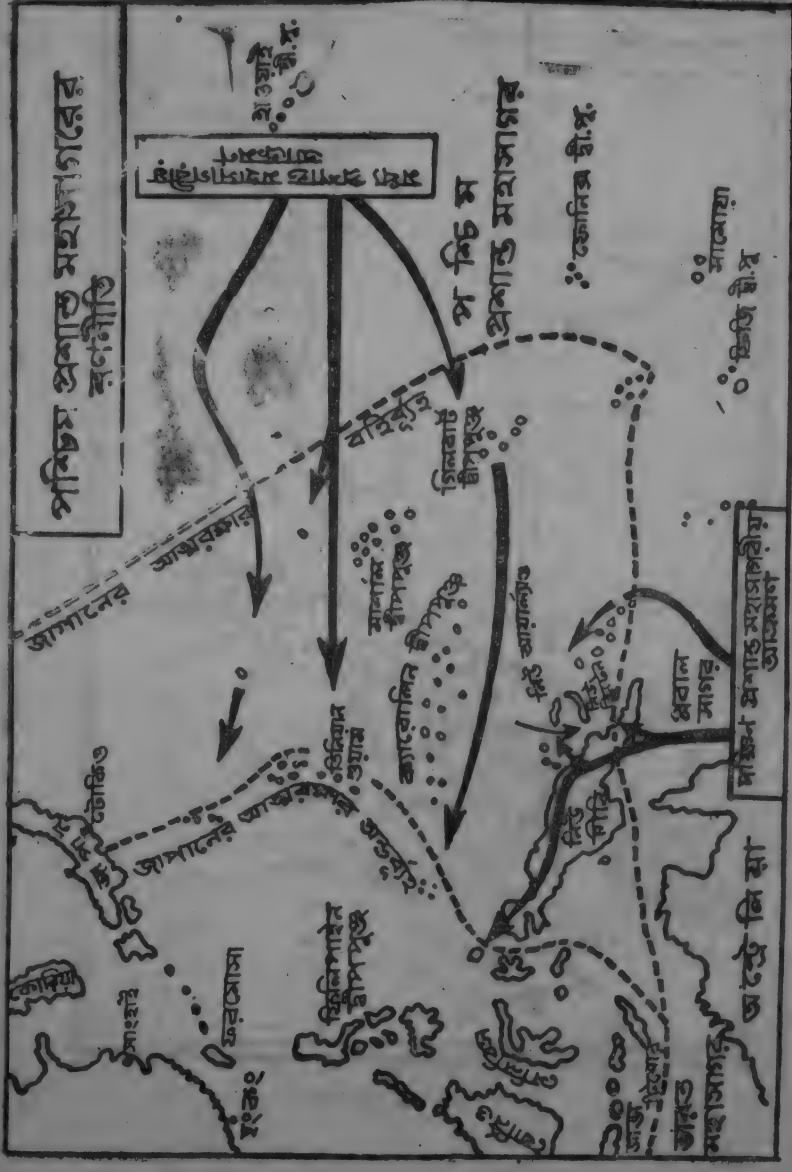
পশ্চিম প্রান্ত মহাসাগর

পশ্চিম প্রান্ত মহাসাগর

পশ্চিম প্রান্ত মহাসাগর

পশ্চিম প্রান্ত মহাসাগর

পশ্চিম প্রান্ত মহাসাগর



পশ্চিম প্রান্ত মহাসাগর



# নির্দেশিকা

স্থানাভাবের জন্য বিস্কৃত নির্দেশিকা দেওয়া হয় নাই  
কেবল প্রধান বিনয় ও নামের উল্লেখ করা হইয়াছে।

অক্ষমতি	৪৭, ৭৭, ২১৩, ২২৩, ২২৫, ২৩১, ২৩৩	অপারেশন সীলারন	২৫, ২০৬, ২০৭, ২৬২, ২৬৫	
অভ্যাসিতিক প্রাচীর	৮১১, ১০৩০	"	২৫ ২৩৪	
অভ্যাসিতিক সনদ	৩৭০-৩৭২, ৬৫৫, ১০০৬	আইবস্টাইন, আলবার্ট	১১৮১-১১৮২,	
অভ্যাসিতিক সম্মেলন	৩৭০ ৩৭৪	১১৮৩		
অপারেশন আইসবার্গ	১১৭৩-১১৭৫	আইসোলেশনিস্ট পলিসি	৬, ৩৬৪	
"	কৈগল	২০৩	আউসভিৎস বার্কেনাউ	২৪৭-২৪৮, ২৫০
"	এ্যাটলা	২২৬	আগষ্ট বিপ্লব	৭৮২-৭৮৩
"	এ্যান্ডিস	৮৮	আজাদীহন্দ সরকার ( কৌজ )	২২৩-২২৮
"	ওক	৬৮৫-৬৯০	আন্তর্জাতিক বিচারালয়	১১২৮
"	ওভারলর্ড	৭৫২-৭৬০, ৭৬১,	আর্কাডিয়া	৪৪১-৪৪৪
৭৬৭, ৮১৫, ৮১২, ৮২৮		অ্যান ফ্রাঙ্ক	২৬০, ২৬২	
"	টেমপেটে	৮৫৮	আইফেন বুক	৫৮৬
"	ভাগন	৮২৮	ইউরোপীয় সনদ	৬৫৫-৬৫৭
"	কেলিন	২২৬	ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেন্ডেন্স লীগ	২২১-২২২
"	ক্লাস	৮৩৩-৮৩৪	ইভা ব্রাউন	১০৮৫ ১০৮৭,
"	বারবারোসা	২৬, ২০৭, ২৪৮,	১০৮৮, ১০২৬	
২৬৫-২৭১, ২৭৩-২৭৭, ২৮০, ৫৫৫		ইয়'ন্টা সম্মেলন	২৮৫-১০০২,	
"	মার্কেটগার্ডেন	২৬৩	১০২৭, ১১২১	
"	মোরিটা	২৩৪	উইলহেলমিনা, রানী	১৪৬
"	হার্বিকউলিস	৪২১	এটলি	১১৪৫
"	হার্বি	৬৬২	এডলফ হিটলার লাইন	৮১৬
"	হিমলার	১০৮-১০৯	এন্টোয়াপ' নাম্বর লাইন	১৪৮, ১৪৯
"	ক্লসহায়াস	৪৫১, ৪৫৮	এল গাজালা লাইন	৪৪৩
"	সানক্লাওয়ার	২৩৪	ওপেনহাইমার	১১৮৫-১১৮৬,
"	সানরাইজ	১০৭৪	১১৮৭-১১৮৮	
"	সিটাডেল	৭২০-৭২৫		

ককেশাশ বুদ্ধ	৫৭৩ ৫৮২	চার্লিস	২২, ৫৬, ৫৭, ২১৬,
কমিউনিষ্ট পার্টি, জার্মান	১৬, ১৮, ২০	২১৫, ১১২৫, ১১২৬, ১১২৮	
কমিউনিষ্ট বিপ্লব	১০	—প্রধানমন্ত্রী	
কমিউটার্স-বিরোধী চুক্তি	৪৫	পদগ্রহণ	১'৮-১৩২
কাইজার, দ্বিতীয় উইলহেল্ম	১৭২	চিয়ানো, কাউন্ট	৭৪-৮০, ৬৮৭-৬৮৯
কালীচরণ ঘোষ	৭৮৫	চিয়াংকাইশেক	৭৪৮-৭৫৩, ৭৭৮, ৮৮২,
কার্যে সম্মেলন	৭৭৪, ৭৭৮ ৭৫৫	৮২০ ৮২৩	
কার্জ'ন লাইন	৭১৩, ৭১৮, ৮৭২,	চীনেব রাষ্ট্রবিপ্লব	১১২৬ ৪২
৮৭৩, ১০০৩, ১০০৪, ১০০৫, ১০০৬, ১১৫৩		চেম্বারলেন	৪৬, ৪৭, ৫১, ৫৭, ১১০ ১১১
কুইজলিং	১৩১-১৩৩	চেম্বারলেন হিটলার সাক্ষাৎকার	৫৫-৫৮
কুইট ইণ্ডিয়া	৭৮১		
কেনেডি, জন এক.	১১৪৬	জওহরলাল নেহরু	৭৭৭, ৭৭৮, ৭৮২
কোডো	৩৭১	জাতীয় কংগ্রেস	৭০৪
কোয়ান্ডর্যাণ্ট সম্মেলন	৭৩৭, ৭৩ ৭৪১	'জাতীয় পার্বত্য আশ্রয়'	১০২৫-১০২৬,
কোয়েক সম্মেলন (দ্বিতীয়)	৮৭৭ ৮৭৭	১০২৩	
ক্যাসান্সা বৈঠক	৫২৫-৫৪০, ৭৩৪	কিমিয়াই	৪৫৮
ক্রিপস মিশন	৪৩২, ৪৭৬, ৭২ ৭৮১	জেনারেল এসেবলি	১১২৮
ক্রুশ্চভ, এন-এস.	২৮৪	জেনেভা কনভেনশন	১২৫২
ক্রারা পেভাকিও	১০৭৮, ১০৮১-১০৮৩		
ক্রেমের লাইন	১০৮	'টর্চ' (অপ রেজেন—)	১৬১, ৪৬৫, ৪৬৬,
খারকোভ অভিযান	৫৬৭	৪৬৭, ৫০০, ৫১২-৫১৩, ৫১৬ ৫২০, ৫৩৮	
গান্ধীজী	৭৭৭, ৭৮১	ট 'ফ্রু' (অপারেজেন—)	৩৩২
গুস্তাভ লাইন	৮১৫, ৮১৬	টানাকা	৪২
গোয়েবেলস্	৩১, ৩৩, ৭৫, ১১০২	টিটো, মার্শাল	৭৬২ ৭৭০, ১১৩২
গোয়েব'িং	২০, ৩৩, ৫০, ৭৭, ২১, ২৩, ১০৬১-১০৬৩, ১০৬৬-১০৬৭, ১২৬৩, ১২৬৮	টোকিও সামরিক	
গ্রাৎসিয়ানী	২১০, ২১১, ২১৫, ২৩৭	আদালত (বিচার)	১২৭০-১২৭৭,
গ্র্যাণ্ডস্ট্যাটেজী	৪৭৪	—গঠন	১২৭০
চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী	৭৭৬	—অভিযুক্ত ব্যক্তি	১২৭১
		টুটস্কি	৪৩
		টিডেট	৭৩৪, ৭৩৬-৭৩৭

ইন্ম্যান	১১১৫, ১১১৬, ১১৩৭-১১৩৭	নুই হাম্মন	১০২-১৩০
১১২৭, ১২৪৫-১২৪৬		নেতাজী সুভাষচন্দ্র	২১৮-২২১, ২২২,
ঠাণ্ডা লড়াই (বুক)	১১৫২, ১১৫৫	২২৩, ২২৪-২২২	
ডর্নজিগ বন্দর ও পোলিশ		নেপোলিয়ন	১১১, ৫, ১২৩
করিডর	৬২-৬৩, ৭৮, ৮০, ৮৫-৮৬, ৮৭	ক্লাশনাল সোসিয়েলিষ্ট	
ডন বাকের বুক	৫৮৬-৫৮৭	দল (নাৎসী)	১১, ১৮, ২৫-২৬, ২৮-২৯
ডটমুণ্ড	২৮২	পঞ্চম বাহিনী	১৩২, ১৩৩
ডায়াবটন ওকস্		পঞ্চাশের মধ্যস্থর	৭৮৪-৭৮৬
( ওয়াশিংটন ) সম্মেলন	২২৫, ১১২৩	পটসডাম সম্মেলন	২২৭, ১০০৫, ১১৪৪
তৃতীয় আন্তর্জাতিক		১১৫৪, ১১৮৮	
( কমিন্টার্ন )	৭০২-৭১০	—৫ পারমাণবিক বোমা	১১৫৫-১১৬৭
তৃতীয় রাইখ	৩০, ১০৫৫	পারমাণবিক বোমা	
তৃতীয় রিপাব্লিক	১৮২	আবিষ্কার ও নির্মাণ	১১৭২-১১৮৬
তেহেরান সম্মেলন	৭০৪, ৭৫৫ ০১৬	— প্রথম বিস্ফোরণ পরীক্ষা	১১৬০-১১৬১,
ভোজো	৩৮৪, ৩৮৫, ৩২৩,	১১৮৬ ১১৮৮	
২২১, ১০১০, ১২৪০-১২৪১, ১২৭৩		—হিরোশিমা ও নাগাসাকি	১১৮৮-১২৭
দার্দানেলিসের বুক	১৩৬	পলবেগো	১৪০, ১৫১, ১৬৫
দালান্দিয়ের	৪৭, ৫১, ৫৫, ৫৭,	পিলসুর্কি, মার্শাল	১০২
১১৬, ১৭০		প্রথম মহাবুক	২, ৫, ৭, ১৩
ডা গল, চার্লস	১৮২, ১২৪, ২০১,	৭৭৭ ৭ বিপ্লব	৭, ১৮২
৩৬২, ৫০১-৫১১, ৫২০-৫২১, ৫২২-৫২৫,		কিনিস ভূগোল্যাটিক রিপাব্লিক	১১০-১২১
৫৪০, ৮৬৭, ৮৬৬ ৮৬৮, ৯১২		ক্যাসিজম্	১৩-২
নরমান বিজয়	১২৩	'কোমি ওয়ার'	১১১-১১২
নাম্বু মেজিয়র্স লাইন	১৫২	ক্রাকো	৬০, ৬৪, ২২০ ২২৭
নিউ ডাচ ওয়াটার লাইন	১৪৫	ক্রি ক্রাল	৫০৩, ৫০৭, ৫০২, ৫১০
নীলস বোয়ের	১১৮৪	ক্রেন্ডরিক দি গ্রেট	৮৭
হ্যারেমবার্গ আদালত		এলকান রাজা (অকল)	২, ৩, ২২৮
( বিচার )	৮৮-৮৯, ১২৪৮-১২৬৯	বিসমার্ক	৭১, ৮৭
—গঠন	১২৫১-১২৫২	বেনেস	৫২, ৫৪, ৫৫
— অভিব্যক্তি ব্যক্তি ও		ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা	১১২০-১২০২
সংগঠন	১২৫২-১২৫৪	ব্যাটল অফ দি আটলান্টিক	৪৭৮
বিচার্য অভিযোগ	১২৫৪		

ব্যাটল অফ দি বালক	২৭০-১৭৬	মৌলানা আজাদ	৭৭৮
ব্যাস্টিল দিবস	১৮৩	ম্যাগিনো লাইন	১১৩, ১৪৩, ১৬৭,
ব্রহ্মযুদ্ধ	৪৩৪-৪৩৭	১৭৪-১৭৫, ১৭৭, ২১৫	
ব্রেট লিটোভেঙ্কের সন্ধি	১০, ৬৪৫-৬৪৬	ম্যানহাটন প্রোজেক্ট	১৮৫
ব্রাক সাটস	১২	ম্যানস্টাইন প্লান	১৬৭, ১৬৩
ভারত রক্ষা আইন	৭৭৫, ৭৮২, ৭৮৪	ম্যানারহাইম লাইন	১৬৮, ১২২, ১২৩
ভারতের কনিউনিটি পার্টি	৭৭৬, ৭৮৮-৭৮৫	রবীন্দ্রনাথ, কবিগুরু	৭৩৫-৭৩৮
ভার্হু'ন যুদ্ধ	১২৩	রাইখস্টাগ	৩২, ৩৩, ১৩৫, ৬৪০, ১০৩৩
ভিক্টোরিয়া, মহারানী	১	রাবারফোর্ড, লর্ড	১৮০
ভিগি গভর্নমেন্ট (সরকার)	১৭৫, ২১৩, ২২৫, ৫০৪, ৫০৭, ৫০৯, ৫১৩ ৫১৮	রাধাবিনোদ পাল	১২৭০, ১২৭৩-১২৭৭
ভিয়েনা বাটোয়ারা	২'২, ২৪১	রাসবিহারী বসু	৩২১, ৩২২, ৩২৪, ৩২৭
ভেইমার কনফিটিনশন	১৬, ১৮, ২৩	রিবেনট্রপ-মলোটচ লাইন	১০৮
ভের্সাই সন্ধি	৪ ৫, ৮, ৩, ১০	রুশ জাপান অনাক্ষয় চুক্তি	২৫০, ৩৩৩
মনরো ডকট্রিন	১৬৩, ৩৬৫, ৩৬৭	রুশ-জার্মান অনাক্ষয় চুক্তি	৩৬, ৬৬-৭৩
মর্গেনথোট প্লান	৩৩৬	রুশ-কিনিশ যুদ্ধ	১১৭-১২১
মহাজোট (গ্র্যাণ্ড অ্যালায়েন্স)	৩৪৩, ৪৪০-৪৫১, ১০১৭, ১০৫৪, ১২৩৩	রুজভেল্ট, প্রেসিডেন্ট	৩৮, ১২৫, ২০৬, ৩৬২
মস্কো সম্মেলন (জিণজিক)	৭৩৪, ৭৪২-৭৪৫	—মৃত্যু	১০৩৪-৩৭
মস্কো বড়ঘর বয়লা	৪৩	—মৃত্যুর প্রতিজ্ঞা	১০৩৭-১৭৪১
মা ও সে-তুং	৮৮৩, ৮৩৫	রোমেল, এরউইন	৪১৮ ৪৫২, ৫৩৮-৫৩৩
মার্কিভ, ডক্টর এবং	১১৮৬	—মৃত্যু	৮৪৬-৮৫০
মার্টিন, বোরম্যান	২৬১, ১০৬৬-১০৬৭	লিওপোল্ড, রাজা	১৪৭, ১৫১
মিউনিখ চুক্তি	৪৩ ৫০, ৫২, ৫৭-৫৮, ৫৩, ৬১, ৬৪	লীগ অব নেশন (বিশ্বরাষ্ট্রসংঘ)	৪, ৫, ৬, ১১, ৩৩, ৪০, ৪৩, ৪৪, ২১৭, ২৩০, ৩৮৩, ৩৮১
মুসোলিনী	৫৭, ৭৪, ২০৮, ২০৯,	লেনিন	৩৮২-৩৮৩
—ভূমধ্য সাগরীয় রণনীতি	২২৩-২২৭	লেনিনগ্রাদ অবরোধ	৩১২-১১৫
—পতন	৬০৭-৬৭৬	লোকার্ণো সন্ধিচুক্তি	৩-১০, ৩৭, ৩৩-৪৪
—হিটলার কর্তৃক উদ্ধার	৬৭৭-৬৮০	লোকার্ণো সম্মেলন	৪২, ১২৫৮
—চরম দণ্ড	১০৭২-১ ৮৪	হাইলে সেলাসী	২১৩
মেরিন কাম্পক্	২৬-২৭	হাকন, রাজা	১৩২
মেটাক্সাস লাইন	২৩৮		

হিটলার, এডলফ—প্রথম জীবন	২১-৩৬	সম্মিলিত জাতিগুণ	
—কমডালাভ	৩০-৩২, ৩৫ ৩৬	( ইউনাইটেড নেশন্স )	৪৪৪-৪৪৭, ১০২৩-১০২৭
—কুম্ভাগাগরীর রণনীতি	২২০-২২৭	সিগক্রীডলাইন	১১৩, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৭৮
—হত্যার চেষ্টা	৮৩৭-৮৪৬	সিকিউরিটি কাউন্সিল	
—অন্তিম পর্যায়	১০৫২-১০৭১	নিরাপত্তা পরিষদ	২২৫, ১১২৭, ১১২৮
—বিবাহ	১০৮৮	সুন্দর	১২৩৩
—শেষ ইচ্ছাপত্র	১০৮৯-১০৯১	সুপার ব্যাটল	১৫৩
—আত্মহত্যা	১০৯৪-১০৯৬	সুশনিগ	৪৬
হিগেনবুর্গ	১২, ২২, ৩১, ৩৩	সেবেস্তা পোল	৫৫২-৫৬৬
হিমলার	১০৬৩ ১০৬৪, ১০৬৯ ১০৭০	সোভিয়েত-কিনিশ শান্তি চুক্তি	১২৩
হিরোহিতে, সম্রাট	৩২৭, ৪০৭, ১২১৭-১২১৮, ১২২১, ১২২২-১২২৩, ১২২৭ ১২২১	সোভিয়েত বিপ্লব	৩৭
হেস, রুডলফ	২৫৩ ২৬৪, ২৬৯	সোভিয়েত বিরোধী চুক্তি	৩৩১
হো-চি-মিন	১২৩০	ষ্ট্যালিন	৬১-৬২, ৫০০-৫০২, ১১১৫
হোহেনজোলার্ন রাজবংশ	১৬	ষ্ট্যালিনগ্রাদ অবরোধ	৫২০-৫২৮
হ্যামবুর্গ রাজবংশ	২	ষ্ট্যালিনগ্রাদ ভরবারি	৭৬৪
হারি হপকিন্স	৩৫২ ৩৫৭, ১১৩১-১১৪৩	স্পার্টাকাস লীগ	১৬
শিন্ন বিপ্লব	১, ৩, ৫	স্পেনীয় গৃহযুদ্ধ	৪৫-৪৬, ৬০
শ্রীমন্তাগবদগীতা	১১৮৭-১১৮৮	স্ত্রানফ্রান্সিঙ্কো সম্মেলন	১০২৩-১০২৩
স্লিকেন প্ল্যান	১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭৬	স্ত্রানজবুর্গ শীর্ষবৈঠক	৬৫৩-৬৬০
		স্ত্রালে ফি পার্লিক	১০৭১, ১০৭৬